সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র

আবুল ফজল

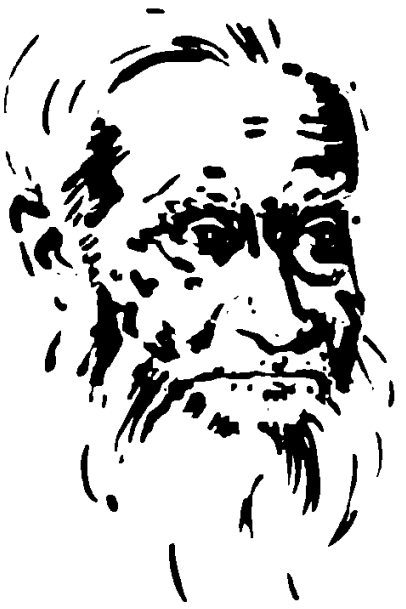

আবুল ফজল
জন্ম : ১৯০৩ মৃত্যু : ১৯৮৩
[শিল্পী আবুল মনসুর অঙ্কিত স্কেচ]

আবুল ফজল কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং মননশীল চিন্তাবিদ। ভাবনা ও ভূমিকায় তিনি জাতীয় ব্যক্তিত্ব।

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত এ জাতির যে রূপান্তর ও উত্তরণ তার পেছনে ভাবগত প্রেরণার জোগানদারদের অন্যতম ছিলেন আবুল ফজল। সে ভাবাদর্শে সদ্য স্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন যেমন দেখেছেন তেমনি তার জন্যে প্রেরণা সঞ্চার ও পথনির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বৃদ্ধবয়সেও।

কিন্তু বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধি ও উদারনৈতিক মানবতার ধারা এবং তাঁর অতি আস্থার সমাজতন্ত্রের গতিপথ বিশীর্ণ হয়ে পড়েছে আজ। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মত্ততার মধ্যে দিশেহারা জাতি আবুল ফজলের সাধনা ও শিক্ষার কথা ভাবতে তেমন আগ্রহী নয়।

তবুও এত প্রতিকূলতার মধ্যেও আবার অনেকেই আছেন তাঁর প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাঁর ভাবনা ও লেখার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সচেতন। অনেকেই ভাবছেন নতুন প্রজন্মের সাথে আবুল ফজল ও তাঁর চিন্তাবিদদের পরিচয় ঘটানো জরুরি। তাঁর জীবনে উত্তরণের ও চলমানতার এবং সময়ের কঠিন প্রতিকূলতা ও জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার পর্বগুলো সচেতন তরুণদের পথ চলার পাথেয় হতে পারে।

– আবুল মোমেন

©
লেখক

দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ ২০১৩
গতিধারা প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০৫
প্রকাশক
সিকদার আবুল বাশার
গতিধারা
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : (+৮৮০২) ৭১১৭৫১৫, ৭১১৮২৭৩
e-mail : gatidhara2008@yahoo.com
info@gatidhara.com
fax : (+8802) 7123472
website : www.gatidhara.com

পরিবেশক
বইপত্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সিকদার আবুল বাশার

কম্পিউটার কম্পোজ
গতিধারা কম্পিউটার
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৩০০ টাকা

ISBN 984 [illegible]

উৎসর্গ

কাজী আবদুল ওদুদ

ও

মরহুম আবুল হোসেন

আমার লেখক-জীবনের শুরুতে যাঁরা আমাকে

যুক্তি আর মুক্তবুদ্ধির পথ দেখিয়েছেন

তাঁদের মধ্যে এ দুজনের নাম সর্বাগ্রে স্মর্তব্য।

নিবেদন

কেউ কেউ আমাকে আজো 'কথাশিল্পী' বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন। কিন্তু কথাশিল্প বল্লে যা মনে করা হয় তেমন শিল্প বা সাহিত্য আমার দ্বারা খুব বেশি রচিত হয়নি, যাওবা হয়েছে তাও জীবনের প্রথম ভাগে। ইচ্ছা থাকলেও, যে ইচ্ছাটা আজো আমাকে মাঝে মাঝে উতলা করে– তাতে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। তবে কথা আমি বলেছি অনেক, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক বিষয়ে অনেক কথা আমাকে বলতে হয়েছে, অনেক সময় বাধ্য হয়েছি বলতে।

বলতে চাই না তবু আমাকে দিয়ে আজো কথা বলায়– দেশ বলায়, সমাজ বলায়, ছাত্ররা বলায়, অ-ছাত্ররাও না বলিয়ে ছাড়ে না। নিজের মনের তাগাদায়ও কম কথা বলি না। এখন বারো মাসে তেরো পার্বণ নেই বটে কিন্তু তেরো দ্বিগুণে ছাব্বিশটা সভা-সমিতির পালা আছে, অনেক সময় চেষ্টা করেও ঐ সবের হাত থেকে রেহাই পাই না আর ঐ সবে যাওয়া মানে কথা বলা। তাছাড়া আছে বেতার, সংবাদপত্র, সংহতি, কৌন্সিল ইত্যাদি শতেক রকম সংস্থা, সে সবও আমাকে দিয়ে কথা বলায়।

নীতি আর স্বাস্থ্যগত কারণে এর অনেকগুলিই যে আমার এখন পরিহার করে চলা উচিত তা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি কিন্তু অনুরোধ এলে সর্বাগ্রে সে বিশ্বাসটাই স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে যায়। আমার এ দুর্বলতাটা অনেকের জানা। অনেকে বিশেষ করে ছাত্রেরা এর পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থাকে। এর ফলেও কথা বলার দায়িত্ব এসে পড়ে। তবে যে-ই বলাক আমি সব সময় নিজের কথাই বলে থাকি। কথা এবং কণ্ঠস্বর দুই-ই আমার নিজের।

দুনিয়াটা আজ আগের দিনের মতো অজ্ঞাত আর অশ্রুত নেই, বিদেশও এখন প্রায় স্বদেশ হয়ে উঠেছে। ফলে তাবৎ দুনিয়ার খবরাখবরও প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে আমাদের মনের দুয়ারে, যার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমাদের হয়তো কোন সম্বন্ধই নেই। এ সবের প্রতিও চোখ-কান বন্ধ করে থাকা কোন সচেতন লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তার ওপর যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা শিল্প আর শিল্পীর এক স্বভাব। তেমন বড় শিল্পী না হলেও সে স্বভাব-দোষটা আমারও আছে। স্বীকার করছি নির্লিপ্ত শিল্পী

বা লেখক আমি হতে পারিনি, পারিনি অন্যায়, অবিচার দেখে একেবারে চুপ মেরে থাকতেও। বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও কথা বলেছি, না বলে পারিনি বলে। কেউ কোন কথা বলছে না দেখলে নিজের দায়িত্বটা যেন আরো বেশি করে বেড়ে যায়। এ আমার একটা ঝোঁক।

এ সব অবস্থার হেরফেরে পড়ে আর মনের অস্বাভাবিক তাগাদায় এ কয় বছরে বিভিন্ন বিষয়ে যে সব কথা আমি প্রবন্ধাকারে বলেছি বা বলতে বাধ্য হয়েছি, তার থেকে বাছাই করে এ সংকলনটি প্রকাশিত হলো। লেখাগুলোর সাহিত্যিক মূল্য গুণী পাঠকদের বিচার্য, তবে আমার বিশ্বাস সংকলিত লেখাগুলিতে এ দশকের একজন অ-প্রধান বা মাঝারি লেখকের, যিনি সব সময় চিন্তা করে লিখতে চেয়েছেন, তাঁর চিন্তা আর মন-মানসের কিছুটা পরিচয় হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

যাঁরা সাহিত্যের এ দিকটায় আগ্রহী আর নিজের সমাজ, সাহিত্য আর রাষ্ট্র সম্বন্ধে ভাবতে চান ও ভাবেন, প্রধানত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এ লেখাগুলি নিবেদিত হলো।

সংকলিত সব কয়টি লেখা ইতিপূর্বে কোন না কেন সাময়িকপত্রে ছাপা হয়েছে, ঐসব পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের সহৃদয়তার কাছে আমি ঋণী আর ঋণী এ বইয়ের প্রকাশক বন্ধুবর মোহাম্মদ নাসির আলীর কাছে।

বৈশাখ, ১৩৭৫
সাহিত্য নিকেতন, চট্টগ্রাম।

আবুল ফজল

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাহিত্যের ভূমিকা	১১
ঐতিহ্য কথাটার অর্থ কি	১৪
আধুনিক মন : আধুনিক সাহিত্য	১৭
রাজনীতি বনাম বুদ্ধিজীবী	২০
আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে	২৩
বাঙালি সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ	২৬
শিক্ষা আর শিক্ষকের সমস্যা	৩৪
ইতিহাসের আহ্বান	৪১
আমার সেরা লেখা	৪৪
আমি যদি আবার লিখতাম : চৌচির	৪৬
রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ	৪৯
বই পড়া	৫৬
নবী ও জাতীয় পতাকা	৫৯
সকল মানুষের নবী	৬৩
বৌদ্ধধর্ম ও বিশ্বশান্তি	৬৭
ইসলাম ও কম্যুনিজমে পার্থক্য	৬৯
ছায়া-ছবির কথা	৭৪
আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাঙ্গালা	৭৭
মুসলিম সাংবাদিকতার একটি সংগ্রামী অধ্যায়	৮৫
সমাজ ও সংবাদপত্র	৯৭
মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন	১০৩
যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে	১০৬
সাহিত্য ও সাহিত্যিক	১০৮
পাঁচটি উপন্যাস	১১১
মাতৃভাষার দাবি ও একুশে ফেব্রুয়ারি	১২২

দুই

সমাজতন্ত্র : জাতীয় চরিত্র ও সমাজ বিপ্লব	১২৮
শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ	১৩৫
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	১৪৭
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রসঙ্গে	১৫৮
কবিয়াল রমেশ শীল	১৬৩
হবীবউল্লাহ বাহার	১৬৭
ঘরের বউ	১৭১
কবি দৌলত উজির বাহরাম খান	১৭৩
দেশ ও দশের ছাত্র-সমাজ	১৮২
নব-বর্ষের বাণী	১৯৩
আমিত্বহীন আমি	১৯৫
লেনিন	১৯৭
মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	২০২
সমাজ ও সাহিত্য	২১৪
জাতীয় দৃষ্টিভংগী	২১৯
বুদ্ধের জীবন-দর্শন	২২৩
হিপ্পোক্রেটিক শপথ অনুষ্ঠানে ভাষণ	২২৬
আর্টগ্যালারি বা চিত্রশালা	২২৯
সাহিত্যের উপকরণ	২৩৩
আজাদী-উত্তর কথা-সাহিত্যের ভাষা	২৩৬
সমালোচনা	২৪২
সাহিত্য বনাম প্রকৃতি চেতনা	২৪৬
ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি দ্য গল হতে পারতেন	২৪৮
সুকর্ণ	২৫৭
ভাষা ও সাহিত্য	২৬৪
রাষ্ট্র ও আইনের শাসন	২৭৬
ম্যাক্সিম গোর্কি	২৮২
সাহিত্য বিদ্রোহ	২৮৫

সাহিত্যের ভূমিকা

চিন্তা, ভাব, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা এ সবই যেমন একদিকে সাহিত্যের উপজীব্য তেমনি অন্যদিকে এ সবকে জাগিয়ে তোলা, এ সবের দিগন্ত প্রসারিত করাও সাহিত্য-শিল্পের এক প্রধান ভূমিকা। আর এ সবেরই ফলশ্রুতি যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, তমদ্দুন এ সার্থক মানব-চেতনা এ বিষয়েও বোধকরি দ্বিমত নেই। বলাবাহুল্য চিন্তাই এসব কিছুর মোল উৎস। তাই চিন্তার উত্তরাধিকার সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার— মহত্তম মিরাছ। চিন্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ একই সূত্রে নিবিড়ভাবে গ্রথিত। যুগ যুগ ধরে চিন্তার বিচিত্রধারা আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছে ভাষা আর সাহিত্যকে। ফলে চিন্তার বৈচিত্র্য আর সমৃদ্ধির সাথে সাথে ভাষা আর সাহিত্যও হয়ে উঠেছে বিচিত্র আর সমৃদ্ধ। ভাবের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে ও চিন্তার জোয়ার এলে তার প্রকাশেও গতিশীলতা আর বর্ণবৈচিত্র্য অনিবার্য। তাই ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও বিকাশ হয়েছে অবাধ ও বহুমুখী।

সামান্য ক্ষীণকণ্ঠের কান্না আর ক্ষুদে ক্ষুদে হাত-পা নাড়া নিয়ে যার অস্তিত্বের সূচনা তার মধ্যে যে চিন্তা ও ভাবের এমন অগ্নিগর্ভ উৎস রয়েছে তা ভাবা যায় না। তাই অবাক কণ্ঠে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস (Frank Harris) এমন ধর্ম বিরোধী উক্তি করতেও দ্বিধা করেননি : "The course of the progress of human thought is to me the only revelation of God." হ্যারিসের এ উক্তি শুনে মার্কস নাকি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন : 'Wonderful! Excellent!' অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিরুদ্ধ-প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে চিন্তার এ ক্ষুদ্র বীজটুকুই ছিল মানুষের একমাত্র হাতিয়ার। এ হাতিয়ার দিয়েই সে আত্মরক্ষা করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেকে, করেছে দিগ্বিজয়, হয়েছে এমা সব কিছুর ওপরে— সৃষ্টির সেরা বলে লাভ করেছে স্বীকৃতি।

সে চিন্তা আজ আমাদের সাহিত্যে অনেকখানি অস্বীকৃত— একদল প্রাচীন চিন্তার খাবর কেটেই আত্মতৃপ্ত, অন্যদল পরিবেশ আর জীবন বিচ্ছিন্ন এক রকম পল্লবগ্রাহিতাতেই খুঁজছে নিজেদের আত্মপ্রকাশের পথ। বলাবাহুল্য এর কোনটাই সাহিত্যে সার্থকতার পথ নয়। এ দুইই জীবনবিমুখিতা শুধু নয় বাস্তববিমুখিতাও। ফলে সাহিত্য-শিল্পের যে আসল ভূমিকা— ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সমন্বয় সাধন, তা আমাদের মনের দিগন্ত থেকে আজ অনেকখানি অপসৃত। আঙ্গিকে চমৎকারিত্ব আর ভঙ্গি আজ যতখানি আমাদের সাধনা আর চিন্তার বিষয় সে অনুপাতে নবতর কোন চিন্তার স্ফুলিঙ্গ খোঁজায় ও সন্ধানে আমরা অনেক বেশি উদাসীন। চিন্তার তেমন কোন চমক আজো আমাদের রচনায় অনুপস্থিত। নবতর ভাবের তথা চিন্তার সন্ধান দুরূহ ব্যাপার কিন্তু তার জন্য অনলস সাধনা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো অপরিহার্য— লেখকের তো ঐ পথ।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যের অনেকখানি যে বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্যের ফলশ্রুতি বিদেশী বই পড়ে পাওয়া তাতে সন্দেহ নেই। (এ কথা নিন্দা অর্থে বলছি না) কিন্তু বিদেশী

সাহিত্যে শুধু তো আঙ্গিক চর্চাই হচ্ছে না, চিন্তা চর্চাও হচ্ছে। বহু পথ মাড়িয়ে এসে এলিয়ট শেষে ধর্মে জীবনের সমন্বয় খুঁজেছেন— সাঁর্ত্রে সন্ধান করছেন তাঁর অস্তিত্ববাদে। এসব অভ্রান্ত সত্যের পথ নাও হতে পারে কিন্তু এঁদের সন্ধান বা অসীম পরীক্ষা-নিরীক্ষাটা তো মিথ্যা নয়। শিল্পীর জন্য পৌছাটা বা গন্তব্য তো কোন কালেই বড় কথা নয়— চলাটাই বড় কথা। আর সে চলা হবে নিজের শক্তি অনুসারে নবতর চিন্তার পথে। যা প্রকাশেও নবত্ব আর বৈচিত্র্য না এনে পারে না।

বলা হয় শিল্প জীবনের অনুকরণ— আদিতে হয়তো তাই ছিল শিল্পের ভূমিকা। আর তখন তার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল আনন্দ দেওয়া। মানুষের জীবন এযাগত বিশ্বের সঙ্গে সংগ্রামের জীবন— এ সংগ্রামের ভিতর দিয়েই সে বিশ্বের সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে। এ সমঝোতা বা সমন্বয় সন্ধান নানাভাবে নানারূপে সাহিত্যে-শিল্পে প্রতিফলিত। এ সমন্বয় সন্ধানের যেমন ইতি নেই তেমনি সাহিত্য-শিল্পেরও নেই ইতি। তাই সাহিত্য অনন্ত পথের পথিক।

সমাজের আদিম রূপ অবিকৃত নেই কোথাও— সমাজের সর্বত্র ক্রমাগতই রদবদল চলছে। ফলে জীবনের সমন্বয় প্রচেষ্টার রূপেরও ঘটছে বদল। সাহিত্য-শিল্পে যুগান্তর বা রূপান্তরেরও মৌল কারণ এখানেই। সাহিত্যের ভূমিকা শুধু অতীত, বর্তমানে সীমিত নয়— ভবিষ্যৎও তার চিন্তাভাবনার বিষয়, তার বিষয়বস্তু ও উপজীব্য। বিশ্বের সঙ্গে জীবনের মিতালি একদিন, দু'দিনের ব্যাপার নয়— অনন্তকালের সমস্যা। জীবিতদের ছাড়িয়ে অজাতদের সীমা পর্যন্ত তাই শিল্পীর দৃষ্টি প্রসারিত। তবে বর্তমানের প্রতি দায়িত্ব পালন না করে ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা স্রেফ আকাশ-কুসুম রচনা।

সময়ের পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভূমিকারও পালাবদল ঘটতে বাধ্য— কথাটাই বলতে চাচ্ছি। তা উপলব্ধির জন্য চিন্তা আর ভাবের কর্ষণ প্রাথমিক শর্ত। ভাবের অভাব ঘটলেই আঙ্গিকের চাকচিক্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুন্দরীর জন্য প্রসাধন বা অলঙ্কারের আধিক্য বাহুল্য। সাহিত্য যদি চরিত্রের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জীবনের সংগ্রামে তথা জগতের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে সাহিত্যের যে বিশেষ ভূমিকা তা পরিণত হবে ব্যর্থতা-হতাশায়। তাই সাহিত্য ও সব রকম শিল্পকর্মে চিন্ত বা ভাবের কিছুটা তড়িৎ-স্পর্শ থাকা চাই। 'The thing that gives people courage is idea.' (জর্জ ক্লিমেনসো) রোমাঁ রলাঁ আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন : 'Every honest idea, even when it is mistaken, is sacred and divine'

'পবিত্র' বা 'ঐশ্বরিক' এসব কথার ওপর আমি কোন জোর দিতে চাই না। কারণ আধুনিক মানুষের কাছে তার কোন আবেদন নাই। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাব অর্থাৎ আইডিয়া অমূল্য বলে লেখকের কাছে তা মূল্যবান। মোপাসাঁকে নাকি ফ্লুবার্ট (Flaubert) লেখা সম্পর্কে এ উপদেশটুকু দিয়েছিলেন : 'Mistrust everything. Be honest, Be straight-forward. Despise cleverness.' আজ আমাদের কাছে শেষোক্তটাই কি অগ্রাধিকার পাচ্ছে না? শুধু রচনায় নয় জীবনেও আজ আমরা অনেক বেশি 'চালাক'। এ ব্যাপারে প্রবীণরা নাকি নবীনদের ছাড়িয়ে গেছেন। ভাব কা

লেখার ব্যাপার তো 'চালাকি' নয়। মনের ভিতর বেশ কিছুটা গভীর উপলব্ধি থেকেই তার জন্ম। আশ্চর্য, আমরা আজ আমাদের প্রবীণ লেখকদের কাছ থেকেও কোন চিন্তার কি ভাবের কথা শুনতে পাচ্ছি না। সততা আর সত্যভাষণ ছাড়া কোন রচনাই সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। এই দুই গুণ ছাড়া রচনায় পরিণতি লাভও সম্ভব নয়।

সন্দেহ বা কিছুটা অবিশ্বাসও শিল্পের ক্ষেত্রে মূল্যহীন নয়। ইবনে রুশদ বলেছেন— 'মনের গোড়া হলো সন্দেহ'। যে বহির্জগতের সঙ্গে নিয়ত সমঝোতার সংগ্রামই মানুষের লিপিলিপি, বিনা প্রশ্নে তার সব কিছু মেনে নিলে হাতিয়ারের ধারটাই যায় ভোঁতা হয়ে— মানুষের পরিবেশ তথা সমাজ-সভ্যতা সব কিছুই তখন হয়ে পড়বে স্থবির। জিজ্ঞাসা তাই শিল্পী মনের এক বড় শর্ত— বহু প্রেরণার এক উৎস-মুখ। এর ফলে সাহিত্য হয় বিচিত্রগামী, হয়ে ওঠে বহুমুখী।

আমাদের সাহিত্যে আজ এ বহুমুখিনতার অভাব। লেখকের আয়ত্তের বাইরে এমন নানা কারণেও আমাদের লেখকরা হতে পারছেন না জিজ্ঞাসা-মুখর বা বেপরওয়া। সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে সমাজ বা রাষ্ট্রকে আরো সহিষ্ণু হতে হবে। এ সহিষ্ণুতার পথ রচনার দায়িত্ব কিন্তু সাহিত্যিক-শিল্পীদের। রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে এ পালাবদল ত্বরান্বিত করা যেতে পারে বটে কিন্তু সে তো পেশাদার রাজনীতিবিদদের দ্বারা হবে না। আর সাহিত্যিক-শিল্পীরা বা তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে কোনদিন শরিক হবে তাও ভাবা যায় না। তাই ঐ পথ পরিত্যাজ্য। কোন বুদ্ধিসম্পন্ন কোন রাজনৈতিক দল যদি আইনের সাহায্যে তেমন একটা পরিবেশ গড়তেও চায়, জনসাধারণের সার্বিক সমর্থন ছাড়া তাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের সমৃদ্ধি, বৈচিত্র্য, নব নব পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুঃসাহসিক অভিযান সব কিছুই নির্ভর করছে পাঠক বা জনসাধারণের ওপর। তাদের গড়ে তোলার দায়িত্ব লেখকদের। বিভিন্ন, বিচিত্র আর নব নব চিন্তা পরিবেশন ছাড়া— অবশ্য সাহিত্যের লেবাসে এর অন্য কোন পথ আমার জানা নেই। 'আমোদ' দিয়ে এ হবে না এ বিষয় আমি স্থির নিশ্চিত। 'আমোদ' সংগ্রামের আনুষঙ্গিক হতে পারে— মৌল উপাদান হতে পারে না কিছুতেই। একমাত্র সুস্থ চিন্তাই জীবনের সমন্বয় সাধনে সক্ষম। সে চিন্তার অভাব আমাদের সাহিত্যে পরিলক্ষিত বলেই কথাটা উত্থাপন করলাম। রচনায় চিন্তার দিগন্ত আরো প্রসারিত করার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। আমাদের মানে লেখকদের।

১৯৬৬

ঐতিহ্য কথাটার অর্থ কি

হালে ঐতিহ্য কথাটা নিয়ে খুব মাতামাতি চলছে। আমি নিজেও যে এতে শরিক হইনি তা নয়। টি.এস. এলিয়টের কল্যাণেই কথাটা বেশি চালু হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের ত্রিশের লেখকরাই এলিয়টকে বাংলা সাহিত্যে আমদানি করেছেন ব্যাপকভাবে এবং তাঁদের দ্বারাই এলিয়ট প্রায় ঘরোয়া হয়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যসেবীদের নিকট। মননশীলতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব ঢেউই পূর্ব পাকিস্তানে তটে এসেও তরঙ্গাঘাত হানে। অন্তত সাম্প্রতিক যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ ঘটেছে। এখানে এলিয়টের জনপ্রিয়তার অনুপ্রবেশও এপথে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা স্বতন্ত্রভাবে এলিয়টকে আবিষ্কার করেননি— স্বাধীনভাবে, স্বকীয় কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে করেননি তাঁর চর্চাও। এখানকার এলিয়ট-চর্চা ওখানকারই প্রতিধ্বনি। সম্প্রতি বোদলেয়ারেরও সে দশা।

ফলে ঐতিহ্য সম্বন্ধে তেমন স্পষ্ট ধারণা আমরা এসব আলোচনা থেকে পাইনি বললে বোধকরি মিথ্যা বলা হবে না। এর আগে আমাদের সাহিত্যে ঐতিহ্য নিয়ে এমন আলোচনা-সমালোচনা কখনো হয়নি— দেখিনি এ নিয়ে কাকেও মাথা ঘামাতে। অবশ্য লেখকদের কথাই বলছি।

মাঝে মাঝে এমন অবান্তর প্রশ্নও শোনা যায়, পাকিস্তান— পূর্ব বাংলা সাহিত্য আমাদের ঐতিহ্য কিনা— রবীন্দ্রনাথকে আমরা ঐতিহ্য হিসেবে নিতে পারি কিনা বা এমনতরো আরো বহু প্রশ্ন। বলাবাহুল্য এসবই হালে উত্থাপিত। আমরা যারা পাকিস্তান কায়েমের বহু আগে থেকে লেখা শুরু করেছি, তাদের মনে এ প্রশ্ন কোনদিন জাগেনি এবং কোন সমস্যা হয়েও তা দেখা দেয়নি। সাহিত্যের যে সার্বজনীন ঐতিহ্য তা আমাদের অনেকের মনে, হয়তো ব্যাপক সাহিত্য পাঠের ফলেই আপনা থেকে দানা বেঁধে উঠেছে। পরিবেশ আর মানুষ— এ দুই-ই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ও উপজীব্য। এ দু'য়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই সাহিত্য। অবশ্য লিপি-কুশলতা বা রচনার শিল্পরূপ সাহিত্যের এক অপরিহার্য শর্ত। এর তারতম্যের ওপর সাহিত্যের মান, জনপ্রিয়তা, স্থায়িত্ব ইত্যাদি অনেক কিছুই নির্ভর করে। Ernst Fischer রচনার এ গুণকেই বলেছেন— Magic। রচনায় এ ম্যাজিক বা জাদুটুকু অত্যাবশ্যক, এ না হলে তাঁর মতে 'Art ceases to be art'। শুধু কথা বা বক্তব্যসর্বস্ব লেখা শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে না। শিল্প মানে রূপদক্ষতা।

সাহিত্য মানে একদিকে কথা অন্যদিকে তার শিল্পরূপ। সাহিত্যের ঐতিহ্য কথাটারও বিচার এ পরিপ্রেক্ষিতে। জীবন থেকেই সাহিত্যের উজ্জীবন যেমন, তেমনি জীবনের জন্যই সাহিত্য, জীবনই সব শিল্পের লক্ষ্য। তাই জীবন বিচ্ছিন্ন হলে সাহিত্যের চলে না— অভিজ্ঞতার উত্তাপটুকু না হলে রচনা নিষ্প্রাণ আর সংবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। অধীত ঐতিহ্য তাই মূল্যহীন ও নিষ্ফল— অমন ঐতিহ্য নির্ভর সার্থক কোন শিল্পকর্মের নজির আমার জানা নেই। রূপ বা আঙ্গিক অনুকরণ বা অনুসরণ করা যায়, যেমন মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। কিন্তু রচনার মূল বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ ঐতিহ্যেরই অনুসারী।

ঐতিহ্য কথাটা আমাদের সাহিত্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অধীত ঐতিহ্য আর অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যে রয়েছে আসমান-জমিন ব্যবধান। আজ আমাদের অনেকের মানস-চেতনার খোরাক হয়েছে অধীত ঐতিহ্য— সে আরব-ইরানেরই হোক কিংবা ইউরোপ-আমেরিকা কি সোভিয়েত রাশিয়ারই হোক। অধীত ঐতিহ্য থেকে প্রয়োজনবোধে আমরা স্রেফ কাঠামোটাই নিতে পারি। কিন্তু সে কাঠামোয় প্রাণ সঞ্চার করতে হবে অভিজ্ঞতালব্ধ ঐতিহ্যের ওপর রচনাকে দাঁড় করিয়ে। তাই রচনায় অভিজ্ঞতা সবচেয়ে মূল্যবান। মোট কথা অভিজ্ঞতাই ঐতিহ্য—ঐতিহ্যই অভিজ্ঞতা। জাতিগত অভিজ্ঞতাও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপায়িত হয়ে সাহিত্যের ঐতিহ্য হয়ে ওঠে। কারণ লেখকই রচনা করে সাহিত্য। জাতি একটা ভৌগোলিক এলাকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে— তাই ঐতিহ্য গঠনে ভূগোলের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। লেখক উত্তরাধিকার সূত্রেই এ ঐতিহ্য পেয়ে থাকে। এমনকি অজ্ঞাতেও এ ঐতিহ্যের প্রভাব এড়ানো লেখকদের পক্ষে সম্ভব নয়। রচনার এ স্থানিক রংটুকু রচনাকে করে তোলে আকর্ষণীয় ও অধিকতর সংবেদ্য। অধীত তথা অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ঐতিহ্য ধার করা বলেই অনেকখানি কৃত্রিম। রচনায় তার সম্পর্ক প্রায় তেল-জলের মতোই। নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা', কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' বা 'মীরপরিবার', কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ', জসীম উদ্‌দীনের 'কবর' বা 'নকসী কাঁথার মাঠ', পরবর্তী রচনা আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লার 'লাল সালু' ইত্যাদি লেখকদের পরিবেশ চেতনা আর অভিজ্ঞতারই যে ফল তাতে সন্দেহ নেই। প্রায় আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছর আগে আমি 'চৌচির' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। কাঁচা হাতের রচনা। তবু এ রচনা রবীন্দ্রনাথেরও কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল— কারণ এতে ফুটেছে একটি বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার চিত্র যা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক হয়েও তাঁকে আনন্দ দিতে পেরেছে। উপরে যেসব লেখকের নাম করলাম তাঁরা কেউই উল্লেখিত রচনাগুলি লেখার সময় এলিয়ট চর্চা করেছেন বলে আমার মনে হয় না। এসব রচনা উচ্চ শিল্পোত্তীর্ণ রচনা নয়, কিন্তু বড় কথা এসবের গায়ে কৃত্রিম বা অধীত ঐতিহ্য-চেতনার কোন ছাপ নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা'ও লেখকের অভিজ্ঞতা আর স্থানিক ঐতিহ্য চেতনারই ফল। অধীত তথা আহরিত ঐতিহ্যে লেখক পণ্ডিত হলেও সে ঐতিহ্য এ রচনার কাঁধে সিন্দবাদের দৈত্য হয়ে বসেনি। এ রকম আরো যে রচনা নেই তা নয়, তবে এ ক্ষুদ্র আলোচনায় সব বইয়ের নাম উল্লেখ সম্ভব নয়। কয়েকটি সুপরিচিত রচনার নাম উল্লেখ করে আমি বলতে চাচ্ছি, লেখকের অভিজ্ঞতাই বড় কথা, এ অভিজ্ঞতায় জারিত না হলে সব ঐতিহ্য-চেতনাই ব্যর্থ। স্রেফ ঐতিহ্য-চেতনা সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা জোগাতে পারে না।

তথাকথিত বিদগ্ধ কবি আর লেখকদের সম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কাও এখানে— তাঁরা বিদেশ বা বৈদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে যতখানি বিদগ্ধ, নিজের দেশ, পরিবেশ ও সমাজ সম্বন্ধে ততখানি নন। দেশজ ঐতিহ্য আর অভিজ্ঞতায় তাঁদের রচনা জারিত নয় বলে তা অনেক ফাঁকা ফাঁকা আর কৃত্রিম মনে হয়। জসীম উদ্‌দীনের রচনায় দুর্বলতা বা শৈথিল্যের সংখ্যা প্রচুর; কিন্তু তাঁর রচনা সর্বতোভাবে অকৃত্রিম— লেখকের অভিজ্ঞতা আর মনোভূমি থেকেই তার উদ্ভব। পুরোপুরি শিল্পোত্তীর্ণ না হলেও এমন রচনার সাহিত্যিক মূল্য

অনস্বীকার্য। উপরে যে কয়টি রচনার নাম করেছি ঐগুলিও কিছুমাত্র অসামান্য সাহিত্য নয়— স্রেফ আন্তরিকতা আর লেখকদের অভিজ্ঞতার অকৃত্রিমতাই— যাকে ঐতিহ্যচেতনাও বলা যায়, ঐগুলিকে বাতিলের কোঠায় ফেলেনি।

বিদেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্য বা তার সাধনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন নেই তেমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আজকের দিনে তেমন কূপমণ্ডুকতা সম্ভবও নয়। বিশেষত সাহিত্যিক-শিল্পীদের শিল্পী হওয়ার প্রাথমিক শর্তই তো সচেতনতা— সচেতনতার দিগন্ত আজ আর ভূগোলে আবদ্ধ হয়ে নেই। শিল্পীকে আজ দাঁড়াতে হচ্ছে বিশ্ব-চেতনার দর্পণের সামনে এসে। কাজেই এলিয়ট-বোদলেয়ার কেন, বিশ্বের তাবৎ বিশিষ্ট লেখকদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে— সব সাহিত্য থেকেই আমরা গ্রহণ করব মনের খোরাক। জৈবিক আহার্য হজম হয়ে যেমন রক্তে পরিণত হয়, জোগায় আমাদের ধমনিতে শক্তি, তেমনি বাইরের সাহিত্যও যদি আমাদের শিল্প-চেতনাকে দৃঢ়তর করে, মনের দিগন্তকে বাড়ায়, আর শিল্পের বিচিত্র প্রকাশকে যদি আমাদের মনে নিবিড় করে তোলে, তাহলেই তার সার্থকতা। কিন্তু ঐ তো ঐতিহ্যের ভূমিকা নিতে পারে না। ঐতিহ্য লেখকের নিজের অভিজ্ঞতারই ফল।

অভিজ্ঞতারও দুই রূপ বটে— ব্যবহারিক ও মানসিক। মানসিক অভিজ্ঞতা অনেকখানি অধীত, তাতে সন্দেহ নেই— কিন্তু এ অভিজ্ঞতা ব্যবহারিকের সঙ্গে একাত্ম না হলে অর্থাৎ তা স্রেফ খেয়ালী বা অবাস্তব থেকে গেলে তা রচনাকে 'আন্তরিক' ও অকৃত্রিম করে তুলতে অক্ষম।

আজ আমাদের অনেকের মানসিক অভিজ্ঞতার দিগন্ত বেড়ে গেছে এ কথা সত্য: কিন্তু ব্যবহারিক বা বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সম্পর্ক তেল-জলের মতো থেকে যাচ্ছে বলেই আপত্তি। ফলে রচনায়ও ঘটেছে তার প্রতিফলন! না হয় আমিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বাস করি 'গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না। যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলেই ভাবনা নেই।' ঐতিহ্য কথাটার সঙ্গেও কালে কালে অনেক আবর্জনা জমে ওঠে— কারণ শব্দেরও অনেক মোহ। জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন অনেক কিছুই ঐতিহ্যের নামে আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। কাজেই সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি শব্দ থেকেও মোহমুক্ত থাকতে হয়। জীবনের মাপকাঠিতে বিচার করেই ঐতিহ্যের করতে হয় বিচার। যাচাই করতে হয় তার প্রয়োজনীয়তা। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জীবন এগোয়, বাড়ে, প্রসারিত হয়, হয় উজ্জীবিত। কাজেই জীবন তথা অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে যে ঐতিহ্য টিকবে না তাকে বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করাই উচিত।

যে ঐতিহ্য সমসাময়িক অর্থাৎ যার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক রয়েছে— যা জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম একমাত্র সে ঐতিহ্যই সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য। কারণ সাহিত্য জীবনের জন্য— জীবন সাহিত্যের জন্য নয়।

১৯৬৬

আধুনিক মন : আধুনিক সাহিত্য

পুরোনো হলেও অনেক কথা বারবার স্মরণ করতে হয়। বিশেষত সাহিত্য ও শিল্পের ব্যাপারে। মানুষের মতো সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্যও পুরোনো। পরিবেশের বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেরও বদল ঘটে। বদল ঘটে বলেই মনের যে ফসল— যাকে আমরা মানুষের সৃজনী-প্রতিভার অবদান বলে অভিহিত করে থাকি তাতেও পরিবর্তন ঘটে— অন্তরঙ্গে যেমন বহিরঙ্গেও তেমনি। এ পালাবদলের চিহ্ন এঁকে এঁকেই সাহিত্যশিল্পের অশেষ অভিযাত্রা।

মনের মতোই তা যেমন পুরোনো ও চিরন্তন তেমনি গতিশীল ও গ্রহণশীল। তাই গতিধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে শত পরিবর্তন মেনে নিয়েও মনের মতোই সাহিত্যশিল্পেও চিরন্তনতার উপস্থিতি অপরিহার্য। এ না হলে পুরনো শিল্পকর্ম কবেই বাতিল হয়ে যেত— এমনকি দূর অতীত যুগে পরিবেশিত নন্দনতত্ত্বকেও তো আমরা পারছি না আজো অস্বীকার করতে। শিল্প সম্বন্ধে এরিস্টটলের মতামত তাই আজো পরম শ্রদ্ধেয়।

বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের সাহিত্যান্দোলন নামে পরিচিত শিল্প-সচেতনতার যে একটা ঢেউ উঠেছিল যার তরঙ্গাঘাত পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে এসে পৌঁছেছে অনেক পরে— বিভাগোত্তর কালেই, সে আন্দোলন বা ঢেউয়ের মৌল ত্রুটি বা কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সজাগ না হলে ওখানে তার যে শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে আমরাও তার হাত থেকে রেহাই পাব না। সাহিত্যের যে মৌল উৎস নিজের মন ও পরিবেশ বা উভয়ের সংগতি সাধন, অতি উৎসাহ বা সাহিত্যে 'নবত্ব' আনয়নের মোহে ওখানকার শিল্পীরা তা আমলেই আনেননি সেদিন; ফলে তাঁদের অধিকাংশ রচনাই হয়ে পড়েছে 'কৃত্রিম' আর 'ভুঁইফোড়'। প্রতিভা আর প্রস্তুতি সত্ত্বেও এ কারণে তাঁদের কেউ সার্থক শিল্পীর মর্যাদায় পারেননি পৌঁছতে। ঐ আন্দোলনের তিন পুরোধা— প্রেমেন্দ্র মিত্র আশ্রয় আর স্বস্তি খুঁজেছেন সিনেমায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত রামকৃষ্ণে আর বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারে! বোদলেয়ারের কাব্যে-উৎস আর পরিবেশ বাঙালি সাহিত্যিকদের জন্য 'গ্রিক' বল্লে খুব কম বলা হয়— 'কেতাবি আনন্দের' বেশি তাঁর কাছে আশা করা বাতুলতা। 'বৈদেশিক উৎসের' ওপর নির্ভর করলে শিল্পীকে হতাশার শিকার হতেই হবে। বিশ বছর সংগ্রামের পর 'কবিতা' বন্ধ করে দিয়ে বুদ্ধদেব বোদলেয়ারে আশ্রয় খুঁজেছেন! যেমন তাঁর বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র আশ্রয় নিয়েছেন দেশী সিনেমায় আর অচিন্ত্য সেনগুপ্ত রামকৃষ্ণে— এও এক রকম স্বদেশী ধর্মীয় 'ছায়াছবি' বই তো নয়। পার্থিব আর অপার্থিবের এমন জগাখিচুড়িই কি সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষ্য ও আদর্শ? সাহিত্যের ইতিহাসে বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়ার নজিরের বেশি এসবের কোন মূল্য নেই। অথচ আমাদের কোন কোন সাহিত্যকর্মীকে তাই যেন আজ পেয়ে বসেছে। আশ্চর্য, যে ঘোড়াটা পশ্চিমবঙ্গে মরে প্রায় ভূত হয়ে গেছে আমাদের এসব সাহিত্যকর্মীরা প্রাণপণে তাকেই পিটিয়ে চলেছেন।

আমাদের সাহিত্য আজ এ এক অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন— এ কৃত্রিমতার অকারণ মোহ ছাড়তে না পারলে আমাদের সাহিত্যে যাকে 'স্বকীয়তা' বা 'চরিত্র' বলা হয় তার

পরিচয় ফুটে উঠবে না।

যুগ-জিজ্ঞাসায় সব সাহিত্যই আধুনিক— কিন্তু এ আধুনিকতার পটভূমি সব সময় শিল্পীর মন আর পরিবেশ। সাহিত্যের মূল প্রেরণা-উৎস মন বটে কিন্তু পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন মন আশ্রয়চ্যুত বলে সে মন যে শিল্প-বস্তুর প্রেরণাস্থল সে শিল্পেরও আশ্রয়চ্যুত বা কৃত্রিম না হয়ে উপায় নেই। আধুনিক যুগ তথা আধুনিক মন এক বিচিত্র আন্তর্দ্বান্দ্বিক জটিলতার সম্মুখীন— তার সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত। সমস্ত পৃথিবী আর গোটা মানবজাতিই আজ শিল্পীর সামনে— কিন্তু পায়ের তলার সীমিত মাটিটুকুর আশ্রয় না হলে এবং সে আশ্রয় শক্ত না হলে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে শিল্পী আজ এ বিরাটের সঙ্গে মোকাবিলা করবে? শিল্পীর সামনে আধুনিক যুগের এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জের সামনে হাওয়াই দুর্গ নিরাপদ আশ্রয় নয়— হাওয়াই হাতিয়ার দিয়েও জেতা যাবে না এ লড়াই। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখিত শিল্পীদের মতো পার্থিব কি অপার্থিবের নির্ঝঞ্ঝাট পক্ষ-পুটে আত্ম-পলায়নই হবে আমাদের শিল্পীদেরও ভাগ্যলিপি।

এখন পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষ শিল্পীর মনের এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে, যে-কোন সৎ শিল্পী আজ মানবতন্ত্রী না হয়েই পারে না। ফলে যুগ-সচেতনতা বা যুগ-জিজ্ঞাসা তাঁর পক্ষে আজ অপরিহার্য। এ না হলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পরিবেশের সঙ্গে বিরোধ আর অবিরাম সংঘর্ষ— তার ফলে হতাশা ও অতৃপ্তি। যা অনেকের ক্ষেত্রে বিষণ্ণতায় পরিণত। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে তাই আত্ম-সমালোচনাই বড় হয়ে উঠেছে— যেহেতু চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা য়ুরোপের অনুগামী আমাদের সাহিত্য শিল্পেও তাই তার ছায়াপাত না ঘটে পারে না। আমাদের সচেতন শিল্পীদের রচনারও এ কারণে এক বড় বৈশিষ্ট্য আত্মসমালোচনা।

সাহিত্যে ও শিল্পে আত্মসমালোচনার এক বিশেষ মূল্য রয়েছে— বলাবাহুল্য এটা ইউরোপীয় রেনেসাঁরই দান। এর ফলে মানুষ সংকীর্ণতার হাত থেকে রেহাই পায়, মনের দিগন্ত যায় বেড়ে, নিজের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়, আর মূল্যবোধ সম্বন্ধে হয়ে ওঠে অধিকতর সচেতন।

আধুনিক সাহিত্য রচনা করতে হলে চাই আধুনিক মন। মনে যদি আধুনিকতা সম্বন্ধে সুষ্ঠু কোন ধারণা না থাকে তাহলে আধুনিককালে রচিত হলেও তা আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করবে না। শুধু আঙ্গিকে আধুনিকতার কোন মানে হয় না— আঙ্গিক নির্ভর রচনার আয়ু কোন সময় দীর্ঘ নয়। সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা তরুণী সুন্দরীর মৃতদেহের প্রতি মানুষ এক নজরের বেশি ফিরে তাকায় না, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণা জীবন্ত সাঁওতাল তরুণীর প্রতি বয়োবৃদ্ধও ফিরে ফিরে তাকায়! আঙ্গিকনির্ভর রচনা একবারের বেশি দু'বার কে পড়ে দেখে!

পাঠকে পাঠকেও বেশকম আছে বইকি। সচিত্র সিনেমা পত্রিকার পাঠক-সংখ্যা যে অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাঁটি শিল্পী কি অমন পাঠক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? আর ঐ পাঠকনির্ভর সাহিত্যের প্রসার হলেই কি কোন দেশের সাহিত্য-শিল্পের প্রসার ও সমৃদ্ধি হয়েছে বলে ভাবা যায়? কোন মহৎ সাহিত্যের প্রধান অংশ কি রম্য-রচনা বা সিনেমা সাহিত্য?

তাঁর যুগে অস্কার ওয়াইল্ড কম আধুনিক ছিলেন না, আজকের দিনেও তিনি অনাধুনিক হয়ে যাননি। এ আঙ্গিকনির্ভর আধুনিকতা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য :

"It is a huge price to pay for a very poor result. Pure modernity of form is always somewhat vulgarizing."

আমি নাম করতে চাই না— এরি মধ্যে আমাদের কারো কারো কোন কোন রচনায় রূপের আধুনিকতার এ দুর্লক্ষণ কি দেখা দেয়নি?

আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আশাবাদী। আমাদের নতুন যাত্রার এ সামান্য কাল-পরিসরে অগ্রগতি যেটুকু হয়েছে এবং যে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তা নিরাশ হওয়ার মতো নয়। তবে আমি সব রকম হীনম্মন্যতার বিরোধী— অনুকরণ, অন্ধ অনুকরণ হীনম্মন্যতারই আর এক নাম। সৃজনী-প্রতিভা ব্যক্তিকেন্দ্রিক— ব্যক্তি-মন আধুনিক হলে অর্থাৎ আধুনিকতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হলেই সাহিত্যে আধুনিকতার আবির্ভাব অনায়াসে হবে। সে সাহিত্যে লেখক যেমন, পাঠকও তেমনি খুঁজে পাবে, দেখতে পাবে নিজের চেহারা।

ধার করা জামা-কাপড়ের মতো ধার করা আধুনিকতাও অশোভন, বেমানান।

১৩৭১

রাজনীতি বনাম বুদ্ধিজীবী

রাজনীতি আজ মোটেও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। পৃথিবীব্যাপী রাজনীতি আজ এমন এক সার্বিক রূপ নিয়েছে যে, এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে চাইলেও উদাসীন থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনটুকুও আজ তার শিকারে পরিণত বলে অন্তপুরিকারাও তার হাত থেকে পাচ্ছে না রেহাই। এমনকি ছেলেমেয়েরাও না। যার বিরাট হা সমস্ত জীবনটাই এমনভাবে গ্রাস করে নিয়েছে যে তার কামড় থেকে কারো রেহাই পাওয়ার কথা নয়। দেশব্যাপী ছাত্র অসন্তোষের মূল কারণও এখানে। আগে ধর্মের তথা পারিবারিক আর সামাজিক ঐতিহ্যের একটা সুষ্ঠু ভূমিকা ছিল। আজ সে ভূমিকাও রাজনীতির কুক্ষীগত। ধর্ম আর ঐতিহ্যের যে পরিবেশ আর আবেদন তার সঙ্গে তুলনায় রাজনীতির পরিবেশ আর আবেদন শুধু যে স্বতন্ত্র তা নয় সম্পূর্ণ বিপরীতও বটে।

রাজনীতির সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক এত অঙ্গাঙ্গি যে স্বভাবতই ক্ষমতার যা দোষ-ক্রটি তা রাজনীতিরও দোষ-ক্রটি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত অনুন্নত দেশে এ প্রায় অনিবার্য। ক্ষমতায় নিরপেক্ষতা অর্জন এক দুঃসাধ্য সাধনা, কারণ ক্ষমতা নিজেই এ সাধনার পরিপন্থী। সব ঐতিহ্যের মতো রাজনৈতিক ঐতিহ্যও দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। বরং অন্য সব ঐতিহ্যের তুলনায় রাজনৈতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে প্রয়োজন অধিকতর সময়ের।

ধর্মের সম্পর্ক অনেকখানি ব্যক্তিগত আর তা জড়িত মৃত্যুর পরে যে জীবন সে জীবনের স্বার্থের সঙ্গে। আর ঐ জীবন সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সে সব মতামতেরও বিবর্তন ঘটেছে অসম্ভব রকম দ্রুতগতিতে। বিবর্তন না ঘটলেও তাতে মানুষের সামাজিক জীবনে বিশেষ কিছু এসে যায় না। কিন্তু রাজনীতির বেলায় এমন কথা বলা যায় না, কারণ রাজনীতি ধর্মের মতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়— ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলে তা আর রাজনীতিই থাকে না। ঐরকম হয়ে পড়লে রাজনীতির যা উদ্দেশ্য তা হয়ে যায় ব্যর্থ। রাজনীতি দেশের সমষ্টিগত জীবন তথা সমাজ দেহেরই প্রতিভূ। কাজেই ওখানে কোন বিকৃতি ঘটলে তা সমস্ত সমাজ-দেহে ছড়িয়ে না পড়ে পারে না।

রাজনীতি আজ কোথাও স্রেফ শাসক-চক্রে সীমিত হয়ে নেই। রাষ্ট্রনায়ক থেকে পাড়াগাঁর ক্ষুদে দিনমজুরটি পর্যন্ত আজ রাজনীতির শৃঙ্খলে বাঁধা। নাস্তিক বা নাস্তিক্য নিয়ে আজ কারো দুর্ভাবনা নেই কিন্তু রাজনীতি আর রাজনীতিবিদ আজ সবারই দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এমনকি পীর-মুর্শেদদের ব্যাপক কর্মতৎপরতার আর প্রভাব কার না লক্ষ্যগোচর?

পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে আজ মানুষের বিশ্বাস আর আকর্ষণ অনেকখানি শিথিল আর সন্দিগ্ধ— কালক্রমে তা যে আরো শিথিল আর প্রায় বিশ্বাসহীনতায় গিয়ে ঠেকবে তাতেও সন্দেহ নেই। এখনি তা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার একটি নজিরের উল্লেখ করছি।

কোন এক ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যারা টাকাকেই একমাত্র মোক্ষ মনে করে এবং টাকার চেয়ে বড় কিছু সংসারে আছে এ যাদের ধারণায় স্থান পায় না তাদের একদল লোককে একজন মাওলানা বলা হলো : তোমরা যে এমন কালোবাজারি আর দুর্নীতির সাহায্যে এত টাকা রোজগার করছো এর ফল একদিন তোমাদের বিনা ডালডায় মাছ ভাজা করে

যাবে। কথাটা তারা তাদের ধর্ম-নেতার গোচরীভূত করলে তিনি নাকি তাঁর শিষ্যদের এ রকম আশ্বাস দিয়েছেন : কুচ পরওয়া নেই, যেভাবেই হোক টাকা তোমরা করে যাও আর দিয়ে যাও যার যার অংশ আমার ধর্মভাণ্ডে। টাকায় কিনা হয়, পরে নরকটারই একটা অংশ লীজ নিয়ে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য এয়ারকন্ডিশন করে নেবো।

হয়তো এ এক শিথিল বিশ্বাসের বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে নিয়ে পরিহাস করারই এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। তা হলেও শিক্ষিতজনের— পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে এই তো আজকের মনোভাব। পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাস শিথিল হওয়া মানে ধর্ম সম্বন্ধেই বিশ্বাসের শৈথিল্য। কারণ ধর্মের আয়ু আর স্থায়িত্ব পুরোপুরি নির্ভরশীল পারলৌকিক জীবন বিশ্বাসের ওপর। নানা আশা ও আশ্বাস দিয়ে এমন বিশ্বাসীদের পরলোকের জীবনকে তথা পরলোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঠাণ্ডা করা যায় বটে কিন্তু ইহলোকের জীবন তো এত সোজা নয়। জীবত মানুষের সমাজে সব কিছুই বাস্তব আর প্রত্যক্ষ, সব কর্মেরই প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। একজনের ত্রুটিতেও এখানে নেমে আসে বহু জীবনে বিপর্যয়— নষ্ট হয়ে যায় সামাজিক ভারসাম্য আর স্থিতিশীলতা। রাজনীতি এ বাস্তব-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই তার ভূমিকাও এতো গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির খপ্পরে পড়ে আজ সব রকম মূল্যবোধ, সততা আর নীতি ধুলায় লুণ্ঠিত। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের হুঁশিয়ারি স্মরণীয় :

"Politics in every country has lowered the standard of morality, has given rise to a perpetual contest of lies and deceptions, cruelties, hypocrisies and has increased inordinately natural habits of vainglory."

আমরা যারা লিখে থাকি, অনির্দিষ্ট অর্থে যাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়, রাজনীতিকে এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষেও আজ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা আছে কিনা এ প্রশ্ন সহজেই এসে পড়ে। রাজনীতির নেশা মদের নেশার চেয়ে কম দুর্দমনীয় নয়। বিশেষত এ কারণেই সক্রিয় তথা দলীয় রাজনীতিতে লেখকদের যোগ না দেওয়াই উচিত বলে আমার বিশ্বাস— বিশেষত আমাদের দেশে যেখানে রাজনীতির এখনো কোন সুনির্দিষ্ট চেহারা দেখা দেয়নি, রাজনৈতিক অর্থেও যেখানে কোন দল বা চরিত্র গড়ে ওঠেনি সেখানে সৎ ও আন্তরিক বুদ্ধিজীবী কখনো স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে বলে মনে হয় না। যুক্তি আর বুদ্ধিহীন এক স্ববিরোধিতা, ব্যক্তিগত বা দলীয় লাভ-লোকসান আর ক্ষমতায় বসা আর সে ক্ষমতাকে পৈত্রিক মিরাছের মতো আঁকড়ে থাকা যে রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ সেখানে সাহিত্যিক শিল্পীরা দায়বোধ করবেন কি করে? যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা আর বিবেকী চিন্তাই তো যে কোন সৎ বুদ্ধিজীবীর মানস-উৎস— এ সবকে বাদ দিলে বুদ্ধিজীবী কথাটার কোন মানেই থাকে না। যুক্তি আর বিবেকের পতাকাই তুলে ধরতে হয় বুদ্ধিজীবীদের— বুদ্ধিহীনতার। মনে হয় বুদ্ধিজীবীর আজ এটিই সবচেয়ে বড় ভূমিকা। অন্তত আমাদের দেশে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আজ যতই কুৎসিত আর ঘোলাটে হোক না কেন— যে অন্ধকার শুধু রাজনৈতিক শক্তির নয় বুদ্ধিজীবীদেরও সব রকম রচনা ও প্রেরণার উৎস, সেখানে খাতিরে বুদ্ধির আলোকবর্তিকা রাখতে হবে অনির্বাণ আর এ রাখার দায়িত্ব

বুদ্ধিজীবীদের। দেখাতে হবে যুক্তি আর র‍্যাশানালিজমের পথ— এমনকি সাময়িকভাবেও যেসব সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তার ওপরও ফেলতে হবে যুক্তির ফোকাস। বলাবাহুল্য জনসাধারণকে নিয়েই রাষ্ট্র, জনসাধারণ যদি সব কিছু যুক্তির আলোয় বিচার করে দেখতে শেখে তাহলেই আমাদের সমাজজীবন আর রাজনীতি হয়ে উঠবে যুক্তিমুখীন ও বিভ্রান্তিমুক্ত। জাতির বড় হওয়ার পথ ও যুক্তি আর বিবেকের কথা বলেছিলেন বলে একদিন স্পিনোজাকে জাতিচ্যুত করা হয়েছিল, ভল্টেয়ার হয়েছিলেন স্বদেশ থেকে নির্বাসিত। আর আজ? শুধু স্বদেশ নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে, জ্ঞানালোকের অগ্রসরমান ইতিহাসের পাতায় এঁরা পেয়েছেন অমরতার শিরোপা। সাময়িকভাবে বুদ্ধি আর যুক্তির আবেদন ব্যর্থ হতে পারে, পড়তে পারে নির্বুদ্ধিতার অন্ধকারে চাপা, ক্ষমতার দাপটে হয়তোবা মেরেও ফেলা যেতে পারে তাকে কিন্তু মরেও সে মরবে না— একদিন উঠবেই মাথা চাড়া দিয়ে। কারণ মানুষের মনুষ্যত্বের সঙ্গে রয়েছে তার সহজাত নাড়ির যোগ। মানুষ মানুষ থাকলে সে একদিন না একদিন যুক্তিবাদী আর বিবেকী হয়ে উঠবেই। তবে সে ক্ষেত্র রচনা করতে হবে বুদ্ধিজীবীকে— সৃষ্টি করতে হবে তেমন পরিবেশ।

সব মানুষকে যেমন চিরকাল ধরে বোকা বানানো যায় না তেমনি সব মানুষও সব সময় যুক্তিহীন আর বিবেকবর্জিত হয়ে পারে না থাকতে। কারণ বিবেক তথা ভালো-মন্দের বিচারবোধ তার মনুষ্যত্বেরই অঙ্গ। লোভে, মোহে পড়ে সাময়িকভাবে সে তাকে ভুলে থাকতে পারে, অস্বীকার করতে পারে আমল দিতে কিন্তু মন থেকে তার তা কখনো নির্মূল কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। তাই চোরও ঘৃণা করে চোরকে, মিথ্যেবাদীও হেয় চক্ষে দেখে অন্য মিথ্যেবাদীকে— যুক্তিহীনও পরিহাস করে যুক্তিহীনকে!

দেশগত বা জাতিগত কোন ব্যাপারে যদি বুদ্ধিহীন যুক্তিহীনতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ব্যক্তিগতের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। লোভে, মোহে, ক্ষমতায় ও আবেগে যারা অন্ধ হয়ে আছে বুদ্ধিজীবীদের আওয়াজের প্রতি তারা আজ হয়তো কান দেবে না সত্য, তবুও সত্যের আওয়াজ তুলতেই হবে, ছড়াতেই হবে সত্যের বীজ, যুক্তির বীজ। জন-চিত্তের অসাধারণ উর্বরতা সব দেশেই এক ঐতিহাসিক আর সুপ্রমাণিত সত্য। সংঘবদ্ধ রাজশক্তি আর মতলববাজরা সব সময় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এ উর্বরতা শক্তির সুযোগ নিয়েছে, করেছে ব্যাপক অপব্যবহার। বুদ্ধিজীবীদের কাজ এর সদ্ব্যবহার— যুক্তির বীজ বপন করে, তাকে অঙ্কুরিত করে ঐ সময় অপব্যবহারকে অসম্ভব করে তোলা। যুক্তির নিক্তিটা তুলে দেওয়া জনসাধারণের হাতে। বুদ্ধিজীবীদের আজ এ এক বড় ভূমিকা বলেই আমার বিশ্বাস। ক্ষমতার রাজনীতিতে শরিক হয়ে পড়লে তাঁরা নিজেরাই হয়ে পড়বেন তার শিকার। ফলে বুদ্ধিজীবীর যথার্থ ভূমিকা তখন হবে অবহেলিত। তখন বুদ্ধিজীবী কথাটার মানেই যাবে বদলে।

বলেছি রাজনীতির নেশা প্রায় মদের নেশার মতোই— জীবনের অন্য সব নেশাকেই তা ঘর-ছাড়া তথা মন-ছাড়া করে ছাড়ে। তখন সাহিত্য, শিল্প, কাব্য আর সংগীত সব তুচ্ছ হয়ে যায়। ভিতরে ভিতরে তখন গোটা মানুষটাই যায় বদলে— এভাবে স্বয়ং বুদ্ধিজীবীই হয়ে পড়েন বিপরীত ভূমিকার নায়ক।.

১৩৭১

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে

আমি কবি নই। এমনকি কবিতার সমালোচকও নই। আমাকে বড়জোর ফেলা যায় কবিতার সমঝদারের কোটায়। আধুনিক কবিতার প্রতিও আমার এ দৃষ্টিভঙ্গি। অধিকারীভেদ কথাটা অর্থহীন নয়। আধুনিক বা অনাধুনিক কোন কবিতারই বিশ্লেষণের অধিকার আমার নেই। অনুরোধে ঢেঁকি যদি গিলেও থাকি তা নেহাৎ দায় ঠেকানো— তাতে প্রকাশিত মতামত বিশেষজ্ঞের নয়, ব্যক্তিরই। যে ব্যক্তি প্রতিনিধি নয় কোন বিশেষ মতামত বা গোষ্ঠীর।

আমাদের সাহিত্যের যে দশা আর সমালোচকের যে রকম আকাল তাতে অনেক সময় আদার ব্যাপারিরও জাহাজের খবর নিতে হয়। তেমন খবর মাঝে মাঝে আমিও নিয়ে থাকি। কবিতার ক্ষেত্রে আমার এটুকুই ভূমিকা।

পূর্ব পাকিস্তানে এ স্বল্প সময়ে যথেষ্ট ভালো কবিতা লেখা হয়েছে, হচ্ছেও। আমাদের আধুনিক কবিরা প্রতিশ্রুতিশীল— বলাবাহুল্য কথাটা স্রেফ আশাবাদ। দেখা গেছে যত মুকুল তত ফুল ফোটে না, ফলে আরো কম। তবে আশার কথা আশাবাদেরও দাম প্রচুর। প্রতিভা ঐশ্বরিক, এ বিশ্বাস আমার মনে তেমন দৃঢ় নয়— সুনিয়ন্ত্রিত আর আমৃত্যু শ্রমই বোধ হয় এর এক নাম। তবে প্রতিভার স্বভাব নিজস্বতা— নিজস্বতার সন্ধান, নিজস্ব ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ। আধুনিক বাংলা কবিতারও আবির্ভাব এ পথে। এ কবিতায়ও ভিন্নতর কোন কথা বা নবতর কোন সত্যের যে উদ্ঘাটন ঘটেছে তা নয় তবে হাল-আমলের চলতি কথাকে তাঁরা অর্থাৎ আধুনিক কবিরা নতুন ঢঙে, নব রীতিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন শুধু। যাকে ব্যাপক অর্থে আঙ্গিক বলা হচ্ছে সেখানেই চর্চা আর সাধনা হয়েছে বেশি। তবে আঙ্গিক সর্বস্বতার আয়ু কোন সময় দীর্ঘ নয়, আঙ্গিককে মুখ্য করা মানে ছোটর জন্য বড়কে ত্যাগ করা। শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিক সাহিত্যের এক বড় অংশই আজ আঙ্গিক-প্রধান হয়ে উঠেছে। আমার মতো পাঠকেরও অভিযোগ এটি। দুর্বোধ্যতার জন্য দায়ী পাঠকও হতে পারেন। সাহিত্য-শিল্পে প্রবেশের জন্য যেটুকু মানসিক প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক, আমাদের অধিকাংশ পাঠকের তা নেই। রাশিয়ায় সাহিত্য-শিল্প অনেকখানি 'নিয়ন্ত্রিত', তবুও সেখানে কবিতার বইয়ের বিক্রির খতিয়ান দেখলে রীতিমতো অবাক হতে হয়। সেখানকার আধুনিক কবিরাও আধুনিক কবিতাই লিখে থাকেন। আমাদের তুলনায় অনেক বেশি যান্ত্রিক হয়েও ওদের মন কবিতা পাঠের জন্য তৈরি। আর দেশজ সাহিত্য-শিল্পের প্রতি রয়েছে ওদের প্রবল আকর্ষণ, যা আমাদের বেলায় অনুপস্থিত। ফলে আধুনিক কবিতার প্রতি আমরা আজো সহজ হতে পারছি না।

আধুনিক কবিরা প্রায় সবাই বয়সে তরুণ; এর সুবিধা-অসুবিধা দু-ই রয়েছে একদিকে এঁদের সামনে এগুবার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দীর্ঘ সময় অপেক্ষমাণ। অন্যদিকে কোন রকম পরিণতি বা সম্পূর্ণতায় এখনো পৌঁছোননি বলে অপরিণতির লক্ষণ এঁদের রচনায় প্রচুর। কিন্তু শক্তির [illegible] আছে বইকি, তবে সেটা সত্যিকার [illegible] শক্তি হওয়া চাই। তেমন শক্তির স্রোতে [illegible] অপরিণতিও অনেক সময় [illegible] মতো [illegible] কবিতা [illegible] আবেদন হয়ে ওঠে অব্যর্থ ও সামগ্রিক। বিদ্রোহী, [illegible] বলাকা, সাত সাগরের মাঝি [illegible]। এমনকি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'ও

বিশ্লেষণে প্রচুর খাদ বেরিয়ে পড়বে। তথাপি এসব কবিতার আবেদন অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই কবিতা হিসেবে এসবের উত্তরণও স্বীকৃত। সমাজ যেভাবে আবর্তিত হচ্ছে তাতে আবেগের স্থানাভাব— এমন কথা প্রায়ই শোনা যায়। জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে তা সত্য হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের বিশেষ করে কাব্যের ক্ষেত্রে আবেগের স্থান থাকতেই হবে। কারণ আবেগই জীবনকে করে তোলে জীবন্ত। হেনরি মিলারের একটি কথা, 'As long as heart pumps blood it pumps life.' জীবনের উজ্জীবন সাহিত্যের কি এক বড় লক্ষ্য নয়? আবেগ এ উজ্জীবনী প্রেরণার উৎস।

মহৎ শিল্প মানুষকে জীবনের দীক্ষা দিয়ে থাকে— 'Great art can never be anything else.' (শ') সুদীর্ঘ জীবনভর যিনি বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করেছেন তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। পরিণতিতে পৌছতে জীবনানন্দ দাশ কি কম পরিশ্রম করেছেন? বিদেশের কাব্যাদর্শ কি ভাবধারার চেয়ে বেশি করে তিনি অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন নিজের দেশ আর দেশের প্রকৃতিকে। তাঁর কবিতার বিশেষ স্বাদটুকুও এ প্রকৃতিরই অবদান। তাঁর কবিতার আঙ্গিকও তাঁর নিজের— নিজের পরিণতি খোঁজার পথেই ঘটেছে তার উদ্ভব। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার সঙ্গে শেষ দিকের কবিতার যে দুস্তর ব্যবধান তা এক অনলস পরিণতি সন্ধানেরই ফলশ্রুতি। আমাদের আধুনিক কবিরা তাঁর কাছ থেকে এ পাঠটুকু গ্রহণ করতে পারেন।

আবেগও তেমন কোন বড় কথা নয়, যদি না তা ভাবে পরিণত হয়ে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। অর্থাৎ ভাবে আর আবেগে এক হয়ে গেলেই তা শিল্প হয়ে ওঠে, নেয় শিল্পের অবয়ব। আবেগ সম্বন্ধে আধুনিক কবিদের মনে হয় কিছুটা উন্নাসিকতা রয়েছে— সম্ভবত এ তাঁদের অতিমাত্রায় বাস্তব চেতনার ফল। তবে সাহিত্যে-শিল্পে বাস্তব কথাটা বেশ বিভ্রান্তিকর। অনেক তরুণ লেখকের মনে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ইংরেজি Reality কথাটাই বাংলায় বাস্তব হয়েছে কিন্তু Reality কথাটার অর্থব্যাপ্তি আরো অনেক বেশি। ইংরেজি আর বৈদেশিক সাহিত্যে এর ওপর বিস্তর আলোচনা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনটা Reality তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার উর্ধ্বে মানুষের মনের অভীপ্সাটাও Unreal বা অবাস্তব নয়। শিল্পে এ দুয়েরই সমন্বয় ঘটে। এ কারণে একদিকে নিটশের উক্তি : 'No artist can tolerate reality.' আর অন্যদিকে আলবার্ট ক্যামুর দাবি 'No artist can ignore reality.' বলাবাহুল্য যথার্থ শিল্পের মূলে এ পরস্পরবিরোধী মনোভাব নিহিত। আধুনিক কবিতার ভিতও এ মনোভাবের ওপর রচিত না হয়ে পারে না।

ইংরেজিতে কবিতার আলোচনায় প্রায়ই Genuine কথাটার প্রয়োগ দেখেছি। এ অর্থে বাংলায় খাঁটি শব্দটা ব্যবহার করতে পারি আমরা। খাঁটি কবি বা কবিতা খুব সুলভ নয়। আমাদের মধ্যে যে ক'জন খাঁটি কবি আছেন (আমি এখানে কারো নাম উল্লেখ করতে চাই না) যত সীমিতভাবেই হোক কিছু না কিছু সাফল্য তাঁরা অর্জন করেছেন। তাঁরা কেউ কেউ যে কবি হিসেবে 'দৃশ্যমান' তাতে সন্দেহ নেই। আবার অনেক প্রতিশ্রুতিশীল যে চিরকালই প্রতিশ্রুতিশীল রয়ে গেছেন তেমন নজিরও দেদার। নিষ্ঠা আর অনলস পরিশীলন ছাড়া আধুনিক কবিতা কখনো পরিণতিতে পৌছবে না, পরিশীলন মানে সচেতন প্রয়াস। পরিণতি ছাড়া আধুনিক কবিতা চিরকাল আধুনিকই থেকে যাবে কবিতার মর্যাদা কখনো পাবে না। সব শিল্পের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটি বড় কথা— এ অভিজ্ঞতা ব্যবহারিক না হয়ে মানসিকও হতে

হোক। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাটুকুও মানসিকে রূপান্তরিত হয়েই শিল্পের উপকরণ হয়ে ওঠে। দুয়েরই মূল্য অনন্য। অভিজ্ঞতা যখন প্রকাশের বেদনায় আকুল হয়ে ওঠে তখনই শব্দ-বিন্যাস ব্যঞ্জনাময় হয়ে অর্থসীমাকে যায় পেরিয়ে। তাই কাব্যের ক্ষেত্রে সুনির্বাচিত শব্দের এক বিশেষ ভূমিকা। আধুনিক কবিতায় অভিজ্ঞতার তপ্ত স্পর্শ কদাচিৎ মেলে। আধুনিক কবিরা প্রচলিত ধারার বিদ্রোহী কিন্তু 'বিদ্রোহী' হতে চান, পেতে চান সে পরিচয়। কিন্তু বিদ্রোহের দহন তাঁদের কবিতায় অত্যন্ত প্রকটভাবেই অনুপস্থিত। বিদ্রোহ মূল্যহীন নয়— শিল্পের ক্ষেত্রেও বিদ্রোহের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিদ্রোহের ফলেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নবতর জীবন-জিজ্ঞাসা গড়ে ওঠে। বিদ্রোহের প্রেরণায় যখন সত্যিকার কিছু সৃষ্টি হয় তখনি তা সার্থক হয়— না হয় তার সমাপ্তি ঘটে একটা বিলীয়মান ভঙ্গিতে, বড়জোর একটা আত্মপ্রসাদী স্মৃতিতে। পশ্চিম বঙ্গের কবিতার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে।

আলবার্ট ক্যামু বলেছেন : 'Rebellion, in itself, is not an element of civilization. But it is a preliminary to all civilizations.' সাহিত্যের বেলায়ও তা বলা যায়। বিদ্রোহ নবতর, ভিন্নতর হয়তো সমৃদ্ধতর সাহিত্যের পথ রচনার ইঙ্গিত দেয় মাত্র। পথ অতিক্রম করে মঞ্জিলে পৌছার দায়িত্ব কবি-শিল্পীদের। তা না হলে বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ। শিল্পেও ফলেন পরিচয়তে বড় কথা।

আধুনিক কবিতার পাঠক সীমিত, শোচনীয়ভাবে সীমিত। একথা মিথ্যা নয়— এমনকি আধুনিক কবিতার পাঠক স্রেফ আধুনিক কবিরাই এমন কথাও বহুল উচ্চারিত। সংস্কৃতিমনা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এ খুব হতাশার কথা। সংস্কৃতি-চেতনার সঙ্গে সূক্ষ্ম রসবোধ ও তার বিরামহীন চর্চা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কবিতা হচ্ছে এর শ্রেষ্ঠতম বাহন ও শ্রেষ্ঠ প্রকরণ। সব দেশে সব সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক স্বীকৃত সত্য। একালের মানুষ একালের কবিতা পাঠ করতে চাইবে এও স্বাভাবিক। প্রাচীন বা গতযুগের কাব্য যতই গভীর ও উচ্চাঙ্গের হোক না হলেও তা আধুনিক পাঠকের সব সময়ের পাঠ্য হতে পারে না। আধুনিক মানুষ আধুনিক জীবনকে জানতে চায় না এ হতে পারে না। সে জীবনের প্রতিফলন আধুনিক কাব্যে ঘটলে তার পাঠক সংখ্যা বাড়বেই। শিল্পও এক রকম প্রচার তবে শিল্পোত্তীর্ণ প্রচার। কাব্যের প্রকৃত লক্ষণ যদি আধুনিক কবিতা মেনে চলে তার পাঠক না জোটার সঙ্গত কোন কারণ নেই। অনুন্নত দেশে লেখক আর কবিদের এ এক দুর্ভাগ্য— তাঁদের শুধু লেখক বা কবি হলে চলে না সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পাঠকও তৈরি করতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশকও। আধুনিক কবিদের এ ফাউ ভূমিকা সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে, আর হতে হবে অদম্য তৎপর। এ প্রসঙ্গে ব্যালজাকের স্মরণীয় উক্তি আমাদের আধুনিক কবিদেরও অবশ্য স্মরণীয় : "An author without readers is nothing but a literary masturbator no matter how great his gifts. The public is fickle, tasteless, stupid and stingy. It is nevertheless the public. It is the second heart that pumps blood into author's creative brains. It must be bullied, cajoled, coaxed, flattered, frightened, dragooned, conscripted, blackmailed, fooled, threatened, in order to make it read books and keep on reading them."

১৯৬৬

বাঙালি সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

বিষয়টি অত্যন্ত জটিল— জটিল একারণে যে দেশের ও সমাজের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ক্রমিক স্থিতিশীলতা ছাড়া কোন সংস্কৃতিই একটি সুনির্দিষ্ট রূপ নিতে পারে না। বাংলাদেশ বলতে একদিন যে ভৌগোলিক বিন্যাসকে বুঝাত তার সাবেক রূপ এখন নিশ্চিহ্ন— কারণ দেশের রাজনৈতিক বিন্যাস নিয়েছে সম্পূর্ণ এক নতুন চেহারা। সঙ্গে সঙ্গে পেশা আর অর্থনীতিতেও দেখা দিয়েছে নিত্যনতুন সম্বন্ধ। তাই বাঙালি সংস্কৃতি বলতে একদিন যা বুঝাত এখন তা প্রায় বিগলিত অবস্থায়— তার পুরোনো আদল প্রতিদিনই হারিয়ে যাচ্ছে। তাই জিজ্ঞাস্য : ভৌগোলিক সীমারেখার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নাম দেওয়ার মতো কোন সংস্কৃতি এখন দেশে দানা বাঁধছে কি? সম্ভবত এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর— না।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা এক নৈরাজ্যের বাসিন্দা। আমাদের অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানবাসী বাংলা ভাষাভাষীদের সাংস্কৃতিক রূপ কি হবে এ সম্বন্ধে কারো মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না— আমার নিজের মনে তো নেই-ই। অনেক সংস্কৃতিসেবীর সঙ্গে এ সম্পর্কে আমি আলাপ করেও দেখেছি কিন্তু কারো কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। বাঙালি সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় বা কি বুঝতে হবে এ প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার কারণ হয়তো উত্তরটাই জানা নেই কারো।

আঠার বছর আগে অর্থাৎ স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে বাংলাদেশ ছিল বলে বাঙালিও ছিল— খণ্ডিত হলেও ছিল তার একটা সাংস্কৃতিক রূপ। তার সঙ্গে অনেক বাঙালি বিশেষ করে নব্যশিক্ষিত বাঙালি গা মেশাতে পারেনি বলে তাকে খণ্ডিত বল্লাম। ঐ সংস্কৃতিতে এমন একটা আদিম আঞ্চলিকতা ছিল যা ঐক্যের পথ তো রচনা করেইনি বরং ইন্ধন জুগিয়েছে অনেক অকারণ বিরোধের।

এ ক্ষেত্রের গবেষকদের কেউ কেউ বাঙালি সংস্কৃতিতে আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ, কেউ কেউ শাক্ত-বৈষ্ণবের বিপরীতমুখী ধর্ম-সাধনা ইত্যাদি নানা গোঁজামিলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এসব ব্যাখ্যা হয়তো প্রাচীন ইতিহাসসম্মত। কিন্তু বর্তমান বাঙালি জীবন তথা বাঙালি সংস্কৃতির ওপর সার্বিক আর নিরপেক্ষ আলোকপাত একে বলা যায় না। এতে অতীতের খণ্ডচিত্র ধরা পড়লেও বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন আভাস এতে ছায়াপাত করেনি। এ খণ্ড-দৃষ্টি শুধু যে বাঙালি সংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, এর ফলে বাঙালি জীবনের কোন অখণ্ড দুর্গতিরও কারণ এটি। ফলে বাঙালি জীবনের তথা বাঙালি সংস্কৃতির ধারণাই বাংলাদেশে জন্ম নিতে পারেনি, পায়নি বিকাশ লাভ করতে।

বাঙালি সংস্কৃতি যেসব সময় দুই বিপরীত খাতে প্রবাহিত হয়েছে এ না মানা ইচ্ছা করে উট-পাখি বনা : অথচ সংস্কৃতি যদি মিলন বা সমন্বয়ধর্মী না হয় তাহলে আমার মতে তা সংস্কৃতি নামেরই যোগ্য নয়। আমাদের আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং আজো আছে বটেই। এ সম্বন্ধে যদি কেউ

বাঙালি সংস্কৃতির লক্ষণ বলতে চায় বলা যে যায় না তা নয়। কিন্তু সংস্কৃতির একটি বড় লক্ষণ তো সামাজিক ঐক্যবোধ— সে ঐক্যবোধ এতে কতখানি হাসিল হয়েছে? এসব ব্যাপারেও বাংলাদেশের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মিল যতটুকু গরমিল কি তার চেয়ে অনেক বেশি নয়? শুধু যে বহিরঙ্গে গরমিল তা তো নয় অন্তরঙ্গে এ গরমিল আরো বেশি। দুই ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক রূপ অনেকখানি ধর্মভিত্তিক এবং ধর্মভিত্তিক বলেই তা বিপরীতমুখী। মূর্তি পূজা আর নিরাকার উপাসনা কখনো একমুখী হতে পারে না। শাশ্বত বাণী মিলনধর্মী ও মানবিক হতে পারে, কিন্তু জীবনের আচার-আচরণে যা রূপায়িত তা নিয়েই তো সংস্কৃতি। বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে সে সংস্কৃতি দুই বিপরীত মোহনার অভিসারী। এ দু'য়ের সমন্বয়ের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই কোন কালে হয়নি। অবশ্য তেমন চেষ্টা সফল হতো কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার জন্য যে ত্যাগ ও জীবনবোধের প্রয়োজন তা তৎকালীন বাংলাদেশের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের কারো ছিল না। সংস্কৃতি সমন্বয়ধর্মী না হলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। আমাদের জীবনে ইতিহাসের এ গতি অমোঘ ও অনিবার্য। আমরা আজ এ ইতিহাসের অংশ। মনে হয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

দীর্ঘকাল আগে এ বিষয়ে আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিল—তাই বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়ক রবীন্দ্রনাথকে আমি ১৯৪১-এর ১৯ জানুয়ারি এক পত্রে এ কথা কয়টি লিখেছিলাম :

"আমাদের সামনে আদর্শ কি? হয় আমাদের এক জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে, না হয় পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে একটা বোঝাপড়া করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে। বাঙালি জাতি গঠনই যদি আমাদের আদর্শ হয় তাহলে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য আমাদের ত্যাগ করে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই গ্রহণ করতে হবে, প্রয়োজন হলে উভয় সম্প্রদায়ের অনাপত্তিকর নতুন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য তৈয়ের করে নিতে হবে, তখন আমাদের শুধু অন্ন-বস্ত্রে এক হলে চলবে না, রক্তেও এক হওয়ার সাধনা গ্রহণ করতে হবে। তখন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহু বেড়া আলগা করতে হবে ও বহু ধারণা আমাদের বদলাতে হবে। যদি পরস্পরের তথাকথিত বৈশিষ্ট্য আমরা ছাড়তে না পারি, তাহলে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হিসেবেই আমাদের বাঁচতে হবে। তখন প্রয়োজন হবে প্রতি ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার। তখন ভাগ-বাটোয়ারার গাণিতিক নির্ভুলতাই হবে আমাদের সাধনা ও আদর্শ। ভবিষ্যতের বঙ্গসন্তানের পক্ষে কোন সাধনা অধিকতর কাম্য হবে কে জানে।"*

রবীন্দ্রনাথ তখন রোগশয্যায় আর তার অল্পকাল পরেই তিনি যান মারা : তাই আমার জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। ঠিক তার সাত বছর পরে ১৯৪৭-এ এ জিজ্ঞাসার রাজনৈতিক উত্তর আমরা পেয়ে গেছি। এ উত্তর কারো কারো মনঃপূত না হতে পারে কিন্তু আমাদের ইতিহাস— এ ইতিহাসেরই আমরা উত্তরাধিকারী। সব উত্তরাধিকারের মতো এ উত্তরাধিকারকেও আমাদের মেনে নিয়ে সার্থক আর জীবনের জন্য অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। এছাড়া নানা পন্থা সমালোচনায় ইতিহাস পাল্টায় না, পাল্টাবেও না। দৈব কারণে পাল্টালেও বাঙালি সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল তা কি

* আমার 'সাহিত্যে সংস্কৃতি ও জীবন' দ্রষ্টব্য

ভাবা যায়? আবারও কি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না? কারণ সে মানুষ, সে সম্প্রদায়, সে ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি, আচার-বিচারের আদিম যত সব কোন্দল তা কি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সব ধ্যান-ধারণা আগের মতোই বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। আবারও যদি তারই ফলে সংকট দেখা দেয় হয়তো তা আরো তীব্র, আরো ভয়াবহ আরো হৃদয়হীন হয়ে দেখা দেবে। তা কি কিছুমাত্র সুখের হবে?

একই দেশের একই মাটিতে আর একই পরিবেশে জন্ম নিয়ে, যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করার পরও দেশের দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের জীবনবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌল পার্থক্য রয়ে গেছে। ভাষার ঐক্য সে পার্থক্য অতীতে যেমন ঘুচাতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে— তেমন কোন লক্ষণ আজো লক্ষ্যগোচর নয়। এ পার্থক্য বা বিরোধ সাম্প্রদায়িক নামে পরিচিত হলেও এর মূল সংস্কৃতিতে— ব্যবহারিক সংস্কৃতিতে। ভূগোলভিত্তিক সংস্কৃতিতে নামে, আহার-বিহারে আর পোশাক-আষাকে অন্তত সাদৃশ্য থাকে আর আমাদের বেলায় সে প্রাথমিক শর্তগুলিও অনুপস্থিত। সংস্কৃতি এজমালি সম্পত্তি— একক দখলের বাস্তুভিটা নয়। দেশের সব মানুষের অংশগ্রহণেই তা হয় সার্থক। দেশের একটা বৃহৎ অংশ যাতে শরিক হতে পারে না তাকে সংস্কৃতি বলা নিজের পুকুরকে সমুদ্র কল্পনা করা। অন্তত আমাদের দেশে অবস্থা এখন তাই। অবশ্য রাষ্ট্রই এখন সব শক্তির আধার— রাষ্ট্রই এখন নিয়ন্ত্রণ করে সাংস্কৃতিক গতি-ধারাকেও। আগের দিনের মতো রাষ্ট্র এখন বিচ্ছিন্ন বা কোন শুথ ব্যাপার নয়। 'খাজনা দিয়েই খালাস' এ-নীতি এখন অচল— কোন রাষ্ট্রই এখন আর এতটুকুতে সন্তুষ্ট থাকে না। আমরা সবাই এখন রাষ্ট্রের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ভূগোলের চেয়ে রাষ্ট্রের প্রভাব এখন অনেক বেশি— এমনকি ক্ষেত্র-বিশেষে ধর্মের চেয়েও। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবিদরা কথায় কথায় যে ধর্মের দোহাই পাড়েন বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির পৃষ্ঠপোষকতা করেন তা কিছুমাত্র ধর্মীয় প্রেরণার ফল নয়— তা স্রেফ নিজেদের সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থরক্ষারই আনুষঙ্গিক। তাই যারা স্বাভাবিক অবস্থায় কখনো ধর্মের নাম নেয় না, ক্ষমতায় বসলে তারাও কথায় কথায় ধর্মের বুলি আউড়াতে থাকে। অর্থাৎ ধর্মটাকে তারা এখন নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-বৃদ্ধির একটা হাতিয়ার করে নেয়। ফলে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক চেতনা যা আধুনিক যুগ-প্রেক্ষিতে বিলোপ ঘটাই স্বাভাবিক তা ক্ষেত্র বিশেষে বরং আরো জোরদার হয়েছে। ফলে ইচ্ছা থাকলেও এখন আর কারো পক্ষে বাঙালি হওয়া সম্ভব নয়। বাঙালি ছাড়া বাঙালি সংস্কৃতি স্রেফ সোনার পাথরবাটি।

রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের জৈব অস্তিত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আত্মিক-জীবন সম্বন্ধে যত উচ্চকণ্ঠই আমরা হই না কেন, আসলে জৈব-অস্তিত্বেরই অগ্রাধিকার। জৈব-অস্তিত্বের তাড়নায় আমাদের মন এখন দ্রুত আপোষ-রফা করে চলেছে— আমাদের বহিরঙ্গে যার প্রতিফলন অনিবার্য। ফলে আমাদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ দিন দিনই বিচিত্ররূপ নিচ্ছে। অতীতে যারা একদিন বাঙালি ছিল তাদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য এখন অদৃশ্যই বলা যায়।

বলাবাহুল্য শিক্ষিতরাই সব রকম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, ভবিষ্যতের রূপায়ণও তাঁদের হাতে। অশিক্ষিতরা চিরকালই রক্ষণশীল— আর রক্ষণশীলতা মাত্র স্থাণু, স্থাণু

[illegible] তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। এদের ছেলেমেয়েরা যখন শিক্ষিত হয়ে ওঠে তখন তারা পিতামাতার বৈষয়িক উত্তরাধিকারকে স্বাগতম জানালেও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে দেয় দেন তালাক। শহরের হল বা হোস্টেলবাসী কোন ছাত্রের পাশাপাশি তার পাড়াগাঁবাসী পাশে দাঁড় করালেই এ উক্তির সত্যতা সহজেই প্রমাণিত হবে।

ইতিহাসে সংস্কৃতির বহু নামই দেখতে পাওয়া যায় : আর্য, সেমিটিক, ইরানীয়, দ্রাবিড়, ভারত, মোগল, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি। এসবেরও রয়েছে বহু শাখা-প্রশাখ। আবার যুগ বা নদী-সমুদ্রের নামেও হয়েছে সংস্কৃতি। আজকের মানুষের কাছে ইতিহাসের [illegible] এসব সংস্কৃতির তেমন কোন মূল্য নেই। আধুনিক মানুষ বিশেষ করে পাক-ভারতের মানুষ আজ কোন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী? এ প্রশ্নটিও উত্তরের অপেক্ষায়।

আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি : আমাদের অনেক পরিচয়— আমরা পাকিস্তানি, আমরা পূর্ব পাকিস্তানি, আমরা বাঙালি, আমরা মুসলমান, সবার ওপরে আমরা আধুনিক মানুষ অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে আমরা আধুনিক বিশ্বের বাসিন্দ। এক 'আমার' সঙ্গে অন্য 'আমার' মিল যতখানি, বিরোধ ত'র চেয়ে অনেক বেশি। সংস্কৃতির বহিরঙ্গে এ বিরোধ আরো বেশি প্রকট। বরং শেষোক্ত 'আমরা'র মধ্যে অর্থাৎ সেখানে আমরা আধুনিক মানুষ সেখানে আমাদের পরস্পরে মিল অনেক বেশি— বাইরে যেমন তেমনি ভিতরেও। আধুনিক হিন্দু আর আধুনিক মুসলমান এক টেবিলে বসে খেতে আপত্তি নেই কিন্তু আধুনিকতার চৌহদ্দির বাইরে এ ভাবা যায় না। আধুনিক মানুষে মানুষে যে মিল— ধর্ম [illegible] আর ভৌগোলিক বাধা-বিঘ্ন ডিঙিয়ে তা দিন দিনই সহজতর হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো সহজ হবে। তেমন সহজ পূর্ব পাকিস্তানি আর পশ্চিম পাকিস্তানির মধ্যে, পাকিস্তানি হিন্দু আর পাকিস্তানি মুসলমানের মধ্যে এমনকি সেকেলে বাপ আর একেলে পুত্রের মধ্যে বা সেকেলে শাশুড়ী আর একেলে পুত্রবধূর মাঝেও হবে কিনা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। না হওয়ার একমাত্র কারণ সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ। হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক চেতনায় যে [illegible] ব্যবধান রয়েছে তা বলার প্রয়োজন রাখে না।

বলাবাহুল্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শব্দেরও অর্থ বদলায়— শব্দও বহমান নদীর মতো। জীবন অর সামাজিক ধারণার রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের তথা তার অর্থের বদল আর ব্যাপ্তিও অনিবার্য। জীবনের প্রয়োজন আর চাহিদা যেমন আজ অসম্ভব বেড়ে গেছে তেমনি তার দিগন্তও বেড়ে গেছে অবিশ্বাস্যভাবে। সংস্কৃতি কথাটারও সীমা আজ তাই আগের [illegible] ভূগোলে আবদ্ধ হয়ে নেই। কোন সংস্কৃতিকেই আজ আর এভাবে বেঁধে রাখা যাবে না। বেধে রাখতে গেলে কূপমণ্ডূকতাই হবে পরিণতি।

আগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে এমনকি গোত্রে গোত্রে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল— তার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনেও একটা বিশিষ্টতা ফুটে উঠত এখন তা আর নেই। তেমন [illegible] জীবন এখন আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান আর তার নানা শাখা প্রশাখা আজ এমন এক সার্বিক বা বৈশ্বিক রূপ নিয়েছে ও নিচ্ছে যার ফলে পারস্পরিক অনুপ্রবেশ অনিবার্য। কোন সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি-চেতনার পক্ষেই নির্ভেজাল [illegible] রক্ষা এখন আর সম্ভব নয়।

আর এক প্রশ্ন : এক প্রজননের (generation) সংস্কৃতি কি অন্য প্রজনন গ্রহণ ও

অনুসরণ করতে পারে? বলেছি সময়ের সঙ্গে সব কিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে— যেতে বাধ্য। ধর্ম আর শাস্ত্রের যতই দোহাই দিই না কেন মুসলমান কৃষক আর মুসলমান ব্যারিস্টারের সংস্কৃতি কখনো এক নয়। সংস্কৃতি আজ অনেকখানি পেশাওয়ারি রূপ নিয়েছে— ধর্ম আর ভূগোল তাতে হালে পানি পাচ্ছে না।

ধুতি-চাদর, ছিলুমছি-বদনা, লোটা-গামছা, হুঁকা-কলকে যা একদিন বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল তা আজ বিলীয়মান। ইচ্ছা করলেও আমরা সে সংস্কৃতিতে ফিরে যেতে পারব কিনা, ফিরে যাওয়া উচিত কিনা বাঙালি সংস্কৃতির ওপর জোর দিলে এসব কথা ভাবতে হবে। ব্যক্তি আর সামাজিক জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন তার জন্য অকারণ অশ্রুপাত যুক্তিসঙ্গত কিনা তাও বিবেচ্য।

আমার বিশ্বাস আঞ্চলিক অহমিকা বা ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কোন সংস্কৃতিকেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। বেঁচে থাকতে হলে সংস্কৃতিকে জীবন্ত তথা living হতে হবে। দৈনন্দিন আচার-আচরণে আর বিশ্বাসে তা যদি বাস্তবায়িত না হয় তেমনি বায়বীয় সংস্কৃতির মৃত্যু কিছুতেই যাবে না ঠেকানো। ফরাশ, তাকিয়া আর আলবোলাকে মুখে যতই বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ বলে বড়াই করি না কেন ব্যবহারে যদি টেবিল-চেয়ার আর সিগারেটই স্থান করে নেয় তাহলে আমাদের সাধের বাঙালি সংস্কৃতি পা রাখবে কোথায়? বাঁচবে কিসের জোরে? হয়তো গ্রাম দেশে এখনো আমাদের অনেকের বাপ-চাচারা হুঁকাই খাচ্ছেন কিন্তু আমরা নগরবাসীরা? বুদ্ধিজীবীরা? অথচ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে, তার উৎকর্ষ সাধন করে শিক্ষিত আর বুদ্ধিজীবীরাই তো। আমরা কি আজ এক চরম স্ববিরোধিতার সম্মুখীন নই?

আরো এক প্রশ্ন : শুধু ভাষাই কি সাংস্কৃতিক জীবনের মাধ্যম? এ বিষয়ে প্রধান মাধ্যম সন্দেহ নেই। জীবনই তো ভাষায় প্রতিফলিত হয়। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে যে জীবন প্রতিফলিত তা কি পুরোপুরি বাঙালি? জীবনের সঙ্গে জীবনের শিল্পরূপের কোন রকম সাদৃশ্য যদি না থাকে তাহলে তা কি কৃত্রিম হয়ে পড়ে না? আমাদের জীবন আর আমাদের সাহিত্য দুই-ই কি আজ কিছুটা কৃত্রিমতার অনুসারী নয়? বাঙালি জীবন দ্বিধাখণ্ডিত বলে তার শিল্প-সাহিত্যও দ্বিধাখণ্ডিত। ভূগোল, ভাষা, অন্ন-বস্ত্র কিছুই আমাদের ঐক্য দিতে পারেনি। উপরের যে মৌল পার্থক্যের ইংগিত করেছি তা এতো গভীর যে তাকে স্বীকৃতি না জানিয়ে উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ কথা কয়টি স্মরণীয় : "নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না, জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ।" একমাত্র এ পথেই বাঙালি আর বাঙালি সংস্কৃতি কথাটা হয়তো অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে— এ আমার বিশ্বাস।

একটা সামাজিক সংস্কৃতির মধ্যেই মানুষ জন্ম নেয় আর তাতেই যাপন করে জীবন এবং তার ব্যক্তিগত জীবনেও সে সংস্কৃতিটাই হয় রূপায়িত। এ না হলে সংস্কৃতি কথাটা একটা বায়বীয় ব্যাপারই থেকে যায়। পাকিস্তানে হিন্দুকে মুসলিম সংস্কৃতিতে আর ভারতে মুসলমানকে হিন্দু সংস্কৃতিতে জোর করে দীক্ষিত করার কু-মতলব যদি কোথাও থাকে তা অন্য দশটা কু-মতলবের মতোই ব্যর্থ হবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' চলে না, চলে

সাংস্কৃতি'— এ অভিব্যক্তির স্বাভাবিক পথে পূর্ব পাকিস্তানে যে সাংস্কৃতিক রূপায়ণ ঘটবে তার নামের আগে বাঙালি বিশেষণ যোগ হবে কিনা তা আগাম বলা যাবে না। তবে গতি যে সমন্বয়মুখীন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর অর্থ এ নয় যে আমরা আমাদের ভূগোল, আমাদের ইতিহাস ভুলে যাব কি ডিঙিয়ে যাব, সেও হবে আর এক দুশ্চেষ্টা— তবে যখন বিশ্বের সঙ্গে নৈকট্য-বৃদ্ধি দিন দিনই দ্রুততর হচ্ছে আর সব মানুষের মতো পূর্ব পাকিস্তানিদেরও অধিকতর বিজ্ঞানমুখীন না হয়ে উপায় নেই তখন আমাদের মনের গতিও যে একম সংস্কারমুক্ত আর বিশ্বমুখীন হতে বাধ্য। অবশ্য ব্যক্তি ও সমষ্টিগত মনের চিন্তাধারাই তো রূপ নেয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর বিভিন্ন অবয়ব আর আধারে। সংস্কৃতিতে আঞ্চলিক রূপ ও রঙ অনিবার্য— তবুও গাছ যেমন শিকড় দিয়ে মাটির রস গ্রহণ করেও থাকে উর্ধ্বমুখী তেমনি আমাদের সংস্কৃতিরও রূপ, রস, রঙ আঞ্চলিক হয়েও বিশ্বমুখীন তথা মানবতামুখীন হতে বাধা নেই। অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি হবে সমন্বয় বা মিলনধর্মী। শুধু আঞ্চলিক ক্ষেত্রে নয় সব রকম জাগতিক ব্যাপারেও।

ধর্মে যাই হোক বাংলাদেশের তাবৎ বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাঙালি কিনা আর বাঙালি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি কিনা সর্বাগ্রে এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানও অত্যাবশ্যক— তা না হলে বাঙালি সংস্কৃতি কথাটাও থেকে যাবে অস্পষ্ট ও অর্থহীন।

জাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ কথাটা মূল্যবান বলেই স্মরণীয় : "রক্তের সঙ্গে রক্তের মিল না হইলে— মস্তকের সহিত পদের অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত রক্ত চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক না হইলে এক জাতি বা Nation গঠিত হয় না, বহু জাতির শিথিল সমবায় মাত্র হইতে পারে— Federation of castes হতে পারে। কিন্তু তাহা Nation বা মহাজাতি গঠনের পরিপন্থী।

তার ওপর ভাষা ছাড়া সংস্কৃতির কি আরো কিছু প্রাথমিক শর্ত নেই? যেমন নাম-ধাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, পাল-পর্ব, বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানাদি? এসব ব্যাপারে সব বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে মিল কতটুকু?

যদি প্রশ্ন করা হয় ধুতি-চাদর কি বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ নয়?

আমার বিশ্বাস শতকরা শতজন হিন্দু বাঙালি উত্তর দেবে : হ্যাঁ।

আর শতকরা একশ'জন বাঙালি মুসলমান উত্তর দেবে : না।

যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নামের আগে শ্রী, শ্রীযুক্ত, শ্রীমতী ইত্যাদি লেখা বাঙালি রীতি কিনা? তাহলে এ প্রশ্নেরও কি অনুরূপ উত্তর মিলবে না?

অতীত ইতিহাস টেনে এনে কোন লাভ নেই কারণ আমরা অতীতে ফিরে যাবো না, কোনোদিন যেতে পারব না। বাঙালি দুর্গাপ্রসাদ কখনো রহিম উল্লাহ, আর বাঙালি রহিম উল্লাহ কখনো দুর্গাপ্রসাদ হতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ। তা না হলে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে এ যে ফাঁক, তা কি চিরকাল না হোক দীর্ঘকাল এমনি ফাঁকই থেকে যাবে না? এ অবস্থায় একটা অখণ্ড আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠা সম্ভব?

সব বাঙালিই ডাল-ভাত খায় সত্য কিন্তু তার বাইরে বাঙালি এমন খাদ্যও খায় যা সময় সময় শুধু বিরোধ নয় রক্তারক্তিরও কারণ ঘটায়, নিয়ে আসে ছোঁয়া-ছুঁইর প্রশ্ন।

সব বাঙালি যাতে অংশ নিতে পারে না তা বাঙালি সংস্কৃতি নয়। হতে পারে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি। আঞ্চলিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে এ আমার ধারণা।

রবীন্দ্রযুগ নিঃসন্দেহে বাঙালি সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ— সে স্বর্ণযুগের কিছু উদাহরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেই শোনা যেতে পারে :

(ক) "— কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে নাই।"

(খ) "একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান সত্ত্বেও এক চালের নিচে হিন্দু-মুসলমান আহার করতে পারে না, এমনকি সে আহারে হিন্দু-মুসলমানের নিষিদ্ধ কোন আহার্য যদি নাও থাকে।"

(গ) "আমি একজন ইংরেজি নবিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর সমস্তই রুচিপূর্বক আহার করতেন। কেবল গ্রেট ইস্টার্নের ভাতটা বাদ দিতেন। বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না।"

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "যে সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তার বাধবে।"

এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সে স্বর্ণযুগেও এ ছিল দেশের মানসিক আবহাওয়া। যে রূপ নিয়ে দেশের স্বাধীনতা এসেছে তার পেছনে এ মনোভাব ও তার প্রতিক্রিয়া কোন প্রেরণা জোগায়নি এ মনে করা স্রেফ ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

এখন আহার-বিহারে আর পোশাক-আষাকে যে শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে তা মোটেও বাঙালি সংস্কৃতির রূপান্তরের বা তার প্রতি দরদের ফল নয় বরং রাষ্ট্রীয় রূপ-বদলেরই ফলশ্রুতি। স্রেফ জৈবিক অস্তিত্বেরই টানাপোড়েন; সুযোগ-সুবিধার অলি-গলি সন্ধানেরই আনুষঙ্গিক।

অনেকে আমাদের ব্যবস্থার সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির তুলনা দিয়ে থাকেন। তারা ভুলে যান যে ওদেশের মানসিক পরিবেশ কখনো আমাদের মতো ছিল না। এখনো নয়। ওদের দেশ-বিভাগের কারণও স্বতন্ত্র— ঐ তো স্রেফ দুই বিজয়ী পক্ষের রাজনৈতিক ভাগ বাটোয়ারা, ফলে দুই পক্ষেরই রাজনৈতিক ভাবাদর্শই তাতে প্রতিফলিত ওখানে। এ ভাগ বাটোয়ারায় জার্মান জাতির নিজের কোন হাত ছিল না। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তো স্বতন্ত্র : আমরা মুসলমানরা ভারত বিভাগ চেয়েছি, হিন্দুরা পালটা দাবি করেছে বাংলা বিভক্তিকরণ। আমাদের বর্তমান অবস্থার এতো পরিপ্রেক্ষিত। আর আমাদের মতো ওদের সাংস্কৃতিক-জীবন আগেও দ্বিধা-বিভক্ত ছিল না, এখনো তা নয়।

ওখানে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় : কোট-প্যান্ট, টাই-হ্যাট জার্মান সংস্কৃতির অঙ্গ কিনা? তাহলে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি সমস্বরে বলে উঠবে : আলবৎ।

এদের আর আমাদের অবস্থার তুলনা চলে না। ওখানে তাবৎ ইউরোপ এক সংস্কৃতির অনুগামী। ওখানে আহার-বিহার, বিয়ে-শাদি পাল-পর্ব ইত্যাদি নিয়ে কখনো দাঙ্গা বাধে না। নাম-ধাম আর পোশাক-আষাকেও চেনা যায় না কে খ্রিস্টান আর কে নয়।

সূচনায় বলেছি প্রেক্ষিত আর বাস্তবের এসব কথা ভুলে যাওয়া মানে ইচ্ছা করে উট-পাখি সাজা। উট-পাখি কি বিপদ এড়াতে পারে? না এতে কোন সমস্যার সমাধান হয়?

আমরা বাঙালিরা দীর্ঘদিন ধরে গোঁজামিল দিয়ে এসেছি— চেয়েছি ইতিহাসকে ফাঁকি দিতে। আজ তারই শিকার আমরা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক অহমিকা ভয়ানক নাছোড়বান্দা— আত্মবিলোপের মুহূর্তেও নিজের ভুল স্বীকার করতে গররাজি।

বাঙালি সংস্কৃতি কাকে বলে, তার আসল স্বরূপ কি তা এ আলোচনায় অস্পষ্ট রয়ে গেল। আমার এ অক্ষমতার কারণ আগেই উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমার নিজের মনেই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। সাধারণভাবে সংস্কৃতি অর্থে আমি কি মনে করি তা আমার সংস্কৃতি* নামক প্রবন্ধে আমি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আশা করি বিজ্ঞতর ব্যক্তিদের আলোচনায় বিষয়টি আরো স্পষ্টতর হবে।

১৯৬৬

শিক্ষা আর শিক্ষকের সমস্যা

আপনারা আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। যে সম্মান আমার প্রাপ্য নয় আপনারা আজ আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করেছেন— এ শুধু আমার মামুলি বিনয় প্রকাশ নয়, অন্তরের কথা। দীর্ঘকাল আমি নিজেও শিক্ষক ছিলাম বটে কিন্তু তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগাযোগ এখন বিচ্ছিন্নই বলা যায়। তাই আপনাদের পেশাগত সমস্যার যথাযথ অনুধাবন আমার পক্ষে কঠিন। তবে সাধারণভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কথা বলার অধিকার সব শিক্ষিত নাগরিকের মতো আমারও হয়তো আছে। তার ওপর সাহিত্য ও শিক্ষার সম্পর্ক প্রায় অঙ্গাঙ্গি— একটি আর একটার ওপর নির্ভরশীল। একে অপরের পরিপূরক। আর যত সীমিতভাবেই হোক সাহিত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজো অব্যাহত। এদিক থেকেও শিক্ষার অগ্রগতিতে আমি কৌতূহলী ও উৎসুক। শিক্ষা ছাড়া সাহিত্য কথাটা অর্থহীন। এ যেন গাছ ছাড়াই ফলের আশা করা। আবার সাহিত্য ছাড়াও শিক্ষা পঙ্গু আর অচল— সাহিত্যের হাত না ধরে শিক্ষা সামনে পা বাড়াতে পারে না কিছুতেই। দুঃখের বিষয় এ মোটা সত্যটাও আজ আমাদের দেশে অস্বীকৃত। ফলে শিক্ষা আর সাহিত্য— কোন ক্ষেত্রেই আশানুরূপ উন্নতি লক্ষিত হচ্ছে না। সব ব্যাপারেই কিছু মৌলিক শর্ত বা Basic condition আছে, সে সবকে অস্বীকার করা মানে গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা। আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে, মনে হয় সে ব্যবস্থাই চলছে।

শিক্ষার ব্যাপারে বড় বড় পরিকল্পনা আর মোটা মোটা অঙ্কের কথা শোনা যায়, দেখা যায় কাগজে-কলমে কিন্তু শিক্ষায়তন আর শিক্ষকদের দুরবস্থা তো আগের মতোই রয়ে গেছে। আগে বরং সম্মান, ইজ্জত আর নিরাপত্তাটা ছিল, আজ তাও নিশ্চিহ্ন। প্রাত্যহিক জীবনের ব্যয়-বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষক-বেতনের কোন সামঞ্জস্যই নেই আজ। ফলে জীবনসংগ্রামেও শিক্ষকরা আজ দিশেহারা ও পর্যুদস্ত। এ অবস্থাকে কিছুতেই শিক্ষা প্রসারের অনুকূল অবস্থা বলা যায় না।

বর্ষণে শস্যভূমি সিক্ত না হলে স্রেফ মেঘ-গর্জনে শস্য জন্মায় না এ তো জানা কথাই। আমাদের রাষ্ট্রীয় আকাশেও শিক্ষার ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে যথেষ্ট মেঘ-গর্জন শোনা যায় কিন্তু তা দেশের দূর-দূরান্তের শস্যভূমিতে যেখানে সমাজের ফুল ও ফলের চারা বপন করা হয়েছে আর সে সবকে বড় ও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, সেখানকার শুষ্ক মাটি যদি বর্ষণের দ্বারা সিক্ত না হয় তাহলে তাকে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াই বলা যায়।

অন্য দশটা ব্যাপারে কথার কারসাজিতে আত্মসন্তুষ্টি সন্ধান হয়তো তেমন ক্ষতির কারণ নয় কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে তো তা বলা যায় না। কারণ এর সঙ্গে শুধু যে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত তা নয়, প্রতিটি নাগরিকের মনুষ্যত্ব বিকাশেরও রয়েছে সম্পর্ক। সমাজ, রাষ্ট্র বা জাতি সব কিছুরই প্রাথমিক উপাদান মানুষ। সে মানুষ যদি সুস্থ আর স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ না পায় তাহলে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্বল আর বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। তাই জাতীয় স্বার্থেই শিক্ষাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করে সেভাবে গড়ে তোলা উচিত। এ দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের।

শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও রাষ্ট্র— এ চার মৌল উপাদান আর এসবের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না। আগে আমাদের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রাষ্ট্রের কথা না ভাবলেও চলত— তখন রাষ্ট্র কথায় কথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোটেও হস্তক্ষেপ করত না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষকরা তখন ভোগ করত অধিকতর স্বাধীনতা। চাকরির নিরাপত্তাও ছিল তখন বেশি। শিক্ষাগত ব্যাপারে তখন যে একটা স্বাধীন পরিবেশ ছিল এখন তাও অনুপস্থিত। আমরা এগুচ্ছি না পিছাচ্ছি তাই মনে স্বতই এ প্রশ্ন জাগে। মানুষ অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে। দিন দিন তার সচ্ছলতা আর বিকাশের সুযোগ হবে সহজতর, অগ্রগতির এ তো অর্থ। অর্থাৎ অগ্রগতি যদি ব্যবহারিক অর্থে সত্য না হয়, শুধু কাগজে-কলমে আর সংখ্যায় সীমিত হয়ে থাকে তাহলে দেশ বলতে যাদের বুঝায় সে মানুষের কোন ফায়দাই হবে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের এ সত্যটুকু উপলব্ধি করা উচিত।

শোনা যায় অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরাও এখন স্কুল-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছেন। তাঁরা যদি শিক্ষকদের সততা আর যোগ্যতায় আস্থা স্থাপন করতে না পারেন আর শিক্ষককে তাঁদের স্বাধীনভাবে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাঁধা দেন তাহলে পরিণামে ছেলেমেয়েরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ যোগ্য শিক্ষকের কোনদিনই চাকরির অভাব হবে না কিন্তু তাঁর স্কুল বা তাঁর ছেলেমেয়েরা আর একজন যোগ্য শিক্ষক পাবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অভিভাবকদের প্রধান কর্তব্য স্কুলের আর্থিক বুনিয়াদকে যথাসম্ভব সুদৃঢ় করতে সহায়তা করা আর ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হতে পারে তার অনুকূল পরিবেশ রচনা করা।

শৃঙ্খলা আর আনুগত্য ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। আর এর ফলে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছাত্রছাত্রীরা— বিশেষ করে ভালো ছাত্রছাত্রীরা। তাই যে কোন মূল্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক— এ সম্পর্কে এ তিনেরই সমান দায়িত্ব। অবশ্য ছাত্রদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি— কারণ ক্ষতির ষোলআনা অংশই তাদের পোয়াতে হয়। যেখানে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত তেমন ব্যাপারে ছাত্রদের কিছু স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে বটে কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যাপারে সে ক্ষমতা শিক্ষকের হাতে থাকা উচিত— কারণ এ বিষয়ে তিনিই বিশেষজ্ঞ।

দেখে দুঃখ হয় অনেক সময় ছাত্ররা তুচ্ছ কারণেও ধর্মঘট করে বসে বা দিয়ে থাকে চরম আনুগত্যহীনতার পরিচয়। পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া বা প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে এসব অজুহাতে ছাত্ররা যে মাঝে মাঝে আন্দোলন করে বসে তা শক্তির অহেতুক অপব্যবহার বলেই আমার বিশ্বাস। পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া মানে স্বয়ং ছাত্রদেরই পিছিয়ে পড়া। আর প্রশ্ন কঠিন হয়েছে কি সহজ হয়েছে সে বিচারের দায়িত্ব ছাত্রদের নিজের স্বার্থেই ছাত্রদের ওপর দেওয়া যায় না। তাহলে খাতা দেখার দায়িত্বও তাদের ওপর দেওয়া হবে না কেন?

শিক্ষার একটি বড় উদ্দেশ্য যুক্তি বিচারের চর্চা আর যুক্তি বিচারমুখীন হওয়া। কাঁচা বয়সে যুক্তিহীনতা একবার প্রশ্রয় পেলে তাকে সহজে দমানো যায় না। ছাত্রদের যুক্তিবাদী মনে র‍্যাশনাল করে তোলা শিক্ষকের এক বড় দায়িত্ব। এ করতে পারলে শিক্ষার অর্ধেক অংশই হাসিল হয়ে যায়। তবে চারপাশের সমাজ যদি যুক্তিহীন ও বিচারবিমুখ হয় তাহলে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমিত পরিধিতে তা তেমন ফলপ্রসূ হতে পারে না। কারণ নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা পরে ছাত্ররা আবার সেই সমাজেই তো ফিরে যাবে। এ বিচার-বুদ্ধি চর্চার অভাবে সমাজে আজ স্তুতি-স্তাবকতা এত বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে যে তা প্রায় সব রকম রুচি আর শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ছাত্রদের মনে রুচি, শোভনতা বা পরিমিতি বোধ জাগিয়ে তোলাও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি তা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া মানে ইংরেজিতে যাকে বলে কয়লার খনিতে কয়লা বহন করে আনা। তেমন দুশ্চেষ্টা আমি করব না। তবে প্রসঙ্গক্রমে কিছু মন্তব্য না এসে পারে না।

শিক্ষকতাকে সব দেশেই মহৎ পেশা বলে গণ্য করা হয়। অনতিকাল পূর্বে আমাদের দেশেও করা হতো। কিন্তু স্বাধীনতার পর হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত সামাজিক বিবর্তনের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে তা আমরা কেউই ভাবিনি। যার ফলে পুরোনো মূল্যবোধ সব আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। সরল জীবন আর উচ্চ চিন্তার কোন মূল্যই নেই আজ সমাজে। আর্থিক আভিজাত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে এ হয়েই থাকে। তবে হয়তো এহ্ বাহ্য— হয়তো এ কালো মেঘ একদিন কেটে যাবেই। তখন সমাজ আবার সুস্থ ও সুস্থির হয়ে উঠবে। ফিরে পাবে স্থিতিস্থাপকতা। হয়তো তা সময়সাপেক্ষ। কারণ একটা নৈরাজ্যিক বিশৃঙ্খলার যুগ পেরিয়ে জাতীয় মানস সুস্থির হতে বেশ সময়ের প্রয়োজন। তা হলে ইত্যবসরে কি শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পরিহার করবেন? না। কোন খাঁটি শিক্ষকই এ ভাবে ভাবতে পারেন না— কারণ তাঁর ব্রত নগদ বিদায়ের ব্রত নয়। তাঁর দৃষ্টি তো সব সময় দূর ভবিষ্যতের পানে। সে ভবিষ্যতের আশায় আজকের এ দুঃসহ জীবনও তাঁকে সহনীয় করে নিতে হবে। যে আলোকবর্তিকা হাতে তিনি জীবনের পথে পা বাড়িয়েছেন তা তো মাঝপথে তিনি নিভিয়ে দিতে পারেন না। তা করা মানে নিজের প্রতি, নিজের আত্মার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা। দেশগত বা জাতীয় স্বার্থের কথা নাইবা বল্লাম। তাই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষকরা, বিশেষ করে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও নিজেদের হাতের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছেন। জাতি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ— ভবিষ্যৎ বংশধররা আরো বেশি কৃতজ্ঞ। অবশ্য কৃতজ্ঞতার ব্যবহারিক প্রকাশ না ঘটলে তার বিশেষ মূল্য নেই। কিন্তু মানুষের আত্মার একটা দাবি আছে, শিক্ষকের পেশার সঙ্গে সে দাবির কোন সম্পর্ক নেই তা আমি মানি না। আর গাণিতিক হিসেবে সে দাবির মূল্য নির্ণয়ও সম্ভব নয়। মানুষের দুই সত্তা— ভিতরে আর বাইরে, এ দুই নিয়েই মানুষ। এ দু'য়ের সঙ্গতি সাধন করে মানব সন্তানকে বড় করে, বাড়িয়ে আর ফুটিয়ে তোলাই শিক্ষার এক সার্বজনীন উদ্দেশ্য। এভাবে মানুষ অর্জন করে জীবন-যুদ্ধের উপযোগিতা। ভিতর আর বাইরের এ সমন্বয় তত্ত্ব মোটামুটি সত্য হলেও প্রধান ভূমিকা কিন্তু ভিতর বা অভ্যন্তরীণ সত্তার। যেমন কারো দেহটা অক্ষত বা অক্ষুণ্ন থাকলেও যখন তার দেহে প্রাণের অভাব ঘটে তখনই আমরা বলে থাকি লোকটার মৃত্যু হয়েছে। কাজেই অভ্যন্তরীণ সত্তার গুরুত্ব আর মূল্য যে কতখানি এ সরল তথ্য থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের মন, মানস আর চরিত্র এসব কিছুই নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ জীবনের ওপর। ইংরেজিতে যাকে Character আর আরবিতে যাকে 'আখলাক' বলা হয়— বাংলায় চরিত্র শব্দ দিয়ে যার শুধু আংশিক দ্যোতনাই আমরা প্রকাশ করতে সক্ষম, তা পুরোপুরি ভিতরের বস্তু। মন্ত্রিত্ব বা আজকে আমার সভাপতিত্বের মতো তা বাইরে থেকে আরোপ

করা যায় না। বহু আয়াসে, বহু শ্রমে ও বহু সাধনায় তা ভিতর থেকে গড়ে তুলতে হয়। এ গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলার জন্য শুধু ভালো বীজ বা চারা হলে চলে না— চাই অনুকূল পরিবেশ আর অনুকূল আবহাওয়াও। বীজটা অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য যদি তার গোড়ার মাটি আর পানি না দিয়ে লাখ লাখ কি কোটি কোটি টাকার নোট কাগজ দেওয়া যে তাহলে বীজটা যে শুধু অঙ্কুরিত হবে না তা নয় কাগজখেকো পোকারা নোট কাগজের সঙ্গে আস্ত বীজটাকেও খেয়ে সাবাড় করবে। তেমনি মানুষের বিশেষ করে বেড়ে-ওঠা মানুষের অর্থাৎ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনের খোরাক চাই। চাই অন্তরের খাদ্য ও অনুকূল পরিবেশ। বলাবাহুল্য পাঁচতলা-সাততলা ইমারত বা কোটি কোটি টাকার কাগজি পরিকল্পনা সে খোরাক নয়— গাছেরও নয়, মানুষেরও নয়। গাছে আর মানুষে উপমা দিলাম সত্য— কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। গাছ জড়বস্তু সে যা কিছু গ্রহণ করে সে মাটি কি শূন্যমণ্ডল যেখান থেকেই হোক, তা করে একান্ত জড়ভাবে, তাতে বিচার-বিবেচনার স্থান নেই। কিন্তু মানব-সন্তান জীবন্ত প্রাণী— তার ভিতর মন আছে, আছে বিচার-বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি আর দীপ্ত হয়ে ওঠার অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। এ সব দিয়েই সে গ্রহণ করে। তাই তার গ্রহণ বিচার-বুদ্ধি আর হৃদয় দিয়ে গ্রহণ। এ গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুতের দায়িত্ব শিক্ষা আর সাহিত্যের। এখানে আমি আপনাদের সহযাত্রী— আমি জানি আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র ও অতিমাত্রায় সীমিত। তবুও আমরা আমাদের কর্তব্য করে যাব। এ করাতেই আমাদের আত্মতৃপ্তি।

একটি অপ্রিয় কথার উত্থাপন করছি। কথাটা যে সকলের প্রতি প্রযোজ্য তা নয়— সব ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম আছে। সমাজ চায়, আপনারা-আমরাও চাই ছাত্ররা শ্রদ্ধাশীল হোক, গুরুজনদের মান্য করতে শিখুক। শিক্ষক, অধ্যাপক আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের প্রতি দেখাক সসম্মান আনুগত্য।

সুষ্ঠু লেখাপড়া আর সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চালাবার জন্য এ সব যে অত্যাবশ্যক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উপরেও এ বিষয়ে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বিদ্যা এবং জ্ঞান যেমন অর্জন করতে হয় তেমনি অর্জন করতে হয় শ্রদ্ধা-ভক্তিও। নিজেকে করে তুলতে হয় শ্রদ্ধা-ভক্তির উপযুক্ত। সর্বত্রই অধিকারীভেদ স্বীকৃতযোগ্য পাত্র হওয়ার জন্য, যেমন সাধনা অত্যাবশ্যক তেমনি শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ার জন্যও যথেষ্ট সাধনা ও ত্যাগের প্রয়োজন। অন্ধ-ভক্তি কোন কাজের কথা নয়— তা ফলপ্রসূ যেমন নয় তেমনি নয় স্থায়ীও। ছাত্রদের যেমন আমরা বিচার করে নিতে চাই তারাও তেমনি বিচার করেই আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করতে চায়। আমরা তাদের পরীক্ষা করব তারা আমাদের পরীক্ষা করবে না— এ কিছুমাত্র যুক্তির কথা নয়, নয় স্বভাবের কথাও। যতই অপরিণত হোক তারাও বিচারবুদ্ধির অধিকারী। এ সত্য আমাদেরও মনে রাখা প্রয়োজন। আত্মজিজ্ঞাসারও এক বিশেষ মূল্য আছে। এর ফলে শুধু যে সত্যের নাগাল পাওয়া যায় তা নয় অনেক বিড়ম্বনার হাত থেকেও রেহাই মিলে। মহাচীনের মহামনীষী লাওৎসের একটি বাণী :

যে অন্যকে জানে সে বিদ্বান,
যে নিজেকে জানে সে জ্ঞানী।
যে অন্যকে জয় করে সে বলবান,
যে নিজেকে জয় করে সে শক্তিমান।

সব মানুষেরই আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন— এর ফলে নিজেকে শোধরানো সহজ হয় পেশাগত যোগ্যতা আর চারিত্রিক সততা ছাড়া সত্যিকার অর্থে শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়। ভয়-প্রলোভন বা বাধ্যবাধকতার পথে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা তার মূল্য কতটুকু? রাজনীতিক্ষেত্রে তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধার বন্যা আমরা অহরহই দেখতে পাই আর দেখতে পাই এসব ভক্তি-শ্রদ্ধার মূল উৎস ক্ষমতাটা খসতে না খসতেই প্রাকৃতিক বন্যার থেকেও তা দ্রুত নেমে গিয়ে শুকিয়ে একদম কর্দমময় হয়ে ওঠে। তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রতি শিক্ষকদের লোভ না থাকারই কথা।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ সমস্যার অন্ত নেই। দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য কিন্তু সে অনুপাতে স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি আবার স্কুলের সংখ্যানুপাতে বাড়েনি উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা। 'এক শ্রেণী এক শিক্ষক' এ প্রাথমিক শর্তটিও অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করা হয় না। এ সবের মূল কারণ অর্থনীতি। সরকারি উদ্যমও এ ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আমলে মেয়েদের একটি মাত্র সরকারি হাই স্কুল ছিল আজো সে একটিই আছে— ছেলেদের দুটি হাই স্কুল ছিল আজো সে দুটির উপর তিনটি হয়নি— কলেজের বেলায়ও তাই। প্রয়োজন আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলের ফলে এখন মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টি বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রাম-দেশে বাস করে অথচ সে গ্রাম-দেশে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা মোটেও বাড়েনি, শহরেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল ও তদসংলগ্ন ছাত্রীবাস। ছাত্রীবাসের অভাবে ইচ্ছা থাকলেও তাই অনেকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারছে না।

এ অবস্থায় শিক্ষা খাতে একশ ত্রিশ কোটি টাকার পরিকল্পনা আর ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা-বৃদ্ধি নিয়ে গর্ব করার কোন মানে হয় কি? ব্যয়বহুল ক্যাডেট কলেজে কয়টা অভিভাবক ছেলে পাঠাতে পারে? ক্যাডেট কলেজের দ্বারা দেশের শিক্ষা সমস্যার শতভাগের একভাগ মেটানোও সম্ভব নয়। আর সেখানে জীবনযাত্রার এমন একটা কৃত্রিম মান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় যে, যার সঙ্গে চারিদিকের সমাজের নেই কোন সম্পর্ক— অনেক পিতামাতার মানের সঙ্গেও রয়েছে বিরোধ। কোন ছেলেমেয়েই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে না আর কোন ক্লাসই থাকবে না খালি। কোটি টাকার পেনিসিলিন কাহিনী না শুনিয়ে সরকার যদি এ আদর্শটাই বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাহলে ছাত্র-অসন্তোষের অনেক কারণই তিরোহিত হবে আর ব্যাপক অশিক্ষা বা নিরক্ষরতারও ঘটবে অবসান।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্যবই সমস্যাও উপেক্ষণীয় নয়। পাঠ্যবই প্রকাশনার দায়িত্ব সরকারের একচেটিয়া মালিকানায় চলে যাওয়ার পর থেকে পাঠ্যবইয়ের মানোন্নয়নের প্রতিযোগিতা তিরোহিত হয়েছে বলে তাতে দ্রুত অবনতি ঘটেছে। এটি শিক্ষক আর শিক্ষিত অভিভাবক সকলেরই এক দুশ্চিন্তার কারণ। উন্নতমানের পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে; কারণ ঐখান থেকেই আহরিত হয় তাদের মনের খোরাক।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজনীতির আমি বিরোধী— তথাকথিত সহজ শিক্ষা কথাটা আমার কাছে স্ব-বিরোধী বলেই মনে হয়। প্রকৃত শিক্ষার পথ কঠিনের পথ— এ কঠিন পথ না

দাঁড়িয়ে কেউ খাঁটি শিক্ষিত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। পাঠ্যবইকে আর্থিক সহজ করা মানে ছাত্রছাত্রীদের মনকে বিকশিত হতে না দেওয়া। শিক্ষা বোতলে দুধ খাওয়া বা খাওয়ানো নয়। আমি পাস-ফেলের কথা বলছি না— বলছি স্রেফ শিক্ষার কথা। আমি জানি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থার ফলে পাস-ফেলের সঙ্গে আপনাদের অনেকের জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। তবু শিক্ষার যে মহত্তম আদর্শ সেটা তো বিসর্জন দেওয়া যায় না। সেটা দেওয়া হয়েছে বলেই, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক প্রায় দারোগা-আসামির সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়।

শারীরিক স্বাস্থ্যের বেলায় যেমন ব্যায়াম অত্যাবশ্যক তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যও মানসিক ব্যায়াম ছাড়া আয়ত্ত হয় না। মানসিক বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশের জন্য মস্তিষ্ককেও পরিশ্রম করতে হয়, খাটাতে হয়। বিষয়বস্তু কিছুটা কঠিন না হলে মস্তিষ্ক খাটাবার কোন প্রয়োজনই হয় না, ফলে অনভ্যাসে মাথা খাটাবার প্রবৃত্তিই ছাত্র হারিয়ে বসে। চিন্তা করতে করতেই চিন্তাশক্তি বাড়ে এ সকলেরই জানা কথা। আমাদের দেশে, আমাদের দেশে শুধু কেন, সব দেশেই লেখাপড়া আগে কঠিন ছিল— তবুও আমাদের মতো অনুন্নত দেশেও যে কয়জন মহাপুরুষ জন্মেছেন তাঁরা সবাই সে কঠিন লেখাপড়া যুগেরই সন্তান। হয়তো সব দেশের বেলায় এ কথা সত্য। সহজ পথে চিন্তাশীল, ভাবুক আর মহৎ মানুষ জন্মায় না— এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আপনারা জানেন রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও শিক্ষাদান নিয়েও তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্য স্মরণীয় :

"ছেলেদের বইএ মাল খুব কমিয়ে দিয়ে হালকা করা কর্তব্য নয়। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার না... অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া ও চেষ্টা করে খাটাটাও শিক্ষার অঙ্গ। সেটা আনন্দেরই সহচর। ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতে একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়।"

বিষয়টিকে খোলাসা করার জন্য আমি আরো কিছু উদ্ধৃতির আশ্রয় নিচ্ছি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত জীবনী লেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"আমরা জানি যে কবি স্কুলের ছেলেদের বড় বয়সের সাহিত্য পড়াইতেন— রাজর্ষি নাম ছিল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য। অজিতকুমার চক্রবর্তী ক্লাসের বড় ছেলেদের

অজানা নয়। এঁদের রচনার সবটুকু গ্রহণ স্কুলছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয় তা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন— কিন্তু এও জানতেন এসব থেকে ছাত্ররা যা গ্রহণ করবে বা করতে পারবে তাই যথালাভ— তাতে মস্তিষ্ক-চর্চার প্রয়োজন হবে বলে তা করবে তাদের মানসিক বিকাশের সহায়তা।

আজকাল আমাদের মাতৃভাষা বাংলার কথা যেখানে সেখানে শোনা যায়— একুশে ফেব্রুয়ারি ঘনিয়ে এলে শিক্ষক আর ছাত্রমহলে এ সম্পর্কে উচ্ছ্বাসের বন্যা নেমে আসে। কিন্তু শিক্ষার বেলায় দেখা যায় বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনে আগের তুলনায় অনেক অবনতি ঘটেছে। পাঠ্যবইয়ের নিম্নমানের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অন্য দুই ক্ষেত্রে যে অবনতি আমার চোখে পড়েছে তাই শুধু নিবেদন করব। আমার বিশ্বাস রিডিং পড়াটা শিক্ষার, বিশেষ করে মাতৃভাষা শিক্ষার একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখন দেখা যায় খুব কম ছেলেই ভালো রিডিং পড়তে পারে। স্কুলে যথোচিত রিডিং শিক্ষা দেওয়া হলে এমন ঘটবার কথা নয়। বইয়ের ভাষা থেকে আমাদের মুখের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক বলে চাটগাঁর স্কুলগুলিতে রিডিং পড়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত।

আর একটা ব্যাপার আমাকে সব সময় পীড়া দেয়। আজকাল প্রায় সভা-সমিতিতে দেখা যায় আবৃত্তির নামে ছেলেরা বই দেখে দেখে পড়ে যায়! এমন বিসদৃশ কাণ্ড আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা কখনো দেখিনি— হয়তো আপনারাও দেখেননি। আগে যে সহজ শিক্ষার কথা বলেছি এ তারই পরিণতি। অর্থাৎ বিনা পরিশ্রমে বাজিমাৎ করা। একটা ভালো কবিতা মুখস্থ করার জন্য যেটুকু পরিশ্রম প্রয়োজন এখনকার ছাত্ররা তা করতেও রাজি নয়। তথাকথিত সহজ শিক্ষা ছাত্র সমাজকে কতখানি পরিশ্রমবিমুখ করে তুলেছে এ তারই দৃষ্টান্ত। আমি আরো অনেকবার আবৃত্তির নামে এমন প্রহসনে আপত্তি জানিয়েছি। কিন্তু কার আপত্তি কে শোনে? স্কুলে আবৃত্তির ওপরও কিছুটা জোর দেওয়া উচিত— যতি রক্ষা করে বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ কবিতা শিক্ষার এ বোধ করি শ্রেষ্ঠ উপায়। নিষ্ঠার সাথে মাতৃভাষার চর্চা অধ্যয়ন আর পঠন-পাঠন ছাড়া মাতৃভাষার নামে উচ্ছ্বাস প্রকাশ তো স্রেফ হাওয়ায় বেলুন ওড়ানো।

আজ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এমন হয়ে পড়েছে যে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম বা আন্দোলন ছাড়া ন্যায্য অধিকারও এখন আদায় করা যায় না। তাই আপনাদেরও পেশাগত অধিকার রক্ষার জন্য আপনাদের সংঘ তথা শিক্ষক সমিতিগুলোকে আরো মজবুত করতে হবে। এ করার একমাত্র উপায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা আর সে ঐক্যকে অধিকতর সংহত আর সক্রিয় করে তোলা। পেশাগত কারণে ব্যক্তিগত নির্যাতন রোধেরও এ একমাত্র পথ।

চট্টগ্রাম জেলা শিক্ষক সমিতি আরো জোরদার হয়ে উঠুক এ আমার আন্তরিক কামনা। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

ইতিহাসের আহ্বান

[সম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা]

…রে যখন আগুন লাগে তখন কে দিলে আগুন? কেন লাগল আগুন? ঘরটি পুরানো ছিল না …? বাঁশের ছিল না টিনের? ঘরের মালিক কালো না ফর্সা? খাটো না লম্বা? ইত্যাদি তর্ক শুধু … অর্থহীন বাকবাহুল্য তা নয়— বরং আগুন নিয়ে মানসিক বিলাসিতাই এর নাম। এরকম … বাক্ বিলাসিতায় ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্র কারো এক বিন্দু ফয়দা হয় না বরং আগুন আরো …তে থাকে, আরো ঘর জ্বলতে থাকে, নিজের ঘরও তখন রেহাই পায় না আগুনের হাত …কে। ওখানে আগুন না লগলে এখানেও লাগত না বা এখানে লাগাতেই ওখানেও থেমেছে— … যুক্তি আহাম্মকের যুক্তি, এই লজিক নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের আত্মঘাতী …ক। কোন সুস্থ ব্যক্তি বা বিবেকবান জাতি কখনো এরকম যুক্তি মানতে পারে না।

এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন সর্বনাশা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা, …জের মনুষ্যত্ব, ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের প্রতি, …ষ্ট্র ও মানুষের প্রতি ছাত্র ও তরুণ সমাজ কখনো এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। … ছাত্র প্রকৃত ছাত্র, যে তরুণের আছে প্রকৃত তারুণ্য, আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সে …খনো চুপ করে থাকতে পারে না, সে কখনো নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করতে …রে না। এদেশের অর্থাৎ দুই বঙ্গের ছাত্রসমাজকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সুদীর্ঘ …৮শ বছর ধরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকতার সুযোগ আমি পেয়েছি, মিশেছি সব …জের সব সম্প্রদায়ের ছাত্রের সঙ্গে। তাদের মনের চেহারা আমার সুপরিচিত। মহত্ত্বের …কে, মনুষ্যত্বের আহ্বানে উদার সত্য ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের ডাকে তারা চিরকালই সাড়া …য়েছে, এগিয়ে এসেছে সামনে, প্রাণ দিতেও কসুর করেনি এতটুকু। দেশের আজাদি …মের পুরোভাগে তারাই তো এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন, এসেছিল জাত ধর্ম সম্প্রদায় … ভুলে, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান সম্বন্ধে এতটুকুন হিসাব না করে। দুর্ভিক্ষের দিনে …ন ও মহামারীর সামনে, সর্বহারা-গৃহহারা মানুষের দুঃখমোচনে চিরকাল অগ্রণী হয়েছে …মাদের ছাত্রসমাজ। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে নিজের সুখ-সুবিধার এতটুকু না ভেবে, তারা …রে বারে তাদের সেবাকল্যাণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিল দুস্থ জনগণের দিকে, ছুটে …গেছিল বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের ঘরে ঘরে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে …ণ করেছিল তাদের দুঃখের অংশ— নিজেদের সুকোমল হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে মুছিয়ে …য়েছিল অবালবৃদ্ধবনিতার চোখের পানি।

…াত্রসমাজের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। আমাদের সেই …সমাজ, সেই তরুণ শক্তি— আমাদের বর্তমানের আশা ও ভবিষ্যতের ভরসা, জাতীয় …তা ও তমদ্দুনের রক্ষক ও বাহক, ছাত্রসমাজ আজো বিদ্যমান, বরং দিন দিন তাদের …া বেড়েই চলেছে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু.... কিন্তু?

…র্ব পাকিস্তানের এখানে ওখানে যখন আগুন লেগেছিল— সাম্প্রদায়িক আগুন,

পাকিস্তানের অসহায় নাগরিকের ঘর যখন দুর্বৃত্তের হাতের আগুনে জ্বলছিল, নিরীহ ও নিরপরাধ নাগরিকের ওপর মুষ্টিমেয় গুপ্ত হত্যাকারীর কাপুরুষোচিত আক্রমণ চলছিল, তখন তারা পূর্বের মতো বিদ্যুৎবেগে সাড়া দেয়নি, বজ্রশক্তিতে রুখে দাঁড়ায়নি দুর্বৃত্তের সামনে এসে, ছুটে বের হয়নি ঘর থেকে পথে। ঘর ছেড়ে, হোস্টেল ছেড়ে তারা কেন দলে দলে বেরিয়ে এলো না, এগিয়ে এলো না বাইরে, কেন ছুটে গেল না হিন্দু প্রতিবেশীর ঘরের দুয়ারে সতীর্থ হিন্দু ছাত্রদের কাছে? কেন দাঁড়াল না দলে দলে রাস্তার পাশে ও পথের মোড়ে মোড়ে দুর্বৃত্তের হাত থেকে অসহায় পথচারীকে বাঁচাবার জন্য? কয়েকজন মাত্র দুর্বৃত্তের ছুরির আতঙ্কে কেন আজ বন্ধ হলো ছাত্র সমাজের পরম তীর্থক্ষেত্র বহু স্কুল-কলেজ? কেন তারা ছুটে গিয়ে হিন্দু শিক্ষক-অধ্যাপক ও ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে বলে না : আমরা নিজেরাই আপনাদের স্কুল-কলেজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব ও বাড়ি পৌঁছে দেব নিরাপদে। দরকার হলে আপনাদের বাড়িতে আমরাই দেব পাহারা। ছাত্র ও শিক্ষয়িত্রীদের স্কুলে ও বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেওয়ার গৌরবময় বীরোচিত ভূমিকা তারা কেন গ্রহণ করল না? কেন এইভাবে সাহায্য করল না স্কুল-কলেজের পড়াশোনাকে অব্যাহতভাবে চালু রাখতে? এ সবই ছিল ছাত্রসমাজের— পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্র সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই দায়িত্ব তারা পুরোপুরি পালন করেনি, রাষ্ট্রীয় ও মানবীয় এই মহান কর্তব্যকে করেছে তারা অবহেলা। মুসলিম ছাত্রসমাজের এই ত্রুটি ও নিষ্ক্রিয় ঔদাসিন্যের লজ্জা নীরবে মর্মে মর্মে আমাকে দহন করেছে। ছাত্রসমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হৃদয়ের, অন্তরের, মর্মলোকের— তাই তাদের ত্রুটি আমার ত্রুটি, তাদের লজ্জা আমার লজ্জা হয়ে আমাকে আঘাত হেনেছে ও আমার মনে রয়েছে কাঁটার মতো বিঁধে। অসঙ্কোচে, মন খুলে, এই লজ্জা ও মর্মজ্বালা তাদের না জানিয়ে চুপ করে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ তা হবে আমার পক্ষে ভাবের ঘরে শুধু চুরি নয়, রাহাজানি, আর ভাবের ঘরে চৌর্যবৃত্তি হচ্ছে মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় দুশমন। এই চৌর্যবৃত্তি সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষে যেমন হারাম, তেমনি মনুষ্যত্বের নবীন পথযাত্রী ছাত্রদের পক্ষেও তা আত্মহত্যারই শামিল।

মুষ্টিমেয় দুর্বৃত্ত দেশের অর্থনীতি ও রাষ্ট্র কাঠামোকে বরবাদ করে দেবে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ও প্রিয়তর রাষ্ট্রের মুখে মাখিয়ে দেবে কালি, সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে করে দেবে বানচাল, ছাত্রসমাজ এই দৃশ্য কি করে সহ্য করে থাকতে পারে নীরবে? অধিকাংশ স্কুল-কলেজ প্রায় অচলাবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে— শতকরা পঞ্চাশজন ছাত্রও নাকি এখন স্কুলে হাজির হচ্ছে না, বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক আতঙ্কে করেছেন দেশত্যাগ যাঁরা করেননি তাঁদেরও অনেকে স্কুল-কলেজে উপস্থিত হতে সাহস পাচ্ছেন না। এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ও তার ভয়াবহ পরিণতি আমাদের ছাত্রসমাজ কি ভেবে দেখবে না? স্কুল-কলেজ, সাহিত্য-শিল্প নানারকম সংস্কৃতি চর্চাকে বাদ দিয়ে যে রাষ্ট্র তা মরু নামের অযোগ্য, মগের মুল্লুক তাকে বলা যেতে পারে। আচ্ছা পাকিস্তানকে কী আমরা মগের মুল্লুকে পরিণত করব? না। তা কখনো হতে পারে না, তা হতে দিতে পারি না আমরা পাকিস্তানের অগণিত মুসলিম জনসাধারণের প্রতি — যারা দীর্ঘকাল ধরে স্বপ্ন দেখছে

জন্য সংগ্রাম করেনি, লড়েনি। মগের মুল্লুকের বাসিন্দা আমরা হতে চাই না; আমাদের দেশ ও রাষ্ট্র হবে শুধু সুসভ্য ও শিক্ষায়-দীক্ষায় সমুন্নত নয়, তা হবে সর্বপ্রকারে, সর্বজনের পক্ষেই নিরাপদ পবিত্রভূমি, তা হলেই তার পাকিস্তান নাম সার্থক হবে। এই নিরাপত্তা সকলের জন্যই, নির্বিচারে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, সব নাগরিকের জন্যই। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম কায়েদে আজম গোড়াতেই বলে দিয়েছেন : "পাকিস্তানে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু স্বীকৃত হবে না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকেরই থাকবে এখানে সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা।" এই আদর্শই আমাদের আদর্শ। প্রত্যেক সংস্কৃতিবান লোকেরই এই আদর্শ।

ইসলামের শব্দগত অর্থও শান্তি। অক্ষুণ্ন শান্তি ছাড়া, সকল নাগরিকের শান্তি ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রের ইসলামী বিশেষণ অসার্থক ও অর্থহীন ব্যঙ্গ বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কলকাতায় বা হিন্দুস্থানের এখানে ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে ও নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। সেই দুর্ভাবনার দায়িত্ব ও অধিকার রাষ্ট্রের, পাকিস্তান রাষ্ট্র যদি মনে করে হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্যে যুদ্ধ করা দরকার যুদ্ধ ঘোষণা তাঁরা করবেনই— সেই যুদ্ধে আমরা সৈনিক হতে রাজি আছি, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত— অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জুলুমবাজির বিরুদ্ধে। সৈনিকের ভূমিকা, গৌরবের ভূমিকা, সেই ভূমিকা অভিনয় করতে আমরা পেছপাও হব না। কিন্তু গুণ্ডার ভূমিকা, খুনি-ঘাতকের ভূমিকা, চোর ডাকুর ভূমিকা— আমরা গ্রহণ করব না, গ্রহণ আমরা করতে পারি না। কারণ তা মনুষ্যত্বের কলঙ্ক, ইসলামের শিক্ষার খেলাপ, রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তার পরিপন্থী।

আজ আমার আবেদন বিশেষ করে আমাদের তরুণ ছাত্রসমাজের প্রতি— তাঁরাই পাকিস্তানের ভাবী কর্ণধার। সব রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে আজ তাঁদেরই রুখে দাঁড়াতে হবে সর্বাগ্রে এবং দেখতে হবে ভবিষ্যতেও যেন না ঘটতে পারে এ ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ পাকিস্তানে। তারাই পাকিস্তানের শান্তি ফৌজ— পাকিস্তানে শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব তাদেরই। এই দায়িত্ব তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পালন করলে, আমাদের নতুন রাষ্ট্রের নতুন ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম লেখা হবে স্বর্ণাক্ষরে ও থাকবে চিরস্মরণীয় হয়ে। কোন দেশে কোন যুগেই গুণ্ডা, খুনি, ডাকু, জালিমের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না, কারণ তারা দেশের শত্রু নয় ইতিহাসেরও কলঙ্ক। আমাদের নৌজোয়ানদেরও ভূমিকা সেই ত্যাগী ও বীর শহীদানের ভূমিকা। যে দেশে সত্য, ন্যায়, ধর্ম রক্ষার জন্য ও অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার তরুণের অভাব পড়ে, যে দেশের নৌজোওয়ানেরা সত্য ও ন্যায়ের সৈনিক হয়ে দাঁড়া দেওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করে না, কাড়াকাড়ি করে না, সেই দেশ অতীব হতভাগ্য। সে দেশের ভাগ্যে জুটে ইতিহাসের ধিক্কারধ্বনি। পূর্ব পাকিস্তানের নৌজোওয়ানদেরও সামনে রয়েছে আজ এই দুই পথ— ইতিহাসের মুবারকবাদ ও ইতিহাসের ধিক্কারধ্বনি শোনার পথ। বেছে নাও— অবিস্মরণীয় গৌরবের পথ না অবিস্মরণীয় ধিক্কারের পথ তোমরা গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমার ইতিহাস আকুল কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে— মুবারকবাদের পথ, গৌরবের পথ, মহিমার অবিস্মরণীয় শহীদী পথ গ্রহণ করতে, মৃত্যুবরণ করে অমর হতে। আমাদের ইতিহাসের শুভ্রপাতা, আমাদের নৌজোওয়ানদের অকলঙ্ক তরুণ মুখের দিক তাকিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে অমরতা অর্জনের জন্য, ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য। আমাদের নবীন ছাত্রদের এই নীরব আবেদন কি ব্যর্থ হবে?

আমার সেরা লেখা

'আমার সেরা লেখা'—শুনেই চমকে উঠবার মতো কথা। একমাত্র শেষ লেখার পরেই সেরা লেখার কথা উঠতে পারে। তাই প্রশ্ন জাগে —আমি কি শেষ হয়ে গেছি? আমার লেখা কি ফুরিয়ে গেছে? আমি কি আমার শেষ লেখা লিখে সেরেছি? মন বলে—না। তবে সেরা লেখার কথা ওঠে কি করে? বলাবাহুল্য দোষ আমার নয়—উঠিয়েছেন রেডিও কর্তৃপক্ষ! মুশকিল আরও, আমাকেই বলতে হবে আমার সেরা লেখার কথা অর্থাৎ নিজের ঢাক নিজেকেই পিটাতে হবে। সাহিত্যিকের পক্ষে এ-এক অস্বস্তিকর ব্যাপার—আত্মহত্যার চেয়েও এ-প্রায় কঠিনতর কাজ। তবুও নিষ্কৃতি নেই, সাহিত্যিক শিল্পীরও নাম যদি একবার রেডিওর খাতায় ওঠে তবে রেডিও যন্ত্রের চড়া সুরের সঙ্গে তাঁদেরও সুর মিলাতে হয়। নিজের ঢাকে কাঠি মারবার আগে এটুকুই আমার সাফাই।

আমার লেখার তালিকা হয়তো দীর্ঘ। সেই দীর্ঘ তালিকায় সেরা লেখা বলব কোনটিকে? ভাল লেখাই তো দেখতে পাচ্ছি না একটিও। চুল পেকেছে, বয়সও আমার কাঁচা নয়। তবুও হাতের লেখা পেকেছে বলতে তো ভরসা পাচ্ছি না। সব লেখাই মনে হচ্ছে কাঁচা—ফিরে লিখতে পারলেই যেন খুশি হতাম। কিন্তু জীবনের খাতার ফেলে আসা পাতা ফিরে উল্টাবার সাধ্য নেই কারো। ফিরে লেখা তো দূরের কথা।

সেদিনের সোনালি কৈশোর ও উত্তপ্ত যৌবন কিছুই আর ফিরে পাবার জো নেই। তখন লিখতে গিয়ে ভুল করেছি অজস্র এবং ভুলকে মনে করেছি ফুল। যা তা লিখেছি, যা তা ভেবেছি। যা লিখবার তা লিখিনি, যা লিখবার নয় তাই হয়তো লিখে বসেছি। ফলে আজ সেরা লেখার সন্ধান করতে গিয়ে দেখি হাতের কলম দিয়ে ফুল যা ফুটিয়েছি, তার চতুর্দশগুণ ফুটিয়েছি কাঁটা, একে-ওকে, মানুষকে, সমাজকে। দেশ ও নীতিধর্মও রেহাই পায়নি সেই কাঁটার খোঁচা থেকে।

স্বপ্ন দেখেছি হয়তো অনেক কিছুর। কল্পনা করেছি বহু, ভেবেছি তারও বেশি—কিন্তু তার সহস্রাংশও তো ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনি। চতুর্দিকের প্রকৃতিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু ভাষার সোনার শিকল তার পায়ে পরতে গিয়ে হয়েছি ব্যর্থকাম। মানুষের বিচিত্র জীবন, তার সুখ-দুঃখ, তার হাসি-অশ্রু আমাকে নাড়া দিয়েছে, আমার মনে তুলেছে ঝড়—এই ঝড়কে ধরতে চেয়েছি মনে ও কলমে। আজ ফিরে দেখি ঝড়কে ধরতে গিয়ে ধরেছি শুধু খড়। এমনি বিড়ম্বিত যার সাহিত্যিক জীবন, তার সেরা লেখার কথা আপাতত মুলতবি থাকাই উচিত।

প্রকাশক অবশ্য বলেছেন—চৌচিরই নাকি আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা অর্থাৎ 'Best Seller'। 'চৌচির' সমাজের প্রতি খোঁচা আছে সঙ্গে সঙ্গে তরুণ মনের আবেগ বিগলিত প্রেমও আছে প্রচুর। বইটির করুণ বিয়োগান্ত পরিণতিই হয়তো এটিকে তরুণ পাঠক-পাঠিকার প্রিয় করে তুলেছে কিন্তু এ বইতে কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট। সাহিত্যিক বন্ধুরা বলেন, গল্পই নাকি আমার ভাল এককালে একটা গল্পের বই প্রকাশ করেছিলাম—'মাটির পৃথিবী' নাম দিয়ে। অর্থাৎ দোষে-গুণে ভরা মাটির মানুষেরই জীবনের কিছুটা পরিচয় এ গল্পগুলিতে ছিল। তাতেও কাঁটা ছিল অনেক—সমাজের গায়ে নিষ্করুণ হাতেই এ কাঁটার খোঁচা দিয়েছি আমি বারংবার। তবুও ঐ বই সেদিন শান্তিনিকেতন

P.E.N-এর প্রশংসা লাভ করেছিল। 'মাটির পৃথিবী' আর ছাপা হয়নি। সম্প্রতি 'মাটির পৃথিবী'কে ভেঙ্গে 'আয়যা' নাম দিয়ে আর একটি গল্পের বই বের করেছি। এতেও কাঁটার খোঁচা আছে যথেষ্ট, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু রসের যোগানও আছে। প্রেমও বাদ পড়েনি।

কিন্তু আমি তো স্বপ্ন দেখেছি অখণ্ড জীবনের, আস্ত মানুষের, গোটা মানুষের। খণ্ডিত, বিকৃত ও রোগ-পাণ্ডুর জীবনের স্বপ্ন আমার নয়। জীবন-সাধক সুস্থ মনুষকে সাহিত্যে দাঁড় করাবার স্বপ্ন রচনাই ছিল আমার ব্যসন। কিন্তু এই স্বপ্ন সার্থক হবে কি করে? দেশ দ্বিধা-বিভক্ত। সমাজের চেহারা বিকৃত। সর্বপ্রকার নীতিবোধ আজ লাঞ্ছিত—ধরতে গেলে গোটা শতাব্দীর চেহারাই তো অস্বাভাবিক রোগ পাণ্ডুর। এখানে আস্ত ও সুস্থ মানুষের যখনই কল্পনা করতে গেছি তা প্রায় বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একদা আমার 'জীবন পথের যাত্রী' নামক উপন্যাসে কয়েকটি সুস্থ মানুষকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলাম। কোনো কোনো চরিত্র কিছুটা অবাস্তব ঘেঁষা হলেও এই বইর প্রত্যেকটি মানুষকে চেনা যায় তারা কে ও কি। প্রেমে, ত্যাগে, সাধনা ও জীবন-বোধে প্রতিটি চরিত্র কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা লাভ করেছে। যে যুগ দ্রুত নিঃশেষিত, যাকে আমরা এখনই Good old days বলতে শুরু করেছি তার এক সুস্থ প্রতিনিধি আজমল সাহেব। আমাদের যুগের রচনায় যে সব তরুণ লেখাপড়াকে সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছিল গ্রন্থের নায়ক মামুন তারই এক সার্থক প্রতিনিধি। নায়িকা হেনার জীবনে এই যুগের চাঞ্চল্য, গভীরতা ও সঙ্কল্পের কিছুটা পরিচয় মিলবে। বামপন্থী রাজনীতির আভাস আছে কাসেমের চরিত্রে। মায় তার দুর্বলতাসহ। Continent— ফেরৎ তরুণ স্বাপ্নিকের ছবি আছে মোহসিনে। সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চায় যারা তাদের প্রতিনিধি শাহাদৎ— রোপেয়া দিয়ে যারা রূপের করে বিচার। নিষ্ঠাবতী মরিয়মের স্বল্প-পরিসর চরিত্রও সুস্থ জীবনেরই প্রতীক। হেনা হয়তো এখনো আমাদের অপরিচিতা। কিন্তু মরিয়ম আমাদের চেনা ও জানা। এমনকি আলীর মাও পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

মোট কথা এই বইতে কয়েকটি সুস্থ মানুষের দেখা মিলবে। আর মিলবে সুস্থ প্রেমের। এ প্রেম পিছনে বাঁধে না, সামনে এগিয়ে দেয়। সর্বোপরি রসোচ্ছল যৌবনের উদ্দাম ভাবাবেগ এই বইটির ভাষাকে দিয়েছে বন্যার কল-কল্লোল ও তীরপ্লাবী বেগ। আমার রচনাগুলির মধ্যে এ বইটিতেই বেগের সাথে আবেগের কিছুটা সমন্বয় ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

এ বই সম্বন্ধে দিলীপ কুমার রায়ের মন্তব্য : "বইটি আমার ভাল লেগেছে। লাগবার প্রথম কারণ : আপনার ভাষার শক্তি আছে। দ্বিতীয় কারণ : আপনার লেখার ধরন ঠিক মামুলি ঢঙের নয়। তৃতীয় কারণ ও সবচেয়ে বড় কথা : আপনার লেখার মধ্যে ভাইটেলেটি আছে। এ বস্তু খুব কম লেখকেরই থাকে। লেখনী নৈপুণ্য চেষ্টা করে খানিকটা আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু প্রাণোচ্ছলতা ভগবদ্ দত্ত। আপনার মধ্যে প্রাণের প্রভাব আছে, এ জন্যেই আমি সবচেয়ে খুশি।"

অন্য পাঠকরাও খুশি হবেন কিনা জানি না। পড়ে দেখলে হয়তো নিরাশ হবেন না লেখক মাত্র বলা যেতে পারে। এ লেখা নিয়েও আমি সন্তুষ্ট নই— সেরা বলতে তো একথায় নারাজ। আমার মনোভাব : ভালো লেখাই যে লেখেনি তার আবার সেরা লেখা 'কী' এসব কথার সেরা কথা হচ্ছে, যে-কোন লেখকের সেরা লেখা আবিষ্কারের দায়িত্ব পাঠকের—লেখকের নয়। আমিও আমার লেখাগুলি সবিনয়ে পাঠকদের খেদমতে পেশ করে আমার এ অপ্রিয় দায়িত্ব থেকে বিদায় গ্রহণ করছি।*

* একটি রেডিও কথিকা (১৯৫০)

আমি যদি আবার লিখতাম : চৌচির

চৌচির লিখেছিলাম প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। তখন আমার বয়স ও মন দুই-ই ছিল কাঁচা। বিচার শক্তি— যা লেখকের জন্য অপরিহার্য, তার বিকাশ ঘটেনি তখনো কিন্তু আবেগ ছিল দুর্দমনীয়। সাহিত্য ও শিল্পের পেছনে আবেগ যে বেশ বড় স্থান জুড়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই তবে তা রচনার দুর্বলতার কারণ হয়েও দাঁড়ায় সহজে। অনেক সময় মাত্রাধিক আবেগ সব রকম বিচার-বুদ্ধি ও পরিমিতিবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে আবেগের আতিশয্যে লেখকের মন যদি ভারসাম্য হারিয়ে বসে রচনাও ভারসাম্য হারাতে বাধ্য। 'চৌচির'ও অনেকখানি আবেগপ্রধান রচনা। তবে আমার বাল্য ও কৈশোর যে সমাজে কেটেছে, সে সমাজের বুকে বসে লেখা বলে—তার প্রতিচ্ছবি কিছুটা যে এ বইতে ফুটে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। সে সঙ্গে ফুটে উঠেছে দুই আবেগ বিগলিত তরুণ হৃদয়ের বাল্য প্রেম-বেদনার রোমান্টিক ছবিও। লেখাটির জনপ্রিয়তার কারণ বোধহয় এটি।

বি. এ. পরীক্ষা ও তার ফল প্রকাশের মাঝখানে যে সুদীর্ঘ বিরতি—তারই সাহিত্যিক ফসল 'চৌচির'। তখন বয়সটা ছিল যেমন রোমান্টিক, যুগটাও ছিল রোমান্টিসিজমের। বেপরওয়া রিয়ালিজম তখনো বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি। চৌচিরে রিয়ালিজমের অভাব নেই সত্য কিন্তু নায়ক-নায়িকা উভয়ে রোমান্টিক বলে বইটির প্রধান সুর রোমান্টিসিজম না হয়ে পারেনি।

মানুষ মাত্রেই যুগের সন্তান; সাহিত্যিক-শিল্পীরা তো বটেই। যে যুগে চৌচির লেখা হয়েছিল, সে যুগের শুধু নয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের মন-মানসেরও বদল ঘটেছে। হয়তো লেখকের শিল্প ও সাহিত্যবোধ আরো পরিণত রূপ নিয়েছে। কাজেই আমার আজকের মন আর চৌচির লেখকের মন এক মন নয়। রোমাঞ্চের কোন নাম-নিশানা আজ কোথাও নেই। যে সমাজের পটভূমিতে চৌচির লেখা হয়েছিল সে সমাজ আজ নিশ্চিহ্ন। শুধু সামাজিক পটের বদল ঘটেনি রাজনৈতিক পটভূমির বদল ঘটেছে আমূল। পরাধীনতার যুগে যখন কলকাতা ছিল সমগ্র বাংলার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র, তখনকার লেখা বইতে তার প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। তখন আমাদের লেখা ছাপাও হতো কলকাতার কাগজে আর লেখকরাও তাকিয়ে থাকতেন কলকাতার দিকে। তখন মনে করা হতো কলকাতার সাহিত্যিক সমাজে ঠাঁই পাওয়া মানে জাতে ওঠা

আজাদির পর আমাদের ও আমাদের পাঠকদের মন-মানসের পট-পরিবর্তন ঘটেছে অবিশ্বাস্যরূপে। কাজেই এ পরিবর্তিত পরিবেশে বসে জীবন ও জগতের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যদি আবার 'চৌচির' লিখতে বসতাম, তাহলে তা নিশ্চয়ই অন্য বই হতো। এমনকি বইয়ের নাম 'চৌচির' রাখতাম কিনা তাও সন্দেহ।

বইয়ের সূচনায় আছে গ্রন্থের নায়ক তসলিম বি. এ. পাস করার পর ল' পড়ার জন্য কলকাতা গেছে। এখন লিখলে নিশ্চয়ই লিখতাম ঢাকা গেছে, না হয় রাজশাহী। হয়তো চাটগাঁও লিখে বসতাম, কারণ এখানেও রাতারাতি এক ল' কলেজ দাঁড়িয়ে গেছে। মোদ্দা

ও মোল্লাতন্ত্রকে চৌচিরে যথেষ্ট খোঁচা দেওয়া হয়েছে। মিলাদের এক মহফিলে মওলানা জুলফিকার আলী নামক এক চরিত্র—ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন, ইংরেজিকে একদম কাফেরী জবান বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন যদি বইটা লিখে লিখতাম তাহলে এসব দৃশ্য হয়তো বই থেকে বাদ যেত বা লেখা হতো অন্যভাবে। যাদেরে আমরা এ সময় মোল্লা বলতাম আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম মোল্লা আর প্রতিক্রিয়াশীল বলে, আজ তাদেরও মন-মানসের পরিবর্তন ঘটেছে, তারাও আর এখন আগের মানুষ নেই। আশ্চর্য, এখন অধিকাংশ মৌলবী-মওলানাই ছেলেকে মাদ্রাসায় না পাঠিয়ে পাঠায় স্কুল-কলেজে। এমনকি তাঁদের মেয়ে আর পুত্রবধূরাও আর এখন পর্দা বা অবরোধের অন্তরালে বন্দি হয়ে থাকে না। কাজেই যে শ্রেণীকে চৌচিরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করা হয়েছে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রেণী হিসেবে তাঁরা আজ নির্জীব ও হৃদ-শক্তি। যুগের স্রোতের ঠেলায় পড়ে আজ তাঁরা ও তাঁদের বংশধরগণ হয়ে পড়েছেন জীবন-যুদ্ধে আমাদের সহযাত্রী। কাজেই এখন তাঁদের চিত্র আঁকতে গেলে আমি তাঁদেরেও নতুন যুগের মানুষ হিসেবেই আঁকতাম। তার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত আমার এ যুগের লেখা 'বিবর্তন' নামক গল্প। সে গল্পে এক মওলানা ও হাফেজকে আমি আধুনিক মানুষ হিসেবে এবং অত্যন্ত সবল ও শ্রদ্ধেয় চরিত্র হিসেবে এঁকেছি। চৌচিরকে নতুন করে লিখতে গেলে, তার চরিত্রগুলিও নতুন মানুষ হয়েই দেখা দিত।

চৌচিরে কিছুটা অলৌকিকতার আমদানিও করা হয়েছে, তাও রোমাঞ্চেরই ফল। এখন অলৌকিকতার ওপর আমাদের আর কোন বিশ্বাস নেই, নেই আস্থা। মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে বা কোরান শরিফ হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ ইত্যাদির আবেদনও আজ আমাদের মন থেকে নিশ্চিহ্ন। আজকের যুবক-যুবতীদের মনে এ-সবের কোন স্থান নেই। বিজ্ঞান এবং ফ্রয়ডীয় মনস্তত্ত্বের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ যুগের নর-নারীর মনকে অলৌকিকতা ও নানা সংস্কারের বন্ধন থেকে দিয়েছে মুক্তি। কাজেই আজ আবার ফিরে লিখলে চৌচিরের মানুষগুলোও হতো মুক্তবুদ্ধি তথা সংস্কারমুক্ত। পুরুষ ডাক্তার দিয়ে স্ত্রীর প্রসব করিয়েছেন বলে চৌচিরের কলিমউদ্দীন নামক এক চরিত্রকে পাড়ার মসজিদে নামাজ পড়তে দেওয়া হয়নি এবং করা হয়েছিল একঘরে। আজ কি আমরা এসব কথা ভাবতে পারি? আজ পুরুষ ডাক্তার দিয়ে প্রসব করানো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন এসব ঘটনার অবতারণা করলে পাঠক রীতিমতো অবাক হবেন বইকি? কাজেই চৌচিরের পৃষ্ঠা থেকে এ সবও বাদ দিতে হতো ও লিখতে হতো নতুন করে।

নায়িকা রৌশনের মৃত্যুর পর নায়ক তসলিম বলছে : "মানুষের দেহমাত্র নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর, অমর—তাহার এ জীবন শেষ নহে, আরও জীবন আছে, তাহার দেহ গিয়াছে, আমার ভালোবাসা তো দেহাতীত, কাজেই কিসের দুঃখ? প্রতীক্ষা করো, জীবন হইতে জীবনান্তরে প্রতীক্ষা করো, খোঁজ—তোমার প্রতীক্ষার এ আনন্দাভিযান যেন কোথাও শেষ না হয়। শেষ হইলেই কিন্তু তোমার মরণ, তোমার প্রেমের সমাধি।" আজ এসব উক্তি মনে হচ্ছে Sentimental—ভাবালুতার চরম ক্লাইমেক্স ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ ভাবালুতার এখানেই শেষ নয়। হজ্ব শেষে মক্কার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তসলিম ভাবছে : "মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা নাকি পরমাত্মার সঙ্গে মিশিয়া যায়,

পরমাত্মার তো কোন নির্দিষ্ট সিংহাসন নাই, সে তো বিপুল সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়া আছে, তাহার প্রিয়াও তো এই আলোর সঙ্গে মিশিয়া আছে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া আছে। তবে তো শুধু এ তীর্থভূমি তার তীর্থস্থান নহে, সারা বিশ্বই যে তার তীর্থভূমি। অনন্ত সন্ধানী, অনন্ত পথের পথিক মানুষ, তাহা হইলে তো বাহির হইয়া পড়িতে হয়" ইত্যাদি।

বাস্তব জগতের সীমা ছাড়িয়ে রোমান্টিসিজম যে কতখানি আসমানী হতে পারে এ তারই নজির। ছেলেমানুষী ছাড়া এসব উক্তির আজ আর কোন মূল্য নেই। তবে ছেলেমানুষীর মধ্যে কি কোন সৌন্দর্য নেই, নেই কোন আবেদন? আছে বলেই চৌচিরের জনপ্রিয়তা এখনো তেমন হ্রাস পায়নি। বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 'চৌচির' লেখকের তরুণ মনেরই নানা সাধ স্বপ্নের প্রতীক। সেই হিসেবে এটি লেখকের লেখক জীবনের একটি মাইলস্টোন।

সামাজিক ইতিহাস হিসেবে চৌচিরের মূল্য অনস্বীকার্য। সমাজবিজ্ঞানীর কাছে অর্থাৎ যাঁরা আমাদের সমাজের অগ্রগতি ও যুগান্তরের হাল-হকিকতের খবর নিতে চান তাঁদের কাছে এ বই অনেককাল কৌতূহলের বিষয় হয়ে থাকবে।

তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, আবার যদি লিখতাম তাহলে এ বইয়ের কি দশা হতো? লেখকের উত্তর : তাহলে এ বই এ বই থাকত না, সম্পূর্ণ নতুন বই হয়েই দেখা দিত।

১৯৫৭

রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাংবাদিকী ও বিকৃত প্রচারণার ফলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুটা ভুল ধারণা যে আমাদের দেশে প্রশ্রয় পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মুসলমান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে উদাসীন ছিলেন তা নয়, অনেকের বিশ্বাস তিনি কিছুটা বিরূপও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, জীবনধর্মী কবি। কবি হিসেবে তাঁর দিকে না তাকিয়ে, নিজেদের ইচ্ছানুগ কল্পনার সঙ্গে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য মিশিয়ে মতামত দিতে গিয়েই এ বিভ্রাটের সৃষ্টি। আমি অন্য এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের দুঃখ ও মর্মবেদনা কিভাবে কতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন আর তাঁর বিভিন্ন রচনায় তা কতখানি ভাষায়িত হয়েছে তার কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আরো উপকরণ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে যার সন্ধান নিলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণারই অপনোদন ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি বা লেখক ছিলেন না—এক সুস্থ-স্বাভাবিক নাগরিক জীবনও যাপন করেছেন তিনি—মতামত দিয়েছেন দেশের পাঁচটা সমস্যা সম্বন্ধেও। এসবেও রবীন্দ্র-মানসের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা মোটেও সংকীর্ণ, অনুদার বা সাম্প্রদায়িক নয়।

কোন বড় প্রতিভা সম্বন্ধেই ভুল ধারণা প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়। পেলে মনের ভিতর এমন একটা সংস্কার গড়ে ওঠে, যা সে প্রতিভাকে বোঝার প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা ভাষাভাষীদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে না চাওয়া বা সে সম্বন্ধে অনীহা থাকার মতো ক্ষতি কল্পনা করা যায় না। কারণ আজো রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্য।

প্রতিভার এক বড় লক্ষণ সর্বানুভূতি ও গ্রহণশীলতা। বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্য এ বিষয়ে এক প্রামাণ্য দলিল। দেশ-বিদেশে যেখানে যা কিছু ঘটেছে, মানুষের মন-মানসে যেসব নবতর ঢেউ দোলা দিয়েছে তার সব কিছু রবীন্দ্র-মানসকেও করে তুলেছে অনুরণিত। সব সময় খোলা ছিল তাঁর মনের সব বাতায়ন। তাঁর কালে দেশ দুই পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ হয়নি। এখনো এক দেশ এক ভাষার মানুষ হয়েও হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক জীবন প্রবাহিত ভিন্ন ভিন্নতর খাতে— রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ঐক্য এবং এ দুই ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক পারস্পরিক নির্ভরতাও সামাজিক ঐক্য স্থাপনে হয়েছে ব্যর্থ। এ সবই রবীন্দ্রনাথের দেখা—এর পরিণতি লক্ষ্য করে তিনি বারবার হয়েছেন ব্যথিত। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত তাঁর নিজের সমাজও গ্রহণ করেনি—তাঁর কথা সেদিন কারো কাছে মনে হয়নি মুখরোচক।

হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা ও বিরোধ শুধু যে দীর্ঘকালের তা নয়, দিনে দিনে তা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জটিল আর জট-পাকানো। এর ফলে মাঝে মাঝে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তাকে রবীন্দ্রনাথ স্রেফ 'বর্বরতা' বলেই অভিহিত করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে বীভৎসরূপ নেয় তাকে এর চেয়ে মোলায়েম শব্দে হয়তো প্রকাশ করাই যায় না। মনে হয় এটি রবীন্দ্রনাথের মনে এক ক্ষত-চিহ্ন হয়েই বিরাজ করেছিল দীর্ঘকাল ধরে।

১৯৩৫ সালে বিশ্বভারতীতে 'নিজাম বক্তৃতা' দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদকে আর বক্তৃতার বিষয় নির্বাচন

করেছিলেন—'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ'। এ বিরোধের জটিলতা আর 'বিভীষিকা' তাঁকে কতখানি ভাবিত করে তুলেছিল এই বিষয় নির্বাচনে রয়েছে তার ইংগিত। ওদুদ সাহেবের সে তথ্যবহুল মূল্যবান বক্তৃতা কবির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী থেকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনে পুরোপুরি সক্রিয় তখনো সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী সমাজের আবির্ভাব ঘটেনি। তখন বাংলাদেশে যে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম অভিজাত পরিবার ছিল তাদের বা তাদের বংশধরদের বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের সঙ্গে ছিল না কোন রকম যোগাযোগ। ফলে সামাজিকভাবে মুসলমান সমাজের খুব কাছাকাছি আসার তেমন সুযোগ রবীন্দ্রনাথ জীবনে পাননি। বলাবাহুল্য সামাজিক ঐক্য আর সাম্য ছাড়া তা সাধারণত সম্ভবও হয় না—সাংস্কৃতিক চেতনা আর সমভাবিতাও তার জন্য অত্যাবশ্যক। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় আর সমঝোতারও ঐ পথ।

সাহিত্য আর শিল্পের ক্ষেত্রে চিন্তা আর ভাবনা কিছুটা সমান্তরাল রেখা ধরে চল্লেই সহযোগিতা আর সহমর্মিতা হয় সহজ আর স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার আগে হিন্দু আর মুসলমানের জীবনধারা সমান্তরাল ছিল না। তবুও রবীন্দ্র-জীবন অনুধাবন করলে দেখা যায়— সে যুগে, সে অবস্থায়ও যতদূর সম্ভব তিনি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে ও তাদের কাছাকাছি আসতে চেয়েছেন। নজরুলের কাব্যজীবনের সূচনায় তিনি তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করে তরুণ কবিকে দিয়েছেন স্বীকৃতি, কবির 'ধূমকেতু'কে জানিয়েছেন স্বাগতম, জেলখানায় কবির অনশনের খবর পেয়ে উৎকণ্ঠিত ভাষায় পাঠিয়েছেন টেলিগ্রাম।

কবি গোলাম মোস্তফার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগ' যখন বের হয় তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও উৎসাহিত করেছিলেন এ বলে :

তব নবপ্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।

জসিম উদ্‌দীন রবীন্দ্রনাথের শুধু যে স্নেহভাজন ছিলেন তা নয়, অজস্র উৎসাহও তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে—ঠাকুরবাড়ির আরো অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছেন স্নেহ ও ভালবাসা। সে সব কথা জসিম নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কবি আবদুল কাদিরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিলরুবা' পড়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করে লিখেছিলেন : "তোমার দিলরুবা কাব্যখানি পড়ে খুশি হলুম। ভাষা এবং ছন্দে তোমার প্রভাব অপ্রতিহত। তোমার বলিষ্ঠ লেখনীর গতিবেগ কোথাও ক্লান্ত হয় না। বাঙলার কবি-সভায় তোমার আসনের অধিকার অসংশয়িত। বিষয় অনুসারে যে কবিতায় তুমি মাঝে মাঝে আরবি-পার্সি শব্দ ব্যবহার করেছ, আমার কাছে তা অসঙ্গত মনে হয়নি।" শেষের মন্তব্য সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই মূল্যবান।

১৯৩৭-এর ৬ মার্চ মুসলিম স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের একটি ভ্রাম্যমাণ দল শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ। তা সত্ত্বেও ছাত্রেরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তিনি তাদেরে যে কবিতাটি তখন লিখে উপহার দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো :

"আমার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ
কখন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী!
ওই সর্বনাশটাকে ধর্ম্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের করো অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তান!
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্ম-ধ্বজীদলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে,
জানিব আমরা দোঁহে ভাই।"... ... ...

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই একমাত্র হিন্দু চিন্তাবিদ যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' যে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার অনুপযুক্ত—এ মত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরমে'র প্রতি মুসলমানদের আপত্তি ও বিক্ষোভ রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন ও স্বীকার করে নিয়েছিলেন বিনা দ্বিধায় নিজ সমাজের ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই। বলাবাহুল্য, প্রচলিত হিন্দুত্বের আচার-বিচারে রবীন্দ্রনাথ কখনো বাঁধা পড়েননি। সামাজিক তথা সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে কতখানি উদার ও যুক্তিনির্ভর ছিল নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তা আরও স্পষ্টতর।

"ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কোন তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করবে না' তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে— কেন করব না। এ কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য। তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল এসব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তাহলে সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে, বিচারের বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশি ভয় ও শ্রদ্ধা করে... ... ...।"

১৯৩৬-এ প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের এক ভাষণের কিয়দংশও এ প্রসেঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে : "নানা কারণে অবশ্য এতদিন মুসলমান সম্প্রদায় সুযোগ সুবিধার অসাম্য হেতু যথোচিত কষ্ট পাইয়াছে। এ বৈষম্য হইতে তাহারা যাহাতে মুক্ত হয় সর্বান্তকরণে তাহাই আমি চাই।... ... মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু দুর্লভ ও প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বিশেষত তাহাদের সহজাত গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি তাহাদিগকে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প নহে, আমি তাহাদের মনেপ্রাণে ভালবাসিয়াছি, তাহাদের দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছি। আমি সব সময় আশা করিয়াছি, যে মূঢ়তা ও অসংস্কৃত যুক্তিহীনতা

আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই ব্যক্তিগত নৈকট্যবোধ ও মৈত্রীবুদ্ধির কাছে পরাজিত হইবে।"

১৩১২ সনে এক বিজয়া সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাতেও তাঁর সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় :

"যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খ-মুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর।"

গুণী ও যোগ্য মুসলমানকে রবীন্দ্রনাথ সব সময় শ্রদ্ধা করতেন এবং কাছে আনার চেষ্টাও কম করেননি। তাঁর জীবনী থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি :

"বিশ্বভারতীতে যখন হিন্দুস্তানি গান শিখাইবার ক্লাস খোলা হয়, তাহাতে প্রথমে দুইজন মুসলমান ওস্তাদকে নিযুক্ত করা হয়।" রঃ জীঃ

"১৩৩৫ এর বর্ষামঙ্গল উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসঙ্গীত। কবির আহ্বানে তিনি পুত্র আকবর আলী খাঁর সহিত পক্ষকাল শান্তিনিকেতনে থেকে যান। এই সময়ে তাঁর ভাই আয়াত আলী খাঁ সংগীত ভবনের সহিত যুক্ত হন।" রঃ জীঃ

শ্রীনিকেতনে ডক্টর মুহম্মদ আলী নামে এক কৃষি-বিজ্ঞানী বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মৃত্যুতে কবি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেন :

"কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি
কেহবা প্রজার সুহৃদ সহায়
কেহবা রাজার জ্ঞাতি
তুমি আপনার বন্ধু জনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।"

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত মন্তব্য অর্থপূর্ণ :

"ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে।" রঃ জীঃ

১৩৪০ সনে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রের জবাবে জনাব এম. এ. আজমকে লিখেছিলেন "সর্বপ্রথমে বলে রাখি, আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষের অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশের অগৌরব মনে করে থাকি।"

বলাবাহুল্য মুসলমানরাও রবীন্দ্রনাথকে কম শ্রদ্ধা করতেন না। কবির আহ্বানে

হায়দ্রাবাদের নিজাম বিশ্বভারতীতে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেছেন। পরে নিজাম অধ্যাপকের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য দেন আরো উনিশ হাজার টাকা। মনে রাখতে হবে সে যুগে টাকার মূল্য এখন থেকে অন্তত দশগুণ বেশি ছিল। মুসলিম কর্তৃত্বাধীন ওসমানিয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট. উপাধি দিয়ে কবিকে সম্মানিত করেছে এবং কবি-[illegible] দিয়েছে স্বীকৃতি।

১৯২০ সালে একবার রবীন্দ্রনাথ বোম্বে পৌছে জানতে পারলেন, কয়েক দিনের মধ্যেই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সাংবৎসরিক সভা হচ্ছে আর তার সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্। জিন্নাহ্ সাহেবের অনুরোধে কবি ঐ সভার জন্য একটি ভাষণ লিখে পাঠিয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন, তখন বিহারের সে যুগের অন্যতম জননায়ক ব্যারিস্টার হাসান ইমাম কবির কাছে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে বলেছিলেন : Your action is as we expected. Please accept my most loving homage.

১৯১০-এ ইউরোপ যাওয়ার সময় জাহাজে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন আগা খাঁ। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা ছিল সবাই সাহেব-মেম। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার প্রভাত মুখার্জী লিখেছেন : "এই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝে তিনি বেশ স্বস্তি অনুভব করেন যখন মহামান্য আগা খাঁ'র সঙ্গে দেখা হয়। আগা খাঁ'র মুখে হাফিজের কবিতার আবৃত্তি শুনিতে বড়ই ভাল লাগে। সেই অপরিচিতের মরুতে এই ছিল মরূদ্যান।" রঃ জীঃ

মুসলিম ভাব সাধনার এক বড় অঙ্গ সুফীবাদ। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহম্মদ হাবিবকে দিয়ে এ সম্পর্কে বিশ্বভারতীতে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থাও কবি করেছিলেন ১৯৩৬-এ।

১৯২৪-এ চিনের পথে হংকং-এ রবীন্দ্রনাথ "পূর্ব ব্যবস্থানুসারে সুরাতি মুসলমান ব্যবসায়ী জনাব নামাজির বাড়িতে সদলবলে উঠিলেন।" রঃ জীঃ

১৯২৭-এর কথা। কবির সহযাত্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "কবি সিঙ্গাপুরে পৌছুলে অভ্যর্থনাকারী আরিয়াস উইলিয়ামস্ জানালেন যে মালয় উপদ্বীপের [illegible] একান্ত ইচ্ছা কবি যেন তাঁর মালয় প্রবাসের প্রথম তিন দিন তাঁর অতিথি হয়ে ...ভবনে থাকেন। কথাটা শুনে কবি কিছুমাত্র খুশি হলেন না। কবি সদলবলে ...দেরই আতিথ্য গ্রহণ করলেন"

শুধু দেশে নয়, বিদেশেও রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন। পারস্যে, ইরাকে, মিসরে যেখানেই কবি গেছেন সেখানে তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন—পেয়েছেন জনগণের ভালবাসা। বাংলা ভাষাভাষী না হয়েও তারা বাংলা ভাষার কবিকে জানিয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা। ১৯৩২-এ কবি যখন পারস্যে যান তখন একদিনের কথা : 'পথে শাহরেজা নামক এক গ্রামে লোকে কবির মোটর থামাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।" রঃ জীঃ

১৯৩৩-এ পারস্যের তদানীন্তন শাহ্ রেজা শাহ্ পাহলবী আগাপুরে দাউদ নামক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতকে নিজ ব্যয়ে শান্তিনিকেতনে পাঠান পার্সি ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যাপক হিসাবে।

১৯২৬-এ একবার কবি মিসর গিয়েছিলেন। তখন ফুয়াদ মিসরের রাজা। এ ভ্রমণের একদিনের ঘটনা কবি এক পত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন :

"পরদিন কায়রোর পালা।.....বৈকালেই সেখানকার সর্বোত্তম আরবি কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচটায় পার্লামেন্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে এক ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হলো—এমন ব্যবস্থা বিপর্যয় আর কখনও আর কারো জন্য হতে পারত না। ওখানে ক্লানুন ও বেহালা যন্ত্রযোগে আরবি গান শোনা গেল। বোঝা গেল, ভারতের সঙ্গে আরব পারস্যের রাগরাগিণীর লেনদেন এক সময় খুবই চলেছিল।"

রাজা ফুয়াদ বিশ্বভারতীর জন্য পরে বহু আরবি গ্রন্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গোড়ার দিকে বিশ্বভারতীতে গোঁড়ামিও কম ছিল না। হয়তো নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের খাতিরে হিন্দু বর্ণভেদ প্রথাকে আমল দিতে কবি বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর উদার জীবনদর্শনই জয়ী হয়েছে—বর্ণাশ্রমের কৃত্রিম ভেদরেখা পরে একটির পর একটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে শান্তিনিকেতনে।

১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌছা মাত্রই কবি বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে শোকসভার ব্যবস্থা করেন। সে সভায় কবি বলেন :

"Turkey was once called the sickman of Europe until Kamal came and set before us an example of a new Asia where living present recalled the glories of dead past.... Kamal Pasha's heroism was not on the battlefield only. he waged a relentless war against the tyranny of blind superstition which perhaps is the deadliest enemy a people have to contend against. To his own people he was a great deliverer, to us he should remain a great example."

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তা নয়, উপরন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা সহজাত মনুষ্যত্ববোধ ছিল, যা সব সময় তাঁকে সব রকম ক্ষুদ্রতা ও মনুষ্যত্বহীনতার উর্ধ্বে থাকতে সহায়তা করেছে। যে যুগে ও যে পরিবেশে তাঁর জন্ম সেখানে মানুষের অপমান ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো তার শিকার হননি।

১৯১৯-এ একবার রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে সিলেট আসছিলেন। তখনো শিলং-সিলেট মোটর রাস্তা তৈরি হয়নি। সাধারণত চেরাপুঞ্জী পর্যন্ত মোটরে অথবা এক্কায় এসে সেখান থেকে 'থাপায়' চড়েই আসতে হতো সিলেটে ও অন্যান্য নিম্নভূমিতে। 'থাপা' মানে—মানুষের মাথার সঙ্গে ফেটি-বাঁধা চেয়ার। আর খাসিয়া শ্রমিকরাই নিজের পিঠে এসব চেয়ার বহন করত। এ দুর্গম পথে মানুষের পিঠে চড়ে সিলেট আসতে রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই রাজি হননি। তিনি গৌহাটি হয়ে লামডিং ঘুরে রেলপথেই সিলেট এলেন।

এমন সবল ও গভীর মনুষ্যত্ববোধের জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মুসলমান প্রজাদের জন্য স্বতন্ত্র ও নিম্নমানের আসন-ব্যবস্থার প্রতিবাদে সভাগৃহ ত্যাগ করে যাওয়া।

এর জমিদারি সেরেস্তার এক কর্মচারী লিখেছেন :

At Shelaidaha a Durbar was arranged for him. He found that while chairs and benches were provided for the Hindus, Muslims were expected to sit on the floor. He was furious.

"Why this discrimination? Why were not the same seating arrangement made for everybody?" "This is the way it has always been, Babu Masai" he was told in reply. "Does your lordship wish to change this ancient custom? Administration will become difficult if you do."

Tagore made it known that he would take no part in such a Durbar. The same respect must be shown to all. In the end it was.

এ রবীন্দ্রনাথের মুসলিম প্রীতির নিদর্শন নয়, বরং তাঁর সুগভীর মনুষ্যত্ব-প্রীতিরই। রবীন্দ্ররচনা ও জীবন-দর্শনের মূল সুরও এই। যে সুগভীর ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে সাহিত্যের উৎসারণ, এ দেশের বিচ্ছিন্ন সমাজবিন্যাসের ফলে মুসলমান জীবনের সে অভিজ্ঞতা লাভ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না সে যুগে।

তবুও তাঁর রচনায় এখানে ওখানে মুসলমান জীবন ও চরিত্রের যে ছোঁয়া লেগেছে তাতে কোথাও সামান্যতম অশ্রদ্ধার ভাবও নেই। শাহজাহান বা তাজমহলের মতো অবিস্মরণীয় কবিতা কোন ভাষায় কোন মুসলমান কবিও লিখেছেন কিনা সন্দেহ। 'মুকুট'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে কবির জীবনীকারের একটি মন্তব্য : "কর্তব্যপরায়ণ সেনাপতি ঈশা খাঁর চরিত্র খাঁটি মুসলমান-চরিত্র, জান ও জবান যাহার এক।"

'সতী' নাটিকা আর গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত খসড়া গল্প 'মুসলমানীর গল্পে' তিনি যে সত্যনিষ্ঠ ও মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার কোন তুলনা নেই। সতী নাট্যকাহিনীটির বিস্তৃত আলোচনা শেষে কাজী আবদুল ওদুদ মন্তব্য করেছেন : "এমন আন্তরিক পরধর্মপ্রীতি জগতের সাহিত্যে কমই রূপলাভ করেছে।"

মহাপ্রতিভা ও মহৎ কবি সম্বন্ধে এসব কথা ও খুঁটিনাটি তথ্য উদ্ঘাটন অনর্থক ও অপাত্তর জেনেও তা করতে হলো স্রেফ দেশ ও সমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখেই।

জীবনে এবং সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া মানবিক—তাই বিরুদ্ধ মানস-পরিবেশের মানুষও তাঁর রচনায় যথাযথ মর্যাদায় সমুন্নত ও সমৃদ্ধ। এ না হলে রবীন্দ্রনাথ কখনো রবীন্দ্রনাথ হতে পারতেন না।

বই পড়া

কেন বই পড়ি এ প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে লেখকদের সমস্ত জীবন-সত্তাই জড়িত! বই পড়ে যেমন জানতে পারি নিজেকে, তেমনি জানতে পারি অন্যকেও, জানতে পারি চারিদিকের সব মানুষ আর প্রকৃতিকে। এ জানা চাক্ষুষ জানা নয়—মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে জানা। এ জানাজানি আমার অনুভব-অনুভূতির বস্তু না হলে তা আমার কাছে ব্যর্থ। অনুভব-অনুভূতিকে বাদ দিয়ে যে জানা তা স্রেফ জৈবিক। আমি স্রেফ জৈবিক নই—আমি মন-মানস আর আত্মার অধিকারী। আত্মার পরিব্রাজনে বই আমার একই সঙ্গে পথ আর পাথেয়। বই পড়ে পড়ে আমি শুধু অন্য মানুষকে নয় আমার নিজেকেও আবিষ্কার করি। আমার নিজের উপলব্ধি আমার কাছে স্পষ্টতর আর জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে বইয়ের মাধ্যমে।

বই না পড়লে আমি নিজেকেই জানতে পারতাম না—আমি নিজেই নিজের কাছে থেকে যেতাম অজানা। তখন আমি থাকতাম খণ্ডিত হয়ে, একটা অংশ মাত্র হয়ে। মানুষ যে কত বড়, তার জীবন যে কত সম্ভাবনাময়—তার জীবন যে অতীত, বর্তমান ভবিষ্যতেরও সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা এ মহৎ সত্যটুকু আমার অনুপলব্ধ থেকে যেত চিরকালের জন্য যদি বইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় না হতো। বই পড়ে পড়েই জেনেছি আমি একক নই, নই নিঃসঙ্গ—আমি বিশ্ববিধানের অংশ। সমস্ত মানব-ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যও বিধৃত। কৃষ্ণ আফ্রিকা কি পীত চিন বা শ্বেত ইউরোপ—যেখানকারই মানুষ হোক সে আমার অংশ, আমার অঙ্গ। বর্ণে ধর্মে ভাষায় পৃথক হলেও সে আর আমি এক—এক বিরাট দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ব্যক্তিগত কি জাতিগত স্বার্থে সে আমার পরম শত্রু হলেও সে আর আমি এক। বই না পড়লে এ মহাসত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটতো না। আমি থেকে যেতাম চিরকালের জন্য ঘরকুনো ও কূপমণ্ডুক হয়েই। আমি মানুষ, সৃষ্টির সেরা—বই আমাকে এ সত্যে পৌঁছে দিয়েছে।

যাকে অসীম বলা হয়, বই আমাকে সে অসীমের সন্ধান দিয়েছে, না সন্ধান দেয়নি, সন্ধানের পথে আমাকে ঘর-ছাড়া করেছে, আমাকে করেছে সে পথের চির-অভিযাত্রী। বই পড়ে পড়ে আমি হয়েছি চির-জিজ্ঞাসু, চির-সন্ধানী, চির-কৌতূহলী, এক চিরন্তন পথিক। পুরাতনের প্রেম আমাকে আরো বেশি করে করেছে নতুনের প্রেমিক।

বই পড়ে পড়ে আমি শুধু বিশ্ব-প্রেমিক হইনি—নিজের ঘরকে, নিজের ঘরণীকে, নিজের প্রিয়াকেও ভালোবাসতে শিখেছি। আমার ভালোবাসা আন্-পড়ার ভালোবাসা নয়। আমার হৃদয়ে শত রহস্য লুক্কায়িত—আমার ভালোবাসায় শত রহস্য উদ্ঘাটিত। বই পড়ে পড়ে আমি শুধু আমার নিজের হৃদয়-রহস্য আবিষ্কার করিনি, আবিষ্কার করেছি অন্যের হৃদয়-রহস্যও। ফলে প্রিয়া হয়ে উঠেছে আমার কাছে প্রিয়তর! মানুষ আর প্রকৃতিও অধিকতর আপন।

ছোটকালে যখন বর্ণমালা শেখানো হয়েছিল—তখন স্রেফ পড়তে পারার জন্যই তা শেখানো হয়েছিল বলে তা ছিল নিরানন্দকর। আর সেদিন বর্ণমালা ছিল শুধু কালো অক্ষরের সারি। কালো অক্ষরের আড়ালে যে আলোর এক অফুরন্ত ঝর্ণাধারা লুক্কায়িত তা

এ জ্যোতির্ময় এক মহাসমুদ্র, বই পড়তে পড়তেই পেয়েছি তার সন্ধান। বইয়ের এক একটি কুঞ্জিকা দিয়েই জ্ঞানের অসীম রহস্যপুরীর এক একটি দ্বার আমি খুলতে চেয়েছি—এ চাওয়ার আজো বিরাম নেই, এ চেষ্টায় নেই আমার ক্লান্তি। আমাকে আমি গড়ে তুলে, আমি থাকতে হলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বই আমাকে পড়তে হবে, আরো বই পড়তে হবে, নিত্যনতুন বইয়ের খোঁজ করতে হবে, তাতে জ্যোতিঃস্নাত হয়ে আমার মনকে করতে হবে উজ্জ্বল, নির্মল, পুষ্প-পেলব আর ইস্পাত-কঠিন। বই গড়ে তোলে চরিত্র—যে চরিত্রে মানুষের পরিচয়।

বই আমার মনকে জাগিয়ে তোলে, নবতর অভীপ্সায় মনকে আমার করে তোলে অভিসারী। আমি স্বপ্ন দেখি স্বর্গের—সে স্বপ্ন রূপ নিতে চায় মর্ত্য-ভূমে স্বর্গ রচনায়। তাই ঊর্ধ্ব-বিহার ছেড়ে আমি বার বার ফিরে আসি মাটি মার শ্যামল বুকে। হাজার কোটি বাসনা-কামনায় বই আমাকে করে তোলে অস্থির, চঞ্চল। এমন বই আছে যা পড়ে আমি হয়ে যাই মাতাল—ইচ্ছা হয় সব ভেঙ্গে-চুরে নতুন করে আবার দুনিয়াটাকে গড়ে তুলি, নতুন করে বিন্যাস করি সব কিছুকে। আবার কোন কোন বই 'ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি' হয়েই দেখা দেয়—তা পড়তে পড়তে আমি ভুলে যাই রুক্ষ-কঠোর বাস্তব, কল্পনার পাখায় চড়ে ঘোড়া ছুটাই তেপান্তরের মাঠে! অনেক সময় বই পড়ি বাস্তবকে ভুলে থাকতে, ভুলে যেতে।

অনেক বই দেখা দেয় আমার জিজ্ঞাসার উত্তর হয়ে, আমি ফিরে পাই শান্তি, স্বস্তি—হয়তো ঘুমিয়ে পড়ি ক্ষণিকের জন্য। শান্তির সুদিনে যেমন বই আমার নিত্যসঙ্গী, তেমনি দুঃখের দুর্দিনেও বই আমার চিরসহযাত্রী। বই আমি পড়ি, কারণ বই আমি না পড়ে থাকতে পারি না। নিজের কাছে না থাকলে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে বই আমি ধার নিই। Buy, Borrow or Steal; সাহসের অভাবে শেষোক্তটা অবশ্য আমি করতে পারি না—অন্য দু'টা হরহামেশাই আমি করে থাকি। টাকা-পয়সা চাইতে কি ধার করতে লজ্জা পাই—কিন্তু বই চাইতে কি ধার করতে মোটেও লজ্জা পাই না আমি। বই পড়তে পড়তে বইয়ের ওপর এমন একটা দাবি আমার জন্মে গেছে যে অন্যের হাতে নতুন বই দেখলে মনে হয় ওটাও আমার পড়ে নেওয়া উচিত। না হয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করি—মনে হয় কি যেন আমি হারিয়ে ফেলছি, কোন এক অমূল্য সম্পদ থেকে আমি যেন থাকছি বঞ্চিত!

বইয়ের দোকানে ঢুকলে তাই আমি অস্থির হয়ে পড়ি, নতুন নতুন বইয়ের নাম আর মোড়ক আমাকে চঞ্চল করে তোলে—ভিতরে ভিতরে মনটা যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে। পকেটের সীমা তখনই আমাকে পীড়ন করে সবচেয়ে বেশি। না হয় সাংসারিক আর দশটা বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট। বইয়ের ব্যাপারে আমি আজো সন্তুষ্টিতে পৌঁছতে পারিনি—পৌঁছতে আমি চাইও না। বইয়ের ক্ষুধা আমার মনে চিরজীবী হোক, এ ক্ষুধা নিয়েই আমি মরতে চাই। বলাবাহুল্য বই পড়তে পড়তেই আমার মনে এ ক্ষুধার জন্ম বই-ই এ ক্ষুধাকে জুগিয়েছে ইন্ধন এবং করে তুলেছে অদম্য। কাজেই বই না পড়ে আমি থাকবো কি করে? বই আজ আমার মন-মানস আর আত্মার খোরাকে পরিণত। ভালো আহার্যের লোভ আমি ছাড়তে পারি, ছেড়েও থাকি কিন্তু ভালো বই পড়ার লোভ ছাড়তে পারি না, ছাড়তে চাইও না। সুলিখিত, সুমুদ্রিত বইয়ের চেয়ে লোভনীয় এমন আর

কিছুই এখন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে না।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আজ আমরা যন্ত্র-সভ্যতার শিকারে পরিণত—সব রকম শিল্পকলাও আজ এর খপ্পরে। যন্ত্রের জাঁতাকলে আমরা আজ নিষ্পেষিত—আত্মা আজ আমাদের পলাতক। ভালো বই আমাকে আমার আত্মার সন্ধান দেয়, বইয়ের পাতায় তার কালো অক্ষরে আমি যেন আমার আত্মাকেই ফিরে পাই। আমি জড়বস্তু নই, নই উদ্ভিদ বা জন্তু-জানোয়ার—আমি আত্মার অধিকারী, আত্মাই আমাকে সব কিছুর ওপরে আসন দিয়েছে। বইতে আমি আমার এ আত্মাকেই খুঁজে পাই—তখনই মাত্র বুঝতে পারি আমি সকলের সেরা।

একদিন জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় মানুষের কাছে ফেরেস্তারা পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল। কারণ ফেরেস্তাদের জ্ঞান সীমিত, মানুষের জ্ঞান অসীম অর্থাৎ অসীম জ্ঞান-আহরণের শক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত আর সহজাত। বই আমাদের নিয়ে যায় এ শক্তির উৎস-মূলে—কালের অসীম সমুদ্রের হাতছানি আমরা দেখতে পাই বইয়ের পাতায় পাতায়। এ সমুদ্র বিহারের সখ একদিন আমার মনে জেগেছিল, আজও জেগে আছে, তাই বইয়ের পাতায় ডুব না দিয়ে আমি থাকতে পারি না।

বই আমার সামনে খুলে ধরে জীবনের সামগ্রিক চেহারা—তাই আমি শুধু সাধু-সজ্জনকেই ভালোবাসি না, ভালোবাসি পাপী, তাপী, দুঃখী সব মানুষকেই। তারাও আমার অনুভব-অনুভূতি আর উপলব্ধির অঙ্গ। পাপকে আমি ঘৃণা করলেও পাপীকে তাই আমি ঘৃণা করতে পারি না। এ মহত্ত্বের জন্য আমি বইয়ের কাছেই ঋণী—বই পড়ার ফলেই আমার হৃদয়-শতদল একটির পর একটি পাপড়ি মেলেছে, আমার হৃদয়-দ্বার একটির পর একটি উন্মুক্ত হয়েছে—তাতে তাই আজ সব মানুষের সমান আসন। এ এক মহাসত্যের উদ্বোধন।

তাই বই আমার সঙ্গী, নিত্যসঙ্গী, শয্যাসঙ্গীও।

নবী ও জাতীয় পতাকা

কিছুদিন ধরে নবী দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ঐ দিন সরকারি ও বহু বেসরকারি ভবনেও জাতীয় পতাকা তোলার তাগিদ দেওয়া হয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস নবীর আদর্শ ও ভূমিকার সঙ্গে এ নির্দেশের বিরোধ রয়েছে। বিশেষ করে হযরত মোহাম্মদের (দঃ) যে আদর্শ ও ভূমিকা, তার সঙ্গে যে বিরোধ রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, কোরান ও হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা আছে তাঁকে বিশ্বের তথা সব দেশের সব মানুষের নবী হিসেবেই পাঠানো হয়েছে। তিনি কোন দেশ বা জাতি বিশেষের নবী নন্। তাঁর প্রচারিত ধর্মও আরব দেশের বা অন্য কোন বিশেষ দেশের ধর্ম নয়—বিশ্বমানবের ধর্ম। এই অর্থেই ইসলাম বিশ্বধর্ম!

অন্যদিকে জাতীয় পতাকা মানে রাষ্ট্রীয় পতাকা। রাষ্ট্র একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় সীমিত। এ কারণে সব মুসলমান দেশ বা রাষ্ট্রের পতাকা এক নয়। তেমনি সব খৃষ্টান বা বৌদ্ধরাষ্ট্রের পতাকাও ভিন্ন ভিন্ন। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা এক রকম অথচ পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে কয়েক মাইল ব্যবধানে যে আফগান-রাষ্ট্র রয়েছে তার পতাকা অন্য রকম। এমনকি সৌদি আরবের জাতীয় পতাকা আর প্রতিবেশী ইরাকের জাতীয় পতাকাও এক নয়। তেমনি সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা থেকে ইরানের জাতীয় পতাকাও ভিন্নতর। অথচ এসব দেশের প্রধান ধর্ম ইসলাম এবং লোকসংখ্যাও প্রধানত মুসলমান। কয়েক বছর আগে ভারত আর পাকিস্তান এক দেশ ছিল অথচ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দু'দেশ দু'রকম পতাকা গ্রহণ করেছে। ভারতের সাড়ে চার কোটি মুসলমানও পাকিস্তানের তথা অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসীদের মতো একই নবীকেই মানে একই নবীর প্রচারিত ধর্মকেই অনুসরণ করে কিন্তু নবী দিবসে জাতীয় পতাকা তুলতে বলে তাঁদের তুলতে হবে ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা।

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিরোধের ওপর, মানুষ ও দেশকে বিভক্ত করে খণ্ড খণ্ড করে দেখার ওপর। রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তার সৃষ্টি করে তার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে পার্থক্য, তার লক্ষ্য মিল নয়, স্বাতন্ত্র্য। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র প্রতীক অর্থাৎ স্বতন্ত্র জাতীয় পতাকা। অন্যদিকে নবীদের শিক্ষা ও লক্ষ্য হচ্ছে ঐক্য, বিশ্বমানবতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সব রকম ভেদ বৈষম্য দূর করে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা—মানুষের মন থেকে বিরোধের বিষ উৎপাটন করে একটা উচ্চতর ও মহত্তর জীবনবোধের ওপর সব মানুষকে সম্মিলিত করা। নবীরা রাষ্ট্রপতি যেমন নন, তেমনি নন রাষ্ট্রপতিও। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু কোরেশের বা আরবদের নবী ছিলেন না। তাই ইসলাম শুধু আরব দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে এই মহানবীর বাণী পৌঁছেনি—যেখানকার অন্তত কিছু সংখ্যক মানুষকে তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণী নাড়া দেয়নি, করেনি নতুন বিশ্বাস ও নবতর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ। এমনকি যেসব দেশে ধর্ম রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার সেখানেও নবীর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিকে ধরা যেতে পারে, সেখানে ধর্ম শুধু যে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত তা নয় বরং পদে পদে বাধা ও বিরুদ্ধতার মোকাবিলা করতে হয় ধর্মকে ওসব

দেশে। এতসব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সেখানকার বহু মানুষের জীবনে আচার বিশ্বাসে ধর্ম তথা ইসলাম বেঁচে রয়েছে। নবীর শিক্ষা এখনো সেখানে বহু মানুষের ধ্যান-ধারণা ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধার খোরাক হয়ে আছে। অথচ তাঁদের জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় পতাকা মুসলমান প্রধান দেশগুলির রাষ্ট্রপতাকা থেকে ভিন্ন। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন আর তাঁদের ইহকালের বহু জীবন-জিজ্ঞাসাও পতাকাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হচ্ছে। হচ্ছে আবর্তিত। যেমন হচ্ছে পাকিস্তানের বা অন্যান্য রাষ্ট্রের মানুষের জীবন তাঁদের স্ব স্ব জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্র করে। রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় আদর্শের দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আসমান-জমিন। তাই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তথা পতাকায় পতাকায় বিরোধ অনিবার্য। আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের যে বিরোধ সে তো নিছক রাষ্ট্রীয় বিরোধ। ধর্মের দিক থেকে, ইসলামের দিক থেকে তাদের সংগে আমাদের কোন বিরোধ নেই। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা যদি কখনো আমাদের সীমান্ত আক্রমণের দুর্বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে আসে তখন তাদের হাতে থাকবে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় পতাকা আর আমরা যখন পাল্টা আক্রমণের জন্য তাদের দিকে এগিয়ে যাবো তখন আমাদের হাতে থাকবে আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় ধ্বজা। কিন্তু নবী দিবসে আমরা এক, আমরা তখন ভাই ভাই—ইসলামের ভ্রাতৃত্বে গ্রথিত একই মালার ফুল। এই দিন অর্থাৎ নবী দিবসে যদি জাতীয় পতাকা তুলতে হয়, তাহলে সীমান্তের দুই দিকে বিরুদ্ধ-প্রতীকের দুই বিরুদ্ধ জাতীয় পতাকাই তোলা হবে। দৃশ্যটা যে শুধু উপভোগ্য হবে না তা নয় বরং যে নবীর নামে পতাকা তোলা হচ্ছে, তাঁর শিক্ষাকেও এই দুই বিরুদ্ধ পতাকা ব্যর্থ করে দেবে। এ হচ্ছে সবচেয়ে শোচনীয়। নবী এসেছেন শান্তির বাণী নিয়ে। প্রচার করেছেন প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের কথা, ঐক্যের কথা। কোরান ও হাদিসে বারবার করে ঘোষণা করা হয়েছে সব মুসলমান ভাই ভাই। আর নবীর নামে আমরা যে দিবস পালন করছি তাতে তুলতে হবে বিরোধের প্রতীক জাতীয় পতাকা। সীমান্তের এই পারে উঠবে এক রকম অন্য পারে উঠবে অন্য রকম পতাকা। অথচ তারাও নবীকে মানেন, তাঁর নামে দরুদ পড়েন। অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা তাঁকে নিবেদন করেন, আমরাও এই নবীকে মানি, তাঁর নামে দরুদ পড়ি আর তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকি। তবুও তাঁর দুই উম্মত বা অনুসরণকারী সীমান্তের দুই পারে দাঁড়িয়ে দুই বিরুদ্ধ পতাকা তুলে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এই দৃশ্য দেখে তাঁর আত্মা বা রুহ খুশি হবেন, এই বিশ্বাস কিছুতেই পোষণ করা যায় না।

রাষ্ট্রীয় পতাকা রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষেরই ঐক্যের প্রতীক। ভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তার ওপর রাষ্ট্রবিশেষের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে থাকে। পাকিস্তানেও যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও পার্সি রয়েছে। নবী দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঢালাই নির্দেশ দেওয়া হলে তারাও নবী দিবসে তা তুলতে বাধ্য। অথচ এঁদের অনেকে নবীকে যে শুধু মানেন না তা নয়, তাঁদের অনেকের জীবন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও মত-বিশ্বাস নবীর শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের যদি ঐদিন পতাকা তুলতে হয়, তাহলে এই ভক্তিহীন, আন্তরিকতাহীন শ্রদ্ধা নিবেদনের কোন মানে হয় কি? নবী দিবসকে রাষ্ট্রীয় দিবসে পরিণত করলে এ রকম প্রহসন ঘটবেই। ভারতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবসে বা ইংলাণ্ডে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিবসে যদি সেই সেই রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহলে সেখানকার মুসলমান নাগরিকরা কি রকম বোধ করবে তা সহজেই অনুমেয়।

বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রের রূপ খণ্ডিত—জাতীয় পতাকা সেই খণ্ডিত রূপেরই প্রতীক। নবীরা অখণ্ড সত্যের প্রতীক। রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করা যায় কিন্তু নবীকে তা করা যায় না। জাতীয় পতাকার সঙ্গে নবীকে মিশাতে গেলেই তাঁরও একটা খণ্ডিত রূপ কল্পনা করা হবে—তাঁকেও করে তোলা হবে জাতীয়। ব্যবহারিক সব কিছু জাতীয় বা Nationalise করা যেতে পারে কিন্তু অখণ্ড সত্যকে আর সেই সত্যের প্রতীক নবী ও মহাপুরুষদের Nationalise করা যায় না। নবীদের National Hero মনে করা তাঁদের প্রতি চূড়ান্ত অপমান।

ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ, দেশ-রাষ্ট্র ভাগ করা যায়, কিন্তু মাথার ওপরে আকাশকেও যদি তেমনভাবে ভাগ করা হয় তাহলে মানুষের জন্য তা হবে চরম দুর্দিন। নবী বা মহাপুরুষরা হচ্ছেন মানুষের জন্য আকাশের মতো। নবীদের তথা সত্যের বাণীবাহকদের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বা সে সীমায় সীমিত করে দেখা মানে আকাশকে খণ্ডিত করে দেখা। নবীরা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নন—তাঁরা সত্যের প্রতিনিধি, যে সত্যের ওপর সব মানুষের রয়েছে সমান অধিকার। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিশ্বনবী এই অর্থে যে, তিনি যে সত্যের প্রচার করেছেন, যে সত্যের তিনি বাণীবাহক, তাঁর ওপর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। এই অর্থেই তিনি বিশ্বনবী। আজো যাঁরা তাঁর বাণী গ্রহণ করেননি তিনি তাঁদেরও নবী। তাঁর বাণীতে যদি শাশ্বত সত্য থাকে সব মানুষ তা একদিন গ্রহণ করবেই। নামে বা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম কবুল না করেও আজ বহু দেশের বহু মানুষ নবীর বহু আদেশ উপদেশ ও নির্দেশকে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে ও মত-বিশ্বাসে স্থান দিয়েছে। নিয়েছে স্বীকার করে। জলধারার উৎস সন্ধান না করে বা না জেনেও আমরা জলের ব্যবহার করে থাকি। তেমনি সত্যকেও মানুষ এভাবে গ্রহণ করে থাকে অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতেই। এ জন্যই Truth shall prevail বা সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী কথাটা অর্থপূর্ণ।

অনেক দেশের জাতীয় পতাকায় নানা জীব-জন্তুর ছবি আঁকা থাকে। যেমন ঈগল, সিংহ ইত্যাদি অথচ ইসলামের মতে জীব-জন্তুর ছবি আঁকা নিষেধ। ইসলামের নবীর নামে যদি এসব জাতীয় পতাকা (এসব পতাকা যে সব দেশের, সে সব দেশেও মুসলমান আছে এবং থাকা বিচিত্র নয়) তোলা হয়, তাহলে শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে আমল না দিয়েও বলা যায়, দৃশ্যটা খুব রুচিসম্মত হবে না। ইসলাম বিশ্বধর্ম, তাই ইসলামের নবী সম্পর্কীয় সব প্রশ্ন বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই যাচাই হওয়া উচিত বলে মনে করি।

আমার বক্তব্য জাতীয় পতাকা খণ্ডের প্রতীক, আর নবী অখণ্ড সত্যের—অখণ্ডকে খণ্ডের মধ্যে তথা সর্বজনীন আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংকীর্ণতায় নিয়ে আসা হলে তাকে ছোট করা হয়। বিশ্ব-মানবধর্ম তথা অখণ্ড সত্যের প্রচারক নবীকে যে কোন দেশের জাতীয় পতাকার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা কখনো সত্য দেখা হতে পারে না। যে নবী সব মানুষের নবী, যাঁর বাণী সর্বজনীন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর নামে ও স্মরণে যে দিবস পালিত হয়, তাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সার্থকতা আমার বুদ্ধির অগোচর। নবীদের তথা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের নামের সঙ্গে যে কোন দেশের জাতীয় পতাকাকে জড়িত করা আমার কাছে অত্যন্ত অশোভন ও বেমানান মনে হয়। আল্লাহ্ যেমন কোন দেশ বা রাষ্ট্রের একার প্রভু নন, তেমনি তাঁর দূত বা রসুলও কোন দেশ বা রাষ্ট্রবিশেষের নিজস্ব নন। এসব ব্যাপার রাষ্ট্রের নিজস্ব এলাকা ও এক্তেয়ারভুক্ত, জাতীয় পতাকার ব্যবহার ও সম্পর্ক একমাত্র তাতেই সীমিত থাকা উচিত।

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আদর্শ ও শাসনব্যবস্থায় আর সমাজ বিন্যাসে যথেষ্ট—এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আমূল রদবদল ও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। ফলে জাতীয় পতাকারও রূপ বদলাতে বাধ্য। বহু দেশে নানা রকম রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে জাতীয় পতাকারও রূপান্তর ঘটেছে, বারবার তা নব কলেবর ধারণ করেছে। যে সব দেশে পরস্পরবিরোধী অথচ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্প্রদায় রয়েছে, সেখানে জাতীয় পতাকার রূপ-কল্পনায় আপস-রফার আশ্রয় নিতে হয়েছে। রাষ্ট্রের খাতিরেই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এ ভাবের আপস-রফা অপরিহার্য। রাশিয়ায় জারের আমলে যে পতাকা ছিল তা পরিত্যক্ত হয়েছে, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক পতাকা। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে সেখানকার শাসন-ব্যবস্থায় যদি আবার রদবদল ঘটে তাহলে জাতীয় পতাকারও পরিবর্তন অনিবার্য। জাতীয় পতাকা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। আর নবীরা হচ্ছেন মানুষের কতকগুলি মৌল প্রকৃতি ও মৌল মূল্যবোধের প্রতীক। মানুষকে ভালোবাসো ন্যায়, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করো, এতিম ও অসহায়কে স্নেহ করো, দুঃখীকে করুণা করো, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না ইত্যাদি মৌল মূল্যবোধ—যার ওপর মানুষের সমাজ ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, নবীরা তারই প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা (আধ্যাত্মিকতা সমাজ-আইনের বহির্ভূত বলে তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন)। আর এসব সর্বযুগেই মানুষের মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলে স্বীকৃত। এই আণবিক যুগেও তা বাসি বা Back dated বলে পরিত্যক্ত হয়নি এবং কোন দিন পরিত্যক্ত হওয়ার নয়—অন্তত মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে। অবশ্য প্রকাশ ও প্রয়োগে রকমফের ঘটবে। চিরন্তনকে সাময়িকীর গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে এলে তার মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়ে না বরং কমে। প্রতিমার সামনে প্রদীপ জ্বালালে প্রতিমার মুখ ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল দেখাতে পারে, কিন্তু সূর্যকে লক্ষ প্রদীপ জ্বেলে বন্দনা করলেও তার রোশনাই কিছুমাত্র বাড়বে না। বড় ও ছোটর পার্থক্য বুঝতে না পারলে বড়কে যেমন বিড়ম্বিত করা হয়, তেমনি নিজেকেও হতে হয় বিড়ম্বিত।

ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে সব মানুষের সামনে একটা বড় আদর্শ থাকা চাই—সেই আদর্শের সন্ধানী আলো হচ্ছেন নবী ও মহাপুরুষেরা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাতীয় পতাকাকে জড়িত করলে চিরন্তন ধর্মের ওপর রাষ্ট্র-ধর্মকে স্থান দেওয়া হয়। যার বিরুদ্ধে আমার এই ক্ষীণ প্রতিবাদ। যদি বলা হয়, বিশেষ দিনে মসজিদে জাতীয় পতাকা তুলতে হবে আর যদি তোলা হয়, তাহলে দৃশ্যটা মোটেও শোভন ও সুখকর হবে না। সব মানুষের একটা সার্বভৌম এলাকা আছে—দেশ, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও জাতির উর্ধ্বে তার স্থান। ধর্ম, সত্য, মানবতা আর তার প্রতিভূ নবী বা মহাপুরুষেরা হচ্ছেন সেই এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের গায়ে, জাতীয় লেবেল লাগলে তাঁদের ছোট করা হয়। তাতে ধর্মের বৃহত্তর উদ্দেশ্য খণ্ডিত ও পীড়িত হয়।

আজ পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের যে বিভীষিকা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তার থেকে মানব-জাতির পরিত্রাণের একমাত্র উপায় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নবী ও মহাপুরুষদের শিক্ষা ও আদর্শকে তুলে ধরা।

সকল মানুষের নবী

প্রায় মুহাম্মদের (দঃ) আগে পৃথিবীতে যেসব ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের আবেদন ছিল কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি। তাঁরা কথা বলেননি সর্বমানুষের প্রতিনিধি হয়ে বা সকল মানুষকে লক্ষ্য করে। অন্য নবীদের মতো হযরত মুহাম্মদেরও (দঃ) জন্ম এক বিশেষ গোষ্ঠী ও এক বিশেষ ভৌগোলিক সীমায়। কিন্তু আশ্চর্য, আজন্ম তিনি এমন এক সহজাত ও স্বাভাবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন যে, যখনই কথা বলেছেন তখনই গোষ্ঠী, জাতি ও ভৌগোলিক সীমাকে ছাড়িয়ে গেছেন—তখন তিনি সর্বমানুষের প্রতিনিধি, সকল দেশেরই লোকশিক্ষক। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন সে যুগে এমন সার্বজনীন ভূমিকা সত্যই বিস্ময়কর ও তুলনাহীন। তখন গোটা পৃথিবী কিংবা গোটা মানবজাতির কোন ধারণাই মানুষের ছিল না—আজকে যাকে আমরা আন্তর্জাতিকতা বা আন্তর্জাতিক মনোভাব বলছি সেদিন তা মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল, ছিল রাজ্যেও অনুপস্থিত।

সে খণ্ড বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ সংকীর্ণতার রুদ্ধশ্বাস বেড়াজাল ও লৌহ যবনিকা ছিন্ন করে প্রথম বিশ্ব নাগরিকের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হলেন তিনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। তিনি যে বাণী ও জীবন-দর্শন প্রচার করলেন তার লক্ষ্য সারা পৃথিবী, তার আবেদন সমস্ত মানব জাতির প্রতি। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ছিলেন পুরোপুরি ঐতিহাসিক মানুষ। তাঁর সব কাজকর্ম, নীতি ও উপদেশ এবং জীবনের সব খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসে। তাঁর আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ধারণা ও মূল্যায়নের জন্য কোন রকম কল্পনার আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল উন্মুক্ত—কোন রকম অলৌকিকতা বা অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগে তা কখনো হয়নি আচ্ছন্ন। তা ছিল যেমন সহজ, সরল, তেমনি স্পষ্ট ও ঋজু। তাঁর কোন কাজ বা বক্তব্য মিস্টিসিজমের আড়ালে রহস্যাবৃত হয়নি—তাই তা নেহাৎ বদ্ধু বা অজ্ঞজনের কাছেও হয়ে ওঠেনি অবোধ্য। বিখ্যাত সমালোচক Keneth Rexroth বলেছেন "Mohammed lived in the light of history. We can form a pretty close idea of what he was like, and he was not very prepossessing in some ways. He was most naively direct. With the simple-mindedness of a camel-driver he cut through the welter of metaphysics and mystification in the Near East of his time (Albert Camus লিখিত The Rebel গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

সাধারণত ধর্ম প্রচারকরা কিছুটা গোঁড়া ও হ্রস্বদৃষ্টি হয়ে থাকেন আর তাঁরা তাঁদের অনুগতী আর নিজের সম্প্রদায়ের কল্যাণকেই মনে করেন একমাত্র কল্যাণ। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এরকম সংকীর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সার্বিক ও সার্বজনীন। নিম্নে উদ্ধৃত হাদিসগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করলে তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা সহজেই বুঝতে পারা যাবে :

'সব সৃষ্ট-জীবই আল্লার পরিবারভুক্ত— তিনিই আল্লার কাছে প্রিয়তম যিনি তাঁর পরিবারভুক্ত জীবের প্রতি সবচেয়ে বেশি উপকার করতে চেষ্টা করেন।'

'মানুষের প্রতি যে সদয় নয়, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি সদয় নন্।'

'যে নিজের জন্য যা কাম্য মনে করে, তা অন্যের জন্যও কামনা করে না, সে কখনো প্রকৃত ঈমানদার নয়।'

'যাঁর দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়, মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম মানুষ।'

'ক্ষুধিতকে খাবার দাও, পীড়িতকে দেখতে যাও এবং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে নির্যাতিতকে সাহায্য কর।'

'ধর্মের পর জ্ঞানের প্রধান অংশ হচ্ছে মানবপ্রেম আর পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গল সাধন।'

'যার হাত ও জবান থেকে মানবজাতি নিরাপদ তিনিই খাঁটি মুসলমান।'

শুধু যে তিনি মানুষের কথাই ভেবেছেন আর মানুষের প্রতিই সহানুভূতির হাত প্রসারিত করেছেন তা নয় তাঁর সহানুভূতির দিগন্তরেখা থেকে পশু-পাখিও বাদ পড়েনি। যে যুগে মানুষ গোষ্ঠী-স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝত না—বৃহত্তর মানবতার কথা বা মানব-স্বার্থের কথা যে যুগে মানুষের কল্পনায়ও উদয় হয়নি—তখনই হযরত এক অখণ্ড সত্য-দৃষ্টির সাহায্যে সমস্ত মানব জাতিকেই যেন চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই সমগ্র মানুষের সমস্যা তাঁর জীবনে ও বাণীতে রূপায়িত হয়েছে। যখন মানুষ মানুষকেই প্রায় পশুর মতো ব্যবহার করত—তখন হযরতের সহানুভূতি ও করুণা মানুষকে ছাড়িয়ে পশু পাখির প্রতিও হয়েছিল সম্প্রসারিত। দেড় হাজার বছর আগে মানবেতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতাও যে নিষ্ঠুরতা এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল—কে করেছিল উপলব্ধি? যখন মানুষের কল্পনায়—Society for Prevention of Cruelty to Animals বা 'পশু নির্যাতন নিবারণী সভার' কথা উদয়ও হয়নি তখন হযরত এ সমস্যার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে দিয়েছেন কঠোর নির্দেশ :

'সওয়ারের পশু ক্লান্ত হলে তার ওপর থেকে নেমে পড়।'

একবার এক সাহাবী কতকগুলি পাখির বাচ্চা ধরেছিল, হযরত দেখতে পেয়ে তখনি নির্দেশ দিয়েছিলেন : 'যেখান থেকে ওদের ধরেছ এক্ষুণি সেখানে রেখে এসো এবং ওদের মাকে ওদের সঙ্গে মিলতে দাও।'

হযরত একবার একটি উষ্ট্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন উষ্ট্রটির পেট পিঠ প্রায় এক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন : 'জীবজন্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো। সুস্থ অবস্থায় ওর উপর চড় আর সুস্থ অবস্থায় ওকে ছাড়ো। (অর্থাৎ চড়তে চড়তে ওকে একেবারে কাহিল করে ছেড়ো না।')

হযরত বলেছেন : 'খাবার না দিয়ে বেঁধে রেখে একটি বিড়ালের মৃত্যু ঘটাবার জন্য একটি স্ত্রীলোককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।'

হযরতের এসব বাণী ও শিক্ষা তাঁর উদার ও সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। এই সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তিনি বিশ্বনবী। তিনি এমন কোন নির্দেশ দেননি যা শুধু

মানুষের পক্ষে তিনি যে দেশের, যে আবহাওয়া ও পরিবেশেরই হোন না কেন, পালন করা সম্ভব নয়।

সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আশ্চর্যভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত হাদিস : 'বস্তুত তোমরা এখন এমন এক যুগে আছ যখন তোমাদের কেউ যদি যা নির্দেশ করা হয়েছে তার এক-দশমাংশও ছেড়ে দাও তার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এরপর এমন এক যুগ আসবে তখন তোমাদের কেউ যদি যা নির্দেশ করা হয়েছে তার এক-দশমাংশও পালন করে সে নিশ্চয়ই নজাৎ বা মুক্তি পাবে।'

দেড় হাজার বছর আগে সমাজ ছিল ছোট, লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম, ছিল না তাতে এত সব জটিলতা। সে স্বল্পসংখ্যক সরল মানুষের সমাজে পান থেকে চুন খসলেও বিপর্যয় ঘটতো—ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ভারসাম্য হতো নষ্ট। তেমন সমাজে লঘু পাপে গুরুদণ্ড তাই প্রয়োজন ছিল। এখনকার মতো তখন মানুষকে নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের চাপে পড়ে পদে পদে বিভ্রান্ত হতে হতো না—নিছক বেঁচে থাকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে হতে হতো না প্রতি মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত। জীবন ছিল তখন অনেকখানি ছকে আঁকা সরলরেখার মতো। সামান্য আঘাতেই সে সরলরেখায় ফাটল ধরা ছিল অনিবার্য। তাই আক্ষরিক নিষ্ঠার প্রতি তখনকার যে দাবি তা যুগের চাহিদা আর প্রয়োজনেরই দাবি। সমাজ এখন আর তা নেই—ব্যক্তি মানুষ পর্যন্ত এখন অসম্ভব জটিল হয়ে গেছে, সামাজিক মানুষের তো কথাই নেই। লোকসংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় অপরিমিত। বিজ্ঞানীদের হিসেবে এ অনুপাতে লোকসংখ্যা বেড়ে চল্লে কয়েক শ' বছর পরে পৃথিবীতে মানুষ দাঁড়াবার জায়গাই পাবে না। এমন অবস্থায় কোন দেশের বর্তমান আইন-কানুন যে শুধু হালে পানি পাবে না তা নয়—ধর্মীয় আদেশ-নির্দেশগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা হয়তো মানুষের পক্ষে তখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের এক পর্ণকুটিরে বসে মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এক দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে যেন মানব-সমাজের এ ভবিষ্যৎ চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে অমন নির্দেশ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, পারস্পরিক সমঝোতা—ইংরাজিতে যাকে বলে Adjustment হযরত-চরিত্রে এও ছিল এক বড় বৈশিষ্ট্য। জীবনে বারে বারে তিনি এ সমঝোতা বা Adjustment-এর পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কোন ব্যাপারে অনমনীয় গোঁড়ামী বা একগুঁয়ে গোয়ার্তুমির পরিচয় দেননি। অন্য ধর্ম-প্রচারকদের সঙ্গে এখানেও তাঁর এক বড় পার্থক্য।

তাঁর এ হাদিসটিও স্মরণীয় : 'নগরবাসীর বিরুদ্ধে পল্লিবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।'

এখানেও তাঁর অসাধারণ সমাজ সচেতনতারই পরিচয় পাচ্ছি। সমাজ সচেতনতা মানে শুধু দীন-দরিদ্রের অভাব অভিযোগ বা শ্রেণী-দ্বন্দ্বের উপলব্ধি নয়—সামাজিক জটিলতা ও পরিবেশ পরিবেষ্টনের পার্থক্য আর জীবিকার বিভিন্নতা মানব চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও যে রূপান্তর ঘটায় তারও উপলব্ধি। শহর ও পল্লির সমাজজীবন আলাদা—সমস্যাও পৃথক। শহরের মানুষকেও কেমন সব জটিল সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় তা পল্লির মানুষের পক্ষে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তেমনি পল্লির

মানুষের সমস্যার সঙ্গেও শহরবাসীর কোন সাক্ষাৎ পরিচয় বা অভিজ্ঞতা নেই। এমন দুই বিরুদ্ধ-জীবন বা পরিবেশের মানুষের পক্ষে একে অপরের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হলে তা কখনো ন্যায়বিচারের সহায়ক হতে পারে না। হযরত তাঁর উপরোক্ত হাদিসে যে বাস্তব-বোধ ও সত্যানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর।

এভাবে তাঁর জীবন ও বাণীগুলির বিচার করলে দেখা যাবে, তিনি শুধু কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতির কথা ভাবেননি—সমস্ত মানুষের কথাই ভেবেছেন, সাধনা করেছেন মানুষের সকল সমস্যার মোকাবেলা করার। এদিক থেকে তিনি ছিলেন সকল মানুষের নবী।

বৌদ্ধধর্ম ও বিশ্বশান্তি

আমার বিশ্বাস এই বিশ্ব রঙ্গ-মঞ্চে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না—তুচ্ছাতিতুচ্ছ থেকে বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, অভ্যুত্থান, বিপ্লব, নতুন ভাবাদর্শ নিয়ে মহামানবের আবির্ভাব ইত্যাদি প্রত্যেক কিছুই কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষায় যাকে বলা হয় "প্রতীত্যসমূৎপাদ"—তারও মূল কথা বোধহয় এটি।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, তাঁর সাধনা ও বাণীর কি কোন ঐতিহাসিক পটভূমি নেই? আমরা জানি বিশ্ব-বিধানে ইন্দ্রজালের কোন স্থান নেই। কিছুই স্বয়ম্ভু নয়। মহাপুরুষরাও হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েন না। ইতিহাসের দাবিতে যুগের চাহিদায় তাঁদেরও আবির্ভাব ঘটে। তৃষিত যুগচিত্তে তাঁরা নিয়ে আসেন অমৃত বারি। সব মহাপুরুষদের বেলায়ই এ কথা সত্য। তবে স্মরণীয়, তাঁরা যুগ-চেতনার প্রতিনিধি বটেন, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে থাকে যুগাতীত বাণী, হাতে থাকে চিরন্তন মনুষ্যত্বের শাশ্বত দীপশিখা।

বুদ্ধদেবেরও আবির্ভাব ঘটে এই উপমহাদেশের এক চরম সঙ্কটের দিনে, যখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বোধ অধঃপতনের প্রায় শেষ ধাপে, ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের নামে মানুষ যখন জীব-হত্যায় উন্মত্ত। মানুষ শুধু নয়, দেবতাও যখন দেবত্ব ছেড়ে হয়ে উঠেছে রক্তপিপাসু— যুগাত্মার সাক্ষাৎ প্রতীক বুদ্ধদেবের মুখে তখনই ধ্বনিত হলো—অহিংসা পরম ধর্ম। মুহূর্তে ইতিহাসের গতিধারা যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন বীর্যবন্ত প্রতিবাদ ইতিপূর্বে আর শোনা যায়নি। শুনে মনুষ্যত্বের দিকে, আত্মার দিকে ফিরে তাকাল বিভ্রান্ত মানুষ, মানুষের হলো নবজন্ম—হলো আত্মার নতুন করে উদ্বোধন।

রাজ-সিংহাসনের তুঙ্গ শীর্ষ থেকে, পারিবারিক ও সাংসারিক সুখ-সম্পদের আরাম শয্যায় বসে এই প্রতিবাদ করলে তা লোকের কানে পৌঁছলেও হৃদয়ে কখনো পৌঁছত না। কিন্তু সর্বত্যাগী এই রাজ-ভিক্ষুর সুদীর্ঘ দ্বাদশ বছর অবর্ণনীয় কঠোর সাধনার দ্বারা লব্ধ এই অগ্নিবাণী তাই ব্যর্থ হওয়ার নয়—নয় তা দেশ-কালের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সত্যের উত্তরাধিকার সব মানুষের, সব দেশের ও সব যুগের। বুদ্ধদেব শুধু মৌখিক বা মামুলি প্রেমের বুলি, মৈত্রীর কথা বা অহিংসার বাণী আওড়াননি। নিজের জীবনে তা তিনি পালন করেছেন, শিষ্যদের পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কঠোর ব্রতধারী ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের দৈনন্দিন জীবন হয়েছে এই নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

আজকের দিনেও আমরা শান্তির কথা, মৈত্রীর কথা চারদিকে এবং যখন তখন শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এই শান্তি হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের মৌখিক বুলি, এর সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই, নেই মনুষ্যত্বের যোগাযোগ। এটা নিছক ব্যক্তিগত, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হাসিলের এক রকম ফন্দি-ফিকির মাত্র। ব্যক্তি তথা মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু কাগজ-কলমে শান্তির বাণী প্রচার করলে তা ভাল প্রোপাগান্ডা হতে পারে কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা তাতে হবে না। তাই আমাদের জীবদ্দশায় আমরা দু'দুটা নরমেধ-যজ্ঞ দেখতে পেলাম। এখনও পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই, বিশেষ করে সামরিক শক্তি মত্ত দেশগুলি অহরহ মুখে শান্তির বাণী

আউড়াচ্ছে আর হাতে-কলমে তৈরি করছে বিচিত্র ও বিপুল ধ্বংসকর আণবিক বোমা। হাতে এদের আণবিক বোমা, মুখে শান্তির লালিত বাণী। কপটতা ও আত্ম-প্রবঞ্চনার এমন লজ্জাকর রূপ ইতিহাসে বোধকরি দ্বিতীয় বার দেখা যায়নি।

ব্যক্তি বা মানুষই হলো সমাজের ও রাষ্ট্রের এক একটি অঙ্গ— সেই মানুষ যদি সৎ না হয়, সেই মানুষের মন থেকে যদি অবিদ্যা দূরীভূত না হয় সেই মানুষ যদি 'মধ্যমা প্রতিপদ' গ্রহণ না করে— মোট কথা ব্যক্তি মানুষের মন থেকে যদি হিংসা-বিদ্বেষ নির্মূল না হয় তাহলে বিশ্ব-শান্তি চিরকালই মানুষের নাগালের বাইরে বন্য-হংস হয়েই থাকবে। মনের ভিতর ছুরি শান দিতে দিতে মুখে শান্তির বাণী আউড়ালে যে শান্তি নেমে আসবে তা হচ্ছে কবরের শান্তি, শ্মশানের শান্তি, তা কখনো জীবনের শান্তি নয়। জীবনের শান্তির পথ আমরা খুঁজে পাব মহামানব বুদ্ধের জীবন সাধনায়, তাঁর শিক্ষা, বাণী ও নির্দেশে। আজকের জিঘাংসা-উন্মত্ত পৃথিবীর মানুষের কানে কি সেই শান্তির বাণী প্রবেশ করবে? সে যে দুরূহ সাধনার পথ—সর্বগ্রাসী হিংসা-বিদ্বেষ, উগ্রতা ও অজ্ঞতা পরিহার করে অহিংসার সাধনা, মধ্যমা প্রতিপতের সাধনা, প্রজ্ঞার সাধনা কি মানুষ গ্রহণ করবে? যদি করত তাহলে আর একটা মহাযুদ্ধের আতঙ্কে পৃথিবীর নাভিশ্বাস উঠত না। আজ মানুষ স্বস্তিবোধ করতে পারত, ঘরে ঘরে নেমে আসত শান্তি।

বুদ্ধদেবের সার্থক চরিতকার অশ্বঘোষ বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন, "তৃষিত জীবলোক এই উত্তমা ধর্মনদীর জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। প্রজ্ঞা স্রোতে এ নদী বেগবতী, স্থির বিনয় ব্যবহারই এ নদীর তটকে দৃঢ় ও সমাধি এর জলকে শীতল করেছে, আর এই উত্তমা নদীর জলে ব্রতচারী চক্রবাকেরা ক্রীড়া করছে।' কাব্যের অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের মর্মোদ্ঘাটন করেছেন এই ভাবে ভাষা-শিল্পী অশ্বঘোষ।

সুবিখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদে' বুদ্ধ বলেছেন : 'বৈরীগণের মধ্যে আমরা বৈরহীন হয়ে সুখে জীবনযাপন করব, বিদ্বেষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য হয়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে ক্লেশ রহিত হয়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হয়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব।' ইত্যাদি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এ যুগ মহাপুরুষের যুগ নয়, মহৎ কথা বা মনুষ্যত্ব সাধনার যুগ নয় এটি। এই যুগ হচ্ছে স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রবিদদের যুগ, ফাঁকা বুলির যুগ। তাই মনে হচ্ছে আজকের দিনে পৃথিবীব্যাপী যে বুদ্ধবন্দনা চলছে তাও অনেকখানি ফাঁকা— লোক দেখানো ব্যাপার। তবুও এও একেবারে মূল্যহীন নয়, সত্যিকার মহাপুরুষদের নিছক লোক-লজ্জার খাতিরে স্মরণ করলেও তা ব্যর্থ হয় না—এর ফলে কারো না কারো মনে মহাবুদ্ধের সাধনা-লব্ধ প্রজ্ঞা পারমিতার স্পর্শ ঘটতে পারে, তাহলে বুদ্ধ না হউন তিনি যে জীবনের মহাসত্যে প্রবুদ্ধ হবেন এতে সন্দেহ নেই। আজ বুদ্ধের পঞ্চশীল রাজনৈতিক বুলি না হয়ে জীবনের বাণী হউক। তা হলেই নিঃসন্দেহে ঘরে ও বাইরে, দেশে ও বিদেশে সর্বত্র আমরা শান্তির মুখ দেখতে পাব।

১৯৫৮

ডা প্রবোধ বাগচীর অনুবাদ

ইসলাম ও কম্যুনিজমে পার্থক্য

'ইসলাম ও কম্যুনিজমে পার্থক্য' এই শিরোনামায় একটি সাপ্তাহিকীর একেবারে শিরোদেশেই একটি ক্ষুদ্র লেখা ছাপা হয়েছে। আমার মনে হয় লেখাটির 'শিরোনামা' ও বক্তব্য দুই-ই বিভ্রান্তিকর। প্রথমত ইসলামের সঙ্গে কম্যুনিজমের কোন তুলনাই সঙ্গত নয়। কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন—তার সীমান্ত ইহকাল-পরকালব্যাপী বিস্তৃত। ইসলামকে যে মানে ও স্বীকার করে সে তাকে ইহকালের দু'একটি সুখ-সুবিধার উপায় হিসেবেই মানে না—বরং তার ইহ-পরকালের জীবনের একটা সুসঙ্গতি ও সুপরিণামের নির্দেশক হিসাবেই মানে। তাই তার কাছে ইসলাম একটা অখণ্ড জীবন-দর্শন।

অন্যদিকে কম্যুনিজম একটা খণ্ড ব্যাপার—মানুষের জীবনের শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কম্যুনিজম বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজকে ভেঙ্গে ধনসাম্যের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। ইহা নিছক ব্যবহারিক জীবনের ও তার একটি খণ্ডদিকেরই কথা। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে আর যে নীতিই কম্যুনিজম প্রবর্তন করতে চায় তার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্থনৈতিক। অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্যান্য সমস্যা বা পরকাল সম্বন্ধে কম্যুনিজম মোটেও মাথা ঘামায় না এবং আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ কম্যুনিজমের দ্বারস্থও হয় না। এদেশে অর্থাৎ পাক-ভারতে যারা কম্যুনিজম করে বা করতে চায় তারা তাদের চারদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে জীবনের যে কলুষিত চেহারা দেখতে পায় তাতে অতিষ্ঠ হয়েই কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকে। শিক্ষা-দীক্ষা, রোগ-শোক ও ঔষধ-পথ্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু প্রতি শুক্রবার ও ঈদের দিনে হাজার হাজার বুভুক্ষু নর-নারীকে যখন একটি পয়সা বা এক মুঠো চালের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে দেখা যায় তখন ভাবপ্রবণ ও আদর্শবাদী যুবকেরা কি স্থির থাকতে পারে? তাদের মনে কি আলোড়নের সঞ্চার হয় না? যার হয় না তার যৌবন-ধর্ম ও মনুষ্যত্বে ধিক! আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির—মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, কৃষক-প্রজা, গণতন্ত্রী দল ইত্যাদির কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক এই অসাম্য দূর করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই নেই। অন্তত কম্যুনিজম এ সমস্যার ওপর যে গুরুত্ব দেয় তার এক দশমাংশ গুরুত্বও এরা দেয় না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের অনেক আদর্শবাদী ছেলে-মেয়ে কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা ছেলেমেয়েরাও কম্যুনিজম বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। কারণ শুধু স্লোগান এদের বুদ্ধি ও মনকে কিছুতেই তৃপ্তি দিতে পারে না। বলাবাহুল্য এরা কেউ বোকা নয়। আশ্চর্য! আমি এ পর্যন্ত কোন বোকা লোককেই কম্যুনিজম করতে দেখিনি।

জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে এই সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক মতাবলম্বী ছেলেমেয়েদের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কম্যুনিজমে বিশ্বাসী ছেলেদেরও ঈদের নামাজে সামিল হতে ও শুক্রবারে জুমা'আর নামাজ পড়তে দেখেছি। বিয়েও করে এরা শেরওয়ানি, পায়জামা, টুপি বা পাগড়ি পরে ও কলেমা পড়ে। হিন্দু হলে পূজার সময়

দুর্গাপ্রতিমাকে নমস্কার করে—মন্ত্র পড়ে বিয়ে করে। আভূমি লুণ্ঠিত ধুতি-চাদর পরে ফুলবাবু সেজে জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। পোশাক-পরিচ্ছদে কমুউনিজমে বিশ্বাসী ও মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগ মতাবলম্বী মুসলমান ছেলেদের মধ্যে কি বিশেষ পার্থক্য আছে? ধর্ম বা তথাকথিত 'আধ্যাত্মিক' ব্যাপারেও কি এদের মধ্যে কোন ইতর বিশেষ দেখা যায়? কাজেই এদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য তা তো শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ। রাজনীতি বা অর্থনীতি জীবনের একটি খণ্ড অংশ মাত্র। সেই খণ্ড অংশের সঙ্গে অখণ্ড জীবন দর্শনের তুলনা অবাঞ্ছনীয় ও অসঙ্গত। তাতে উভয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। ইসলাম অখণ্ড জীবনশাস্ত্র। তার সঙ্গে শুধু রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ কমুউনিজমের তুলনায় কমুউনিজমের প্রতি অবিচার ও ইসলামের প্রতি অমর্যাদা অনিবার্য। ইহাতে কমুউনিজমের পরিচয় ও ইসলামের স্বরূপ উপলব্ধি অপূর্ণ থাকতে বাধ্য। একটা আস্ত বটগাছের সঙ্গে একটা আম্র শাখার তুলনা করতে গেলে, না বটগাছের পরিচয় পাওয়া যাবে, না আমগাছের।

ইসলাম একটি ধর্ম। ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের তুলনা চলতে পারে। কমুউনিজম কখনো ধর্ম নয়। কমুউনিজমের প্রচারক নিছক ও অবিমিশ্র অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর মতবাদের যাচাই আর বিচারও হয়ে থাকে অর্থনীতির মাপকাঠি দিয়ে। মার্ক্সের অনুবর্তীরাও তাঁকে এর বেশি কিছু মনে করেন না। কম্যিউনিজম ধর্ম হলে তা কি পাকিস্তানে বেআইনি ঘোষণা করা সম্ভব হতো? ইসলামের সর্বপ্রধান দুশমন 'পৌত্তলিকতা'। ইসলামের মূলমন্ত্র 'তৌহিদ'—পৌত্তলিকতার চেয়ে সেই 'তৌহিদে'র বড় শত্রু আর নেই। অথচ সেই 'পৌত্তলিকতা' পাকিস্তানে বেআইনি নয়। এমনকি আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় এমন সব সম্প্রদায়ও পাকিস্তানে আছে, যথা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু সেই ধর্ম বেআইনি ঘোষিত হয়নি! কারণ সেইগুলি 'ধর্ম'-ইসলাম-বিরোধী হলেও অনুবর্তী সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই কমুউনিজম যে পাকিস্তানে বেআইনী ঘোষিত হয়েছে তা ইসলামবিরোধী বলে নয়—বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনাই ইহার মূল কারণ। যাঁরা আজ 'বাড়তি ধনের' অধিকারী কমুউনিজম সফল হলে তাঁরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। এখন কোন মন্ত্রী বা লাট সাহেব ধরুন পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পান, কিন্তু তাঁর চাপরাশি পায় বড় জোর একশ টাকা। অথচ তিনি যে দামে 'তেল-নুন লাকড়ি' খরিদ করেন, চাপরাশিকেও সেই দামেই তা খরিদ করতে হয়। 'বাড়তি ধনের' মালিক কে হন সেটা সহজেই অনুমেয়। কাজেই যে নীতি এই 'বাড়তি ধনের' শত্রু তাকে রাষ্ট্রেরও শত্রু বলে ঘোষণা করার মূল কারণ রাষ্ট্রের চাবিকাঠি এখন 'বাড়তি ধনের'ই হাতে।

কাজেই আমাদের রাষ্ট্রও যখন কমুউনিজমকে একটা পৃথক ধর্ম হিসেবেই দেখে না বা বিবেচনা করে না আমরা তখন তাকে ধর্মের সঙ্গে তুলনা করি কেন? ইসলামী রাষ্ট্র ও অর্থনীতির সঙ্গে কমুউনিজমের তুলনা চলতে পারে। ধর্ম হিসেবে ইসলামের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে অন্য ধর্মের সঙ্গে করতে হয়, যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি। ধনতন্ত্রবাদের পাল্টা হিসাবেই কমুউনিজমের আবির্ভাব! কাজেই ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গেই কমুউনিজমের তুলনামূলক আলোচনা অধিকতর সঙ্গত ও উচিত

তাতেই কমুউনিজমের স্বরূপ স্পষ্টতর হবে।

'তোমার ধর্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য'—কম্যিউনিজম সম্বন্ধে এই বাণীর উদ্ধৃতিও অর্থহীন। কোরানের পাঠক মাত্রেই জানেন এটি সুনির্দিষ্টভাবে ধর্মমত সম্পর্কেই বলা হয়েছে। আগেই বলেছি কমুউনিজম কোন ধর্মমত নয়, তাই ধর্মমত সম্পর্কীয় নির্দেশ তার ওপর প্রয়োগ করে তাকে অনাবশ্যক মর্যাদা দানের কোন অর্থ হয় না। আমার মনে হয় এখানে কোরানের বাণীর অপপ্রয়োগ হয়েছে। কারণ এই বাণীকে যদি আমরা রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যাই তাহলে অচলাবস্থা অনিবার্য। রাষ্ট্র ও অর্থনীতি আইনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়—আইন মানে বল-প্রয়োগ। মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে শুধু 'আবেদনে' কাজ হলে আইনের কোন প্রয়োজনই হতো না। এখন যে পরিমাণে আয়কর বা ইনকাম ট্যাক্স আদায় হয় আইনের বল প্রয়োগ না করে শুধু শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আবেদন করে দেখুন—এর শতাংশের একাংশও আদায় হয় কিনা! যাকাতের বেলায় কি তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না? কম্যিউনিজম যে বল প্রয়োগে বিশ্বাসী তাও এই রকম আইনের বল-প্রয়োগ। জমিদারের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থাশীল থেকে সরকার যদি বাড়তি জমিদারি প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার আবেদন করতেন তাতে কি কোন ফল হত? ফল হতো না বলেই 'জমিদারি উচ্ছেদ' আইন খাতে হয়েছে অর্থাৎ আইনের বল-প্রয়োগ করতে হচ্ছে। এই 'বল প্রয়োগের নীতি ইসলামবিরোধী' একথা নেজামে ইসলাম পার্টিও এখনো বলেনি। মানুষের জান-মাল-ইজ্জত যে আজ অনেকখানি নিরাপদে আছে তা নিছক 'শুভবুদ্ধির' ফলে নয়। আইনের বল প্রয়োগের ভয়েই। এই বল প্রয়োগের ভয় দূর করুন, কাল দেখবেন শতকরা পাঁচজনও রেলের টিকেট কিনবে না!

'ইসলামিক জীবন দর্শনে প্রয়োজনের বাড়তি ধনে ব্যক্তির কোন অধিকার নেই।' ইসলামের আদি থেকে এ কাল পর্যন্ত এ কথার সত্যতার কোন প্রমাণ নেই। বরং ইসলাম বাড়তি ধন স্বীকার করে বলেই 'যাকাত'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। 'যাকাত' মানে সমস্ত বাড়তি ধন বিলিয়ে দেওয়া নয়—বাড়তি ধনের সামান্য অংশ মাত্র অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা বিলিয়ে দেওয়া। বাকি ৯৭।।০ টাকা কি হারাম বিবেচিত হয়? কখনই নয়। বাড়তি ধনের হিসাবেও তো একটা রেখা টানতে হয়। না হয় তাতেও গোঁজামিল থেকে যাবে। দিন, মাস ও বছরের হিসাবে বাড়তি ধনের খতিয়ান করা যেতে পারে। কারো বাড়িতে রোজ দিনে পাঁচ সের চালের দরকার, কিন্তু তার ঘরে আছে দশ সের; যদি সে এই ইসলামী দর্শনের অনুসারী হয় তাহলে তাকে পাঁচ সের বিলিয়ে দিতে হয়। যিনি মাসের বা বছরের হিসাবে বাড়তি ধনের হিসাব করবেন তাঁকে মাসের বা বছরের প্রয়োজনাতিরিক্ত যা কিছু সব বিলিয়ে দিতে হবে। নীতি ও আদর্শ হিসেবে এ মন্দ নয়। কিন্তু গত চৌদ্দশ বছরের মধ্যে এ কখনো কার্যকরী হয়েছে কি? ইতিহাসে এর কোন সাক্ষ্য আছে কি? খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ও এ নীতি কার্যকরী হয়নি। ইসলামের ইতিহাসে যাকে স্বর্ণযুগ বলা হয় সেই স্বর্ণযুগেও আমরা 'বাড়তি ধনে'র প্রতাপই বেশি করে দেখতে পেয়েছি। ব্যক্তি বিশেষের জীবনে ত্যাগের অপূর্ব মহিমা যে ফুটে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক চেহারা দিয়েই তো, অন্ততঃ বেশিরভাগের জীবন দিয়েই তো যে-কোন নীতি বা দর্শনের বিচার করতে হয়। ইসলাম মুষ্টিমেয়র ধর্ম নয়, বরং সর্বসাধারণের ধর্ম—সেই সর্বসাধারণের জীবনে এই নীতি রূপ লাভ করেছে কিনা তাই দেখতে হবে। বাড়তি

ধনের সুযোগ থাকলেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যও থাকবে। কমুউনিজম বাড়তি ধন ব্যক্তির হাতে না দিয়ে রাষ্ট্রের অর্থাৎ সর্বসাধারণের প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত করতে চায়। বাড়তি ধন বিলিয়ে দেওয়া মানে তো ভিক্ষা দেওয়া— যে দিচ্ছে সে সগৌরবে হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, যে নিচ্ছে তার কি দীনতার অন্ত থাকে? অথচ দাতার তুলনায় গৃহীতাই তো বেশি। দাতা অর্থাৎ বাড়তি ধনের অধিকারী আর কয়জন! দেশের বৃহত্তর অংশই তো 'নাই'য়ের দল। যে দেশের বৃহত্তর অংশকে ক্ষুদ্রতর অংশের কাছে অহরহ হাত পেতে দাঁড়াতে হয় সে দেশের মনুষ্যত্ব কি লাঞ্ছিত, অপমানিত ও খর্বিত হয় না? কমুউনিজম মনুষ্যত্বের এই অবমাননাকর ভূমিকা লোপ করে দিতে চায়। শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদনে তা কি সম্ভব? শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন কি রকম ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়েছে তার নিখুঁত ছবি ইচ্ছা করলে মসজিদ ও মাজারের দুয়ারে অহরহই দেখতে পাওয়া যাবে। কমুউনিজম যা বলে ও বিশ্বাস করে তা বাস্তবে রূপ দিতে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে। আমাদের সব বুলি ও দর্শন মুখ আর কলমের উচ্ছ্বাস বাক্যেই লাভ করে সমাপ্তি। এই যা তফাৎ! লেখা হয়েছে : "ইসলাম বলে মানুষের মহাপ্রভু এক। কম্যুনিজম বলে : মানুষের পেট এক, পিঠ এক।" এই কথাগুলি বিভ্রান্তিকর। পেট ও পিঠ আল্লার বিপরীত কথা নয়। পৃথিবীতে ধর্ম মানে না, আল্লাহ, রসুলকে স্বীকার করে না এমন মানুষের অভাব নেই। কিন্তু পেট ও পিঠ মানে না এমন মানুষ বোধ করি একটিও নেই। হযরত আদম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সব মানুষকেই পেট ও পিঠের ধান্দা করতে হয়েছে ও হচ্ছে। হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে যখন বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় তখন আল্লাহ স্বয়ং তাঁদের স্বহস্তে জীবিকা অর্জনের অর্থাৎ পেট ও পিঠের ধান্দা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমাদের হযরতও নবুওত পাওয়ার আগে এবং পরে সব সময় পেট ও পিঠের ধান্দা করেছেন। পেট ও পিঠের কথা বলায় কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই। কারণ এই দুইকে বাদ দিয়ে কোন রকম আধ্যাত্মিকতাই চলতে পারে না। আগেই বলেছি কমুউনিজমের বুনিয়াদ হলো অর্থনীতি—মানে পেট ও পিঠের ধান্দা। কয়লাকে কাল বলা যা কমুউনিজমকে পেট ও পিঠের নীতি বলাও তাই। সর্বাগ্রে পেট ও পিঠের ব্যবস্থা করে তারপর সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি করা যায়। কমুউনিজমকে যাঁরা গাল দেন আদতে তাঁরাও তাই করেন। এ রকম এক হাদিসও তো নাকি আছে—নামাজের সময় খানা তৈয়ার হলে আগে খানা খেয়ে তারপর নমাজ পড়বে। এখানেও পেটের অগ্রাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। পেট ও পিঠের ওপর গুরুত্ব দিয়ে কমুউনিজম কিছুমাত্র ভুল করেনি। কিন্তু ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলাম পেট ও পিঠকেও স্বীকার করেছে কিন্তু সেখানে থেমে থাকেনি—আরও এগিয়ে গেছে অর্থাৎ জীবনের আধ্যাত্মিক দিককেও ইসলাম স্বীকার করেছে। সেখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণাঙ্গতা।

ইসলাম যদি শুধু আধ্যাত্মিকতার ওপর জোর দিত অথবা 'মানুষের মহাপ্রভু এক'—এই বলে থেমে যেত তাহলে ইসলাম ধর্ম হিসাবে অসার্থক, অবাস্তব ও ব্যর্থ হতো। যে কোন ধর্ম বা জীবনদর্শন মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করে একদিনও টিকতে পারে না। ইসলাম Rational বা যুক্তিবাদী ধর্ম—তাই মানুষের ব্যবহারিক ও প্রাথমিক প্রয়োজনের ওপর কোরান জোর দিয়েছে বারবার। কুলু অ ওশরেবু— খাও, পিয়ো—এই কথা কোরানে বহু জায়গায়, বহুবার বলা হয়েছে। আমাদের যে তিনটি রিপু

ধর্মীয় পরব—দুই ঈদ ও মহরম, তাতেও কি পেট ও পিঠের প্রতাপই বেশি লক্ষ্যগোচর হয়? ফলত ইসলাম বস্তুকে স্বীকার করে এবং বস্তুকে স্বীকার করেই অবস্তুতে পৌঁছতে চায়। এই অবস্তুতে পৌঁছার সাধনাই তার আধ্যাত্মিক দিক। কিন্তু এই সাধনা করে দু'চার জন। কমুউনিজম সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক কিনা জানি না। কারণ কম্যিউনিষ্ট রাষ্ট্র বা সমাজ আমি দেখিনি। তবে কমুউনিষ্ট দেশেও সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাস্কর্য লোক-কল্যাণমূলক নানা বিষয় হচ্ছে শুনতে পাই। এগুলি নিছক বস্তুতান্ত্রিকতার পরিচায়ক নয়। লোক-কল্যাণকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিকতার কতটুকু মূল্য? আমার বিশ্বাস ইসলাম সে রকম আধ্যাত্মিকতাকে আমল দেয় না।

আধ্যাত্মিকতা ইসলামের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সব ধর্মেই আধ্যাত্মিকতার স্থান রয়েছে। কেতাবে বা বই পুস্তকে আবদ্ধ আধ্যাত্মিকতার মূল্য কতটুকু, যদি না তা মানুষের জীবনে, অন্তত অনুবর্তীদের বৃহৎ এক অংশের জীবনে রূপ লাভ করে? আমাদের চতুর্দিকে যে সমাজকে, যে মানবমণ্ডলীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় তো দেখা যায় না। কয়েক দিন আগে এক অধ্যাপক বন্ধু দুঃখ করে বলেছিলেন : 'গত শত বছরের মধ্যে বাঙালি মুসলমান সমাজে রামকৃষ্ণের মতো একজন লোকও জন্ম গ্রহণ করেনি!' রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনা রামকৃষ্ণ মিশনের মারফৎ আজ দেশ-দেশান্তরে জনকল্যাণের যে বৃহৎ ভূমিকা রচনা করেছে তা কার না লক্ষ্য-গোচর?

'ইসলাম আধ্যাত্মিক, কম্যুনিজম বস্তুতান্ত্রিক'—এরকম ঢালাও মন্তব্যের মধ্যে আত্মাভিমান ও অহমিকার পরিচয় আছে, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি আর সত্যানুরাগের পরিচয় নেই। আত্মাভিমান ও অহমিকার পরিচয় মুসলমানেরা যথেষ্ট দিয়েছে—তার শোচনীয় পরিণাম ও চিত্র পাক-ভারতে, প্যালেস্টাইনে ও মধ্য-প্রাচ্যে আমরা যথেষ্ট দেখেছি। আর নয়, আর নয়—এবার কিঞ্চিৎ বিচার-বুদ্ধি ও সত্যানুরাগের পরিচয় দিন।

আজ আমাদের সামনে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেমন গণতন্ত্র, কমুউনিজম, ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন, ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যুক্ত ও পৃথক নির্বাচন ইত্যাদি—তার সম্বন্ধে Academic আলোচনার সূত্রপাত হলে আমাদের রাজনীতিতে 'স্বচ্ছতা' আসার পথ সুগম হবে বলেই আমি মনে করি। বলাবাহুল্য আমার এই আলোচনাও Academic। কমুউনিজমের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আমি যে একেবারে ওয়াকিবহাল নই তা নয়— যেমন কমুউনিজম ব্যক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। সমষ্টির জন্য ব্যক্তিকে অকাতরে বলি দেয় ইত্যাদি। আমি যে জীবনদর্শনে বিশ্বাসী তার সঙ্গে এই সব খাপ খায় না। কিন্তু এই সব আমার আজকের আলোচনার সীমার মধ্যে পড়ে না বলে তার আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হলো। অর্থনীতির যে তিনটি রূপ আজ আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি : ধনতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলামী অর্থনীতি—আমার বিশ্বাস শেষোক্ত দুই নীতির মধ্যে অনেকখানি মিল আছে। উভয়ের লক্ষ্য এক—ধনের ন্যায্য বণ্টন। উভয়েই বাড়তি ধনের শত্রু। পার্থক্য যা তা উপায় বা প্রয়োগ পদ্ধতিতে।

১৯৫৫

ছায়াছবির কথা

সিনেমা বা ছায়াছবিও একটি শিল্প। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার আর তার উৎকর্ষের ফলশ্রুতি এটি। এ শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু তাই বলে একে যান্ত্রিক ভাবলে ভুল করা হবে। তাহলে শিল্পের আসল উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ। শিল্প কেন এবং কার জন্য? সব শিল্পের মূলে এ প্রশ্ন আর তার উত্তর সন্ধান সক্রিয়। কে শিল্প রচনা করে, কার শিল্পের স্রষ্টা? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—মানুষ। সব শিল্পই মানুষের তৈয়ারি, মানুষকে নিয়ে আর মানুষের জন্যই। শিল্প সম্বন্ধে এ এক পুরাতন উক্তি হলেও এতেই প্রকাশ শিল্পের চিরন্তন সত্য—সব কালের, সব দেশের শিল্পের লক্ষ্যও এই। শিল্প কোন কোন সময় যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না তা নয়। বিশেষত সিনেমা শিল্পের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আকর্ষণ প্রলোভন অনেক বেশি।

উচ্চতর শিল্পের জন্য অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা ক্ষতিকর। অথচ সিনেমার প্রধান লক্ষ্য আর অবলম্বন জনপ্রিয়তা আর সাফল্যের মাপকাঠিও এটি। ফলে অনিচ্ছায়ও সিনেমা প্রযোজককে নেমে আসতে হয় নিজের আদর্শ আর উচ্চ রুচিবোধ থেকে। সত্যিকার শিল্পসচেতন মানুষের জন্য এ এক ট্রেজেডি তথা মানসিক দুঃখভোগ।

নির্মীয়মান শিল্প আর যে শিল্পে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ অত্যাবশ্যক তাতে এ না হয়ে হয়তো পারে না। কারণ ব্যক্তিগত পুঁজির একটা সীমা আছে আর সে সীমার মধ্যে আত্মরক্ষা করেই এ শিল্পকে বেড়ে উঠতে হয়। সিনেমা শিল্পের উচ্চতম আদর্শ অনুসরণ এ কারণে প্রায় অসম্ভব। বিশেষত আমাদের মতো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে যেখানে এ শিল্প এখনো শৈশবে। যেখানে জাতীয় জীবন এখনো একটা সুনির্দিষ্ট রূপ-রেখায় গড়ে ওঠেনি এক কথায় আমাদের সব কিছু এখন নির্মীয়মান অবস্থায়— এ অবস্থায় ভুল বা বিকৃত পদক্ষেপসমূহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই আমাদের ছবি নির্মাতাদের এ সম্পর্কে বেশ কিছুটা সাবধানতা এক্তেয়ার করতে হবে।

স্রেফ আনন্দ দান কোন শিল্পেরই লক্ষ্য হতে পারে না—তাহলে শিল্প কথাটা হয়ে পড়ে অর্থহীন। আনন্দের চেয়েও শিল্পের আবেদন আরো ব্যাপক ও গভীর। এ গভীর তাৎপর্যবোধ ছাড়া শিল্প কখনো শিল্প হয়ে ওঠে না। চারদিকের মানুষ আর সমাজকে অবলম্বন করেই শিল্প গড়ে ওঠে। জীবন আর সমাজ ক্রমাগতই আবর্তিত হচ্ছে এগুচ্ছে—নানা সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন আর আশা-নিরাশা এ জীবনের সঙ্গে রয়েছে জড়িয়ে, শিল্পে তার প্রতিফলন ঘটলেই তা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয় আর আবেদনে দুর্বার। পাকিস্তানি মানুষের জীবনে এ সবের অভাব নেই—এখানে সিনেমা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করতে সক্ষম, কারণ সিনেমাই একমাত্র শিল্প যেখানে প্রবেশাধিকার সর্বজনীন। শিল্পের ক্ষেত্রে এর মতো দ্বিতীয় আম-দরবার আর নেই।

অন্য সব শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অধিকারী-ভেদ কথাটা—অন্তত কিছুটা অধিকার বা প্রস্তুতি ছাড়া সাহিত্যে, সংগীতে বা চিত্র-শিল্পে কি তার ভাবার্থে প্রবেশ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সিনেমার বেলায় সামান্য অক্ষর পরিচয়েরও দরকার পড়ে না। এ কারণে

শিল্পের ক্ষেত্রে কনিষ্ঠতম হয়েও এর এতখানি ব্যাপক আর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ব্যস্তবাগীশ মানুষের পক্ষে এত স্বল্প ব্যয়ে ও সময়ে অবসর বিনোদনের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় আর নেই। আর আজকের দিনে কেইবা ব্যস্ত নয়? ব্যস্ত যারা নয় তাদেরও ব্যস্ততার অজুহাতের অভাব নেই। কাজেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সিনেমার দ্রুত প্রসার আমাদের না মেনে উপায় নেই।

যদি তাই হয় তাহলে এ-ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। জাতি হিসেবে এ আমাদের কর্তব্য।

কথায় কথায় আমাদের চেয়ে অগ্রগামী বিদেশের সঙ্গে সব ব্যাপারে তুলনা করা আমাদের দেশে অনেকের একটা বাতিক। এতে ফয়দা কিছুই হয় না বরং প্রকাশ পায় নিজেদের হীনম্মন্যতা—এতে ছড়িয়ে পড়ে হতাশা আর নৈরাশ্য। এই ধরনের সব রকম হীনম্মন্যতাবোধ থেকেও আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। তা না হলে আমরা কিছুই গড়ে তুলতে পারবো না। আমাদের রাষ্ট্র যেমন নতুন তেমনি আমাদের স্বতন্ত্র জাতীয়-চেতনা আর উপলব্ধিও নতুন। জাতীয় জীবনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য সব কিছুই আমাদের গোড়া থেকে শুরু করতে হচ্ছে, নতুন করে করতে হচ্ছে নির্মাণ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেমন তেমনি শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। কোন ব্যাপারেই আমরা সব সময় পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারি না—শিল্পের ক্ষেত্রেও আমাদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। এ না হলে আমাদের অর্থনীতি যে পঙ্গু হবে শুধু তা নয়, এসব শিল্পের বিকাশও হবে বাধাগ্রস্ত এবং ঘুচবে না আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা। এ অবস্থা কোন আত্মমর্যাদাশীল জাতির কাম্য হতে পারে না। তাই সব সংস্কার ও বাধা জয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের একটা স্থানিক বা ভৌগোলিক রূপ আছে—আমাদের সিনেমায় তার রঙ লাগা চাই, রূপায়িত হওয়া চাই তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য। সিনেমা চোখে-দেখা শিল্প— দেশের মানুষ আর দেশের প্রকৃতি ছাড়া এ দেখা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই আমাদের সিনেমা-শিল্পকে গড়ে তুলতে হবে আমাদের নিজস্ব পরিবেশে-পটভূমিতে। দেখা মানে তাকানো নয়—হৃদয় স্পর্শ না করলে স্রেফ তাকানোই হয়। দেখা হয় না। আমাদের চলচ্চিত্র যেন দেখার বস্তু হয়ে ওঠে। অন্যান্য শিল্প— যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি ব্যক্তির একক উদ্যম ও সাধনায়ও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু সিনেমা পুরোপুরি যৌথ-শিল্প। বহুজনের সম্মিলিত সহযোগিতা আর সাধনায় এ শিল্প গড়ে ওঠে। এখানে অদ্বৈতবাদ অচল। পুঁজি, যন্ত্র ও যন্ত্রী, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, গায়ক ও সংগীতকার, সংলাপ রচয়িতা, সর্বোপরি কাহিনী বা কাহিনীকার—এ সবের যথাযথ যোগসাজশ চলচ্চিত্রের জন্য অপরিহার্য। কাহিনীকে সর্বোপরি বললাম এ কারণে যে আকর্ষণীয় কাহিনী ছাড়া কোন ছবিই আকর্ষণীয় হতে পারে না। আর আকর্ষণীয় না হলে যে-কোন ছবির ভাগ্যে ব্যর্থতা অনিবার্য। একটি সুতার অবলম্বন ছাড়া যেমন মিছরি দানা বেঁধে ঢেলা হয়ে ওঠে না তেমনি কাহিনীর সূত্রটুকু না থাকলে আর সব আয়োজনই হয়ে পড়ে অবলম্বনহীন। তেমন ছবি কিছুতেই উঠবে না আকর্ষণীয় ছায়াছবি হয়ে। তাই ভালো কাহিনীর ওপর চলচ্চিত্রের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। এখানেই আমাদের দ্বিধা ও আশঙ্কা। মানবীয় ও যুগোপযোগী কাহিনীর অভাব আমাদের চলচ্চিত্রের

এক বড় সমস্যা। সমৃদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক এ কারণে অত্যন্ত নিবিড়। আমাদের সাহিত্য বিশেষ করে কাহিনী সাহিত্য এখনো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। তাই প্রশ্ন জাগে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প কিসের ওপর নির্ভর করে বেড়ে উঠবে। অতীতের লোককাহিনীর ওপর আংশিকভাবে নির্ভর করা চলে বটে—কিন্তু সে ভাণ্ডও তো অত্যন্ত সীমিত। অচিরে তা নিঃশেষিত হতে বাধ্য। আর অতীত লোক কাহিনীতে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার তো কোন উত্তর মিলবে না। কাজেই চলচ্চিত্রকেও বারবার ফিরে আসতে হবে আধুনিক সাহিত্যের দ্বারে। কারণ চলচ্চিত্রের মতো আধুনিক সাহিত্যও ক্রমবিকাশমান—আর আধুনিক জীবন এ সাহিত্যেই বিধৃত। এ সাহিত্যের অভীপ্সাও তাই আধুনিক ও ভবিষ্যৎ জীবনকে উদ্ঘাটন করা। সাহিত্য আর চলচ্চিত্র পাশাপাশি না চলে সাহিত্যের চেয়ে চলচ্চিত্রের ক্ষতি হবে অনেক বেশি—কারণ তখন চলচ্চিত্রের উৎস-মূল যাবে শুকিয়ে। চলচ্চিত্রের পক্ষেও গল্প শোনানো বা দেখানো বড় কথা বা লক্ষ্য নয়, বড় কথা হালের আর ভবিষ্যতের জীবন দেখানো। চোখ ভুলানো নয়, মন ভুলানোই তার লক্ষ্য। তা না হলে শিল্পের স্বধর্মচ্যুতি অনিবার্য। সব শিল্পের সমসাময়িক আদর্শ জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান। প্রতিভা আর সাধনার সংযোগ ঘটলে তা অনায়াসে আকর্ষণীয় কাহিনীতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মানুষই একমাত্র জীব যে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে, ভাবে— ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাই কোন শিল্পীই ভবিষ্যৎ তথা আগামীদিনের মানুষের কথা না ভেবে পারে না। এ কারণে আধুনিক জীবনের পাশে শিল্পে ভবিষ্যতেরও ছায়াপাত ঘটে। 'শিল্পের জন্য শিল্প' এ এক বিতর্কমূলক আর বহু আলোচিত কথা। বলাবাহুল্য এটি রোমান্টিক যুগেরই সৃষ্টি। কিন্তু রোমান্টিক যুগ তো বহুকাল আগে আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন আমরা পুরোপুরি বাস করছি Realism তথা বাস্তববাদের যুগে—তাই এখনকার সব রকম শিল্পকর্মে দেখা দিয়েছে বাস্তবতার ছোঁয়া। এ ছোঁয়াটুকুর অভাব ঘটলে শিল্প কৃত্রিম হয়ে পড়তে পারে। তাই আমাদের সিনেমা-শিল্পও বাস্তবধর্মী হওয়া চাই।

আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাঙ্গালা

'আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাঙ্গালা' একদিন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে, বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। বাঙালি মুসলমানকে বলা হতো আত্মবিস্মৃত জাতি। এই উক্তিতে যথেষ্ট সত্য নিহিত রয়েছে। বাঙালি মুসলমানের তথা পাক-ভারতীয় মুসলমানের মনে একদিনে বা আকস্মিকভাবে 'জাতীয়তাবোধ' জাগেনি। এর পেছনে বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সাধনা রয়েছে—অনেকে তিল তিল করে জীবন দিয়ে গেছেন সমাজের মনে আত্মবোধ জাগিয়ে তোলার সাধনায়। এসব প্রতিষ্ঠান ও তার কর্মীরা আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছেন—আমরা ভুলে গেছি তাঁদের অনেকের কথা। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' ভূমিকা ও অবদানের যেমন মূল্যায়ন ও যাচাই হয়নি আজো, তেমনি 'আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাঙ্গালা' কি 'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' ইত্যাদির মূল্যায়নও হয়নি। আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সূচনার যুগে মীর্জা ইউসুফ আলী, এয়াহেদ হোসেন, মুজিবর রহমান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রভৃতি সমাজকর্মীরা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, স্বীকার করেছেন অভাবনীয় দুঃখ-কষ্ট ও শ্রম। সমাজের মনে আত্মবোধ জাগিয়ে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য এঁরা এবং আরো অনেকে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের সাধনা ও আত্মত্যাগের ফলে সমাজের মনে ধীরে ধীরে যে 'জাতীয়তাবোধ' ও আত্মসচেতনতা জেগে উঠেছিল ও গড়ে উঠেছিল স্বাতন্ত্র্যবোধ পাকিস্তান তারই ক্রমিক ঐতিহাসিক পরিণতি। অথচ আজো এসব সাধক ও তাঁদের আর যেসব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তাঁদের কর্ম-শক্তি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কোথাও সে সবের কথা যথাযথভাবে আলোচিত হয়নি—সে ইতিহাস এখনো অনুদ্ঘাটিত। এ যুগের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এখনো বেঁচে আছেন—এসব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎভাবে জড়িতও ছিলেন। বরং প্রথম জীবনে বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রধান কর্মী ও নেতা। আশ্চর্য, সব রকম যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনিও এ যুগের ও তাঁর পরলোকগত সহকর্মীদের সম্বন্ধে সবিস্তার কিছুই লেখেননি। আমার বিশ্বাস, তিনি ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ যুগের অনেক উপকরণই জোগাতে পারবেন। 'আঞ্জুমান-ওলামায়ে'র সঙ্গেও এঁরা উভয়ে সাক্ষাৎভাবে জড়িত ও যুক্ত ছিলেন।

আমাদের আলেমসমাজ সম্বন্ধে অনেকেরই এরূপ একটা ধারণা আছে যে, আলেমরা মুসলমান জাতিকে ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে সমাজের অগ্রগতিতে বাধা দিয়েছেন, নিজেদের পেশা ও জীবিকার খাতিরে সাধারণ মুসলমানকে কুসংস্কারে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন ইত্যাদি। কোন কোন আলেম সম্বন্ধে এরকম ঢালাও মন্তব্য কখনো সত্য হতে পারে না, এবং সত্য নয়। সত্য যে নয়, তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। বহু আলেম বহু জায়গায় ইংরেজি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকি, আমাদের

সাংবাদিকতার ভিত-পত্তনও তাঁদের হাতে। অনেক আলেম সাহিত্য ও গবেষণার ক্ষে দেখিয়েছেন—অনেকে ইসলামের অতীত ইতিহাস থেকে বহু তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন ক তা বাংলা ভাষায় প্রচার করেছেন। একথা বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হবে না যে, শাশ্ব তথা শরিয়ত বর্ণিত ও নির্দেশিত ইসলামকে বাংলার আলেম-সমাজই বাংলা ভাষা মারফত সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের কাছে বোধগম্য ও সহজ-গ্রহণীয় করে তুলেছে। এসব আলেমদের মধ্যে অনেকের বাংলা ভাষার ওপর দখল বিস্ময়কর। অনেকেই ছিলে সুবক্তা— মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা মোহাম্মদ রু আমীন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ—এ র বক্তৃতা একদিন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হ শুনেছি। এঁদের ভাষা, বর্ণনাকৌশল ও বিষয়বস্তুকে জনতার সামনে তুলে ধরার পদ্ধ ছিল সত্যই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। এঁরা একদিকে লেখনী দ্বারা অন্যদিকে বক্তৃত মারফৎ ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে মুসলিম-জনসাধারণের কাছে প্রচ করেছেন—ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের, বিশেষ করে খ্রিস্টান পাদ্রিদের অভিযোগ এঁর খণ্ডন করেছেন ও পাল্টা জবাব দিয়েছেন। এঁদের প্রচারের ফলে সমাজ আত্মসচেতন হ উঠেছে—সমাজ দেহ থেকে দূর হয়েছে বহু কুসংস্কার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত— এই সুদী অর্ধশতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল বাংলাদেশের আলেমরা যে ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কিছুমাত্র অগৌরবের নয়। তাঁরা যতখানি ক্ষতি করেছেন— মহল বিশেষে যে মনে ক হয়, তার চেয়ে, আমার বিশ্বাস, অনেক বেশি উপকার করেছেন। দেশের রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেমদের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। সেকালে দেশে এমন কো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, যার পেছনে আলেমরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে বাংলার আলেম সমাজের যে অবদান, তা সম্বন্ধে যথাযথ গবেষণা হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস, এই গবেষণার ফলে এমন ব মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হবে যা বাঙালি মুসলমানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহা রচনায় সাহায্য করবে এবং এর ফলে আলেমদের সম্বন্ধেও বহু ভুল ধারণার হ অপনোদন।

বাংলার আলেমদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল 'আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাঙ্গালা'। সমা সংস্কার ও ইসলাম প্রচার, এই ছিল আঞ্জুমানের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আঞ্জুমানের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। সে অধিবেশনে যে রিপোর্ট পঠিত হ তাতে আঞ্জুমানের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয় : "আজ হইতে অষ্টাদশ বৎসর পূর্বে যখন সর্বপ্রথম, রাজশাহীর সদরে বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি প্রথম অধিবেশন হয়, তখন উক্ত সমিতির অন্যতম প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা 'সোলতান' সম্পাদ মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ শিক্ষা সমিতির সঙ্গে সঙ্গে এক আলেম সম্মিলনী বা এসলাম মিশন সমিতির অধিবেশনেরও চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন ন কারণে তাঁহাদের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবর্তী হইতে না পারিলেও তাহা আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রত্যেক বৎসর শিক্ষা সমিতির অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং ভিন্ন প্রদেশ হইতে আমন্ত্রিত প্রা আলেম, ওয়ায়েজ ও বক্তাবর্গের সমবায়ে কনফারেন্সের অতিরিক্ত সময়—সকাল

যাহাতে ওয়াজের মজলিশ অনুষ্ঠিত হইত। তাহাতে ধর্ম ও জাতীয় বিষয়ে অনেক সারগর্ভ আলাপ, বক্তৃতাদির কার্যাদি সম্পন্ন করা হইত। এই ক্ষেত্রে এ কথা না বলিলে অকৃতজ্ঞতার কারণ হইবে যে, ইসলাম মিশনের সর্বপ্রথম প্রস্তাব রংপুর মহীপুরের জমীদার খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী সাহেব মরহুম কর্তৃক উত্থাপিত হয় এবং তিনি 'আকাশ-কুসুম' নামক একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার পূর্বক 'ইসলাম মিশন' স্থাপনের কল্পনা জনসমাজে প্রচার করেন এবং তিনি এই মতের পোষকতায় প্রস্তাব করেন যে 'সোলতান' কাগজের মুদ্রাযন্ত্রের নাম যদি 'এসলাম-মিশন-মেশিন-প্রেস' রাখা হয় তাহা হইলে তিনি আর্থিক সাহায্য করিবেন। তাঁহার সেই প্রস্তাবানুযায়ী 'সোলতান' পত্রের প্রেসের 'এসলাম মিশন-মেশিন প্রেস' নাম করা হইয়াছিল এবং তিনিও আর্থিক সাহায্যের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ মৌলবী, মৌলানা ও বক্তা মহোদয়গণ জনসাধারণের অন্তর হইতে হানিফী, মোহাম্মদী এবং শিয়া-সুন্নির আত্ম-দ্বন্দ্ব এবং পরস্পর সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-হিংসা বিজড়িত বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীভূত করিয়া সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃ-ভাবে সমাজহিতকর কাজে যোগদান করিতে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহাদের উৎসাহ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা ও ধর্মভাবপূর্ণ ওয়াজ শ্রবণে ক্রমে জনসাধারণ গৃহবিবাদের সর্বনাশকর অনিষ্টকারিতা এবং একতা ও ভ্রাতৃ-ভাবের সাহায্য-গরিম্য বুঝিতে সমর্থ হয়। রাজশাহী, ত্রিপুরা, পশ্চিম গাঁও, কলিকাতা, পূর্ণিয়া ও বর্ধমান প্রভৃতি সর্বস্থানেই এরূপ আলেম সম্মিলনী দ্বারা সামাজিক উন্নতি, জাতীয়ভাব ও ধর্মের প্রভাব প্রবলতর করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করা হইয়াছিল। বিহারের প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মৌলানা শাহ সোলেমান ফুলওয়াড়ী, স্বনামখ্যাত আলেম মৌলানা কাদের বখ্‌শ প্রভৃতি মহোদয়গণ অনেক সম্মিলনীতে যোগদানপূর্বক জনমণ্ডলীকে তাহাদের সারগর্ভ উপদেশমালায় ভূষিত করিয়াছিলেন। মরহুম মুনশী মেহেরউল্লাহ সাহেবের অসাধারণ বাগ্মিতাপূর্ণ উপদেশাদিও সমাজের গৃহবিবাদ নিবারণ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিদূরণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহাদের সেই সাধু-চেষ্টার ফলস্বরূপ বিগত ১০/১২ বৎসর পূর্বে হানিফী, মোহাম্মদী ও শিয়া সুন্নির মধ্যে যেরূপ সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ ও বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল তাহা এখন অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ চেষ্টা যে বর্তমান আলেম সমিতি গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষা সমিতির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বৎসর আলেমগণের সম্মিলন এবং যথা নিয়মে ওয়াজ-বক্তৃতাদির কার্য পরিচালিত হইলেও তাহা শিক্ষা সমিতির অঙ্গীভূত হইয়াছিল। ইসলাম মিশন ও আলেম সমিতির কোন স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব স্থাপিত হইয়াছিল না।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ইসলাম-মিশনের জল্পনা-কল্পনা ও তাহার আংশিক কার্যকলাপের সূত্রপাত হইলেও তাহা ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোনরূপ শৃঙ্খলিত ও সুসংবদ্ধাবস্থায় আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায় নাই। এমনকি ইসলাম-মিশনের প্রস্তাবটিও অন্ধকার চাপা পড়িয়া গিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়া বানিয়াপাড়া গ্রাম হইতে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের নিকটবর্তী ...চদা গ্রামের প্রসিদ্ধ আলেম স্বজাতিবৎসল, সমাজহিতৈষী, জ্বলন্ত উৎসাহী মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী সাহেব ও তাঁহার সহকারী বন্ধু বানিয়াপাড়া মদ্রাসার কতিপয় শিক্ষক পরিচালক বঙ্গীয় আলেম সমিতি গঠনের প্রতি নব উদ্যমে অগ্রসর হন। মোহাম্মদী

কাগজের আন্দোলন আলোচনা এবং নিমন্ত্রণপত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ আলেম ও প্রচারক এবং বক্তা ও অন্যান্য সমাজহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে সাদরে আহ্বান করা হয়।" এই আহ্বানের ফলে—"১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মার্চ তারিখে বগুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুরহাট স্টেশনের অনতি-দূরবর্তী বানিয়াপাড়া গ্রামে আলেম সম্মিলনীর আনুষ্ঠানিক সভার অধিবেশন হয়। মোহাম্মদী-সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির সারগর্ভ অভিভাষণ প্রথম বর্ষের রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছে। ৪/৫ হাজার লোকের সমাবেশে তিনদিন ব্যাপিয়া মহাসমারোহের সহিত সভার কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়। এই আলেম সম্মিলনীতে সমগ্র বঙ্গদেশের সমবেত শক্তি লইয়া ইসলাম মিশন ও সমাজ-সংস্কার এবং জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে 'আঞ্জুমানেওলামা' নামে একটি স্থায়ী সভার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।"

'আঞ্জুমানে'র প্রথম অধিবেশনে যে ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলির দিকে তাকালেও সে যুগের আলেমদের উদ্দেশ্য ও সমাজ-কল্যাণের পরিধি বুঝতে পারা যাবে। নিম্নে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১৬শ প্রস্তাব উদ্ধৃত হলো :

পঞ্চম প্রস্তাব—"এই সভার মতে বর্তমান আরবি শিক্ষার যথোচিত সংস্কার সাধন পূর্বক তাহাকে সাময়িক অভাব বিমোচনের অনুকূল করা, বিশেষত ইংরেজি, বাঙ্গালা ভূগোল, ইতিহাস ও আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানকে পঠ্যভুক্ত করিয়া আরবি শিক্ষার পূর্ণ সাধন করা একান্তই প্রয়োজনীয়।"

ষষ্ঠ প্রস্তাব—"বিশেষ কার্যকরী ও হিতকর নীতি অবলম্বনে আধুনিক প্রণালীতে মুসলমান সমাজে জ্ঞান বিতরণ, ধর্ম বিস্তার ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ইসলাম প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করা এবং এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনকল্পে একদল প্রচারক প্রস্তুত করা এই আঞ্জুমানের একটি বিশেষ কার্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া আবশ্যক।"

দশম প্রস্তাব—"এই সমিতির মতে জাতীয় উন্নতি সাধন ও ইসলাম ধর্ম-বিধানের মর্যাদা রক্ষা করে আলেম মণ্ডলী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সমাজে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত কর্তব্য।"

একাদশ প্রস্তাব—"যেহেতু বঙ্গদেশের প্রাইভেট মাদ্রাসাসমূহ কোনরূপ সুনিয়মাধীনে শৃঙ্খলিত নহে, এই জন্য ঐ সকল মাদ্রাসার শিক্ষা-দীক্ষা ও পরীক্ষা গ্রহণাদি বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত নাই; পরন্তু সর্বদা নানাবিধ অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আঞ্জুমানের মতে প্রাইভেট মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও পরিচালকগণের পক্ষে তাঁহাদের বিদ্যালয়সমূহের সুচালন ও শৃঙ্খলা বিধানকল্পে তাহাদের মনোনীত ও গঠিত একটি কমিটি কিম্বা আঞ্জুমানের হস্তে তাঁহাদের বিদ্যালয়সমূহের শৃঙ্খলা বিধানের ভার অর্পণ করা আবশ্যক।"

ষষ্ঠদশ প্রস্তাব—"নিম্নলিখিত মেম্বার ও কর্মচারীগণকে লইয়া আঞ্জুমানে-ওলামার কার্য-নির্বাহক কেন্দ্রসভা গঠিত হউক এবং নির্বাচিত মেম্বারদিগকে আবশ্যকমতে আরো মেম্বার-সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা দেওয়া হউক :

সভাপতি : মৌলানা শাহ্ ছুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব (হুগলী) ও মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ মুসা (বর্ধমান)।

সহকারী সভাপতি : মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি. এল. ও মৌলবী আবদুর রহমান খাঁ।

সেক্রেটারি : মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

জয়েন্ট সেক্রেটারি : মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী

সহকারী সেক্রেটারি : মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ.

ক্যাশিয়ার : আবদুল হামিদ খাঁ সওদাগর"

প্রতিষ্ঠানের নাম 'আঞ্জুমান-ওলামা' হলেও অনেক ইংরেজি শিক্ষিত লোকও এতে স্থান লাভ করেন এবং এর কার্য-নির্বাহক কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। এতে মনে হয়, আঞ্জুমান কর্তৃপক্ষের মনে কোন রকম গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা ছিল না।

গৃহীত প্রস্তাবগুলির দিকে তাকালে সহজেই বুঝতে পারা যাবে আঞ্জুমান শুধু ধর্মপ্রচার বা সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণেরই সংকল্প গ্রহণ করেনি মাদ্রাসা-শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ, ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানকেও পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি মেয়েদের শিক্ষার কথাও তাঁরা বাদ দেননি। কাজেই সামাজিক অগ্রগতিতে আলেমরা বাধা দিয়েছেন একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

আঞ্জুমানের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায়—১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর। রিপোর্টে আছে : 'দারুল মুছান্নেফিনের অধ্যক্ষ 'আলম আরেফ'-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সৈয়দ সোলেমান নদবী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আগন্তুকগণের মধ্যে আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি নবাব হাজী মোহাম্মদ ইসহাক খাঁ মহরুম, অনরেবল মিয়া মোহাম্মদ শফি সি. আই. ই., ভারত প্রসিদ্ধ শফাউল মূলক্ হাকিম আজমল খাঁ, অল-ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি মৌলবী হাবিবুর রহমান শেরওয়ানী, কলিকাতা হাই কোর্টের ভূতপূর্ব জজ সৈয়দ হাসান ইমাম প্রভৃতি এবং হিন্দুস্থানের বহু গণ্যমান্য আলেম এই অধিবেশনে যোগদান করত সভার গৌরব বর্ধন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গের বহু গণ্যমান্য আলেম-ফাজেল, ব্যবস্থাপক সভার মান্যবর মেম্বর, উকিল, ব্যারিস্টার, হাকিম, শিক্ষক, জমিদাররেছ, সম্পাদক, আঞ্জুমানের হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক মেম্বরগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়া বিশেষ উৎসাহ সহকারে সভার কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।"

এই অধিবেশনে আঞ্জুমানের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য যে সাবকমিটি গঠিত হয় তাতে জনাব এ. কে. ফজলুল হক, 'দি মুসলমান' সম্পাদক জনাব মুজিবর রহমান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতির নামও দেখতে পাওয়া যায়।

সেদিন মুসলমান সমাজেও সামাজিক ভেদনীতি কি চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় আঞ্জুমানের নিম্নলিখিত প্রস্তাবে :

"আসাম ও বঙ্গদেশের সাধারণ মুসলমানগণ, বাদিয়া, মাঠিয়াল, আদিম, সাঁওতাল মুচি ও দেশীয় খ্রিস্টান ইত্যাদি শ্রেণীর নব-দীক্ষিত মুসলমানদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে, তাহাদের সঙ্গে ইসলামী ভ্রাতৃভাব আদান-প্রদান করিতে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে

তাহাদিগকে মসজেদে প্রবেশ করিতে ও জুমার জমাতে শরিক হইবার অধিকার দিতে সম্মত নহে। এ জন্য আঞ্জুমানে উপস্থিত আলেমগণ ও অন্যান্য মোসলেম সভাবৃন্দ সকলেই একবাক্যে এই ধর্মবিরুদ্ধ মহাপাপজনক ঘৃণিত নীতির তীব্র ও কঠোর প্রতিবাদ করিতেছেন। এই কাফেরি নীতি এতদ্দেশে ইসলাম প্রচারের পথে ঘোর অন্তরায় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করার জন্য সকলেই সমস্বরে সমাজের নিকট অনুরোধজ্ঞাপন করিতেছেন।" আর এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে :

"বঙ্গদেশে যে সকল ওয়াক্‌ফ এষ্টেট্ আছে সে সকল এষ্টেটের আয়-ব্যয় ও তাহা যথাযথভাবে ওয়াক্‌ফনামা অনুসারে নির্বাহিত হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই আঞ্জুমানের মতে গভর্ণমেন্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করা একান্ত উচিত ইত্যাদি।" আঞ্জুমান শুধু যে প্রস্তাব পাস করেছেন তা নয় সে সব প্রস্তাবকে যথাসম্ভব কাজে পরিণত করতেও চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে ধর্ম-শিক্ষা ও ধর্ম-সাহিত্য প্রচারের জন্য আঞ্জুমান পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন, 'আল-ইসলাম' নামক মাসিক পত্র প্রচার করেছেন, ইসলাম-মিশন ফান্ড সৃষ্টি করেছেন এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্জুমানের বহু প্রচারক তৈয়ারী করেছেন, উপযুক্ত প্রচারক নিযুক্ত করে তাঁদেরে বিভিন্ন স্থানে প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। আঞ্জুমানের প্রচারকেরা কিভাবে এবং কি কাজ করতেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আঞ্জুমানের রিপোর্টে আছে। আল্-ইসলাম সম্বন্ধে রিপোর্টে লেখা হয়েছে :

'আঞ্জুমানে-ওলামার কার্যাবলীর মধ্যে আল-ইসলাম' মাসিক কাগজখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিগত আড়াই বৎসর হইতে (অর্থাৎ ১৩২২ সাল হইতে) এই কাগজখানি চলিত হইতেছে। বর্তমানে কাগজের প্রচার ১৫০০। কাগজখানির প্রতি ক্রমে সমাজের সহানুভূতি আকর্ষিত হইতেছে। প্রচার সংখ্যা সন্তোষজনক না হইলেও এ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে যতগুলি মাসিক কাগজ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'আল-ইসলামে'র প্রচার সর্বাপেক্ষা অধিক।"

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিহার প্রদেশের আরা শাহবাদ জেলায় যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয় যার ফলে হাজার হাজার মুসলমান পরিবার গৃহহারা হয়ে পড়ে—তাদের সাহায্যার্থেও আঞ্জুমান এগিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে আঞ্জুমানের রিপোর্টে লেখা হয়েছে :

"হাজার হাজার মুসলমান বস্ত্র ও অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া পথে ঘাটে ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এরূপ দুঃসময়ে সর্বাগ্রে কলিকাতায় আঞ্জুমানে-ওলামার পক্ষ হইতে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিহার গভর্ণমেন্টের নিকট আঞ্জুমানের পক্ষে একটি ডেপুটেশন প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। অনুমতি পাওয়ার পর আঞ্জুমানের সেক্রেটারি মৌলবী মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব ঘটনাস্থলে যাত্রা করেন। এই দিকে আঞ্জুমানের জয়েন্ট সেক্রেটারি ইসলামাবাদী সাহেব 'মোহাম্মদী' সংবাদপত্র দ্বারা ও নানা স্থানে সভা-সমিতি করিয়া দেশময় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন, বঙ্গদেশ আসাম ও ব্রহ্মদেশব্যাপীয়া আন্দোলনের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার ফলে কলিকাতার দিল্লী নিবাসী ব্যবসায়ীগণ একটি কমিটি গঠন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে চাঁদা সংগ্রহ করেন। তাঁহাদের কমিটির হাতে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়। আঞ্জুমানে ওলামা তাহার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া পূর্ব হইতে কার্যারম্ভ করিয়াছিল। খোদাতালা তাহার কার্যে সহায় হইলেন।

দিগের আন্দোলন আলোচনার ফলে বঙ্গদেশ ও আসাম হইতে ৮ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। আঞ্জুমানের সম্পাদক সাহেব একদল স্বেচ্ছা-সেবকসহ প্রায় দুই মাস ... জেলার লুণ্ঠিত গ্রামসমূহে ভ্রমণপূর্বক দুঃস্থ লোকদিগের মধ্যে অর্থ, বস্ত্র ও কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গের মামলা-মোকদ্দমার তদবির, সাক্ষী সংগ্রহ, হিন্দুপ্রতাপে সত্য সাক্ষ্য দিতে ভীত ব্যক্তিবর্গকে অভয়দানপূর্বক তাহাদের দ্বারা মোকদ্দমা পরিচালনার চেষ্টা, সর্বোপরি মুসলমানগণের মধ্যে আত্মরক্ষার ভাব জাগাইয়া দেওয়া, জাতীয় জীবন গঠনের উপায় নির্ধারণে উপদেশ দান ইত্যাদি ব্যাপার দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। আঞ্জুমানের খাস তহবিলে এ যাবৎ ৮ হাজার টাকা সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইয়াছে।"

আঞ্জুমানের চেষ্টায় রেঙ্গুন থেকেও প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর জামাল কে. সি. আই. সাহেব সাত হাজার টাকা দান করেছিলেন আরা শাহবাদ ফাণ্ডে। সর্বমোট পঁচিশ হাজার টাকা নাকি সংগৃহীত হয়েছিল। "উক্ত টাকাসহ রেঙ্গুন-মোসলেম সমাজের পক্ষ হইতে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার ও ব্যবসায়ী আবদুল বারী চৌধুরী সাহেব প্রতিনিধিস্বরূপ কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং রেঙ্গুন কমিটির মতানুসারে আঞ্জুমানে-ওলামার সহযোগিতায় আরা যাত্রা করেন।" রিপোর্টের উপসংহারে লেখা হয়েছে—'আরার হাঙ্গামার ব্যাপারে আঞ্জুমানে-ওলামা রেঙ্গুনের চাঁদাসহ প্রায় ৩৫ হাজার টাকা দুঃস্থ লোকদিগকে বিতরণ করিয়াছেন।" কাজেই দেখা যাচ্ছে, আঞ্জুমান-ওলামা তথা আলেম সমাজ শুধু ধর্মপ্রচার বা ধর্মশিক্ষা নিয়েই মশগুল থাকেননি—প্রয়োজনের সময় সমাজ-সেবার ক্ষেত্রেও তাঁরা এগিয়ে এসেছেন।

অনেকের ধারণা, আলেমরা শুধু চাঁদা ও দান-খয়রাত গ্রহণেই অভ্যস্ত, দেওয়ার বেলায় তাঁরা অনুপস্থিত। এ ধারণাও ভুল। অনেক আলেম নানা স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজেরা সর্বহারা হয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত কিছু মাত্র বিরল নয়। সীতাকুণ্ডের মাওলানা ওবায়দুল হক সীতাকুণ্ড সিনিয়র মাদ্রাসা ও সীতাকুণ্ড হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু নিজের ওয়ারিশদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি। চট্টগ্রামের মওলানা আবদুস সোবহান পটিয়া রাহাত আলী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু আত্মীয়দিগের জন্য কোন বিত্ত-সম্পত্তি রেখে যাননি। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সুদীর্ঘ জীবন ধরে দেশের ও সমাজের সেবা করে গেছেন, কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছেন কপর্দকশূন্য অবস্থায়। জীবনের শেষ সময়েও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু না করে তিনি যথাসর্বস্ব ব্যয় করে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত কদম মোবারক এতিমখানা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন আলেম বহু শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং এসবের পত্তনে তাঁদের অনেকে সব রকম কায়িক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি। এ সবের ইতিহাস এখনও সংকলিত হয়নি বলে আলেমদের অবদানের সামগ্রিক রূপ দেশের সামনে অজ্ঞাত রয়েছে। এ কারণে আলেমদের সম্বন্ধে সমাজে বেশ কিছুটা ভুল ধারণাও প্রশ্রয় পেয়েছে।

মনে হয়, আঞ্জুমান সেদিন বাংলার মুসলমান সমাজে প্রবল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। চাঁদার পরিমাণ বেশি নয় বটে, কিন্তু দেখা গেছে হাজার হাজার মুসলমান

নরনারী আঞ্জুমানকে আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। এঁদের সকলের নাম ও চাঁদার পরিমাণ আঞ্জুমানের রিপোর্টে ছাপা হয়েছে—এমনকি যাঁরা দু'আনা চার আনা চাঁদা দিয়েছেন তাঁদের নামও বাদ পড়েনি। যাঁরা চাঁদা দিয়েছেন বা আঞ্জুমানের মেম্বার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক মহিলার নামও নজরে পড়ে।

আঞ্জুমানের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল চট্টগ্রামে—১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। মনে পড়ে লালদিঘীর ময়দানে বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরি করে তাতে একসঙ্গে চার চারটে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। বলাবাহুল্য, এসবের ব্যবস্থা ও আয়োজনের পেছনে ছিলেন অক্লান্ত কর্মী মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় এসব সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে আঞ্জুমানেওলামার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিহারের মাওলানা সোলেমান ফুলোয়ারী সাহেব। বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার এ. এফ. রহমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিস্টার আমিনুর রহমান, আর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে ও বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে যথাক্রমে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব।

এই সম্মেলন ও তার পরবর্তী কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি কোন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, সেসব রিপোর্ট সংগৃহীত হলে আলেমদের ভূমিকা ও অবদান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্টতর হবে আর তা হবে আমাদের ইতিহাসের এক মূল্যবান উপকরণ।

১৩৬৯

মুসলিম সাংবাদিকতার একটি সংগ্রামী অধ্যায়

প্রচলিত রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে 'বঙ্গ-ভঙ্গ' বা Partition of Bengal বলা হয় তাতে পাকিস্তানের অঙ্কুর নিহিত ছিল। পূর্ব-বাংলা আর আসামকে নিয়ে স্বতন্ত্র একটি মুসলিম-প্রধান প্রদেশ গড়তে চেয়েছিলেন ইংরেজ সরকার অর্থাৎ সেদিনের ইংরেজ বড় লাট লর্ড কার্জন। এ ঘোষণা প্রচারিত হয় ১৯০৫-এ। পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেমন তেমনি এ ঘোষণার বিরুদ্ধেও গোটা হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—এ বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করে সন্ত্রাসবাদে। আর তখন থেকেই রাজনীতিক্ষেত্রে বোমা-পিস্তলের আমদানি। একদিকে স্বদেশী প্রচার অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ—এ দু'মুখী আন্দোলনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে ইংরেজ সরকার তার পূর্ব ঘোষণা বাতিল করতে বাধ্য হয়। এ বাতিল ঘোষিত হয় ছ' বছর পরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে, পরিত্যক্ত হয় পূর্ব বাংলা আসামকে নিয়ে স্বতন্ত্র নতুন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা—মুসলমানদের মনে ধরতে গেলে তখন থেকেই রাজনৈতিক সচেতনতার শুরু। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হিন্দু-নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে কোন কোন মুসলমান নেতাও যে সহযোগিতা করেননি বা তাতে অংশ নেননি তা নয়। এঁরাও সমাজহিতৈষী আর মুসলমান সমাজের স্বার্থ সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন। তাঁরা হয়তো সেদিন আন্তরিকতার সঙ্গেই বিশ্বাস করতেন বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে বাংলার মুসলমান দ্বিধা-খণ্ডিত হয়ে পড়বে—ফলে সমাজ হয়ে পড়বে দুর্বল। এঁরাও সমাজহিতৈষী ও সমাজদরদি ছিলেন— দেশ আর সমাজ দুইকেই এঁরা ভালবাসতেন আর চেয়েছিলেন দুয়েরই সেবা করতে। এঁদের মধ্যে কুমিল্লার ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, বর্ধমানের মৌলবী আবুল কাসেম ও ময়মনসিংহের আবদুল হালিম গজনভীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সত্য সত্যই সমাজপ্রেমিক ছিলেন; খেদমত করেছেন সমাজের নিজ নিজ সাধ্যানুসারে আর সে যুগের প্রয়োজন আর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

পরবর্তী পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যেমন তেমনি সেই ১৯০৫/৬-এর স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও মুসলমান নেতারা দু'শ্রেণীতে ছিলেন বিভক্ত। এক শ্রেণী দেশের স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং সেই সঙ্গে চাইতেন স্ব-সমাজেরও কল্যাণ। দেশ স্বাধীন হলে মুসলমান সমাজেরও সব অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সহজ হবে এ বিশ্বাসে তাঁরা ছিলেন বিশ্বাসী। অন্য শ্রেণীর নেতারা মনে করতেন মুসলমান সমাজকে আগে শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যেতে হবে, দখল করতে হবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিজেদের ন্যায্য আসন—সর্বক্ষেত্রে অর্জন করতে হবে প্রতিবেশী সমাজের সমকক্ষতা। তার পরেই সর্ব-ভারতীয় স্বাধীনতার কথা।

আবদুর রসুল, আবুল কাসেম, আবদুল হালিম গজনভী আর মুজিবর রহমানেরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অচিরে এঁরা পড়লেন উভয় সংকটে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁদের যে ভূমিকা তার প্রচার প্রচারণার কোন অসুবিধা নেই বটে

কিন্তু স্ব-সমাজের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অর্থাৎ মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে তাঁদের যা বক্তব্য তা বলার ও সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিধ্বনিত করার কোন মাধ্যমই তখন তাঁদের হাতে ছিল না। একদিকে নবাগত শিক্ষিত মুসলমানদের মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত করে দিতে হবে অন্যদিকে ইংরেজ সরকার আর ইংরেজ রাজ-পুরুষদের কানেও পৌছাতে হবে মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগের কথা— আশা-আকাঙ্ক্ষা আর দাবি-দাওয়াকে ভাষা দিয়ে করে তুলতে হবে পরিচিত। তাঁরা বুঝতে পারলেন সংবাদপত্র ছাড়া এ দ্বৈত-ভূমিকা পালন সম্ভব নয়—আর এ সংবাদপত্রের ভাষা হতে হবে ইংরেজি, তা না হলে ইংরেজের কানে মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগের কথা প্রবেশ করবে না সহজে। আর ক্রমবর্ধমান মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীও এখন পড়তে চায় ইংরেজি সংবাদপত্র—তাদের চাহিদাও মেটাতে হবে, দিতে হবে তাদেরও মনের খোরাক।

এ দ্বৈত ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেদিন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি মুসলমানের প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমানের' পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন আবদুর রসুল, আবুল কাসেম, আবদুল হালিম গজনভী আর মুজিবর রহমান। মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. (এখনকার আই. এ.) পর্যন্ত পড়েছেন—অর্থাভাবে ছেড়ে দিয়েছেন কলেজীয় লেখাপড়া। মাঝে মাঝে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি সম্পাদিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় তখন পত্রাকারে কিছু কিছু লিখতেন তিনি। তাঁর এসব লেখার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আবদুর রসুল, আবুল কাসেমদের। তাঁদের পরিকল্পিত কাগজের জন্য একজন উপযুক্ত কর্ণধার চাই। তাঁদের ধারণা সে দায়িত্বভার গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি যুবক মুজিবর রহমান, ইতিমধ্যে যাঁর ঝোঁক দেখা গেছে সাংবাদিকতার দিকে। আবদুর রসুল কলকাতা হাইকোর্টের কৃতী ব্যারিস্টার, আবুল কাসেম সাহেব রাজনীতিবিদ, গজনভী সাহেব আয়াসী জমিদার, রাজনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক-বর্জিত নন—এঁরা অর্থ আর প্রভাব দিয়ে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু কাগজের ব্যবহারিক আর বৈষয়িক দিক দেখার সময় কোথায় এঁদের? মুসলমান সমাজের মুখপত্র হিসেবে 'The Mussalman' নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিক বের করার মূল পরিকল্পনা আর সংকল্প এঁদের। প্রথম দিকে এর আর্থিক ঝুঁকিও নিয়েছেন এঁরাই কিন্তু একে বাস্তবায়িত করে টিকিয়ে রাখার দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়েছিলেন মুজিবর রহমানের ওপর।

'মুসলমানে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো ৬ ডিসেম্বর ১৯০৬। সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হলো আবুল কাসেম সাহেবের আর ম্যানেজার হিসেবে মুজিবর রহমানের, কিন্তু মাস দেড়েক কাগজ প্রকাশিত হওয়ার পর আবুল কাসেম সাহেব অসুস্থ হয়ে বর্ধমান চলে গেলেন। দীর্ঘকাল আর ফিরলেনই না। সুস্থ হওয়ার পর ডুবে গেলেন নিজের রাজনীতি সংক্রান্ত কাজকর্মে। অগত্যা এবার সম্পাদকের দায়িত্বও এসে পড়ল মুজিবর রহমানের ওপর—এখন থেকে তিনি হলেন একাধারে সম্পাদক আর ম্যানেজার। তার ওপর তাঁর নিজের একটা স্টেশনারি দোকান ছিল— সেটারও করতে হতো তাঁকে দেখাশুনা।

সে যুগের তুলনায় 'মুসলমানে' প্রকাশিত মতামত ছিল প্রগতিশীল—সূচনায় ইংগিত করেছি পরিচালকরা সবাই ছিলেন মোটামুটি 'জাতীয়তাবাদী' তাই স্বভাবতই এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতো কাগজে। ফলে সমাজের একটা বড় অংশ এর বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো

অনেকে প্রকাশ্যে একে হিন্দু কাগজ বা হিন্দু সমর্থিত কাগজ বলে নিন্দা করতেও কসুর করল না। তদুপরি কাগজের নাম 'মুসলমান', তাই অন্য সমাজের লোকে এ কাগজ পড়ার কথা নয়, মুসলমান সমাজেও তখন ইংরেজি শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য—তার সঙ্গে রয়েছে সমাজের এক বড় অংশের বিরোধিতা, এ অবস্থায় কাগজের প্রচার তেমন আশানুরূপ না হওয়ারই কথা।

আবুল কাসেম সাহেব চলে গেছেন, কাগজের সঙ্গে তেমন সম্পর্কও তিনি আর রাখেননি। এখন একমাত্র ভরসা আবদুর রসুল আর আবদুল হালিম গজনভী—এঁরাই বহন করতে লাগলেন কাগজের কিছু কিছু আর্থিক দায়িত্ব। গজনভী সাহেব কয়েক দফায় সাতশ' টাকা চাঁদাও দিয়েছেন। এমনকি ছাপাখানার প্রাপ্য শোধের দায়িত্বও তিনি করেছিলেন গ্রহণ; আর পত্রিকার অফিসেরও জায়গা দিয়েছিলেন নিজের বাসায়। আবদুর রসুল সাহেব সম্পাদকীয়টা মাঝে মাঝে দেখে দিতেন—স্বদেশী আন্দোলনের ফলে তখন প্রেস-আইনের খুব কড়াকড়ি, তাঁর সম্পাদকীয় দেখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আইনের দিকটা কোথাও লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেটাই দেখা। মতামত নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই ছিল না, কারণ তিনি আর মুজিবর রহমান ছিলেন প্রায় সমমতাবলম্বী।

কাগজের আয়ু ছ'মাস কি সাত মাসে পৌঁছতেই দেখা দিল বিপদ। আবদুল হালিম গজনভী সাহেব হঠাৎ কাগজের সঙ্গে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে বসলেন। এ সম্পর্কচ্ছেদ মানে ছাপাখানার দেনা-পাওনা আর অফিসের দায়িত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সে দায়িত্ব একা বহনের শক্তি মুজিবর রহমানের ছিল না। তাই তিনি রসুল সাহেবের সহায়তা কামনা করলেন। দেশ-প্রাণ রসুল মুজিবর রহমানের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর সাহায্যের হাত—আর্থিক দায়িত্বের অংশগ্রহণে শুধু নয়, তাঁর বাসায় পত্রিকা-অফিসের জন্য জায়গা দিতেও হলেন রাজি। কাগজের খরচ খুব সামান্যই, কারণ অফিস-ভাড়া লাগত না, সম্পাদককেও দিতে হতো না কোন মাইনে—একজন মাত্র কেরানি, তাকে দিতে হতো মাসে মাত্র কুড়িটি টাকা। খরচের মধ্যে ছিল কাগজ-ছাপাখানা আর ডাক টিকিটের দাম। তবুও কাগজের চাঁদা থেকে এ খরচটুকুও উঠত না। এক বছরেই কাগজের দেনা দাঁড়াল সাতশ'-এর তিন ভাগের দু'ভাগই দিয়ে দিলেন এ. রসুল (এ নামেই তিনি যখন ছিলেন পরিচিত) নিজের পকেট থেকে। বাকিটা জোগাড় করার জন্যে তাঁকেই করতে হলো ছুটাছুটি। বন্ধু, হিতৈষী আর প্রতিষ্ঠাতারা সবাই মিলে এ এক বছরে 'দি মুসলমানে'র জন্য মাত্র চৌদ্দশ' টাকাই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। কাজেই গোড়া থেকেই 'মুসলমান'কে সংগ্রাম করে করেই চলতে হয়েছে—এ অভাব কোনদিনই ঘুচেনি।

কাগজের আর্থিক সংকট আর মুজিবর রহমানের সংগ্রাম আর দুশ্চিন্তা দেখে রসুল সাহেব খুবই যেন বিব্রত বোধ করছিলেন। হঠাৎ একদিন, তখন কাগজের আয়ু এক বছর পার হয়ে গেছে—তিনি মুজিবর রহমানের প্রতি [illegible] সহানুভূতি প্রকাশ করে কাগজ গুটিয়ে ফেলার দিলেন প্রস্তাব। মুজিবর রহমান কোন উত্তর দিলেন না তখন—চুপ করে থেকে কাগজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। [illegible] থেকে কাগজের আর্থিক অনটনের [illegible] মুজিবর রহমান আর [illegible] পাছে তিনি আরো বেশি হতাশ হয়ে পড়েন আর জেদ করে কাগজ [illegible] করে দেওয়ার [illegible]। তা সত্ত্বেও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর

মৃত্যুকাল পর্যন্ত রসুল 'মুসলমান'কে যথাসাধ্য সাহায্য করে এসেছেন। মুজিবর রহমানও সব সময় চাইতেন ও গ্রহণ করতেন তাঁর পরামর্শ।

১৯০৯-এর মার্চ মাসে মিসেস্ রসুল কলকাতার ৭১ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে একটি ছাপাখানা খুলেছিলেন—এবার থেকে 'মুসলমান' ঐ প্রেসে ছাপা হতে লাগল খুব কম খরচে আর 'মুসলমানে'র অফিসও স্থানান্তরিত হলো ওখানে। মুজিবর রহমানের সব সময়টা কাগজের পেছনেই ব্যয় হতো—নিজের স্টেশনারি দোকানটা দেখাশুনার তিনি সময়ই পেতেন না মোটেও। ফলে দোকানটি লাল বাতি জ্বালাল। 'দি মুসলমানে'র সঙ্গে সঙ্গে প্রেসটারও দেখাশোনা করতে হতো তাঁকে আর এ সময় থাকতেনও তিনি ওখানেই। কাগজের তখন তৃতীয় বৎসর চলছে—গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে হাজার কি তার কিছু ওপরে। এ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে প্রেস আর কাগজের অফিস স্থানান্তরিত হলো ৪ নম্বর ইলিয়ট লেনে। এবার চেষ্টা করা হলো প্রেসটাকে কিছুটা লাভজনক করে তুলতে—মুজিবর রহমানের পরামর্শে প্রেসের জন্য আলাদা একজন ম্যানেজারও রাখা হলো। কিন্তু দেখা গেলো এ ব্যাপারে লোকটার কোন যোগ্যতাই নেই—একে একে আরো দু'তিন জনকে নিয়োগ করে দেখা গেল কিন্তু কেউই কাজে কোন অগ্রগতি- দেখাতে পারল না। ফলে স্বত্বাধিকারিনী প্রেস থেকে পাচ্ছিলেন না কোন প্রতিদানই. এ যাবৎ পানওনি। সামান্য যা কিছু লভ্যাংশ তা প্রেসের সরঞ্জাম কিনতেই হয়ে যেত খতম। ১৯১৩'র নভেম্বর থেকে কাগজের বার্ষিক চাঁদা চার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ টাকা করা হলো। ফলে গ্রাহক সংখ্যা ১৭০০ থেকে নেমে ১২০০য় এসে দাঁড়াল: 'মুসলমানে'র আর্থিক অবস্থা কোন সময়ই ভালো ছিল না. তবুও গ্রাহক সংখ্যা কমাতে পত্রিকার বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। বর্ধিত এক টাকায় ক্ষতিটা অনেকখানি পুষিয়ে গিয়েছিলো। আর বিজ্ঞাপন থেকেও পাওয়া যেতে লাগল মাসে গড়পড়তা দু'শ টাকা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কাগজের এই ছিল আর্থিক অবস্থা।

বল্কান যুদ্ধের সময় (১৯১২-১৩) বুলগেরিয়ানেরা মেসিডোনিয়ায় যে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল তার বর্ণনা সম্বলিত—"মেসিডোনিয়ায় এসে আমাদের সাহায্য করুন' এ নামের একটি প্রচার পুস্তিকা তখন প্রকাশিত হয়েছিল কনস্টান্টিনোপোল থেকে। এটি 'দি মুসলমানে' পুনর্মুদ্রিত হলো কয়েক কিস্তিতে। ফলে ১৯১৩-র ২৩শে নভেম্বর সরকারি আদেশে পুলিশ 'দি মুসলমান' অফিসে হানা দিয়ে খানাতল্লাসি চালাল আর কাগজের সাত সাতটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে যা যা কপি পেল সব নিয়ে গেল।

১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই সর্বত্র দেখা দিল মন্দা—অনেকেই বন্ধ করল কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া কিন্তু কাগজের প্রচার সংখ্যা পেল বৃদ্ধি। যুদ্ধের খবর জানার জন্য মানুষ তখন উদগ্রীব।

এ সময় অর্থাৎ ১৯১৪-এর ১৩ নভেম্বর 'দি মুসলমানে'—'ইংলেন্ড তুরস্ক আর ভারতীয় মুসলমান'-এ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার ফলে বাংলাদেশের তদানীন্তন চিফ সেক্রেটারি জে. জি. কামিং সম্পাদককে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লেখেন :

Sir. I am directed to inform you that the attention of the Government of Bengal has been drawn to the article entitled

England, Turkey and Indian Mussalmans' which appeared in the Mussalman of the 13th November 1914.

Government consider that the article is of an objectionalble nature; and I am to warn you against publishing similar writing in future." তুরস্ক-সম্রাট ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরপরই উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল আর তাতে অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার পর মন্তব্য করা হয়েছিল—যেহেতু তুরস্ক মুসলমান জগতের খলিফা অর্থাৎ ধর্মীয় নেতা তার প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের সহানুভূতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই মিত্রশক্তির উচিত ভারতীয় মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতির ওপর যা কিছু আঘাত হানতে পারে তেমন কোন অন্যায়-অবিচার তুরস্কের প্রতি না করা ইত্যাদি।

যুদ্ধের আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মূল্যও বেড়ে চল্লো। ১৯১৬-তে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে 'মুসলমানের' পক্ষে দেশী কাগজ ব্যবহার করা আর সম্ভবই হলো না। ১৯১৭-এর জানুয়ারি থেকে 'মুসলমান' ছাপা হতে লাগল অমসৃণ বিলাতি কাগজে—তারও দাম কম নয়। তবুও আর্থিক অবস্থা তখন তেমন হতাশ হয়ে পড়ার মতো ছিল না।

১৯১৭-এর ৩১ আগস্ট কাগজ আর কাগজের পরিচালক মুজিবর রহমানের জন্য এক দুর্দিন। ঐ দিন মারা গেলেন মি. এ. রসুল। মুজিবর রহমানের কাছে তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু আর দার্শনিক—বিশেষ করে কাগজ পরিচালনা ব্যাপারে। মুজিবর রহমানের বন্ধু সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না; যে কয়জন ছিলেন তার মধ্যে রসুল ছিলেন একজন যাঁর কাছে বিপদের কালে শুধু যে পরামর্শ পেতেন তা নয় অভাবের দিনে পেতেন ধারকর্জও। কাজেই রসুলের মৃত্যুতে কাগজ আর মুজিবর রহমানের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

প্রেস থেকে কোন মুনাফাই তিনি পাচ্ছেন না দেখে এবার মিসেস রসুল প্রেসটি বিক্রি করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মুজিবর রহমানকে অনুরোধ করলেন সম্ভাব্য ক্রেতা খোঁজ করতে। ১৯১৮-এর অক্টোবর কি নভেম্বরে মেসার্স করিম বক্স ব্রাদার্সের জনাব রেজাউর রহমান খাঁন মিসেস রসুলের এক চিঠি নিয়ে এসে মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চিঠিতে মিসেস রসুল লিখেছেন, প্রেসটা তিনি করিম বক্স ব্রাদার্সের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। অতএব প্রেস আর আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম যেন ওঁদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। রেজাউর রহমান খাঁন অবশ্য মুজিবর রহমানকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন যতদিন 'দি মুসলমানের' মুদ্রণ ব্যাপারে অন্য কোন সুবন্দোবস্ত না হচ্ছে ততদিন তাঁরা প্রেসটি স্থানান্তর করবেন না।

এ প্রেসটির নাম ছিল 'The New Age Press' আর এতে একটি ডাবল ক্রাউন মুদ্রণযন্ত্র, একটি ডাবল ক্রাউন হ্যান্ড মেশিন, প্রুফ ছাপ দেওয়া যন্ত্র আর ইংরাজি, বাংলা, উর্দু নানারকম টাইপ আর প্রয়োজনীয় কেস্ স্টেন্ড ইত্যাদি ছিল। এ সবই করিম বক্স ব্রাদার্স কিনে নিয়েছে মাত্র আড়াই হাজার টাকায়। সে যুগের তুলনায়ও বলতে হয় এ অত্যন্ত সস্তা। মুজিবর রহমান সাহেব করিম বক্স ব্রাদার্সের মালিককে অনুরোধ করলেন—পত্রিকাটির খাতিরে একটা যুক্তিসঙ্গত মূল্য নিয়ে প্রয়োজনীয় টাইপ ইত্যাদিসহ যদি একটা মেশিন তাঁকে দেন তাহলে তিনি খুবই উপকৃত হবেন। মাত্র আটশ'

টাকায় হস্তচালিত মেশিনটি, পত্রিকা মুদ্রণের উপযোগী টাইপসহ তাঁকে দিতে করিম বখ্‌শ ব্রাদার্স সম্মত হলেন। এও খুব সস্তা বলতে হবে। এভাবে যত ছোটই হোক না কেন 'দি মুসলমানে'র নিজস্ব একটা প্রেস হলো বটে কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্যদিক থেকে। এখন থেকে একটা নতুন নামে নতুন মালিকানায় একটা নতুন প্রেস হিসাবেই চালু হবে—অতএব ১৯১০-এর প্রেস আইন অনুসারে মুজিবর রহমানকে দু'হাজার টাকা সিকিউরিটি জমা দিয়ে 'প্রেস রক্ষকের' অনুমতি নিতে হবে। তাছাড়া প্রেস চালানো যাবে না।

'দি মুসলমান' আর তার সম্পাদকের এ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। তাই মুজিবর রহমান সংকল্প করলেন একটা 'প্রেস তহবিল' খোলার আর গ্রাহকদের কাছে আবেদন করলেন প্রত্যেকে যেন তাঁকে কমপক্ষে পাঁচ টাকা করে কর্জে হাসনা দেন। কিছুটা সাড়া পাওয়া গেল বটে কিন্তু তা আশানুরূপ নয়। তার পর তিনি গ্রাহকদের জানালেন প্রত্যেককে পাঁচ টাকার এক একটা ভি.পি.পি. তিনি পাঠাবেন, তাঁরা যেন দয়া করে তা গ্রহণ করেন। ভি.পি.পি. পাঠানো হলো। এতে সাড়া যা পাওয়া গেল তা একেবারে নিরাশ হওয়ার মতো নয়। এভাবে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হলো। এর থেকে দু'হাজার টাকা সিকিউরিটি জমা দিয়ে বাকি টাকা দিয়ে কেনা হলো প্রেস আর প্রেসের সরঞ্জাম। বলাবাহুল্য অনেক দাতা জানিয়েছিলেন টাকা তাঁরা ফেরত চান না—'দি মুসলমানে'র প্রতি ওটা তাঁদের এককালীন দান। অন্যদের অবশ্য ক্রমান্বয়ে টাকা শোধ করা হয়েছিল। এভাবে প্রায় হাজার টাকা শোধ করেছিলেন মুজিবর রহমান। এর মধ্যে কেউ কেউ ঠিকানা না জানিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। কেউ কেউ বা গ্রাহক হওয়াই দিয়েছেন ছেড়ে— মুজিবর রহমান কাগজের মারফৎ জানিয়ে দিলেন খোঁজ পাওয়া গেলে এঁদের দেনাও তিনি শোধ করে দেবেন।

১৯১৮ সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় মুসলমানদের একটা সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। হঠাৎ গভর্নমেন্ট তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ফলে ক্রুদ্ধ জনতা শুরু করল গোলমাল— সে গোলমাল দমন করতে গিয়ে পুলিশ চালাল বেপরওয়া গুলি। 'দি মুসলমানে'র ওপর আরোপিত হলো 'সেন্সার'। ১৪ সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত নিষেধাজ্ঞা বাংলা সরকার পক্ষ থেকে জারি করা হলো মুজিবর রহমানের ওপর : Whereas in the opinion of the Governor of Bengal in Council there are reasonable grounds for believing that Moulvi Mujibur Rahman, editor of the Mussalman, an English weekly newspaper in Calcutta has acted, is acting and is about to act in a manner prejudicial to the public safety, the Governor of Bengal in Council, in exercise of the powers conferred by Rule 3 (c) of Defence of India (Consolidation) Rules, 1915, is pleased hereby to direct that the said Moulvi Mujibur Rahman shall abstain from publishing any part of the said paper without first submitting manuscript of the same to the Special Mohammadan Press Censor, Bengal, for censorship.

By order of the Governor of Bengal in Council.

J. H. Kerr

Chief Secretary to the Government of Bengal.

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে মুজিবর রহমান লেখার পাণ্ডুলিপি সেন্সার করার জন্য সরকারে দাখিল না করে কাগজের প্রকাশনাই করে দিলেন বন্ধ আর শুরু করলেন সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে লেখালেখি। এর ফলে, প্রায় মাসখানেক পরে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল। পাঁচ সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর ১৯১৮-এর ২৫ অক্টোবর থেকে 'দি মুসলমান' আবার প্রকাশিত হতে লাগল। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে সরকার সম্পাদককে একথাও জানিয়ে দিলেন: It must be understood that the orders will be reimposed should the paper again act in a manner prejudicial to public safety.

এ চিঠি পেয়েই মুজিবর রহমান চিফ সেক্রেটারিকে লিখে পাঠান : 'As I wish to have a clear idea of what Government means, I request the favour of your kindly advising me as to what kind of act constitutes the condition of things referred to in the Government orders and which renders pre-censorhip of my paper necessary.'

বলাবাহুল্য সরকার বা চিফ সেক্রেটারি এ চিঠির কোন উত্তরই দেয়নি।

চার বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ১৯১৮-এর শেষের দিকে শেষ হলো—পরাজিত হলো জার্মেনি আর তার মিত্রপক্ষ। জয় হলো ইংরেজ আর তার মিত্রদের। ১৯১৯-এর গোড়াতেই শান্তি আর সন্ধির শর্তাবলী রচিত হবে। জার্মেনির সহকারী শক্তি হিসেবে তুরস্কেরও ভাগ্য এ সন্ধিপত্রেই হবে নির্ধারিত। এ সময় একদিন চিফ সেক্রেটারি মুজিবর রহমানকে ডেকে পাঠালেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময় চিফ সেক্রেটারির ঘরে গিয়ে মুজিবর রহমান দেখতে পেলেন চিফ সেক্রেটারির পাশে বসে আছেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার স্যার জর্জ ক্লার্ক (Sir George Clarke)। চিফ সেক্রেটারি মুজিবর রহমানকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন—তুরস্ক যখন পরাজিতের দলে তখন সন্ধি-শর্ত কখনো তুরস্কের অনুকূল হতে পারে না। আর তাঁকে অনুরোধ করলেন—সন্ধিপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি যেন তাঁর পত্রিকায় এ নিয়ে কোন বিরূপ সমালোচনা না করেন। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিলেন করলে পরিণতি বিশেষ ভালো হবে না। মুজিবর রহমান জানালেন তিনি নিজেও চান শান্তি আর শৃঙ্খলা রক্ষিত হোক এবং সে উদ্দেশ্যে লেখনীও চালনা করবেন তবে তা করবেন তাঁর ধর্ম আর সমাজের প্রতি তাঁর যে কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে। এতে পুলিশ কমিশনার বিরক্ত হয়ে বললেন : আপনি এ সব কি বলছেন? মুজিবর রহমান তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। ব্যাপারটি চিফ সেক্রেটারি আর গড়াতে দিলেন না বেশি দূর। আলাপ-আলোচনা ঐদিন ওখানেই হলো খতম।

সন্ধিপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর তুরস্ক-সমস্যা নিয়ে 'দি মুসলমানে' যথেষ্ট তীব্র আলোচনা হয়েছে। মুজিবর রহমান ভয় পাওয়ার লোক ছিলেন না। ইসলাম আর মুসলমানের স্বার্থের ব্যাপারে তিনি কোন দিন আপোষ করে চলেননি।

১৯২০-এর জুলাই মাসে 'দি মুসলমান' অফিস ৪ নম্বর ইলিয়ট লেন থেকে সরিয়ে ১১/৫, কড়েয়া বাজার রোডে নিয়ে আসা হয়। ১৯২১-এর ৯ ডিসেম্বর আরো অনেকের সাথে মুজিবর রহমানকেও গ্রেপ্তার করা হলো। রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনিও এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বলাবাহুল্য তখন অসহযোগ-খেলাফৎ আন্দোলনের ভরা জোয়ার, চারদিকে পড়ে গেছে গ্রেপ্তারের ধুম।

এবার 'দি মুসলমানে'র দায়িত্ব গিয়ে পড়লো তাঁর চাচাতো ভাই তরুণ রফিকর রহমানের কাঁধে। রফিকর রহমান মাত্র আগের বছর এম. এ. পাস করেছেন, পড়ছিলেন তখন আইন; কিন্তু অসহযোগের ডাকে আইন পড়া ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন 'দি মুসলমানে'র ম্যানেজারের দায়িত্ব। অগ্রজ মুজিবর রহমানকে যেমন কাগজের সূচনার যুগে— আবুল কাসেম সাহেব চলে যাওয়ার পর একই সঙ্গে ম্যানেজার আর সম্পাদকের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল তেমনি এবার মুজিবর রহমানের কারাদণ্ডের ফলে অনুজ রফিকর রহমানকেও একই সঙ্গে ঐ দুই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো।

এক বছর বাইশ দিন পরে মুজিবর রহমান জেল থেকে ছাড়া পেলেন—৩১ ডিসেম্বর, ১৯২২। অসহযোগ আর খেলাফত আন্দোলনের তীব্রতার সময় অর্থাৎ ১৯২০ থেকে পত্রিকার প্রচার বেড়ে ১৯০০তে গিয়ে পৌঁছেছিল। জেল থেকে ফিরে এসে দেখলেন গ্রাহক সংখ্যা কমে মাত্র নয় শতে এসে ঠেকেছে। তিনি ভার নেওয়ার পর আবার তা বাড়তে শুরু করল।

১৯২৩-এর এপ্রিলের শেষের দিকে 'দি মুসলমান'কে এক লাখ টাকার পুঁজিতে একটা লিমিটেড্ কোম্পানিতে পরিণত করা হলো। এ করার প্রধান উদ্দেশ্য পত্রিকাটির একটি সপ্তাহে তিনবার সংস্করণ প্রকাশ করা। এখন থেকে প্রেস আর 'দি মুসলমান' হলো কোম্পানির সম্পত্তি— প্রেসের দাম আর পত্রিকার সুনামের মূল্য হিসেবে মুজিবর রহমানকে দেওয়া হলো কিছু অংশ। কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হলো যত দিন তিনি স্বেচ্ছায় ছেড়ে না দেন ততদিন তিনিই সম্পাদক থাকবেন, পত্রিকার নীতি নিয়ন্ত্রণেরও অধিকার থাকবে তাঁর, কোম্পানি যদি অন্য কোন পত্রিকা বের করে তারও সম্পাদকীয় কর্তৃত্ব থাকবে তাঁর হাতে। অধিকন্তু তিনি থাকবেন কোম্পানির স্থায়ী ডিরেক্টারদের একজন। সম্পাদক হিসেবে তিনি কি মাইনে পাবেন বা তাঁকে কত মাইনে দিতে হবে সে সম্বন্ধে আগে কোন আলাপ-আলোচনাই হয়নি। কোম্পানি গঠিত হওয়ার পর তাঁর জন্য ডিরেক্টর বোর্ড যৎসামান্য বেতন ধার্য করেছিল।

সংবাদপত্র আর সাংবাদিকতার অনুকূল পরিবেশ তখনো মুসলমান সমাজে গড়ে ওঠেনি—কাজেই এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার বিক্রি আশানুরূপ হওয়ার কথা নয়। ফলে এক বছরে শেয়ার যা বিক্রি হলো তার সংখ্যা অতি নগণ্য। ১৯২৪-এর গ্রীষ্মকালে মুজিবর রহমান কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর কুমিল্লার আশরাফউদ্দীন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম আর ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা জেলা) ঘুরে এলেন। এ দুই জেলায় হাজার দশেক টাকার শেয়ার বিক্রি হলো—নগদ পাওয়া গেল হাজার দুই। ইতিপূর্বে যে হ্যান্ড মেশিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল জার্মানি থেকে সে মেশিনও এসে পড়েছে তখন—আংশিক মূল্য পরিশোধ করে সে মাসেই তার ডেলিভারি নেওয়া হলো। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে

পরিকল্পিত সপ্তাহে তিন বার সংস্করণ তখনও বের করা সম্ভব হয়নি।

এর প্রথম সংখ্যা বের হলো ১৯২৫-এর ২০ জানুয়ারি। বাংলা বিহার আর আসামের সিবির লিস্ট দেখে সব মুসলমান অফিসারের নামেই এর প্রথম সংখ্যা পাঠানো হয়েছিল। সাপ্তাহিক সংস্করণের গ্রাহকদের থেকেও বাছাই করা কারো কারো কাছে এ সংখ্যাটা পাঠানো হয়েছিল। সাপ্তাহিকের গ্রাহকদের প্রায় দেড়শ'জন নিজেদের নাম সপ্তাহে তিনবার সংস্করণে পাল্টিয়ে নিয়েছিল। যাঁদের কাছে এ নতুন সংস্করণের প্রথম সংখ্যা পাঠানো হয়েছিল তাঁদের থেকেও কেউ কেউ হয়েছিলেন গ্রাহক। তবে আইনজীবীদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। সে তুলনায় সরকারি কর্মচারীদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে অনেক বেশি সাড়া। তবুও বলতে হবে সমাজের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া গেল তা তেমন আশানুরূপ ছিল না। গ্রাহক সংখ্যা বাড়ছিল খুব ধীরে ধীরে। সাপ্তাহিক সংস্করণের ছাপা আর অঙ্গসজ্জা কিছুটা ভালো করায় এখন থেকে ঐ সংস্করণের গ্রাহক সংখ্যা বেশ বেড়ে উঠল। যদিও এর মধ্যে প্রায় দেড়শ'জন গ্রাহক সাপ্তাহিক ছেড়ে সপ্তাহে তিন বার সংস্করণের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন তবুও মোটের ওপর সাপ্তাহিকের গ্রাহক-সংখ্যার বৃদ্ধি সন্তোষজনক বলা যায়।

তা সত্ত্বেও পত্রিকার আর্থিক সংকট লেগেই রইল। ১৯১৫-এর শেষের দিকে অবস্থা প্রায় পৌঁছল চরমে। ১৯১৬-এর ফেব্রুয়ারি থেকে অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গেল বটে কিন্তু আর্থিক সংকট রয়েই গেল। যে সমাজের সেবার জন্য এ পত্রিকার আবির্ভাব সে সমাজ যদি পত্রিকাখানির দিকে একটু ফিরে তাকাত তাহলে অচিরে এর আর্থিক দুর্গতি কেটে যেতই। সামান্য আর কয়েক শ' গ্রাহক হলেই সপ্তাহে তিন বার সংস্করণ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারতো—হতে পারত স্বাবলম্বী। সাপ্তাহিকটার গোড়ার দিকে অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

প্রথম বছর সম্পাদক তো কোন মাইনেই নেননি। পরে আরো প্রায় দু'বছর ধরে সম্পাদকের জন্য পত্রিকাটিকে মাসে কুড়ি টাকার বেশি খরচ করতে হয়নি। এর পরে গ্রাহক সংখ্যা যখন কিছুটা বৃদ্ধি পেল তখন সম্পাদক নিজের খরচের জন্য কোন রকমে টাকা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত নিতে সক্ষম হতেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই চল্লো এ অবস্থা। তারপর তো বেড়ে চল্লো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য। তবে কাগজের অবস্থা কিছুটা ভালো হয়ে উঠল বলে এখন সম্পাদক একটু বেশি খরচ করার মতো টাকা পত্রিকা থেকে নিতে সক্ষম হলেন। সম্পাদক ছাড়া আর দু'জন মাত্র কেরাণী ছিলেন তাঁদের মাইনে ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশ। ১৯১৮-য় অন্যতম কেরাণী আজিজুর রহমান যখন চাকুরি ছেড়ে চলে গেলেন তখন সে জায়গায় আর কাকেও নেওয়া হলো না। রফিকর রহমান তখন এম. এ. আর ল'য়ের ছাত্র। এবার তিনি এসে বড় ভাই মুজিবর রহমানকে সাহায্য করতে লাগলেন। ১৯২১শে মুজিবর রহমান জেলে যাওয়ার পর অবশিষ্ট কেরাণীটাকেও বিদায় দিয়ে এখন সব কাজ রফিকর রহমান চালাতে লাগলেন একাই। বলাবাহুল্য এ সবই করা হলো খরচ বাঁচানোর জন্য।

সপ্তাহে তিনবার সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয়, স্বভাবতই কর্মী-সংখ্যা কিছু বাড়াতেই হলো কিন্তু তাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলে মুজিবর রহমানের ইচ্ছা আর

আশার অনুরূপ করে কাগজ তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না। সারাজীবন এ এক বড় দুঃখ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

অনেক সময় তাঁকে কাগজের হিতৈষী আর তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে হাওলাত নিয়ে কাগজের দৈনন্দিন প্রয়োজন, যেমন ডাকটিকেট, কাগজ কেনা ইত্যাদি মিটাতে হতো। এ সীমিত সংখ্যক বন্ধুদের মধ্যে মি. আর মিসেস্ রসুলের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। মাঝে মাঝে এ দেনা শোধ করতে বেশ দেরি হয়ে যেত। সাধারণত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে কাগজের আর্থিক সচ্ছলতা কিছুটা যেন বৃদ্ধি পেত—আর দেনাটাও শোধ করা হতো তখনই। একবার তো প্রায় এগারো শ' টাকায় [illegible] দাঁড়াল এ দেনার অঙ্ক। যদিও চোখের সামনে এ দেনা শোধের কোন উপায় দে[illegible] না পেয়ে মুজিবর রহমান তখন হয়ে পড়েছিলেন কিছুটা মন মরা তবুও আল্লার ওপর বিশ্বাস তিনি কখনো হারাননি। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন আল্লাহ্ উপায় একটা করে দিবেনই। সত্যসত্যই উপায় একটা যেন আকাশ থেকেই নেমে এলো। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে 'দি মুসলমান' পেয়ে গেল এক বড় রকমের বিজ্ঞাপন আর তা চল্লো একটানা দু'মাস, যার বিল দাঁড়াল ১১২৫ টাকা। যথা সময় বিলের টাকাও এসে হাজির—ফলে কর্জ শোধ করে উদ্বৃত্ত রইল আরো পঁচিশ টাকা। এ রকম ঘটনা 'দি মুসলমানে'র জীবনে অনেকবার ঘটেছে।

'দি মুসলমানে'র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মোটামুটি জাতীয়তাবাদী। এ ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে। যদিও 'দি মুসলমান' আগাগোড়া সমর্থন করে এসেছে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তবুও এর প্রচার মুসলমান সমাজেই ছিল সীমাবদ্ধ। প্রথম আর দ্বিতীয় বছরেও হিন্দু গ্রাহকের সংখ্যা চল্লিশের বেশি কখনো ওঠেনি। ক্রমে ক্রমে তাও কমে এলো। সূচনা থেকেই স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আশুতোষ মুখার্জি আর রাজা বনবিহারী কাপুর 'দি মুসলমানে'র গ্রাহক ছিলেন—এঁদের মৃত্যুর পর হিন্দু গ্রাহক সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় চার কি পাঁচে দাঁড়িয়েছিল। সপ্তাহে তিনবার সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক খ্যাতনামা হিন্দুর নামে পত্রিকা পাঠানো হয়েছিল—এদের থেকে মাত্র দু'জন কি তিনজন গ্রাহক হয়েছিলেন। কাজেই বৃহত্তর হিন্দু সমাজের কাছ থেকে এ পত্রিকাখানি—পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী হওয়া সত্ত্বেও কোন সাহায্য বা সহানুভূতি পায়নি। সপ্তাহে তিনবার সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর স্বভাবতই কাগজের ব্যয়ভারও গেল বেড়ে। তার ওপর ইংরেজি না জানা অগণিত পাঠকের কাছে দুনিয়ার খবর আর সমাজের আদর্শ আর লক্ষ্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য এ সময় 'খাদেম' নামে এক বাংলা সাপ্তাহিকও প্রকাশ করলেন মুজিবর রহমান। একসঙ্গে সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান', সাপ্তাহিক 'খাদেম' আর সপ্তাহে তিন বার 'দি মুসলমান'—এ তিনটা কাগজের সম্পাদকীয় দায়িত্ব মুজিবর রহমানকে একাই বহন করতে হয়েছিল। এ বিরাট দায়িত্ব পালনে তিনি সহকারী হিসেবে পেয়েছিলেন রফিকর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দিন আর আবু লোহানীকে। এ কয়জন মাত্র সহকর্মী নিয়ে তিন তিনটা কাগজ চালানো যে কি কঠিন ব্যাপার—সংবাদপত্র পরিচালনা সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন। শুধু প্রুফ দেখার জন্যই তো কমপক্ষে তিন-চার জন লোকের দরকার। তদুপরি রফিকর রহমান

ছিলেন 'দি মুসলমান' আর 'খাদেমে'র ম্যানেজার এবং The Mussalman Publishing কোম্পানির সেক্রেটারিও—কাজেই সম্পাদকীয় কাজে সহায়তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না।

সম্পাদক আর হিতৈষীদের ইচ্ছা ছিল সপ্তাহে তিনবার সংস্করণের প্রচার বৃদ্ধি করা—এ সংস্করণের প্রচার বৃদ্ধি পেলেই তখন একে পুরোপুরি দৈনিকে পরিণত করবেন এ ছিল তাঁদের দূর পরিকল্পনা। প্রচার বৃদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সব দিক দিয়ে কাগজের মান উন্নয়ন আর তা করার জন্য চাই অর্থ। প্রেস যদি বেশি করে বাইরের ফালতু কাজ নিতে পারে তাহলে আয়ের একটা পথ খুলে যায় বটে কিন্তু তা করার জন্যও প্রয়োজন প্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করা—সরঞ্জাম ইত্যাদি বাড়ানো। প্রেস, পত্রিকা সবই এখন মুসলমান পাবলিশিং কোম্পানির সম্পত্তি। কোম্পানির তহবিলে কোন অর্থ নেই; অর্থ সংগ্রহের জন্য দরকার শেয়ার বিক্রি করা। সে চেষ্টাও বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। কাজেই পত্রিকার তথা মুজিবর রহমানের অর্থকৃচ্ছ্রতা জীবনে কোন দিন ঘোচেনি।

নীতি আর আদর্শের দিক দিয়ে মুজিবর রহমান সম্পাদিত পত্রিকা তিনটিরই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জাতীয়তাবাদী, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এ জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ন্যায্য হক আর স্বার্থ রক্ষা। সপ্তাহে তিনবার সংস্করণের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুজিবর রহমান তাঁর পত্রিকার আদর্শ ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে : "এদেশে জাতীয়তার যে চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে জটিল আর বিমিশ্রিত। এ জাতীয়তা এখনো ভ্রূণাবস্থায় অর্থাৎ গঠনের যুগে। সযত্নে লালন করতে হবে একে। 'দি মুসলমান' এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই অবিরাম চেষ্টা করতে থাকবে। কিন্তু মুসলমান সমাজের দাবি-দাওয়া, অধিকার আর স্বার্থ রক্ষার জন্যও আমরা সমভাবে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই চেষ্টা করব—এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকবে সদা-জাগ্রত। এই দুই দাবি বা আদর্শ পরস্পরবিরোধী বলে আমরা মনে করি না। যে জাতীয়তার স্বপ্ন আমাদের মনে জেগেছে নিঃসন্দেহে তা নতুন ও অভিনব। এ জাতীয়তা একরঙ্গা হবে না, হবে বহুরঙ্গা। নানা ধারা এতে মিশে একে শক্ত আর মজবুত করে গড়ে তুলবে—এর সব অংশকে সমভাবে বেড়ে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, তাহলেই এ এমন ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে তা আর কখনো ভাঙবে না, হবে না বিচ্ছিন্ন আর লাভ করবে স্থায়িত্ব। শক্তি আর দুর্বলতায় মিল হয় না, হয় না কোন রকম সহযোগিতাও। শক্তিমানে শক্তিমানেই গড়ে ওঠে সত্যিকার মিল ও ঐক্য। তাই মুসলমান সমাজকেও হতে হবে শক্তিমান, ভারসাম্য ও শৃঙ্খলার অধিকারী—তাহলেই তাদের ভূমিকা হবে যথার্থ ও সত্যিকার আর তাদের অবদান হবে মূল্যবান। যে জাতীয়তাকে আমরা পবিত্র আর মূল্যবান মনে করি সে জাতীয়তার খাতিরেই মুসলমান সমাজের হক, অধিকার আর স্বার্থের প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি আমরা রাখবই—এটি আমাদের এক মহান দায়িত্ব।"

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মুজিবর রহমানের স্বপ্ন সফল হলো। 'দি মুসলমান' এবার পরিণত হলো দৈনিকে। সমাপ্তি ঘটল সপ্তাহে তিন বারের অস্বস্তিকর ভূমিকা। কিন্তু সমাজের অবস্থা এখনো একটা ইংরেজি দৈনিকের ভার বহনের উপযোগী হয়নি। কাজেই অনেক কষ্টে

পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখিতে হয়েছিল। মুজিবর রহমানের মতো চির-কুমার সর্বত্যাগী আদর্শনিষ্ঠ সম্পাদক কাগজটির পেছনে ছিলেন বলেই হয়তো পত্রিকাটির পক্ষে এতদিন অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাতেও যেন কুলোল না—১৯৩৩-এ দৈনিক সংস্করণ বন্ধ হয়ে গেল—দৈনিকের অগ্রদূত সপ্তাহে তিন বার তো আগেই করে দেওয়া হয়েছে বন্ধ। এখন রইল শুধু পুরোনো সাপ্তাহিকটা।

এবার দেখা দিল সম্পাদক আর পত্রিকার জীবনে বৃহত্তম সংকট। কাগজের নীতি আর আদর্শ নিয়ে কোম্পানির ডিরেক্টরদের সঙ্গে—এর মধ্যে অনেকেই নবাগত, শুরু হলো সম্পাদক মুজিবর রহমানের সঙ্গে সংঘর্ষ। নীতি আর আদর্শ নিয়ে মুজিবর রহমান কোন দিন আপোষ করেননি—এবারও করলেন না। জন্মমুহূর্ত থেকে যে পত্রিকাকে তিনি সন্তানের মতো পরম স্নেহে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছেন—যার জন্য জীবনের সব রকম আরাম-আয়াস ত্যাগ করেছেন, শেষ বয়সে এখন নিজের আজীবনের নীতি আর আদর্শের জন্য তিনি তাঁর সে পরমপ্রিয় পত্রিকাখানির সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। 'দি মুসলমান' ছেড়ে এসে এবার 'The Comrade' নাম দিয়ে আর একখানা সাপ্তাহিক বের করলেন কিন্তু অচিরে হঠাৎ আক্রান্ত হলেন পক্ষাঘাত রোগে। ফলে 'কমরেড' বেশিদিন চল্লো না—'দি মুসলমানের'ও সেই একই অবস্থা। সে যুগে মুসলমান সমাজে সংবাদপত্রকে সফল করে তোলার জন্য যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল—সে ত্যাগ ও নিষ্ঠা নিয়ে আর কেউই মুজিবর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হলেন না। এভাবে মুজিবর রহমান ও 'দি মুসলমানে'র সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি সংগ্রামী অধ্যায়েরও সমাপ্তি ঘটল। এ ১৯৩৬-৩৭-এর ঘটনা।

মুজিবর রহমান আরোগ্য লাভ করেননি। ১৯৪০-এর ২৬শে এপ্রিল, ৭১ বছর বয়সে মুসলিম বাংলার এ মহান সাংবাদিকের তিরোধান ঘটে। তাঁর নমাজে জানাজায় ইমামতি করেছিলেন সহকর্মী মওলানা আকরম খাঁ আর অন্যতম মুক্তাদি ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। বলাবাহুল্য এ দু'জন জেলেও ছিলেন তাঁর সঙ্গী।

সমাজ ও সংবাদপত্র

আমি সংবাদপত্র জগতের মানুষ নই। নই সমাজকর্মীও। এই দুই বিষয়ে আমি আনাড়ি। লেখকরা প্রধানত নিজের কথারই ব্যাপারি। আমিও এ সুযোগে সমাজ আর সংবাদপত্র সম্বন্ধে আমার নিজের মনের কথাই হয়তো কিছু বলে যাব। আমি সাংবাদিক বা সংবাদপত্র জগতের মানুষ না হলেও সংবাদপত্র ছাড়া আমার একদিনও চলে না। যেদিন সংবাদপত্র আসে না সেদিন মনে হয় আমি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন—দিনটাই যেন মাটি। বোধ করতে থাকি সারাদিন ধরে একটা শূন্যতা। অথচ আমি ভালো করেই জানি সংবাদপত্র আমার বহু কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, নষ্ট করে সময়, শান্তি আর মনের ভারসাম্য, বিগড়ে দেয় মেজাজ। তা ঠিক রাখা আমার এ বয়সের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সংসারের সঙ্গে প্রতিনিয়তই আমাদের বিরোধ মনেপ্রাণে যা চাই, ঘটে ঠিক তার বিপরীত। আল্লার দুনিয়া আল্লা যেভাবে খুশি চালাক—এ কথায় আমি মোটেও আত্মসন্তুষ্টি খুঁজে পাই না। ফলে ভিতরে ভিতরে মনটা গজরাতে থাকে। আর যত সব দুঃখ-বিরোধের বার্তা রোজ বয়ে আনে সংবাদপত্র, তুলে ধরে আমার চোখের সামনে। মন-মেজাজ খারাপ হওয়ার এটিই প্রধান কারণ। তবুও সংবাদপত্রের জন্য আমি মনে মনে প্রবল ক্ষুধাবোধ করে থাকি। হকার আসতে দেরি হলে তার প্রতীক্ষায় আজও আমি তাকিয়ে থাকি তার পথের দিকে। আর কখনো তৃপ্তি পাই না একটিমাত্র সংবাদপত্র পড়ে। একাধিক সংবাদপত্র নেওয়া আমার বহুকালের অভ্যাস। এমনকি আমার প্রিয় পত্রিকাও আছে—যা না পড়লে দশখানা পত্রিকা পড়ার পরও থেকে যায় আমার মনে অতৃপ্তি। সংবাদপত্রে কোথায় যেন একটি অদৃশ্য জাদু রয়েছে—যে জাদুমন্ত্রে আমার মতো আরো অনেকে হয়তো বন্দি। হয়তো এ কারণেই এ যুগকে বলা হয় সংবাদপত্রের যুগ—The age of Newspapers। আবার সংবাদপত্রকে বলা হয় চতুর্থ রাষ্ট্রও। এতে বুঝা যায়, সংবাদপত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে সবাই সচেতন। শ্রেণী হিসাবে সংবাদপত্রের স্থান চতুর্থ নির্দেশ করা হলেও আমরা জানি প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় সব রাষ্ট্রই সংবাদপত্রের ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত। তাই একদিকে তাঁরা সংবাদপত্রকে রাখতে চান খুশি অন্যদিকে রাখতে চান শাসনে। ফলে অনেক সময় সংবাদপত্রের মাথায় যুগপৎ বর্ষিত হতে থাকে তোষণ আর শাসন। এ অবস্থা বা নীতি শুধু সংবাদপত্রের জন্য নয়, দেশ বা সমাজের জন্যও শুভ নয় মোটেও।

সাংবাদিকরাও সমাজ জীবনেরই ডাক্তার। যে রোগী ডাক্তারকে তার সব ব্যাধি প্রকাশ করতে দেয় না, তার যে দশা হওয়ার কথা, যে সমাজে সংবাদপত্র সব কথা খুলে বলতে পারে না, সে সমাজেরও অবিকল সে দশা হতে বাধ্য। বলাবাহুল্য, ব্যাধির কথা জানতে না চাওয়াও আর এক ব্যাধি। আর তা মনের ব্যাধি বলে দেহের ব্যাধির চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক। ডাক্তারের যেমন রোগীর রোগ নির্ণয়ের পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকা চাই তেমনি সংবাদপত্রেরও সংবাদ প্রকাশের আর সমাজদেহকে তন্ন তন্ন করে বিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। এ না হলে শুধু যে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতা দুর্বল হয়ে পড়বে তা নয়, দেশ, সমাজ, আর জাতিও হয়ে পড়বে হীনবল, রক্তহীন আর ফ্যাকাসে। আজকের

দিনে সংবাদপত্র শুধু সংবাদ পরিবেশন করে না—উচ্চমানের আর দায়িত্বশীল সংবাদপত্রই এখন জাতির প্রতিদিনের সমগ্র জীবনটাই তুলে ধরতে চায় পাঠকদের সামনে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতি কথা বলে, প্রকাশ করে নিজেকে। সংবাদপত্র জাতির কণ্ঠস্বর—সে কণ্ঠস্বরকে তোষণ বা শাসন যে ভাবেই হোক, স্তব্ধ করে দেওয়া মানে জাতিকে বোবা বানিয়ে দেওয়া। বোবা মানুষ স্বাভাবিক মানুষ নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে কালা-বোবারা স্বভাবতই কিছুটা আহাম্মক হয়ে থাকে— কারণ, ওদের মানসিক শক্তির বিকাশ যথাযথভাবে হয় না, থাকে রুদ্ধ হয়ে। মানুষ হিসেবে ওরা থেকে যায় Inferior বা হীনস্তরের। একটা জাতির যদি এ দশা ঘটে তাহলে পরিণামটা শিউরে উঠবার মতো নয় কি? ডাক্তারকে মেরে ধরে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ায় যে ফল তাঁকে প্রচুর খাইয়ে-দাইয়ে মোটা ফিস্ দিয়ে বৈঠকখানা থেকে বিদায় দেওয়ারও একই ফল। অর্থাৎ রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া না হলে বর্ণিত দুই অবস্থায় এর পরিণতি না হয়ে যায় না—ফলে ইতর-বিশেষ ঘটবে না মোটেও। খোশামুদে কথায় কোন রোগী আরোগ্য লাভ করেছে, তেমন কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। ডাক্তার আর সংবাদপত্রসেবীকে নিরপেক্ষ আর সত্যবাদী হতে হয়। এ তাঁদের কর্তব্য, এ তাঁদের ধর্ম। সমাজের মঙ্গলের জন্যই তাঁদের এ কর্তব্য পালনের সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সত্য কথায় সব সময় আহাম্মকেরা বেজার হয়ে থাকে। ডাক্তার আর সংবাদপত্রের এখানেই বিপদ। কারণ অনেক সময় ক্ষমতা থাকে আহাম্মকদের হাতে—সত্যকে তাঁরা মনে করেন তাঁদের পরম শত্রু। আহাম্মক রোগীকে নিয়ে ডাক্তারকে কি রকম নাজেহাল হতে হয়, তা সব ডাক্তারেরই জানা। তেমনি বোকা শাসকদের হাতে সংবাদপত্রের নাজেহালের খবরও প্রত্যেক সাংবাদিকেরই মর্মে মর্মে জানা। আজ পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে সংবাদপত্র আর সংবাদপত্রসেবীরা প্রতিনিয়ত নাজেহাল হচ্ছেন না।

ডাক্তার আর সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের যে উপমা দিয়েছি তা নিরর্থক নয়। উভয়ের অনেক ক্ষমতা, আর মাঝে মাঝে সে ক্ষমতার অপব্যবহার যে তাঁরা করেন না, তাও নয়। তাই উভয়কে সমীহ করে চলে অনেকেই। অনেক সময় তাঁরা রাতকে দিন দিনকে রাত করেই ছাড়েন। একজন আস্ত সুস্থ মানুষকে ডাক্তার ইচ্ছা করলে পাঁচ মিনিটে রোগী বানিয়ে ছ'মাস কি এক বছরের পুরো বেতনে ছুটি পাওয়ার এমনকি Invalid Pension-এরও ব্যবস্থা করে দিতে পারেন—দিয়ে থাকেনও। আবার এর বিপরীত কাণ্ডও তাঁরা যে না করেন, তা নয়। সাংবাদিকরাও কম যান না। অনেক সাংবাদিক হরহামেশাই পাঁচ হাজারকে পঞ্চাশ হাজার আর পঞ্চাশ হাজারকে পাঁচ হাজারে পরিণত করে থাকেন। লালদীঘির ময়দানের কোন জনসভায় যদি পাঁচ হাজার লোক হয়, পরদিন কোন কাগজে ব্যানার হেডিংয়ে হয়তো ছাপা হয় পঞ্চাশ হাজার। অন্য কোন কাগজে হয়তো ছোট টাইপে মাত্র শ' পাঁচেক লোকের উপস্থিতির কথাই হয় উল্লেখিত! সংবাদপত্রের কলামে এভাবে একটা সত্য দুটা মিথ্যা হয়েই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। ফলে শুধু সত্য নয়, দেশের ইতিহাসও হয় বিকৃত। এভাবে সত্য চাপা পড়ে, মিথ্যা পায় স্থায়িত্ব। স্থায়িত্ব এ কারণে যে, প্রতিদিনের ঘটনাই দেশের ইতিহাস, ইতিহাসের উপকরণ। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক আর গবেষকরা সংবাদপত্রের পুরোনো ফাইল থেকেই সংগ্রহ করেন ইতিহাসের উপাদান, এ সব নিয়েই লিখিত হয় দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস। সাংবাদিকরা চলতি ইতিহাস রচয়িতা।

দেশের এবং বিশ্বের। তাই সাংবাদিকদের কিছুটা নির্লিপ্ত আর বস্তু-নিরপেক্ষ হতে হয়। কারণ, প্রতিদিনের ঘটনাই পরিণত হয় চিরদিনের ইতিহাসে। প্রতিদিনের ঘটনা যদি বিকৃত হয়, হয়ে পড়ে ভুল তথ্য-নির্ভর, তাহলেই দেশের সমস্ত ইতিহাসটাই বিকৃত আর ভুয়া না হয়ে পারে না। ভুল তথ্য ভুল ধারণারই দেয় জন্ম। ভুল ধারণা নিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন প্রায় আকাশে দুর্গ-নির্মাণেরই সমান। সংবাদপত্র প্রধানত প্রচারবাহন বলে তার আরো বেশি তথ্যনির্ভর হতে হয়। দেশের প্রকৃত অবস্থা আর চেহারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে তুলে ধরা সংবাদপত্রের এক মহান দায়িত্ব। আমি জানি, সংবাদপত্র আজ পুরোপুরি এ দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, কেন পারছে না সে ইঙ্গিত উপরে করা হয়েছে। সরকার সমর্থক আর সরকারবিরোধী উভয় শ্রেণীর কাগজ আজ এ এক অদ্ভুত সংকটের সম্মুখীন। সরকারের, বিশেষ করে জন সমর্থনহীন সরকারের মন অত্যন্ত নাজুক আর তার এক চরম মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা হচ্ছে, সে নিজের সমর্থকদের কাছ থেকেও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা শুনতে একদম নারাজ। ফলে সরকার সমর্থক কাগজগুলোও নির্জলা সত্য প্রকাশে হয় ব্যর্থ। এ অবস্থা সরকারের জন্যও স্বাস্থ্যকর নয়, এতে সরকারের অজ্ঞতা যায় আরো বেড়ে। আর নিজের অজ্ঞতাকেই মনে করা হয় অভ্রান্ত। এ হয়তো অপ্রতিহত ক্ষমতারই এক অনুষঙ্গ। এ প্রসঙ্গে Oscar Wilde-এর একথাটা স্মরণীয় All authority is quite degrading. It dergades those who excercise it and it degrades those over whom it is exercised. মাত্র এ কয় বছরে আমাদের সমাজে এ degradation বা নৈতিক অধঃপতন কি হারে বেড়ে চলেছে তা কারো নজর এড়াবার কথা নয়।

সংবাদপত্রের বেলায় 'সরকার সমর্থক' আর 'সরকারবিরোধী' কথা দুটাও আমার পছন্দ নয়। সরকারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই দেশের সংবাদপত্র-জগৎও আজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গুরুত্বটা জনগণ বা জনস্বার্থের সপক্ষে দেওয়া হলে এমন অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটত না। সরকার সাময়িক ব্যাপার—দেশ, সমাজ অর্থাৎ দেশের মানুষই চিরকালের বা স্থায়ী। সংবাদপত্রকে সে মানুষেরই বাহন হতে হয়, হতে হয় সমাজের দর্পণ, সমাজের আওয়াজ, সমাজের প্রতিনিধি ও সমাজের প্রতিদিনের ইতিহাস। চোখ বুজে সরকারের সমর্থন বা নির্বিচারে সরকারের সমালোচনা কখনো সংবাদপত্রের আদর্শ হতে পারে না। এ হতে গেলে সংবাদপত্র কখনো যথাযথভাবে নিজের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। জনমত বা জনমতের বাহনকে দুর্বল আর হীনবীর্য করে দেওয়ায় সরকারের যেটুকু সুবিধা তা অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর আর ততোধিক ক্ষণস্থায়ী। যে কোন বড় রকমের জাতীয় সংকটের মুহূর্তে এর ভয়াবহ পরিণাম বুঝতে পারা যাবে। সরকার সমর্থক আর সরকারবিরোধী—জাতি আর জাতির মুখপত্রকে এভাবে ভাগ করতে গেলে জাতিও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়বে, হয়ে পড়বে দুর্বল, তখন সরকারের নিজের অবস্থাই হয়ে দাঁড়াবে সবচেয়ে কাহিল।

সরকারি নীতির যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা কখনো দেশের শত্রু নন, তাঁদের মতামতও শত্রুতামূলক নয়। তাঁরাও দেশের কল্যাণ কামনা করেন, তবে তাঁদের মতামত বর্তমান সরকারের মতামত থেকে ভিন্নতর এ যা। এমন মতামতকেও যথাযথ মর্যাদার সাথে মেনে নেওয়া সব সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশেরই স্বীকৃত নীতি। তাই ইংল্যাণ্ডে সরকারকে যেমন বলা হয় His or Her Majesty's Govt. তেমনি বিরোধী পক্ষকেও

বলা হয় His or Her Majesty's Opposition অর্থাৎ জাতির সামনে উভয়ের মর্যাদা সমান। কোন পক্ষই জাতির শত্রু নয়—উভয় পক্ষই জাতির কল্যাণকামী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিলাতের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে হাজির হতেন তখন সঙ্গে নিয়ে যেতেন এটলিকেও। এ সম্পর্কে একবার প্রশ্ন করা হলে চার্চিল বলেছিলেন : 'সরকারি সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ওঁর জানা থাকা প্রয়োজন। কারণ পরে তিনিই যে সরকার গঠন করবেন না তা কে বলতে পারে?' সবাই জানেন সত্য সত্যই তাই ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে। যুদ্ধবিজয়ী চার্চিলকে বাতিল করে কিছুটা গো-বেচারি এটলিকেই ইংরেজ তাঁদের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করে নিয়েছিলেন। বিরোধী দলের প্রতি এ শ্রদ্ধা আর দায়িত্বশীল আচরণ গণতন্ত্রের এক প্রধান লক্ষণ।

দেশের কোন মানুষকেই শত্রু মনে করা উচিত নয়, তারাও দেশের সম্পদ এবং তারাও উৎপাদন করে দেশের ধন-ঐশ্বর্য। যাদের সরকারবিরোধী বলে অভিহিত করা হয় তারাও, এমনকি জেলখানায় আটক থেকেও, সরকারি খাজাঞ্চিখানায় খাজনা দিয়ে থাকে, দিয়ে থাকে রাষ্ট্রের সবরকম রাজস্ব আর ট্যাক্স। অর্থাৎ রাষ্ট্রদেহটাকে সজীব আর সচল রাখতে সরকার সমর্থকদের থেকে তারাও কম সহায়তা করে না। কোন সরকারই বোধহয় একথা ভাবতে পারে না—আমরা সরকারবিরোধীদের কাছ থেকে কোন রকম খাজনা বা ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় করব না এবং নেব না তাদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বও। কোন পাগলা সরকার যদি এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে পরিণামটা একবার ভেবে দেখুন। তখন মুহূর্তে দেশটা কি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ছারখার হয়ে যাবে না?

আমার বক্তব্য : সরকারের যেমন নীতি নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে তেমনি জনসাধারণের আর জনসাধারণের মুখপত্রগুলিরও সেসব নীতির বিচার আর সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এ অধিকার স্বীকৃতির ওপর শুধু গণতন্ত্র নয়, সভ্যতাও নির্ভরশীল। সভ্য সমাজব্যবস্থা আর জনগণের নৈতিক মানোন্নয়নের এ এক অপরিহার্য শর্ত।

সত্য সত্যই শত্রুতা বা রাষ্ট্রদ্রোহের অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে তার মোকাবিলা করার জন্য প্রচলিত আইনই যথেষ্ট—প্রচলিত আইনে না কুলোয় নতুনতর আইন রচনায় কোন বাধাই তো নেই সরকারের সামনে। প্রচলিত কথায় যাকে আইনের শাসন বলা হয়, তা প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্র প্রভূতভাবে সহায়তা করতে পারে। আর সমাজে তার অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্য সংবাদপত্রের চেয়ে উত্তম মাধ্যম আর নেই। কিন্তু সংবাদপত্র নিজেই যদি আইনের দ্বারা শাসিত না হয়, তার ওপর যদি আইনের বে-আইনি হামলা চলে তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্রের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় না হয়ে পারে না। রাষ্ট্র এখন অসীম ক্ষমতার অধিকারী—সে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতি একমাত্র সংবাদপত্রই রাখতে পারে সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু এর ফলে সংবাদপত্রের অস্তিত্বই যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে তা হবে সংবাদপত্র-শিল্পের পক্ষে এক ভয়াবহ অবস্থা—সে অবস্থায় সংবাদপত্রের প্রসার আর বিকাশ অসম্ভব। তাই, রাষ্ট্রকে কিছুটা সহিষ্ণু হতে হয়। স্বাধীন সংবাদপত্র যে রাষ্ট্রের এক বিশেষ শক্তি, জাতি গঠনের এক মস্ত বড় হাতিয়ার, এ বোধ যেদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থান পাবে, সেদিন রাষ্ট্র আর সংবাদপত্রের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক থাকবে না, 'সরকারবিরোধী' সংবাদপত্র কথাটাও তখন পাবে লোপ। আসলে সংবাদপত্র আর রাষ্ট্র একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের একই উদ্দেশ্য, একই লক্ষ্য—অর্থাৎ জাতি

আর জনগণের সেবা ও তাদের কল্যাণ, সুস্থ ও সবল জাতি গঠন।

এ সভার আলোচ্য বিষয়ে সমাজ কথাটা আছে, আমিও কথাটা বারবার ব্যবহার করেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায়— কোন্ সমাজ? আমরা যে সমাজের কথা বলছি তার রূপরেখা কি?

এ বিষয়ে আমাদের দেশে কারো কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা আছে বলে মনে হয় না। যাঁরা এ ব্যাপারে অতি বেশি মুখর, তাঁদের ধারণা আরো অস্পষ্ট।

সমাজতান্ত্রিক দেশে আপামর জনসাধারণ থেকে রাষ্ট্র পরিচালক পর্যন্ত সকলের সামনে এক সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সমাজ-চিত্র রয়েছে, তার রূপরেখা আঁকা হয়ে আছে সকলের সামনে। তাদের সব কর্ম ও চিন্তা তার রূপায়ণেই নিয়োজিত, সে ভাবেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ওখানকার সংবাদপত্রেরও সে ভূমিকা—সমগ্র জাতির কর্ম আর ধ্যান-ধারণারই তা বাহন। পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশেও সমাজের একটা সুস্পষ্ট রূপ রয়েছে। ওখানকার সংবাদপত্র তারই প্রতিনিধিত্ব করে, সে সমাজের রূপরেখাই ওখানকার সংবাদপত্রে প্রতিফলিত। কিন্তু আমাদের সামাজিক আদর্শ কি? কি ধরনের সমাজ আমরা চাই? আর কি ভাবে তা গড়ে তুলতে হবে, তার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা কর্মপন্থা দেশের সামনে তুলে ধরা হয়নি আজো।

ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার কথা যে মাঝে মাঝে শোনা যায়, তা অনেকখানি সাময়িক সুবিধাবাদ বলেই মনে হয়। কারণ যাঁরা তা বলেন, তাঁরা নিজেরাও জীবনে তা পালন করেন না। এতে যে শুধু আন্তরিকতার অভাব রয়েছে তা নয়, মনে হয় প্রবক্তাদের মনেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আর দ্বিধা আছে। না হয় এর পেছনে আইনের জোর দেয়ার কোন চেষ্টা হয় না কেন? আইনের জোর ছাড়া এ যুগে কোন মহৎ আদর্শ বা সংকল্পের বাস্তবায়ন যে সম্ভব নয়, তা বহু অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া সমাজ গঠন কথাটা আমার কাছে মোটেও অর্থপূর্ণ মনে হয় না। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও আমাদের সংবদপত্রগুলোর কোন ঐক্য-ভূমিকা নেই—এ অবস্থায় ঐক্য-ভূমিকা গ্রহণ হয়তো সম্ভবও নয়। এখন আমাদের সমাজকে মোটামুটি মিশ্র সমাজ বলা যায়—এতে ইসলাম যেমন আছে, অন্-ইসলামও যথেষ্ট আছে, দেশী যেমন আছে, বিদেশীও কম নেই। সব মিলে আমাদের সমাজ এখন একটা হ-য-ব-র-ল। আমাদের মনেরও এ অবস্থা, বাইরেরও এ অবস্থা। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও আমাদের মধ্যে কোন সামাজিক ঐক্য নেই।

সাধারণত অর্থনীতিই সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলে, কিন্তু আমাদের অর্থনীতিতেও কোন ঐক্য নেই। ফলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মতো এমন ভারসাম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত দেশে ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর গতি এখন ধন-সাম্যের দিকে আর আমাদের গতি ধন-বৈষম্যের দিকে। এ অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ, সংহত ও সমন্বয়ধর্মী সমাজ গঠন প্রায় অসম্ভব বল্লেই চলে। তাই আমাদের সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকাও পরস্পরবিরোধী—সামাজিক বিষয়েও কোন ঐক্য নেই একের সঙ্গে অন্যের। অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ আলাদা।

আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত। ধনী মালিক যদি সুবিবেচক না হন, তাহলে স্বল্প বেতনভোগী কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে

সংঘর্ষ অনিবার্য। এর ফলে ক্ষতি হয় সংবাদপত্রের। কারণ কর্মরত সাংবাদিকরাই পত্রিকাকে রাখেন চালু। এও সামাজিক অনৈক্যেরই ফল—বৈষম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে এ না হয়ে পারে না। আর্থিক বৈষম্য ছাড়াও মালিক আর কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে আদর্শের বা মতামতেরও কোন ঐক্য নেই। এ ঐক্য ছাড়া একটা সুনির্দিষ্ট আর সবল ভূমিকা নেওয়া কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। কোন পত্রিকা বিশেষের মালিকের জন্য হয়তো কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করে কাগজ চালিয়ে যাওয়াই বড় কথা কিন্তু দেশে এমন আদর্শবাদী সাংবাদিকও হয়তো অনেকে আছেন, যাঁরা শুধু অস্তিত্ব রক্ষায় সন্তুষ্ট নন, কিছুটা নিজেদের আদর্শের কথাও বলতে চান, বলতে চান দেশের কথা, মানুষের কথা, নিরন্নদের কথা। কিন্তু মালিকের তাতে সায় নেই, তিনি কোন রকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। অথচ দেশে জীবিকার ক্ষেত্র এত সঙ্কুচিত যে আদর্শবাদী সাংবাদিকের পক্ষে এ চাকরি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ারও উপায় নেই। ফলে প্রতিদিনই তাঁকে নিজের মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে করেই সাংবাদিক জীবন চালিয়ে যেতে হয়। এ অবস্থায় কারো ভালো হওয়ার কথা নয়—না মালিকের, না সাংবাদিকের না সংবাদপত্রের। আমাদের দেশে সাংবাদিকতার এও এক বড় সমস্যা। বলাবাহুল্য, এও সমাজ-ব্যবস্থারই প্রতিক্রিয়া। সমাজ না বদলালে এ অবস্থারও বদল হবে বলে মনে হয় না।

জানি, বাস্তব অবস্থা আর আদর্শের মাঝখানে সব সময় একটা ব্যবধান থাকে। আমাদের দেশে ব্যবধানটা অত্যধিক। তা হলেও অবস্থার বাইরে তো আমরা যেতে পারি না। অবস্থাকে মেনে নিয়েই অবস্থাকে বদলাবার সাধনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অবস্থাকে বদলে বদলেই এগুতে হবে আমাদের। এক অবস্থা পেরিয়ে অন্য অবস্থায় উত্তরণের নামই সভ্যতার অগ্রগতি—সমাজের বিবর্তনও ঘটে এভাবে।

আমরা লেখকরাও কি নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারছি যথাযথভাবে? আমরাও কি বলতে পারছি মনের কথা মন খুলে বা মনের মতো করে? তবুও এ অবস্থার যতটুকু সম্ভব সাধ্যানুসারে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি এবং করতেই থাকবো। সাংবাদিকদেরও আজ এ করা ছাড়া উপায় নেই। আন্তরিকতার সাথে তাঁদেরও যথাসাধ্য নিজের ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। তবে লক্ষ্য থাকবে নিষ্ঠা, সততা আর নিরপেক্ষতার সাথে দেশ আর বিশ্বকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। সংবাদপত্রের সাহায্যে আমরা শুধু দেশের মানুষের সঙ্গে নয়, বিশ্বের সাথেও একাত্মবোধ করে থাকি। সম্ভবত এ যুগে সংবাদপত্রের এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

আগেই উল্লেখ করেছি, সংবাদপত্র শুধু সংবাদ পরিবেশন করে না, সংবাদপত্র জনগণকে শিক্ষিত করে তোলে, দেয় আমোদ-আনন্দও, সাহিত্য, শিল্প, ভাষা আর ভাষার শব্দ-সম্পদকে করে নানাভাবে সমৃদ্ধ, প্রকাশে নিয়ে আসে বিচিত্র ভঙ্গি। প্রতিভাবান সংবাদপত্রসেবীর হাতে দেশের ভাষা প্রতিদিনই নির্মিত হয়, নতুন রূপ নেয়, হয়ে ওঠে অধিকতর অর্থবহ। আমরা, লেখকরাও তাঁদের কাছে তথা সংবাদপত্রের কাছে নানাভাবে ঋণী। আমাদের বহু রচনার উপকরণ জোগায় সংবাদপত্র, জোগায় সংবাদপত্রের প্রভাবে বহু কাহিনীর প্লট, আমাদের ভাষা হয় তীক্ষ্ণ, ধারালো, বাস্তবধর্মী ও সুনির্দিষ্ট।

১৯৬৬

মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন

(ক) সাহিত্যিক শিল্পীদের দায়িত্ব

সভ্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান শর্ত নাগরিকদের মৌলিক মানবীয় অধিকারের স্বীকৃতি, তার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন। এ জন্যই আইন-কানুন, বিচার-বিচারক আর পুলিশ-পেয়াদা ইত্যাদি। এ তিনের সূত্রে সভ্যজীবন বাঁধা—সভ্যতার বিকাশও এর ওপর নির্ভরশীল। এর যে-কোন একটা নিষ্ক্রিয়, দুর্বল বা পক্ষপাতদুষ্ট হলে সমাজের বুনিয়াদ তছনছ হয়ে ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। কাজেই বে-আইনি কাজের প্রশ্রয় দেওয়া মানে শুধু ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের ওপর হামলা নয়, গোটা সমাজ-ব্যবস্থার মূলেই কুঠারাঘাত হানা। স্রেফ গায়ের জোরে আজ যাঁরা বে-আইনি কাজে লিপ্ত, আর যাঁরা এমন বে-আইনি কাজকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, আর যাঁরা অপরাধীকে জেনে-শুনেও দিচ্ছেন আশ্রয়, তাঁরা যে শুধু সমাজবিরোধী কাজ করছেন তা নয়, তাঁরা পরোক্ষে নিজেদের জন্যও ডেকে আনছেন বিপদ। ক্ষমতা, পদ ও আসন চিরস্থায়ী নয়—একদিন এসবের অবসান ঘটবেই, তখন স্বভাবতই গায়ের জোর কমে আসবে, তখন উল্টো তাঁরাই হয়ে পড়বেন বে-আইনের শিকার। অপরিমিত ক্ষমতা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ছাড়ে, ইতিহাসের পাঠ সে পড়ে না, দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। তাই জ্ঞানীরা এবম্বিধ ক্ষমতার নিন্দা করেছেন। বলেছেন, এতে যে শুধু ক্ষমতাসীনের চরিত্রের অবনতি ঘটে তা নয়, যার ওপর এ ক্ষমতা চালানো হয়, তারও ঘটে চারিত্রিক অধঃপতন। আমরা আজ আমাদের চারদিকে, বিশেষ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সার্বিক চারিত্রিক অধোগতি দেখছি তার জন্য মুষ্টিমেয়র নিরঙ্কুশ ক্ষমতাই কি দায়ী নয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা ক্ষমতার অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়ারই এক নমুনা। আগের দিনে বিশেষ করে খলিফাদের আমলে, খলিফা বা কাজীরা এক হাতে যেমন বিচার করতেন, তেমনি অন্য হাতে সে বিচারকে বাস্তবে প্রয়োগেরও তাঁরা ছিলেন অধিকারী। ফলে, দণ্ডের হাত এড়াবার উপায় ছিল না। এখন বিচারকদের বিচার করার, আইনের ব্যাখ্যা করে রায় দেওয়ার অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাঁদের রায়ের বাস্তবায়নের অধিকার অন্যের হাতে অর্থাৎ পুলিশ ও প্রশাসকদের এখতিয়ারে। ফলে, দণ্ডিতের প্রতি যদি শেষোক্তদের কোন রকম সহানুভূতি বা স্বার্থ-সম্পর্ক থাকে তাহলে তাঁরা সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকেও অকেজো করে দিতে সক্ষম। বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতা যে বিচারকে প্রহসনে পরিণত করেছে, দেশে দেশে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতেও তারই প্রতিধ্বনি রয়েছে। মাঝে মাঝে চাকরি যাওয়া বা মন্ত্রিত্বের গদি থেকে খসে পড়ার যে-সব খবর কাগজে পড়া যায় তার পেছনেও নাকি ক্ষমতার বিচিত্র রহস্যই লুক্কায়িত। কাগজে বা সরকারি প্রেস ইশতেহারে যা প্রকাশ করা হয় তাতে সব সত্যের সন্ধান তো থাকেই-না, এমনকি কখনও কখনও বিপরীতটুকু থাকাও অসম্ভব নয়। অথচ এগুলি আমাদের সামাজিক ইতিহাসের অংশ। অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের নীরবে, নিভৃতে গোপনে এ-সব রহস্যের সন্ধান, ক্ষমতার বিচিত্র গতিবিধির খবর নিতে হবে, সংগ্রহ করে রাখতে হবে সে সব উপকরণ। কে কি ভাবে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে তার উদ্ঘাটন ঘটলে আমাদের

সামাজিক বিবেক একদিন-না একদিন জেগে উঠবে—এসবের প্রতিকার একমাত্র তখনই সম্ভব। ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের মুখোশ খুলে তাদের স্বরূপ উদঘাটনের দায়িত্ব এ যুগের কবি শিল্পী-সাহিত্যিকদের। এ এক অপূর্ব উপকরণ—এ সহজে গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। ধর্মীয় ভেক, বুলি ও লেবাসের অন্তরালে ক্ষমতারূপী যে শয়তানটি লুকিয়ে আছে, তার স্বরূপ সাহিত্যিক শিল্পীরা উদ্ঘাটন না করলে কে করবে? দান্তে, মিলটন বা গ্যাটের মতো মহাপ্রতিভার অধিকারী আমরা না হতে পারি, কিন্তু ছোট প্রতিভারও তো দায়িত্ব আছে। সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি, আইন ও বিচারের প্রতি দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালন না করলে শিল্পীরা নিজের—তথা নিজের আত্মার মুখোমুখি দাঁড়াবেন কি করে? বিশেষ করে যে সব তরুণ লেখক ও শিল্পী ঢাকায় আছেন, যাঁরা চোখের সামনে ক্ষমতার বিচিত্র খেলা আর কারসাজি দেখছেন, শুনছেন, অনুভব করছেন—যা প্রতিনিয়ত তাঁদের মানস অভিজ্ঞতায় আঘাত হানছে, তাঁরা এসবকে আত্মস্থ করে কেন সাহিত্যে, শিল্পে ও নানা ব্যঙ্গ-রচনায় রূপ দেবেন না? নিজ নিজ দেশের সাম্প্রতিক ও সামাজিক অধঃপতন নিয়ে ইউরোপে বহু সার্থক রচনা লেখা হয়েছে। জানি না আমাদের দেশের অফিসাররা যাঁরা ভিতর থেকে সব কিছু দেখছেন, দেখছেন ক্ষমতার লীলা-খেলা, তাঁরা নিজস্ব কোন ডায়রি রাখেন কি-না, না রাখলে রাখা উচিত—নিঃসন্দেহে এসব ডায়রিতে এমন সব উপকরণ খুঁজে পাওয়া যাবে, যা হবে পরবর্তী ইতিহাস রচনার সহায়ক। বলাবাহুল্য, আমাদের হাল আমলের সমাজ-ব্যবস্থার ইতিহাস আবর্তিত হচ্ছে ক্ষমতা আর ক্ষমতাসীনদের কেন্দ্র করেই। আজ আমাদের সাহিত্যিক-শিল্পীদেরও গোয়েন্দা হতে হবে, ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের প্রতি তাঁদের কঠোর নজর রাখতে হবে; তা না হলে এ-যুগের যথাযথ ইতিহাস উদ্ঘাটন সম্ভব হবে না কোন দিন। বিভিন্ন সূত্রে সমাজের গলদের যেটুকু চিত্র প্রকাশিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি থেকে যায় অপ্রকাশিত। তাই সাহিত্যিক-শিল্পীদের দায়িত্ব ও শ্রম অনেকখানি বেড়ে গেছে এ যুগে।

(খ) আইনের শাসন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার পর পরিচিত তরুণ অধ্যাপক আর শিক্ষকরা এসে প্রায়ই মনের খেদ জানিয়ে যান। বলেন, বড় আশা নিয়ে শিক্ষকতা করতে এসেছিলাম, টাকা নেই, সম্মানটা ছিল। এতকাল ছাত্রেরা ইজ্জত করতো, দেখা হলে হাত তুলে সালাম করতো। এখন কোন কোন খ্যাতনামা অধ্যাপকের ওপর লাঠি তোলার পর আর তো ভরসা পাচ্ছি না। আপনি মানে মানে অবসর গ্রহণ করে ভালোই করেছেন। আজ চারদিকে শিক্ষক ও অধ্যাপক মহলে এ হতাশাই দেখছি। অপরাধের ঘৃণ্যতা ছাড়া এদিক থেকেও দেশের এক দুর্লক্ষণ। ক্ষমতা সব সময় আত্মকেন্দ্রিক—তাই ক্ষমতালিপ্সুরা দেশ ও সমাজের ভালো ভাববার অবকাশ পান না, ভাবেন স্রেফ নিজের মুখ ও মুখোশ রক্ষার কথাই।

প্রাচ্য জীবন-দর্শন আর সভ্যতায় শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও পবিত্র। চিরকাল ধরে এ আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। মাঝে মাঝে দু'একটি কালাপাহাড়ি ব্যতিক্রম হিসেবে কদাচিৎ ঘটলেও এবার দিনদুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে তার কোন তুলনা নেই। শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ শৃংখলা বা ডিসিপ্লিন। আজ বিশ্ববিদ্যালয়

জীবন থেকে সেটি নিশ্চিহ্ন বলে অধ্যাপকরা নিজেদের দৈহিক নিরাপত্তা সম্বন্ধেও নিশ্চিন্তবোধ করছেন না। আরও আশ্চর্য, এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুমাত্র তৎপরতার পরিচয় দেননি। এমনকি নির্যাতিত শিক্ষকের প্রতি তাঁরা প্রকাশ করেননি একটুখানি মামুলি সহানুভূতিও। পৃথিবীর তাবৎ ভদ্র-সন্তানই চায় আইনের সাহায্যে প্রতিকার। তোমার যদি কোন অভিযোগ থাকে, তুমি আইন করগে—এ তো আমরা হর-হামেশাই বলে থাকি। আর অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের এ তো একমাত্র ভদ্র উপায়। শান্তি, নিরাপত্তা, নাগরিক জীবন ও ভদ্র-সমাজের একমাত্র বুনিয়াদ তো আইন-অপরাধ তত্ত্বে যাদের জন্ম-ক্রিমিনেল বলা হয়, আইনের নামে একমাত্র তারাই আঁৎকে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে পড়ে ও ভয় পায়। শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি ভদ্রমানুষ তো আইন ও বিচারকে স্বাগত জানায়। এ কয় বছর ধরে আমাদের দেশে যা ঘটছে মনে হয়, তার পেছনে একটা হৃদয়হীন জিগীষাই ক্রিয়ারত। অভিজ্ঞতায় দেখেছি একটুখানি যুক্তি ও সহৃদয়তার সঙ্গে মোকাবিলা করলে শিক্ষক-ছাত্রের সব সমস্যা সহজে মিটিয়ে ফেলা যায়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরও এ দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। বলাবাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি শহরের এস. পি. নন্— যেই তাঁকে নিযুক্ত করুন, তিনি অধ্যাপকদেরই প্রতিনিধি, তাঁদেরই নেতা। কাজেই অধ্যাপকদের প্রতি তিনি যদি নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিশীল না হন, তাহলে তাঁর আসনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। যে-কোন বিচার নিরপেক্ষ ও আইন মোতাবেক হয়েছে কি-না সে বিচারের দায়িত্ব জনসাধারণের নয়, ছাত্র সমাজের তো নয়ই—তার ভার উচ্চতর বিচারালয়ের। কোন ভুল বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় আইনেই রয়েছে। কাজেই কোন মামলা বিশেষের রায় শুনে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন যুক্তিই নেই—এর মানে আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এভাবে আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া যদি একবার প্রশ্রয় পায় তাহলে অচিরে আমরা সবাই জঙ্গল-জীবনের বাসিন্দা হয়ে পড়বো। যে বিচারের ফলশ্রুতি হিসেবে যিনি বা যাঁরা মার খান মারটা তাঁদের গায়ে পড়ে বটে কিন্তু পরোক্ষভাবে এ মারের প্রচণ্ড আঘাতটা গিয়ে পড়ে আইনের ওপর; বিচার, বিচারপতি ও বিচারালয়ের ওপর। আইন মোতাবেক বিচারের এ যদি পরিণতি হয় তাহলে আইনের শাসন কায়েম হবে কি করে? কায়েম থাকবে কি করে? আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবারই জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তাইবা কোথায়? এখানেই আমাদের আতঙ্ক সবচেয়ে বেশি। বাইরের হস্তক্ষেপে আইন ও বিচার যদি হৃৎশক্তি হয়ে পড়ে, তাহলে সামাজিক জীবন ভিসুদ্ধই চুরমার হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার উচ্চতম পাদপীঠে যদি লাঠি বা হকিস্টিকের জয় প্রশ্রয় ও স্বীকৃতি পায় তাহলে সব রকম শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা শিকেয় উঠবে। আইনের প্রয়োগ যাদের হাতে তাঁরা সমাজকে সভ্য-জীবন না বন্য-জীবনের সদর রাস্তা নির্দেশ করবেন এখন থেকে দুরু দুরু বুকে তাই লক্ষ্য করতে থাকব আমরা—যাঁরা আইনের শাসন ও আইন শাসিত সমাজের স্বপ্ন দেখি আর বিশ্বাস করি মৌলিক মানবীয় অধিকার রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে আইন ও আইনের প্রয়োগ।

১৩৭২

যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে

শিশু-পাঠ্য গল্পের কথা হলেও কথাটা আজও সত্য। সোনার সব ডিম একসঙ্গে পাওয়ার লোভে সেদিন হাঁসটাকেই মেরে ফেলা হয়েছিল। ফলে ডিম পাওয়া চিরকালের জন্যই হয়ে গেল বন্ধ। লোভের এ পরিণাম। 'অতি লোভে তাতি নষ্ট' কোন যুগ বিশেষের কথা নয়।

হাঁস আর সোনার ডিম তো একটা প্রতীক। ধন আর ধন-উৎপাদনের প্রতীক। ধন জীবনের অত্যাবশ্যক বস্তু—এছাড়া ব্যক্তি-জীবন যেমন অচল, তেমনি সমষ্টিগত জীবন—যার নাম সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি ইত্যাদি তাও অচল।

কারা সমাজ বা রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখে, রাখে চালু? কারা উৎপাদন করে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ? একমাত্র উত্তর : দেশের শ্রমিক। ব্যাপক অর্থে দৈহিক শ্রম খাটিয়ে যারাই করে উৎপাদন আর উপার্জন তারাই শ্রমিক। তারাই সোনার ডিম পাড়ে।

দেশের উজির-নাজিরেরা তো গদিতেই থাকেন বসে ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার আর সেক্রেটারিরাও বৈদ্যুতিক পাখার নিচে বসেই চালান কলম, কিন্তু একবারও হয়তো ভেবে দেখেন না নিচের নরম গদিটা কার মেহনতে তৈরি? মাথার ওপরকার পাখাটা কার শ্রমের ফল? বিদ্যুতের কলটাকে কে রেখেছে চালু?

শ্রমিক না হলে শুধু যে ধান-পাট-গম উৎপন্ন হয়না তা নয়, শ্রমিক না হলে রেল-স্টিমার চলে না, বিমান ঘাঁটি হয় বন্ধ, গাড়িঘোড়া, রিকশা-বাস, অফিস-আদালত, ব্যাঙ্ক সবই হয় অচল। তবুও সে শ্রমিক যখন একটু বাঁচার দাবি জানায় তখন রাষ্ট্রনেতা থেকে থানার ক্ষুদে দারোগা পর্যন্ত মারমুখো হয়ে ওঠে। তাকে চিহ্নিত করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী বলে, মাথায় পড়ে তার পুলিশের লাঠি, পাঠানো হয় তাকে হাজতে, জেলে, এটা-ওটার অজুহাতে। এভাবে যে হাঁস সোনার ডিম পাড়তো তাকে করে দেওয়া হয় খতম।

পুঁজি বা টাকা থাকলেই ঘোড়া কেনা যায়, কেনা যায় গাড়ি। কিন্তু ঘোড়া আর গাড়িকে চালু রাখতে হলে চাই কোচোয়ান-গাড়োয়ান। গাড়ি টানার জন্যে যেমন ঘোড়াকে দিতে হয় দানা তেমনি খাওয়া-পরা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয় কোচোয়ানকেও। গাড়ির মালিকেরা এ মোটা সত্যটাই বুঝতে পারেন না, পারলেও চান না বুঝতে। ফলে তাঁরা গাড়োয়ানকে ঠেলে দেন মৃত্যুর পথে। তখন গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়া আর গাড়িও যায় সহমরণে। এভাবে হাঁসকে মেরে তাঁরা ডিম থেকে হন বঞ্চিত এবং নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও করেন দেউলিয়া।

পাকিস্তান খাজাঞ্চিখানায় যে হংস সোনার ডিম পাড়ে তা রাজহংস নয় তা পূর্ব পাকিস্তানের পাট-হংস। বিদেশী বণিকরা যার নাম দিয়েছে Golden Fibre বা সোনালি আঁশ। এ ডিম পাড়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের জলো জমিতে আর তা গিয়ে জমা হয় করাচি ল্যাহোর-ঢাকা রাওয়ালপিন্ডির সরকারি খাজাঞ্চিখানায়। পাট সত্যই হাঁস এবং তা পূর্ব পাকিস্তানেরই খাস! হাঁস যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না পাটও জল ছাড়া বাঁচে না।

জলে ভিজে ভিজেই তার সবুজ রঙ হয়ে ওঠে সোনালি।

অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস, যারা আকণ্ঠ জলে ভিজে এ পাট-হংসকে পালন করে, লালন করে, করে তোলে ডিম পাড়ার উপযোগী, তাদের ভাগ্যে ডিমের একটু খোসাও জোটে না। ফলে পালকের সঙ্গে সঙ্গে হাঁসেরও গতি হয় মৃত্যুর দিকে। পালক না থাকলে প্রাকৃতিক নিয়মে হাঁসের ঘটবে মৃত্যু। হাঁসই যদি না থাকে ডিম পাড়বে কে? তাই রাষ্ট্র, পুঁজিপতি আর জনসাধারণ সকলেরই উচিত, যে হাঁস ডিম পাড়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা। কারণ এ তিনেরই মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তার বেঁচে থাকার ওপর—তাকে বাঁচিয়ে রাখার ওপর।

সব দেশের মেহনতি জনতাই সে দেশের 'যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে'। অতিলোভের ফাঁদে পড়ে পুঁজিপতি আর মালিকেরা সে হাঁসকেই জবাই করে একসঙ্গে সব ডিম কুড়িয়ে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে তালগাছ হতে চায়। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। গল্পে হাঁসের মালিকের যা পরিণতি এঁদের পরিণতিও তার থেকে ভিন্নতর নয়।

প্রকৃতি এবং ইতিহাসের এই নির্দেশ।

১৩৭০

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

সাহিত্য এক পুরোনো ব্যাপার। মানুষ যখন থেকে মানুষ হয়ে উঠেছে অর্থাৎ ভাবতে আর অনুভব করতে শিখেছে তখন থেকেই সাহিত্যের সূচনা। সংক্ষেপে সাহিত্য ভাব আর অনুভূতির প্রকাশ। প্রকাশ সাহিত্যের অপরিহার্য শর্ত। সব মানুষই অল্পবিস্তর ভাবতে আর অনুভব করতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে লাখে এক। এখানেই সাহিত্যিকের অনন্যতা। ভাব আর অনুভূতি প্রকাশিত হয়ে দেখা না দিলে সাহিত্য হয় না। তাই উপহাসের বেশি 'নীরব কবি' কথাটার কোন মূল্য নেই।

মাটির নিচে অজস্র ফল্গু ধারার অস্তিত্ব ভূতত্ত্ববিদদেরও স্বীকৃতি পেয়েছে কিন্তু সব ধারা নদী হয়ে, ঝর্ণা হয়ে কিংবা সমুদ্রের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে না। যে সব স্রোত নিজের দুর্বার গতিতে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে স্রেফ সেগুলিই রূপ নেয় নদী, ঝর্ণা আর সমুদ্রের। বাদবাকি হারিয়ে যায় মাটির নিচে।

ভাব বা অনুভূতির বেলায়ও এ কথা—যার মনে কোন চিন্তা বা অনুভূতি দুর্বার হয়ে ওঠে, প্রকাশের জন্য করে আকুলি-ব্যাকুলি সেই হয় সাহিত্যিক অর্থাৎ সে খুঁজে নেয় বা খুঁজে পায় নিজের প্রকাশের মাধ্যম। অবশ্য কৃত্রিমতা সব ক্ষেত্রেই আছে—সাহিত্যেও দেদার। স্রেফ লেখক হওয়ার জন্যও অনেকে লেখে—হয়তো মনের ভিতর আন্তরিক কোন অনুভূতিরই সঞ্চার হয়নি, কোন ভাবই মনের ভিতর হয়ে ওঠেনি দুর্বার, তবুও লেখতে চায় কেউ কেউ, লেখেও হরহামেশাই। এমন লেখাকে স্রেফ কাগজের ফুলের সঙ্গেই দেওয়া যায় তুলনা। বাগানের পুষ্প সভায় যেমন কাগজের ফুলের কোন স্থান নেই তেমনি সাহিত্যের শাহি দরবারেও স্থান নেই আন্তরিকতাহীন কৃত্রিম রচনার। আন্তরিক ও হৃদয়-উৎসারিত রচনা আমাদের বর্তমান সাহিত্যে বিরল বল্লেই চলে। এর জন্য বহুতর কারণ যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক—অন্য সব মানুষের মতো লেখকদের জীবনও এ তিন সূত্রে বাঁধা—এ তিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক জীব বলেই এ তিনের বন্ধন অস্বীকার করা লেখকেরও সাধ্যাতীত।

এককালে যখন শিল্পী-লেখকরা রাজা-বাদশা কি ভূস্বামীদের পোষ্য ছিল তখন লেখা হয়তো পণ্য ছিল না, এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত—অন্য দশটা পণ্যের মতো এখন লেখাও একটি পণ্য মাত্র। লেখকরাও পণ্যোৎপাদনকারী। এ পণ্যের ওপরই নির্ভর করে তাঁদের জীবিকা আর সামাজিক সত্তা। ফলে স্বভাবতই চাহিদা আর সরবরাহের Supply and Demand-এর কথা এসে পড়ে। আমি অন্য এক প্রবন্ধেও বলেছি সাহিত্যও আজকের দিনে এ চাহিদা আর সরবরাহের নীতিতেই নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্যের উৎকর্ষ, প্রকরণ আর বিষয়বস্তুও তাই চাহিদার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সমাজে যদি সৎ, আন্তরিক ও উচ্চচিন্তার কদর থাকে লেখার মান আর গতিও সেভাবেই মোড় নেবে আর সমাজ যদি হাল্কা, কৃত্রিম, সিনেমাধর্মী, রহস্য রচনারই অনুরাগী হয়ে ওঠে সাহিত্যেরও প্রধান প্রবণতা তা না হয়ে পারে না।

সমাজ সাহিত্য গড়ে না সাহিত্য সমাজ গড়ে— কার আগে কে? মুরগি আগে না ডিম আগে? এ প্রশ্নের মতো এও এক অবান্তর প্রশ্ন। কারণ আমরা জানি মুরগি আর ডিমের অস্তিত্ব যুগপৎ— তেমনি সমাজ আর সাহিত্যের বেলায়ও তা সত্য। সামাজিক উন্নতি সার্বিক না হলে তা কখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না আর সার্বিক উন্নতির আওতায় সাহিত্য-শিল্পেরও রয়েছে এক প্রধান স্থান। সাহিত্য আর সমাজের অগ্রগতিও তাই যুগপৎ হতেই হবে। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা অচল। এ দুই একে অন্যের পরিপূরক। তাই উন্নত দেশে অনুন্নত সাহিত্য বা অনুন্নত দেশে উন্নত সাহিত্য আশা করা যায় না। জৈবিক আর মানবিক এ দুই সত্তা নিয়েই ব্যক্তি—এ দুই সত্তা নিয়েই সমাজ, এ দু'য়ের উন্নতির নামই সার্বিক উন্নতি। আমাদের সামাজিক উন্নতির গতি সার্বিক নয় বলেই জীবনে ও সমাজে আমরা পদে পদে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের দালানকোঠা, বিশ্ববিদ্যালয় আর কারখানার চিমনি ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে বটে কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে সমতালে তেমন কোন ঊর্ধ্বগতি কোথাও লক্ষিত হচ্ছে না। সমাজে উচ্চচিন্তার চাহিদা থাকলে অবস্থা এমন হওয়ার কথা নয়।

সৎ ও আন্তরিক চিন্তা, যে চিন্তায় লেখকের আস্থা আর প্রত্যয় রয়েছে তার মূল্য সাহিত্য-শিল্পে অপরিমেয়। সাহিত্য-শিল্পের মূল্য আর আবেদনও এ কারণে। আমাদের সাম্প্রতিক রচনায় তা অনেকখানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে এসেছে। চিন্তার সততাই লেখককে দিয়ে থাকে সত্য-কথনের দুর্বার সাহস। মহৎ সাহিত্যের প্রাণ এ সত্য—এ সত্যের ফলেই সমাজ হয় কলুষমুক্ত। লেখায় সত্যের প্রতিফলন না ঘটলে সাহিত্য স্বধর্মচ্যুত হতে বাধ্য। আমার আশঙ্কা আমরা যেন কতকটা স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ছি। বিজ্ঞানের অভিনব আর নিত্য-নতুন আবিষ্কার সাহিত্যের সামনে খুলে দিয়েছে নতুন দিগন্ত। তাই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করারও উপায় নেই আজ সাহিত্যের। বিজ্ঞান আজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ— তাই বিজ্ঞানবিমুখ সাহিত্যের জীবনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে পদে পদে। জীবন নিয়ে আর জীবনের জন্যই সাহিত্য—তাই সাহিত্য জীবনভিত্তিক হওয়া চাই।

জীবনের বিধিবিধান আর তার সূত্র আবিষ্কারের দায়িত্ব বিজ্ঞানের—এসবকে অস্বীকার করে চলা কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। কারণ এ তাকে বাঁচার পথ ও পাথেয়ের সন্ধান দেয়। সন্ধান দেয় বাস্তুধর্মিতার। আধুনিক সাহিত্যের এক বড় মাপকাঠি রচনার বাস্তুধর্মিতা। বিজ্ঞান যেমন বাঁচার পথ বাৎলায় তেমনি সাহিত্য জোগায় বাঁচার আনন্দ। সাহিত্যিক বা পাঠক কারো পক্ষেই এ দুয়ের একটাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাহিত্য বা শিল্প জীবনের তথা অস্তিত্বের যা আনন্দ তাকেই জাগিয়ে তোলে, বহন করে বাঁচার সুখ, জীবনকে করে তোলে আকর্ষণীয়। স্নেহ-ভালোবাসায়, প্রেম-প্রীতিতে যে একটা অনির্বচনীয় আবেগী মূল্য রয়েছে সাহিত্য আমাদের সে সম্পর্কে সচেতন করে তোলে—মনুষ্যত্বের একট অদৃশ্য অন্তর্জগৎ আমাদের অহরহ ঘিরে রয়েছে—যা না থাকলে মানুষ হিসেবে আমাদের জীবন ব্যর্থ হতো। মানুষের অন্তর্জগতের উদঘাটন সাহিত্যের প্রতিদিনের দায়িত্ব। ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকতার চাপে মানুষের অন্তর্জগৎ আজ অনেকখানি চাপা পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ হৃদয়ের ব্যাপারে আমরা হয়ে যাচ্ছি যান্ত্রিক। তাই

সাহিত্য আর সাহিত্যিকের দায়িত্বও গেছে বেড়ে—আজ লেখক ও শিল্পীকে অধিকতর হৃদয়ধর্মী আর বিবেকী হতে হবে।

মানবতার এক নীরব কণ্ঠস্বর আছে— সাহিত্য আমাদের তা শোনায়। এ কণ্ঠস্বর আদিমকাল থেকে বর্তমানের পথ বেয়ে ভবিষ্যতের দিকে বয়ে চলেছে। এর গতি আর প্রবাহ অব্যাহত রাখার দায়িত্ব শিল্পীর-সাহিত্যিকের। এ প্রসঙ্গে বোরিস প্যাস্টারনকের এ কয়টি লাইন স্মরণীয় :

Artist, be ever watchful
Lest sleep should close your eyes.
You are eternity's hostage
In bound to time that flies.

একটি উপন্যাস

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মুষ্টিমেয় মানুষের রাজনৈতিক সুবিধা, স্বল্পসংখ্যকের স্বাধীনতার স্বপ্ন—প্রাক্ পাকিস্তান যুগে গোটা বাংলাদেশের এ এক অদ্ভুত আর অভূতপূর্ব পটভূমি। এ পটভূমিতে মানুষ নেমে গিয়েছিল অমানুষের ভূমিকায়। নিঃসন্দেহে সচেতন আর কুশলী শিল্পীর জন্য এ এক আকর্ষণীয় বিষয়-বস্তু। বিশেষ করে ঔপন্যাসিকের পক্ষে। অনেকে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার যে করেননি তা নয়। তবে কালগত নৈকট্যের জন্য কোন কোন শক্তিমান লেখকের পক্ষেও নির্লিপ্ত শিল্পী-দৃষ্টি অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে তখনকার অনেক লেখাই সাংবাদিকতার পর্যায়ে গেছে নেমে—পরিমিতিবোধের অভাবে অসাধারণ লিপিকুশলতা সত্ত্বেও কোন কোন রচনা হয়ে পড়েছে প্রচারধর্মী আর তার বক্তব্য অকারণে উচ্চরোল। ফলে তার শৈল্পিক আবেদন সাময়িকতায় নিঃশেষিত। প্রতিভার সংযম আর স্থির-দৃষ্টি আয়ত্তের জন্য ঘটনা-স্রোতের আবর্ত থেকে শিল্পীর নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান আর রচনায় কাল ব্যবধান রক্ষিত হওয়া উচিত। গরম গরম ঘটনা নিয়ে টাটকা রচনার পক্ষে শিল্পোত্তীর্ণ হওয়ার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে।

আলাউদ্দীন আল-আজাদ তাঁর নতুন উপন্যাস 'ক্ষুধা ও আশা'কে এ পটভূমির ওপরই দাঁড় করিয়েছেন। যুদ্ধের নির্মম ধাবায় মানুষের শোচনীয় অধঃপতন, সমাজের সার্বিক ভাঙন আর নৈতিক বোধের চরম দুর্গতি, মনে হয় নিখুঁতভাবে তিনি এঁকে রেখেছিলেন তাঁর মনের পটে। দীর্ঘকাল পরে, সমস্ত ঘটনাপঞ্জীকে আত্মস্থ করে—গ্রহণ-বর্জনের শৈল্পিক চেতনা দিয়ে পরে গড়ে তুলেছেন এ উপন্যাসের উপকরণ আর কাঠামো। উপন্যাসটির গায়ে দীর্ঘ প্রস্তুতির স্বাক্ষর পদে পদে।

ঢাকা আর তার কাছাকাছি এলাকা—যা তাঁর জানা, যেখানকার মানুষ, মানুষের ভাষা আর চালচলন তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার নখদর্পণে তা নিয়ে তাঁর এ উপন্যাসের ভিপত্তন। পরে ঘটনা যে-শহরে এসে শাখায়িত হয়েছে তাও তাঁর অজানা নয়। তাই বইটির কোথাও ঘটনা বা মানুষ অবাস্তব বা ফাঁপা কি ফাঁকা হয়ে দেখা দেয়নি, কোন মানুষকেই লেখক হাজির করেননি কল্পনার মুখোশ পরিয়ে। কাকেও মনে হয় না অপরিচিত বা আন্‌দেখা। 'ক্ষুধা ও আশা'য় যে যুগের ছবি আঁকা হয়েছে, সে যুগের বীভৎস চেহারা আমাদের অনেকেরই স্বচক্ষে দেখা। বইয়ের পাতায় আবার নতুন করে তা দেখলাম, পুরোনো স্মৃতি ফিরে এলো শিল্পের আবেদন নিয়ে। মানব-ভাগ্যের পরিণতি দেখে মনটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল। সাময়িকভাবে বিচলিত বোধ করলেও আশান্বিতও হলাম। কারণ ধ্বংসের মধ্যে নবজন্মের অঙ্কুর লুক্কায়িত—এ রচনায় সে প্রচ্ছন্ন ইংগিতটুকুও পাঠকের নজর এড়াবার কথা নয়। লেখক এক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে দু'টি জীবনধারাকে একই কাহিনী-সূত্রে গেঁথে এমন এক অবয়বিক দর্পণে পরিণত করেছেন যে যাতে দেশের সে যুগ-চিহ্নিত সার্বিক চেহারাটাই প্রতিফলিত। দেশের যে বৃহত্তর ধারা যারা গতর খাটিয়ে দেশকে অন্ন-বস্ত্রের দেয় জোগান, পরিহাসের মতো শোনালেও সাহিত্যের ভাষায় যাদের দেশের মেরুদণ্ড বলে অভিহিত করা হয়, যে কোন সংকটের দিনে তারাই হয়ে পড়ে সর্বাগ্রে সবার

চেয়ে বঞ্চিত, নির্যাতিত—এমনকি সর্বহারা। দেশ মানে মাটি, দেশের মানুষের শেষ আশ্রয়। প্রাণের বিনিময়েও মানুষ এ শেষ আশ্রয়টুকু ছাড়তে চায় না। এ শেষ আশ্রয়ের লড়াই মানুষের মতোই আদিম—হাল আমলে এ লড়াই আমরা আলজিরিয়ায় দেখেছি—এখন দেখছি ভিয়েতনামে, আসলে এ লড়াইও তো দেশের মাটির অধিকারটুকু রক্ষারই লড়াই। আমাদের দেশের অগণিত মেহনতি মানুষ যারা কখনো প্রাচুর্যের মুখ দেখেনি—যারা বীর নয়, যোদ্ধা নয়, যাদের নামে রাস্তাঘাটের নাম হবে না বা কেউ দেবে না কোন দিন 'জিন্দাবাদ', তারা ঝড়-তুফান-রোদ আর বজ্র-বিদ্যুৎ মাথায় করে দেশের মাটিটুকু আঁকড়ে পড়ে ছিল, যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে একক বা যৌথভাবে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর তার আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষের আঘাতে তারাই হারিয়ে বসল মাটির এ শেষ আশ্রয়টুকুও। ভাত নয়, একটু ভাতের ফ্যানের আশায় তারাই দলে দলে পাড়ি দিয়েছিল শহর-বন্দরের দিকে, যারা একদিন হাত বাড়িয়ে দিত তারাই আজ দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরছে। হাড্ডিসার দেহটা টেনে টেনে, ভিড় করছে লঙ্গরখানায়, শরিক হচ্ছে ভুখমিছিলে। শেষকালে রাস্তার ধারে, নদী-নালার পাড়ে, বটগাছের ছায়ায় মরে থেকে শৃগাল-কুকুর আর শকুনির আহার্যে হয়েছে পরিণত। সেদিন বাংলাদেশের কোথাও এ কিছুমাত্র বিরল দৃশ্য ছিল না। এ কঙ্কাল-সার ক্ষুধিত মুমূর্ষুদের ছবি এঁকে একদিন জয়নাল আবেদিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'জায়গাটা জুড়ে বটগাছের নয়, আজরাইলের ছায়া'— লেখকের এ উক্তি সেদিন কিছুমাত্র অর্থহীন ছিল না।

ক্ষুধা আর মৃত্যুর কুৎসিত চেহারা দেখতে দেখতে, হয়তো তার আঘাতে আঘাতে মানুষের সুকুমার বৃত্তির তথা হৃদয়ের শেষ-চিহ্নটুকুও হারিয়ে গিয়েছিল। এক অবয়বে ছাড়া মানুষে আর পশুতে সেদিন কোন তফাৎই ছিল না। ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সেদিন মানুষে আর পশুতে করেছে কাড়াকাড়ি, মারামারি, লড়াই। যেখানে স্রেফ জৈব-শক্তি নিয়ে প্রতিযোগিতা সেখানে পশুর সঙ্গে মানুষ পারবে কেন? তাই সেদিন বাংলাদেশের পথে ঘাটে যত মানুষ মরেছে তার সিকি পরিমাণ কুকুর মরেনি! মানুষ কাব্য লিখেছে, ধর্ম বানিয়েছে, দেখেছে স্বর্গের স্বপ্ন—সেদিন এর কিছুই হালে পানি পায়নি। দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষার মরা-বাঁচার এ সংগ্রামে কাব্য, ধর্ম আর স্বর্গের স্বপ্ন মানুষের হাতে তুলে দেয়নি আত্মরক্ষার কোন হাতিয়ার। তাই সেদিন মানব-সভ্যতার পরাজয় ঘটেছিল কুকুর সভ্যতার কাছে। সে পরাজয়ের মালিন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কখনো মুছবে না। মুছবে না বলেই এ যুগিয়েছে শিল্প আর সাহিত্যের প্রেরণা। আলাউদ্দীন আল-আজাদের মতো সচেতন আর উৎসর্গিত শিল্পী এমন উপকরণ হাতছাড়া করতে পারেন না। তাই দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে সে খণ্ড-ইতিহাসের উত্তরণ ঘটেছে তাঁর হাতে শিল্পের সীমিত অথচ দূরপ্রসারী এলাকায়।

'ল্যাম্পপোস্টের নিচে একটা লোক লম্বা হয়ে পড়ে আছে, পাশে একটা শানকি, শুধু চামড়াটুকুন লেগে থাকা পাঁজরের ভিতরে ধুকধুক করছে প্রাণটা, মরতে দেরি নেই। আর কিছু দূরে ময়লা ঘাঁটছে একটি মেয়ে, কাছে ছ'সাত বছরের একটি ছেলে, ন্যাংটা একটা কুকুরও তৎপর এবং সে কুকুর বলেই যেন এদের দিকে পিট্ পিট্ করে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চলেই গেল।' (পৃঃ ৭৯) মানব ভাগ্যের এ পরিণতি

দেখে সেদিন কুকুরও যেন দেখিয়েছিল মানুষের প্রতি করুণা! গভীর জীবন-প্রেম আর শিল্প-চেতনা এখানে এক মহত্তর লোকে উন্নীত হয়েছে যার তুলনা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কুকুরের বেলায় 'সে' সর্বনামের ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো—এর অর্থময় তাৎপর্যও রীতিমতো বিস্ময়কর। এ সভ্যতার খপ্পরে পড়ে মানুষ অমানুষ হয়ে গেছে, নেমে গেছে পশুর স্তরে কিন্তু প্রতিভার জাদুমন্ত্রে কুকুর উঠে গেছে মানবলোকে। 'সে কুকুর বলেই'...কথাটা সামান্য অর অতি সরল অথচ কি ইংগিতগর্ভ!

হানিফ গরিব চাষী—প্রাণপণ খেটে পৈত্রিক জমির ভগ্নাংশ সাড়ে সাত গণ্ডাকে সে এখন পৌনে এক কানিতে বাড়িয়ে তুলেছে, তার চোখে-মুখে সর্ব অবয়বে গতরখাটা চাষীর ফসলের স্বপ্ন। "বৌয়ের মধ্যে কালা-বৌ, গাইয়ের মধ্যে কালা গাই আর মাটির মধ্যে কালা মাটি। এরাই সেরা, এরাই খাঁটি"—হানিফের এ একমাত্র জীবনদর্শন। এ জীবনদর্শন এখন ভেঙে চুরমার। সচ্ছলতার স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি স্বপ্ন একটি নতুন ধরনের ক্ষীণ আশাও যেন তার মনে উঁকিঝুঁকি মেরেছিল। তাই একমাত্র বেঁচে-থাকা পুত্র জোহাকে সে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল গ্রামের স্কুলে। স্কুল মানে—'ভাঙা-বেড়া, ভাঙা টুল-চেয়ার। গোয়াল মতো স্কুলটা, এককালে এর যথেষ্ট সুনাম ছিল। এখান থেকে দু'তিন জন 'জুয়েল' বেরিয়ে গেছে, তারা এখন বড় অফিসার।" 'জুয়েল' শব্দটায় যে ধারাল ব্যঙ্গের তির্যকভঙ্গি রয়েছে তাতে তিক্ততা নেই আছে পরিহাসের মর্মভেদি খোঁচা।

স্কুল যাই হোক মাস্টারটি কিন্তু খাঁটি শিক্ষক। একদিন এসে হানিফের বৌকে বল্লেন : 'পোলাডারে একটু দেইখ্যো জহুর মা। মাথা ভালা, লেহাপড়া কইরলে বহুত বড় অইতে পারব।' জহু জোহার পিঠাপিঠি বড় বোন—এগারো-বারো বয়স। জোহাকে লেখক এক সচেতন কিশোর হিসেবেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন, 'মাথা ভালা' এটা তারই ইঙ্গিত। সে অনুভূতিপ্রবণ, নির্যাতিত মানুষের কান্না দেখে বালক বয়সেই তার মনে প্রশ্ন জাগে : মানুষ কাঁদে কেন?

সোবান পণ্ডিতের সাধনা মানুষকে বড় করে তোলার, কচি কচি ছাত্রদের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন দেশপ্রেমের কবিতা, মহৎ চিন্তা আর উচ্চতর ভাবের নানা বাণী। আসলে পণ্ডিতের চোখের সামনে সব রকম মহৎ আদর্শ এখন ভেঙে খান খান, সব রকম নৈতিকবোধ ধুলায় লুণ্ঠিত। এমনকি প্রিয়জনের মৃত্যুতে কান্নার আবেগটুকুও আজ মানুষ হারিয়ে বসেছে, প্রথারক্ষার খাতিরে যে চক্ষুলজ্জায় সে হয়তো চেঁচায় খানিকক্ষণ—কাঁদে না, কান্নার উৎস যে হৃদয়, দেহের আগে সে হৃদয়েরই ঘটেছে মৃত্যু। জোহা বালক হলেও বুঝতে পারলো : 'লেখাপড়া শিখে কি হবে, স্কুলের মাস্টারদের তো কম বিদ্যে নেই। তারাও দু'বেলা খেতে পায় না, তার বাপ হানিফও এখন বুঝতে পেরেছে : উচ্চাশা দারিদ্রের ঘোড়ারোগ। মনুষ্যত্ব আর সমাজ-জীবনের এ সার্বিক অধঃপতনের সঙ্গে যে-বুদ্ধিজীবী মোকাবেলা করতে অক্ষম মস্তিষ্ক বিকৃতিই তার শেষ পরিণাম। সোবান পণ্ডিতেরও তাই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কবির কাব্য আর সৌন্দর্য-চেতনা, নিজের দেশ সম্বন্ধে অহমিকা আর নীতিধর্মের যত সব বুলি আজ তাঁর কাছে এক তির্যক পরিহাসমিশ্রিত ভঙ্গিতে পরিণত—জীবনের সব স্বপ্ন যেন এখন তাঁকেই ব্যঙ্গ করছে। তাই উরুতে তাল ঠুকে মুখভঙ্গি করে তিনি গাইতে থাকেন—'ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এ বসুন্ধরা।

তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা' ইত্যাদি।

গ্রামের দরবেশ চাচাও না খেতে পেয়ে মারা গেল একদিন—নিজের কুঁড়ে ঘরে, সকলের অজ্ঞাতে। যে দরবেশ চাচা দু'তারা বাজিয়ে : "লোককে দিনের পর দিন শুনিয়েছে মরমী গীতি, মারফতী, বাউল, বিচ্ছেদ; যার গানের একটি কলি : 'লাইলি আমায় ডাকে নিশিদিন, আমি যে তারই মজনু দীনহীন' তার জীবনের এ এক বিয়োগান্ত দিকেরই ইঙ্গিত। গ্রামের ক্ষীণ সংস্কৃতি ধারাটুকুও এবার নিঃশেষিত হলো দরবেশের সঙ্গে সঙ্গে। সমাজ-জীবনে যে মৃত্যু নেমে এলো তা মানুষকে শুধু ভাতে মারল না, মনের দিক দিয়েও দিলে ফতুর করে।

মৃত্যু আর অভাবের ঘা খেয়ে খেয়ে মানুষ আজ হৃদয়হীন পাষাণে পরিণত : "আজকাল বাপ মরলেও কেউ কাঁদে না। কিন্তু দরবেশ চাচার জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল। গ্রামবাসী যেন জমিয়ে রেখেছিল কিছু কান্না তার জন্য।" 'দরবেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সারা গ্রামটা ভিত্তিহীন হয়ে পড়ল'— লেখকের এ উক্তিও বিশেষ অর্থপূর্ণ। দেহের চেয়ে মন বড়—মনই মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে। গ্রামের মনটাকে এতকাল বাঁচিয়ে রেখেছিল গ্রামবাসীদের এ দরবেশ চাচা। সে দরবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা দিকও শেষ হয়ে গেল। এ ক্ষতি অপূরণীয়—অশিক্ষিত হলেও গ্রামের মানুষ এ সত্যটুকু যেন মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারল। এ কান্নার তাই এক বিশেষ অর্থ রয়েছে—এর প্রতীক মূল্য আরো অনেক বেশি। লেখক এখানে এমন এক প্রাজ্ঞচেতনার পরিচয় দিয়েছেন যার তুলনা অন্যত্র বিরল। আর এ পরিচয়টুকু ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন গুটি কয়েক অতি সহজ-সরল শব্দ—সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শব্দের অতিব্যবহার করেননি এতটুকু। বইটির সর্বত্র শিল্পীজনোচিত এ সংযম আর অসাধারণ পরিমিতিবোধ লক্ষ্য করবার মতো।

হানিফ আরো হাজারো চাষীর মতো এখন বাস্তুহারা। স্ত্রী ফাতেমা, কন্যা জহু আর পুত্র জোহাকে নিয়ে সেও এখন শহরের হা-ভাতের দলে। সে কিছুটা হাবা আর বেজায় সরল, তার বুদ্ধির ওপর ফাতেমার কিছুমাত্র আস্থা নেই। ওর বিশ্বাস এমন মানুষ শহরের রাস্তায় একা বেরুলে পথ হারিয়ে নিজেই যাবে হারিয়ে। এমন স্বামীর জন্য তার একদিকে যেমন দুর্বলতা তেমনি অন্যদিকে উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। ফাতেমার চরিত্রটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফাতেমা শহরে আসার পর এক বড় বাড়িতে রাঁধুনির কাজ পেয়েছে—মাইনে দেয় না, দেয় কিছু ভাত-সালুন। অস্থায়ী আস্তানা এক ঝুপড়িতে এনে সবাই মিলে তাই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খায়। জোহা সমবয়সী কয়েকটি বখাটে ছেলের সঙ্গে জুটে ঘুরে বেড়ায় আর বাজারে গিয়ে মিস্তি বা বাজার বওয়া কাজ করে। জহু এখনো কিশোরী হলেও এক বিত্তমান, যুদ্ধের বাজারে নতুন গজিয়ে ওঠা নানা ব্যবসায়ীর দ্বারা প্রথমে নির্মমভাবে ধর্ষিতা হয়ে পরে নিষিদ্ধ পল্লীতে হয়ে যায় চালান। এভাবে এক অমানুষিক নিষ্ঠুরতার খপ্পরে পড়ে সে হারিয়ে বসে তার কৈশোর—তার দেহ মনের পবিত্রতা। তার সমস্ত সত্তা ঘিন ঘিন করলেও সে খুঁজে পায় না পরিত্রাণের কোনো পথ। তার মতো আরো বহু হতভাগিনীর মতো তাকেও তার কচি দেহ বিক্রয় করতে হয় নানা জাতের সৈনিকদের কাছে। এ দুঃসহ যন্ত্রণার মূল্যটুকুও সে পায় না, পায় যে [illegible]

ব্যাধের মতো শিকার করে এখানে এনেছে সেই সরবরাহকারী। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে একটি নিষ্পাপ পল্লী-কিশোরীর জীবনে এভাবে নেমে এসেছে এক বীভৎস নরক-জীবন—ফলে ফোটার আগেই তার জীবনের আর যৌবনের কলি সভ্যতার বুটের তলায় এভাবে দুমড়ে থেঁতলে গেছে! এ যুগ নাকি সভ্যতার ক্রমোন্নতি আর জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্প্রসারণের যুগ, এ সম্প্রসারণশীল সভ্যতার বুটের তলাতেই এভাবে পিষে গেল একটি নিষ্কলঙ্ক অনাঘ্রাতা কুসুম।

ফাতেমার যা আশঙ্কা একদিন তা সত্যে পরিণত হলো। হানিফ পথ হারিয়ে আর ফিরতে পারলো না ঝুপড়িতে। ফাতেমার এ সময়ের মানসিক অবস্থাও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। হানিফ পথ হারিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল হঠাৎ এ সময় শহর পরিচ্ছন্নকারীদল তাকে দেখতে পেয়ে যতোসব ভিখারীদের সঙ্গে তাকেও মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা ফেলা ট্রাকে তুলে চালান করে দিলে শহরের বাইরে। কি করে সেখান থেকে ছিটকে পড়ে সে আবার এলোপাতাড়ি পথ চলতে শুরু করে, লক্ষ্য হয়তো শহর। শ্রান্ত-ক্লান্ত অভুক্ত পথ চলতি হানিফ ফসলের স্বপ্নে ক্ষণিকের জন্য তন্ময় হয়ে গিয়েছিল বুঝি হঠাৎ হুড়মুড় করে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো চলন্ত এক বাস কি ট্রাক্। এভাবে চোখের পলকে এক মর্মান্তিক অপঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল হানিফের দেহ শুধু নয়—ফসলের স্বপ্ন, সন্তানের স্বপ্ন সবকিছুই। এও এক প্রতীক— হানিফ বা হানিফ পরিবার তো একক নয়, তার মতো আরো হাজার পরিবার এ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের শিকারে পরিণত হয়ে এমনিভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। শেষে জীবনের চরম দেনা শোধ করে এরা এ পৃথিবী থেকে গেছে মুছে। সেদিন সাধারণ আর মেহনতি মানুষের জীবনে যে দুর্গতি নেমে এসেছিল, তাদের জীবনের শান্তি আর স্বস্তি শুধু নয় মূলশুদ্ধ যেভাবে দুমড়ে-মুচড়ে থেঁতলে গিয়েছিল গল্পের এ ধারায় তা হয়েছে বর্ণিত।

দ্বিতীয় ধারায় এসেছে হালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতীক হয়ে আলী মর্তুজা চৌধুরী আর তার পরিবার। এ দুই ধারা মিলেই আমাদের সমাজ। যারা আরো উচ্চ কোটির মানুষ তাদের সংখ্যা আর প্রভাব আমাদের সমাজে নগণ্য। এরা সমাজদেহে অনেকখানি পরগাছার মতো—নেপথ্য থেকে ক্ষমতার সূত্র কিছুটা টানতে সক্ষম হলেও এদের অস্তিত্ব তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয়। যখনকার পটভূমিতে এ গ্রন্থ রচিত তখন এরা মোটেও ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না।

শিক্ষা আর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজেও একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব-সম্ভাবনা তখন থেকেই দেখা দিচ্ছিল। এদের ছেলেমেয়েরাই আধুনিকতার দিকে এসেছিল এগিয়ে। সেদিন এরা নিজেরাও আজকের মতো কেউ এম.এল.এ. হয়েছিল, কেউবা মন্ত্রী আর কেউবা দেখছিল মন্ত্রিত্বের খোওয়াব। এদের ছেলে-মেয়েদের একটা দল আবার দেশ, সমাজ আর স্বাধীনতা সম্বন্ধেও হয়ে উঠেছিল আগ্রহান্বিত। মোটকথা, এরাই দেখা দিয়েছিল সমাজের সচেতন অংশ হিসেবে। কাজেই যুগের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে এদের স্থান অনিবার্য। যদিও দুই গল্পের দুই পৃথক ধারা আর মানুষগুলিও ভিন্ন জগতের তবুও একই পরিধিতে এদের স্থান না হ'লে সমাজের পূর্ণাঙ্গ চেহারা হয়তো ফুটে উঠত না। আমাদের সমাজ দাঁড়িয়ে আছে এ দুই কাঁধের

ওপর; কাঁধ দুটি সমান্তরাল নয়, তাই সমাজে নেই ভারসাম্য। শিথিলভাবে যাকে বুদ্ধিজীবী সমাজ বলা হয় তার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর মেহনতি মানুষের ব্যবধান দুস্তর। মেহনতি মানুষ যুগের শিকার আর এরা যুগের সন্তান, বলা যায় আদুরে সন্তান। এদের হালচাল মনোগড়ন আর দৃষ্টিভঙ্গি আদুরে ছেলের মতই—এরা নিজের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয় পদ আর পদবির দিকে নজর রেখে। এ সমাজেরই প্রতিনিধি আলী মর্তুজা চৌধুরী আর তার ছেলে রেজা—সে সংবাদপত্র আর বেতারে পরিবেশিত খবর শোনার জন্য একদম পাগল যেন তার জীবনটাই নির্ভর করছে ঐ খবরের ওপর। আবার এ সমাজ থেকেই দু'একটি ছেলে আরাম-আয়েশ আর নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধা কাটিয়ে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে, তারা সত্যসত্যই মানুষকে, দেশের স্বাধীনতাকে, সর্বোপরি সর্বহারা ক্ষুধিত জনতাকে ভালোবাসে। আদর্শের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে এরা প্রস্তুত, এরাই হাসতে হাসতে জেলে যায়, মুক্তির বাণী বুকে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকে, ভোগ করে অশেষ নির্যাতন। একদিন এদেরই বলা হতো প্রগতিশীল। সরকার আর সরকার সমর্থকরা এদের সন্দেহের চোখে দেখে; অন্যরা জানে এরাই খাঁটি দেশপ্রেমিক। এদেরই প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, রেজা আর লিনার মামাতো ভাই। আলী মর্তুজার কন্যা লিনা কলেজে পড়ে—ফল্গুধারার মতো তার মনে রয়েছে আলীর প্রতি আকর্ষণ, প্রেমও বলা যায়। গভীর হলেও তা বাঁধ-ভাঙা নয়। লিনার প্রতি আলীর আকর্ষণও চাপা—মোটেও সোচ্চার নয়। তার অবশ্য কারণ রয়েছে। আলী আদর্শনিষ্ঠ। আদর্শ থেকে এতটুকুও স্খলিত হ'তে সে রাজি নয়। রাজনৈতিক সহকর্মী যতীনের বোন সুজাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, আলীর যেন কিছুটা বেশি আকর্ষণ তার প্রতি— হয়তো আদর্শের সমধর্মিতারই এ ফল। আলী-সুজাতার প্রেমের ছবি তেমন স্পষ্ট ক'রে আঁকা হয়নি—তবে তার গভীরতা অনুমান করা যায়। যতীন এখন জেলে। তার বাবা অঘোর বাবু সফল আইনজীবী। কন্যার মনের খবর তিনি জানেন, আলীর মনের খবরও তাঁর অজানা নয়। প্রথম দিকে তাঁর মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল কিন্তু ইতিহাসের গতিধারা তিনি আঁচ করতে পারেন। স্বাধীনতা যেমন অবধারিত তেমনি দেশের বিভাগও অনিবার্য এ বুঝে নিতে তাঁর দেরি লাগেনি। অবস্থার চাপে পড়ে তাঁর মতো বুদ্ধিমান উদার প্রকৃতির লোকও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। শেষকালে মেয়ের প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে তিনি তৈরি ছিলেন। কিন্তু আলীর মনেও দ্বিধা কম নয়। লিনার প্রেমের গভীরতা তার অজ্ঞাত নয়—সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে রাজনীতি, রাজনীতির পথ দুর্গম। বিয়ে তার এ পথের অন্তরায় হতে পারে এ ভেবেই সে সংকল্প নিয়েছে সে বিয়ে করবে না। বয়সোচিত আবেগ-আকর্ষণ যতই থাক তার কাছে তার আদর্শ সব কিছুর ঊর্ধ্বে। সুজাতার খবর লিনার ভাই রেজাই লিনাকে পল্লবিত করে শুনিয়েছে। তাই আলীকে 'প্রিয় প্রতারক' এই অদ্ভুত সম্বোধন করে সে লিখছে তার শেষ চিঠি।

আলী মর্তুজা সাহেব মন্ত্রী হতে চান তাই 'মন্ত্রী-নির্মাতা' হাসেম সাহেবের ছেলে কন্ট্রাক্টর কাসেমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তিনি মেনে নিয়েছেন যদিও ভালো করেই জানেন কাসেম লিনার যোগ্য নয়। শুধু আলী মর্তুজা নয়, তাঁর ছেলে রেজারও স্বপ্ন মন্ত্রী হওয়ার। আলী মর্তুজা মনকে এ বলেই সান্ত্বনা দিয়েছেন: 'বন্য লোকেরা তো দেবতার

বেদিতে কন্যা বলিও দিয়ে থাকে।' অতএব মন্ত্রিত্বের বেদিতে কন্যা বলি দিতে তাঁর দ্বিধা থাকবে কেন? কন্যা যে সত্যি সত্যি বলি হবে তা তিনি অনুমান করতে পারেননি তখন।

তাকে কেউই বুঝল না—না বাবা, না ভাই, না আলী—মাও নির্বিকার অথচ এদের সকলের কাছেই তার মনের খবর জানা। এ অবস্থায় তার মতো আবেগপ্রবণ মেয়ের মনে একটা ক্ষুব্ধ অভিমান জাগা খুবই স্বাভাবিক। বাপের প্রস্তাবে মুহূর্তে সায় দেওয়ার পেছনেও রয়েছে তার এ অভিমান। আহত প্রেম, ক্ষুব্ধ অভিমান আর বাপ-ভাইয়ের লোভ— এ তিনের দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত, হৃদয় তার রক্তাক্ত। নিরপরাধ স্বামীর প্রাপ্য স্বামীকে সে দিয়েছে, বাসররাত্রে পরিতৃপ্ত স্বামী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন সে নিজের প্রাণ নিজে দিলে অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খেয়ে। আর মৃত্যু-মুহূর্তে গলায় পরলে আলীর প্রেরিত ফুলের মালা। লিনা হয়তো যুগের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই প্রতীক আর এ অন্তর্দ্বন্দ্বেরই বলি।

লিনার মৃত্যু প্রায় নাটকীয়—তবে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ নাটকের পটভূমি রচনা করেছেন। লিনার মনের দ্বান্দ্বিক ভাবটি অপরূপ। 'আমার গর্ব রইল কোথায়?' এ উক্তির মধ্যে লিনার আত্মহত্যার বীজ লুক্কায়িত। তার ধারণা সে সুজাতার কাছে হেরে গিয়েছে—তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে তার ভাই রেজা।

অথচ এ লিনাই— জোহা যখন বাপের অপঘাতে মৃত্যুর কথা ভেবে শোকের ভারে ভেঙে পড়ছে— তখন তাকে এ বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল : দুঃখকে ভয় করিসনে। দুঃখই আসল বন্ধু, সে তার দহনে পুড়িয়ে আমাদেরকে খাঁটি সোনা করে তোলে। এজন্য কবি গেয়েছেন, 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন পূর্ণ করো।' সুস্থ মনে যে উপদেশ পরকে দেওয়া যায় দুঃখে, অভিমানে আর ক্রোধে মন যখন দিশেহারা তখন নিজের উপদেশ নিজেই মানুষ যায় ভুলে। লিনারও হয়েছে সে দশা।

লেখক তাঁর এ উপন্যাসটিকে এভাবে দুই শাখায় ছড়িয়ে দিয়েছেন—আসলে এ দু'টি একটিমাত্র সমাজ বৃক্ষেরই শাখা।

বিপুল নৈরাশ্যের সামনে শুধু লিনাই দিশেহারা হয়ে নিজের প্রাণ নিজে নেয়নি, ভূগোল আপার মতো মেয়েও নিজের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে আত্মহত্যা না করে থাকতে পারেনি। পিতৃহীন ভাইবোনগুলিকে লেখাপড়া শিখিয়ে আগে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেবে এ আশায় প্রেমেও সে সাড়া দেয়নি দীর্ঘকাল। নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে চাকরি করে বোনদের বিয়ে আর ভাইদের প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে এবার যখন ভূগোল আপা নিজের দিকে তাকাবার ফুরসৎ পেল তখন দেখল সময় পার হয়ে গেছে, প্রেমের শুধু নয়, বিয়েরও। এত বড় নৈরাশ্য ভূগোল আপা সহ্য করতে পারল না, তাই মুক্তি খুঁজল আত্মহত্যায়।

আবেগপ্রবণ অভিমানী কলেজি মেয়ে লিনার পক্ষে যা স্বাভাবিক ভূগোল আপার মতো অমন দৃঢ় মনোবলের অধিকারিণীর, যে আবেগ বা ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেয়নি কখনো—আত্মহত্যা ঠিক সঙ্গত পরিণতি কিনা প্রশ্ন করা যায়। অতগুলি এতিম ভাইবোনদেরও জীবনে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে— এ গৌরব-বোধ জীবনকে তার সামনে আরো মোহনীয় করে তুলতে পারত। অবশ্য জীবনে এমন ঘটনা যে ঘটে না তা

নয় তবে সাহিত্যের ঘটা আরো অপ্রতিরোধ্য হওয়া চাই। নিজের হাতে গড়া ভাইবোনদের সফলতা আর সুখের জীবন ভূগোল আপার মনে কিছুমাত্র সুখের কি গর্বের ভাব জাগায়নি এ ভাবা যায় না। কোন দিক দিয়েই ও তো আত্মকেন্দ্রিক ছিল না—আর ত্যাগের জীবন তো ওর স্বনির্বাচিত। ভূগোল আপা ছোট চরিত্র কিন্তু স্পষ্ট এমনকি প্রত্যক্ষগোচর। ব্যক্তিত্বটা এর খুব উজ্জ্বল করে চিত্রিত বলে ওর অমন মৃত্যু মন সহজে মেনে নিতে চায় না।

যতীন-সুজাতার ছোট ভাই অরুণ এসে একদিন বড়বিবি তথা লিনার মাকে জানাল : আলীদা আজ দুপুরে অ্যারেস্ট হয়েছেন। ভুখমিছিল অর্গেনাইজ করবার জন্য স্ট্রিটকর্নার মিটিং করছিলেন। ব্যস তাতেই নেমে এলো হাতকড়া।

বড় বিবি অনেক আঘাত পেয়েছেন, স্বামী এম.এল.এ. হয়েই একটি তন্বী তরুণীকে বিয়ে করে কলকাতায় বাসা করে থাকে, তার ওপর মেয়ে লিনার মর্মান্তিক মৃত্যু। এ সব আঘাতে তিনি প্রায় হাবা-বোবা বনে গেছেন। কিছুই যেন এখন সহজে তাঁর মাথায় ঢোকে না। মনের মধ্যে সব যেন এলোমেলো হয়ে যায়। অরুণের বক্তব্য বালক ভৃত্য জোহাই তাঁকে বুঝিয়ে দিলে।

যাওয়ার সময় অত্যুৎসাহী অরুণ বলে উঠল : আমরা জানি এবং আপনিও জানেন, 'শিকল-পরা ছল এ মোদের শিকল-পরা ছল, শিকল পরেই শিকল তোদের করবোরে বিকল।'

এ কণ্ঠস্বরও আমাদের অপরিচিত নয়। নৈতিক অধঃপতনের সে চরম দুর্দিনে এও ছিল দেশের একটি অন্তঃসলিলা ধারা। ক্ষীণ হলেও এ ছিল খর-স্রোতা।

গল্পের শেষের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরুদ্দেশ লা পাত্তা বোনের খোঁজে কিশোর জোহা এসেছে চাটগাঁ— চাটগাঁ তখনো যুদ্ধ সীমান্ত। চারদিক গিজগিজ করছে সৈন্য— রাত নিষ্প্রদীপ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলতে হয় পথ—জানে অবস্থার খপ্পরে পড়ে বোনও তার আজ অন্ধকারের যাত্রী। এখানে ওখানে অনেক ছাউনি—এসব ছাউনিতে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত সৈনিকদের জন্য চাই খাদ্য—দৈহিক খাদ্য। এক জাতের কন্ট্রাক্টর সে খাদ্য সরবরাহ করে দিনের বেলা, রাতের বেলা সরবরাহ করে অন্য জাতের কন্ট্রাক্টার। উভয়ে রাতারাতি লাল—নতুন কড়কড়ে নোটের তাড়ায় উভয়ের পকেট তখন ফুলে কোলাব্যাং। এ সব জোহার শোনা ছিল—তাই বোনের তালাসে সে এসেছে নিষ্প্রদীপ শহরে। যেখানে মৃত্যু ওৎ পেতে আছে পদে পদে।

মৃত্যুর এ অন্ধকার বিভীষিকার মধ্যেও যে হঠাৎ জীবনের কান্না শুনতে পাবে এ তার কল্পনারও অতীত। এ জীবন আজ যতই অসহ্য আর ঘৃণ্য হোক এও তো জীবন যা এ গ্রহের সর্বোত্তম সম্পদ। ধ্বংস আর মহামারীর মাঝখানে এই তো জীবনের ধারাকে রেখেছে অব্যাহত—সৃষ্টি রহস্যের এ হয়তো বীজমন্ত্র।

দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী অন্ধকার পথে জোহা হঠাৎ শুনতে পেল নারীকণ্ঠের কাতরধ্বনি—কে গো তুমি? আমারে লইয়া যাও, হাসপাতালে লইয়া যাও।

এ শহরে জোহা আগন্তুক—হাসপাতালের পথ তার অজানা। দুঃসহ যন্ত্রণায় মেয়েটি কাৎরাচ্ছে। হয়তো সান্ত্বনা দিতেই ও বাড়িয়েছিল হাত। মুহূর্তে ওর একটি হাত গিয়ে লাগল তার বিরাট, সুডৌল বিবর্ণ ছেঁড়া কাপড়ে আংশিক আবৃত পেটের ওপর—তৎক্ষণাৎ

মায়ের পেটের কথা মনে পড়ল ওর, শুধু এবারই দেখে এসেছে তা নয়, আগেও দেখেছে কয়েকবার এবং জানে এর পরে অবস্থা কি...।

দাঁতে দাঁত চেপে যেখানে বসে পড়ল মেয়েটি তা পাতাল নয়, ধূলি-মাটিরই স্থান : একটি গাছের নিচে শুকনো পাতার সম্ভার। বেদনাকে ধরে রাখার জন্যে চাপা দাঁতের ভিতর থেকে আবার একটি পুরো কথা বেরিয়ে এলো : আমারে শক্ত কইরা ধরো।

এভাবে লাঞ্ছিত যুগের এক লাঞ্ছিতা জননীর গর্ভ বিদীর্ণ করে জন্ম নিল এক মানব-শিশু—যে মানব-শিশুকে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে আশরাফুল মখলুকাৎ—সৃষ্টির সেরা জীব, অভিহিত করা হয়েছে 'অমৃতস্য পুত্রা' বলে। হয়তো এ সত্য, জীবনে সবচেয়ে পবিত্র—হয়তো এও এক সূর্য, লাঞ্ছনা আর গ্লানির তিমির গর্ভে যার জন্ম।

দীর্ঘ দশ মাস ধরে যে ঘৃণা আর লাঞ্ছনার গ্লানির বিষ-বীজ সে নিজের দেহাভ্যন্তরে বহন করে ফিরেছে আজ তার হাত থেকে পরিত্রাণ-মুহূর্তে ধর্ষিতা জননী বিড়বিড় করে শুধু শুধাল : 'কুত্তার বাচ্চা অইচে? কুত্তার বাচ্চা?'

অবৈধ সন্তানের জন্যও জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে জননীকে সানন্দে পথের ভিখারিণী হতে দেখা গেছে। কিন্তু এ তো তা নয়। এ সন্তানের পেছনে বৈধ কি অবৈধ তার মনের কোন উত্তাপ, কোন বাসনা-কামনার বা আকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র সম্পর্কও ছিল না— নেইও। এ তো স্রেফ বলাৎকার আর ধর্ষণেরই জৈবিক পরিণতি। এর সবটুকুই অনিচ্ছা আর ঘৃণায় ঘেরা। এ তো তার সবচেয়ে পবিত্র আর সবচেয়ে সুকুমার আবেগ-অনুভূতিকে পেরেক-আঁটা বুট দিয়ে থেতলে দেয়া। এ যে স্রেফ কুকুর-বৃত্তি তা এ নগণ্যা নাম-না-জানা ভিখারিণী মেয়েটিরও সর্বসত্তায় প্রতিধ্বনিত। তার জীর্ণ-বস্ত্র আর শীর্ণ-দেহের অন্তরালে যে নারী সত্তাটি আজো বেঁচে আছে তার গভীরতম উপলব্ধি—মাতৃত্বের সহজ অধিকার। এ অধিকারকে জড়িয়ে আছে বাসনা-কামনার হাজারো উত্তাপ। যুগ যুগ ধরে এ অনুভূতিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পবিত্রতার এক সূর্যমণ্ডল। তার সে পবিত্রতাকে আজ লাঞ্ছিত আর পদদলিত করে তার সত্তার সূর্যটাকে নিভিয়ে দিয়ে তাকে টেনে-ছেঁচড়ে নামিয়ে এনেছে কুক্কুরীর পর্যায়ে। তাই জননীর সর্বোত্তম ধন আজ তার সব ঐশ্বর্য, সব উত্তাপ হারিয়ে তার সামনে দেখা দিয়েছে রিক্ততার এক অবিমিশ্র ঘৃণার রূপ নিয়ে। তার উপলব্ধিতে মাতৃত্বের এতটুকু উত্তাপও আজ অবশিষ্ট নেই। উপরে কুকুর-সভ্যতার কাছে মানব-সভ্যতার পরাজয়ের যে ইংগিত করেছি গ্রন্থশেষে তার প্রতীক চেহারাটা আরো স্পষ্টতর। 'কুত্তার বাচ্চা অইচে? কুত্তার বাচ্চা?' এ তো একটা জননীর নয়—উপন্যাসে বর্ণিত যুগটারই প্রতিধ্বনি। মর্মভেদি ঘৃণার এক অতুলনীয় অভিব্যক্তি! এ সামান্য ঘটনা আর সামান্য কয়টি কথায় যে গভীর অর্থারোপের ইংগিত রয়েছে তাতে লেখকের শিল্পচেতনা আর জীবনবোধ মুহূর্তে হয়ে উঠেছে উদ্ভাসিত। একে কুকুর-সভ্যতা বলেছি বটে কিন্তু লেখকের অসাধারণ শিল্প-পরিমিতি-বোধ কুকুরকেও অমানুষ হতে দেয়নি—ক্ষুধিত মানুষের প্রতি কুকুরের মনেও সঞ্চারিত করে দিয়েছে একটু করুণা। কুকুরটা—'শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে চলেই গেল'— সাধারণ এ কয়টি কথায় এসেছে এক অসাধারণেরই ইংগিত। হতে পারে যুগের প্রতি এ এক তিক্ত ব্যঙ্গেরই অভিব্যক্তি!

এ নবজাতকের পেছনে যে তিক্ত ঘৃণার ইতিহাস তা তো বালক জোহার অজানা।

শিশু আকাঙ্ক্ষিত, কাম্য, সুন্দর আর আনন্দেরই দূত। এ তার স্বল্পপরিসর জীবনের অভিজ্ঞতা, এ তার আশৈশবের সংস্কার—এটুকুই সে জানে, এ সে দেখে এসেছে নিজেদের আর প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে। তাই এ অজ্ঞাতনামা জননীকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে সে বল্লে : 'না, না, মাইনষের বাচ্চা। সকাল হইলে দেইখ্যো, বেশ সুন্দর।'

সত্যই তো মানব-শিশু সব সময় সুন্দর। পঙ্কজ কথাটা নিসর্গের বেলায় অবাস্তব অর্থহীন কিন্তু মানুষের বেলায় তা সত্য। শত আবিলতা আর ঘৃণা-লাঞ্ছনার মধ্যেও যে শিশুর জন্ম সেও নিয়ে আসে একটি নবজীবনের অঙ্কুর—নিয়ে আসে একটি নতুন সূর্যের সম্ভাবনা। এ সম্ভাবনাটুকুই শিশুর সব সৌন্দর্যের মূল উৎস—জন্ম তার ধুলামাটিতে কি রাজপ্রাসাদে যেখানেই হোক।

জোহা এতসব ভেবে কথা বলেনি—সে সরলমনে তার নিজের অভিজ্ঞতাটুকুরই শুধু দিয়েছে জানান, নবজাতকের জন্য জননীর গর্ব আর আনন্দ ছাড়া এমন বিপরীত মনোভাব তার অভিজ্ঞতার বাইরে। তাই মেয়েটির মুখের কথায় সে 'থতমত খেয়েছে।' এ-হতচ্ছাড়া যুগটাই এ সরল কিশোরকে এমন একটা অদ্ভুত অবস্থার মুখোমুখি এনে ছেড়ে দিয়েছে!

মনে হয় এ উপন্যাসের এখানে শেষ নয়। জোহা আর আলীর চরিত্রে সম্ভাবনার যে ইংগিত রয়েছে তা হয়তো বেড়ে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হয়ে উঠবে এ বইয়ের ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলিতে। তবুও একটি সফল উপন্যাস পাঠের যে আনন্দ তাই শুধু এখানে জানালাম। পূর্ব পাকিস্তান উপন্যাসে আজও দরিদ্র এ আমাদের জানা, আর এজন্য আমাদের ক্ষোভেরও অন্ত নেই। স্বাধীনতার পর আমাদের যে কয়টি উপন্যাস লেখা হয়েছে 'ক্ষুধা ও আশা' নিঃসন্দেহে তাতে এক বিশিষ্ট স্থানের দাবি রাখে। পরিধি, গঠন-কৌশল আর চরিত্র অঙ্কনের দিক দিয়ে এর জুড়ি নেই। ছোট-বড় প্রত্যেকটি চরিত্র স্পষ্ট, স্বতন্ত্র আর প্রত্যক্ষগোচর। কোন চরিত্র ঝাপসা বা অচেনা নয়। তার ওপর ভাষা আর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা পূর্ব পাকিস্তানি আমেজ ছড়িয়ে রয়েছে যে তা অন্যত্র দুর্লভ—বইটির এ ভাষাও বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। 'পেট পোড়ানি, বেচশম, বাঘের মতো রোদ আদাওতি, হুড়মুড় করে দৌড়ে আসে। গুমুর গুম্‌মুর বিরল, এক্কিন বেচইন ভাইল দিয়ে চলা, দিশবিশ না পাওয়া—এমনতর খাস বহু পূর্ব পাকিস্তানি শব্দ আর প্রকাশশৈলী এ রচনার গায়ে মিশিয়ে দিয়েছে নতুন স্বাদ। এর ফলে ভাষাও হয়ে উঠেছে অধিকতর বাস্তবধর্মী আর ঘরোয়া।

এ বইতে আরো দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর : এক লেখকের ব্যাপক সাহিত্য পাঠ আর যথাস্থানে তার প্রয়োগ। ফলে স্থানবিশেষে বাস্তবতার স্থূল চিত্র আঁকতে গিয়েও লেখক তাঁর স্বাভাবিক মননশীলতা কোথাও খোয়াননি। দ্বিতীয়, পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবন, তার সংস্কার-সংস্কৃতি আর জীবনধারার সঙ্গে লেখকের গভীর পরিচয়। মেয়েলি নানা বুলি আর ঘরোয়া যত সব প্রবাদ লেখক এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা শুধু যে বেমানান হয়নি তা নয় কাহিনীর সঙ্গে পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধনেও তা যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এর ফলে ঘটনা আর চরিত্র যেন গায়ে গায়ে মিশে গেছে।

লেখক এক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এ উপন্যাসে—প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন ঘটনা আর চরিত্রের গভীরে। গভীরতর উপলব্ধির ফলে তাঁর কোন কোন কথা প্রায় আপ্তবাক্য হয়ে উঠেছে। যেমন, সান্ত্বনা কান্নার প্রেরণা, উচ্চাশা গরিবের ঘোড়ারোগ,

খাদ্যবস্তু মাত্রই মারাত্মক, সত্য মানেই সংগ্রাম, সে জীবন দেওয়া নয়, জীবন সৃষ্টি করা, আলো দিয়ে আলো জ্বালা, আকাশ আর মাটি দুই একটি চাকায় বঁধা, স্বপ্ন বলেই এত পূর্ণ, বিশ্বাস যতই অন্ধ হোক তার মূল্য অপরিসীম, প্রেম কথা বলে না, কথা তোলে—হারিয়ে যায় না, নিজেকে হারায়। মানুষকে বাঁচানো সবচেয়ে বড় যুদ্ধ, যে বাঁচতে জানে না তার মরে যাওয়াই ভালো, গরিবের দুনিয়াও নাই আখেরও নাই—এমন অজস্র অর্থপূর্ণ কথা এ বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

ছোটখাটো পার্শ্ব ঘটনা আর চরিত্রের বেলায়ও লেখক যে অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব অধ্যয়নের পরিচয় দিয়েছেন তাও নির্ভুল এবং উপভোগ্য হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চতর ভাবাবেগে লেখকের ভাষা কাব্যধর্মী এমনকি রোমান্টিক ঘেঁষাও হয়ে উঠেছে—তবে লেখক কোথাও বেসামাল হয়ে আবেগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি, হারাননি পরিমিতিবোধ। অতিরিক্ত বস্তু নির্ভরতার তাগিদে কোথাও কোথাও তিনি যে কিঞ্চিৎ স্থূল হয়ে পড়েননি তা নয় তবে তা দু'একটি ক্ষেত্রেই সীমিত।

বইটি সিরিয়াস কিন্তু নীরস নয়। চাপা আর সূক্ষ্ম পরিহাসের এক তির্যক ভঙ্গি লেখক আগাগোড়া বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বইটির এও এক বড় আকর্ষণ। তবে এ রস গ্রহণের জন্য পাঠককেও কিছুটা রসিক হতে হবে।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানুষের সৌন্দর্যবোধকে যেমন তৃপ্তি দেয় তেমনি উদ্বুদ্ধ করে তোলে মহৎ ভাব আর আদর্শকেও। 'ক্ষুধা ও আশা' অনেকখানি সে পর্যায়ে উন্নীত। এ বই পড়ে আমার মনে এ আশা জাগে যে, যে অখণ্ড জীবনবোধ থেকে মহৎ শিল্পকর্মের জন্ম একদিন এ লেখকের হাত থেকে তা হয়তো আমরা পাব।

মাতৃভাষার দাবি ও একুশে ফেব্রুয়ারি

॥ ১ ॥

দেশের ইতিহাস নতুন করে তৈরি হচ্ছে—লেখা হচ্ছে নতুন করে। এ নতুন ইতিহাসের উপাদান চাই। চাই লেখার নতুন উপকরণ। এটা দেশের প্রাণের, দেশের অন্তরের উদাত্ত আহ্বান। একমাত্র জীবন্ত ও মহৎ জাতিই জোগাতে পারে এ উপাদান ও উপকরণ।

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রমাণ করেছে আমরা জীবন্মৃত নই, নই আমরা মহত্ত্ব-ভ্রষ্ট। আমরা ইতিহাস রচনা করতে পারি, পারি নতুন করে ইতিহাস সৃষ্টি করতে। আমরা প্রাণবান মানুষের মতো বেঁচে আছি, জানি বাঁচতে, প্রয়োজন হলে মরতেও পারি, জানি কি করে জীবন দিতে হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ইতিহাসের শুধু স্মরণীয় উপাদান নয়, আমাদের তরুণদের রক্তে-লেখা এক স্বর্ণ-স্বাক্ষরও। কিন্তু মহৎ জাতি শুধু একটি ইতিহাস রচনা করেই সন্তুষ্ট থাকে না—একটি উপাদান ভাঙ্গিয়ে তারই চর্বিত চর্বণ করে সে পায় না তৃপ্তি। অপদার্থ ও অকর্মণ্য সন্তানই শুধু পৈতৃক পুঁজির ওপর নির্ভর করে জীবন উজাড় করে দেয়। বলিষ্ঠ ও আত্মমর্যাদাবান সন্তান নিজেই রোজগার করে নিজের জীবিকা এবং এভাবে নিজেই করে নিজের জীবন রচনা।

তাই একুশে ফেব্রুয়ারির এই স্মরণীয় দিনে আমাদের তরুণদের নতুন করে শপথ গ্রহণ করতে হবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার—ইতিহাসের দেওয়াল-পঞ্জিতে এ রকম আরও অসংখ্য স্মরণীয় তারিখ সংযোজনার। শুধু একটি তারিখের মধ্যেই কি আমাদের ইতিহাস আটকা পড়ে সীমিত হয়ে থাকবে?

এ প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে—এ প্রশ্নের জবাব আমাদের তরুণদের দিতে হবে। এ জবাবের ওপর নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাস।

যে জাতির ইতিহাসে অসংখ্য স্বর্ণ-স্বাক্ষর পড়েনি, একটিমাত্র স্মরণীয় তারিখের জাবর কেটেই যাদের বার্ষিক চক্রাবর্তন, সে জাতি অত্যন্ত হতভাগ্য, তারা ইতিহাসের করুণার পাত্র।

একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণীয় শহীদদের স্মৃতি আমাদের এ প্রেরণা দিক, আমরা ইতিহাসের পাতায় হতভাগ্য ও করুণার পাত্র হয়ে থাকব না—আমাদের জাতীয় জীবনের খাতায় আমরা নব নব স্মরণীয় তারিখ সংযোজন করব।

মাতৃভাষার দাবি, স্বভাবের দাবি, ন্যায়ের দাবি, সত্যের দাবি—এ দাবির লড়াইয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদেরা প্রাণ দিয়েছেন, প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন স্বভাবের ব্যাপারে, ন্যায় ও সত্যের ব্যাপারে কোন আপোষ চলে না, চলে না কোন গোঁজামিল। জীবন-মৃত্যুর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই হতে হয় তার সম্মুখীন।

যে-কোন জাতির জন্য সবচেয়ে মহৎ ও দুর্লভ উত্তরাধিকার হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয়ী

উত্তরাধিকার—মরতে জানা ও মরতে পারার উত্তরাধিকার। একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদেরা জাতিকে সে মহৎ ও দুর্লভ উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। দেশ ও দেশের ইতিহাস তাঁদের কাছে ঋণী—থাকবে চিরঋণী হয়ে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আমাদের ঐতিহ্যে পরিণত। এ ঐতিহ্য থেকে আমরা প্রেরণা সংগ্রহ করব, সঞ্চয় করব শক্তি ও সাহস। কিন্তু আমাদের পদক্ষেপ হবে সামনের দিকে, দৃষ্টি থাকবে ভবিষ্যতের পানে এবং আমরা এগিয়ে যাব মহত্তর ত্যাগের নবতর সংকল্প বুকে নিয়ে। এভাবে ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত হবে আরও নতুনতর স্মরণীয় তারিখ, তাহলেই একুশে ফেব্রুয়ারি তথা শহীদ দিবস পালন হবে সার্থক।

আজ আবার নতুন করে আমাদের তরুণেরা শপথ গ্রহণ করুক আমরা কখনও মিথ্যার কাছে, অন্যায়ের কাছে, শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব না, করব না মাথা নত।

সব রকম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা গড়ে ওঠে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করেই—মানুষের সব রকম অনুভূতি ও কল্পনা, ভাব ও আদর্শ, মনের আকুতি ও আত্মার ব্যাকুলতা প্রেরণা পায় ও রূপায়িত হয়ে ওঠে মাতৃভাষার মাধ্যমেই। তাই ধর্মপ্রচারকরাও মাতৃভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি করেননি অস্বীকার। মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ সগৌরবে ঘোষণা করেছেন : "আমি আরব, আমার ভাষা আরবি।" তাঁর অনুকরণে আমরাও সগৌরবে ঘোষণা করছি : "আমরা বাঙালি আমাদের ভাষা বাংলা।" হজরতের "আমি আরব, আমার ভাষা আরবি"—এ উক্তির সঙ্গে ইসলাম ও তার বিশ্বজনীনতার যেমন কোন বিরোধ নেই, বরং ইসলামের বিচিত্র ভাবরাজি তাঁর মাতৃভাষা আরবিতে রূপায়িত হয়ে তাকে এক অপূর্ব সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে—তেমনি আমাদের 'আমরা বাঙালি, আমাদের ভাষা বাংলা'—এ উক্তির সঙ্গে ইসলামের বা পাকিস্তানের আদর্শের কোন বিরোধ নেই, নেই কোন অসঙ্গতি। বরং ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শ বাঙলা ভাষায় আরও বেশি করে রূপায়িত হয়ে শুধু যে এ ভাষাকে সমৃদ্ধতর করবে তা নয় ইসলামের আর পাকিস্তানের আদর্শকেও জনগণের কাছে আরও বেশি পরিচিত ও সহজবোধ্য করে তুলবে। পাঞ্জাবিরা পাঞ্জাবি হয়ে, পাঠানেরা পাঠান আর পস্তুভাষী হয়ে আর সিন্ধিরা সিন্ধি হয়ে আর সে পরিচয় রক্ষা করেও যেমন পাকিস্তানের নাগরিক ও তার অঙ্গ, তেমনি আমরা বাঙালি আর বাংলাভাষী হয়েও পাকিস্তানের নাগরিক ও তার অচ্ছেদ্য অংশ। পাকিস্তানের সামগ্রিক রূপরেখা আর ধারণার সঙ্গে এ চেতনাবোধের কোন বিরোধ নেই। হাত আর পা আলাদা, নামে এবং অবয়বেও—এ কথা বল্লে বা স্বীকার করলে হাত ও পা-কে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতলবেই তা করা হচ্ছে বলে যদি কেউ সন্দেহ করেন তাহলে তেমন লোকের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কি সন্দেহ হয় না? মুশকিল—আমাদের দেশে সুস্থ লোকও যখন ক্ষমতার আসনে বসেন তখন রীতিমতো প্রলাপ বকতে থাকেন। তখনই তা দেশের জন্য আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। পাগলকে হয়তো সহজেই উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু পাগলের হাতে যদি লাঠি আর প্রস্তরখণ্ড থাকে তাহলে নিরীহ পথচারীদের বুকটা দুরু দুরু না করে পারে না।

কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে— যাদের বুক রাইফেল বন্দুক-সঙ্গীন-বুলেট দেখে দুরু দুরু করে না। এরা ব্যতিক্রম আর এ ব্যতিক্রমরাই রচনা করে ইতিহাস। একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদরাও ব্যতিক্রম। তাই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তাঁরা মাতৃভাষার দাবি

ছাড়েননি—ছাড়তে পারেননি। তাঁরা নিজের প্রাণ ও জীবনের মায়া ছেড়েছেন কিন্তু মাতৃভাষার দাবি ছাড়েননি। সে দাবির বেদিমূলে তাঁরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাণটুকু দু'হাতে রক্তপদ্মের মতো উপহার দিয়েছেন।

ইতিহাসের দুর্গম পথে প্রত্যেক জাতির জীবনেই সঙ্কট-মুহূর্ত আসে—সেই সঙ্কট-মুহূর্তের মোকাবেলা করেই জাতি নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করে—আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। জীবনের গতানুগতিকতায় জাতির জীবনে আত্মবিস্মৃতি নেমে আসে, নেমে আসা স্বাভাবিক—তখন জাতি ভুলে যায় মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদা, সহানুভূতি ইত্যাদি মহৎ গুণ। সংকট জাতির সামনে নিয়ে আসে এ সব মহত্ত্বকে নতুন করে আবিষ্কারের সুযোগ। এ সুযোগ যে জাতি গ্রহণ করতে পারে তারা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকে। যারা পারে না তারা ও তাদের নাম মুছে যায় ইতিহাস থেকে। তারা বাঁচে না, দেহের সঙ্গে প্রাণটাকে শুধু টিকিয়েই রাখে।

গত মহাযুদ্ধে ইংল্যান্ডের ওপর শিলাবৃষ্টির মতো বোমা পড়েছে, মরেছে হাজার হাজার নর-নারী, তবুও ইংরেজ পরাজয়ের কথা, আত্মসমর্পণের কথা মনের ত্রিসীমানায়ও স্থান দেয়নি। নেতা দু'আঙ্গুল তুলে যে V দেখিয়েছিলেন অগণিত প্রাণের বিনিময়ে সে V তথা Victory বা বিজয় তারা ভাগ্যের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। এভাবে ইংরেজ সেদিন নতুন করে নিজের মনুষ্যত্ব, আত্মশক্তি ও বীর্যের সন্ধান পেয়েছিল। তেমনি স্তালিনগ্রাডের সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে রাশিয়া, আর চুংকিং-এর সংগ্রামে চিন নূতন করে আবিষ্কার করেছিল নিজের জাতীয় মর্যাদা ও আত্মশক্তি। পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে জেল, ফাঁসি, নির্বাসনের সামনে দাঁড়িয়ে এ উপমহাদেশের মানুষ খুঁজে পেয়েছিল তার আত্মত্যাগ-শক্তি, তার মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদা। এই বীর্যবন্ত মনুষ্যত্বের সামনে অত বড় ব্রিটিশ-সিংহকেও মাথা নত করে লেজ গুটাতে হয়েছে। আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত বিশ্ব ইতিহাসের এসব ঘটনা ও তার দৃষ্টান্ত স্মরণীয়। এর থেকে আমাদেরও পাঠ গ্রহণ করতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদেরা সে পাঠ গ্রহণ করেছিল।

স্বাধীনতার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাদ দিলে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষার ওপর হামলাই হচ্ছে মানুষের তৈয়ারি সবচেয়ে বড় সংকট। আমাদের তরুণরা সে সংকটের সম্মুখীন হয়ে জাতির জন্য নূতন করে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বকে আবিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের সামনে যে মহাসংকট নেমে এসেছিল, আমাদের তরুণরা অকুতোভয়ে সে সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন ও সে পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত করেছেন।

আজ আবার নূতন করে আমাদের তরুণদের শপথ গ্রহণ করতে হবে —মাতৃভাষার দাবির জন্য আবারও যদি প্রাণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, প্রাণ দেওয়ার জন্য লোকের অভাব হবে না। আবারও তরুণরা দলে দলে এগিয়ে আসবে প্রাণ দেওয়ার জন্য, কার আগে কে দেবে সেজন্যে করবে প্রতিযোগিতা।

একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের প্রাণদান ব্যর্থ হয়নি। বলাবাহুল্য কোন আত্মত্যাগই ব্যর্থ নয়। সভ্যতার ভিত রচিত হয় আত্মত্যাগের ওপর! তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন বলেই

মাতৃভাষার দাবি আজ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মর্যাদা পেয়েছে। তাঁদের জীবন ও তাঁদের মৃত্যু দুই-ই সার্থক। আজ আমাদের বেদনার্ত হৃদয়ের একমাত্র প্রার্থনা : শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা শান্তি লাভ করুক।

॥ ২ ॥

দেশ বা জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য সম্ভারে দালানকোঠার সংখ্যায় আর সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বা রেডিও ছাড়িয়ে টেলিভিশনে পৌঁছলেই বড় হয় না। এই বাহ্য। বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিকবোধে, জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। দেশ আমাদের পুরানো বটে কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের নতুন, এখনো নবীন। এ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় সত্তা তা এখনো গঠনের মুখে— জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া তার ভিত্ কখনো শক্ত ও দৃঢ়মূল হতে পারে না।

কেতাবের কালো অক্ষরের বাঁধন ছিঁড়ে এ মূল্যবোধ যদি জীবনাশ্রয়ী না হয়, যদি ছড়িয়ে না পড়ে সমাজদেহে—যদি একে তুলে রাখা হয় স্রেফ পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মগজের তাকে তাকে তাহলে জীবন-সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে জাতি হিসাবে আমরা হয়ে পড়ব এক হাওয়াই দুর্গের তালপাতার সেপাই শুধু।

এমন সেপাই দিয়ে জেতা যায় না জীবনের কোন যুদ্ধই। এমন মানুষ নিয়ে যে জাতীয় সত্তা বা জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠবে তা হবে দুর্বল—ভঙ্গুর আর নড়বড়ে। এমন জাতি মহৎ কাজের অযোগ্য। তাই সব রকম মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে হয় ব্যবহারিক জীবনে। করে তুলতে হয় প্রত্যক্ষ আর বাস্তব। তখন তা হয়ে ওঠে জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার আর জাতীয় মহত্ত্বের প্রতীক। নানা স্বার্থের সংঘাতে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় নানা সমস্যা—নানা সংকট, ক্ষমতালোভীদের দ্বন্দ্ব এতে জোগায় ইন্ধন। নবীন রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি বলে এখানে অকারণে এরা ডেকে আনে সংকট, হয়ে দাঁড়ায় এরা জাতীয় অগ্রগতির পথে অন্তরায়।

মূল্যবোধের যে হাতিয়ার সে হাতিয়ার দিয়েই এসব সংকটের যেমন তেমনি লোভী নেতৃত্বেরও করতে হয় মোকাবেলা। মূল্যবোধ নিয়ে চলে না কোন রকম আপোষ রফা। তাই ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় এ মূল্যবোধ রক্ষার সংগ্রামে শহীদ হয়ে অনেকে হয়েছেন অমর। এ শহীদের সংখ্যা যে জাতিতে যত বেশি তারা তত বড়। আমাদের এ আঠারো বছরের সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রীয় জীবনেও আমাদের তরুণরা, আমাদের ছাত্ররাও বারে বারে মৃত্যুপণ করে এ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে—প্রতিষ্ঠা করেছে আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত। এ সংগ্রাম শুধু জাতীয় নয়—মানবিকও। কারণ প্রতি মানুষের ভিতরে যে মানবতা তারও তো ভিত রচনা এ মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনার ওপর। মূল্যবোধ মানে সত্য-বোধ—আমাদের ইতিহাসে ২১শে ফেব্রুয়ারি অমর হয়ে আছে এ সত্য-বোধের এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তরূপে। এ দিনে এগিয়ে এসেছিল আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজ জীবনের মূল্যবোধ আর সত্য রক্ষায়। এ এক মহৎ উত্তরাধিকার। এ শুধু এ যুগের জন্য নয়, আগামী দিনেরও এক মহৎ সম্পদ। আমাদের এ সবুজে-ছাওয়া প্রিয় দেশে আগামীতে যারা জন্মাবে—পেছন ফিরে তাকালে তারা দেখতে পাবে এদেশের ইতিহাসের আকাশে

একুশে ফেব্রুয়ারি একটি উজ্জ্বল তারা হয়ে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে তাদের চোখের সামনে। সে তারার আলোয় তারা দেখতে পাবে মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে কি করে এগিয়ে যেতে হয় সত্য আর মনুষ্যত্বের সংগ্রামে।

জয় হোক সত্যের, জয় হোক মনুষ্যত্বের—জয় হোক সংগ্রামী তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের।

শিক্ষার প্রথম শর্তই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—এ উদ্বোধন হোক আরো ব্যাপক, আরো সার্বজনীন।

॥ ॥

যেখানে জীবনের দাবি আর প্রয়োজন সাক্ষাৎভাবে জড়িত সেখানে কোন আপোষ নেই, সেখানে জীবন দিয়েও জীবন-সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জীবন-সত্য মানে যা জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক, যা জীবন বিকাশের সহায়ক। ভাষা ছাড়া মানুষ, মানুষ হতে পারে না—ভাষার সোপান পরম্পরা পার হয়েই আদিম বন্য মানুষ আজ সভ্য মানুষে পরিণত। তার আশা আর অভীপ্সা যে আজ চন্দ্র আর মঙ্গলগ্রহের অভিযাত্রী তার মূল উৎস-মুখ ভাষা। ভাষাকে আশ্রয় করেই মানুষের মন লালিত-পালিত ও বিকশিত। তার সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম সব কিছুই ভাষা-আশ্রিত। তাই ভাষার দাবি, জীবনের দাবি, মনুষ্যত্বের দাবি। এ দাবির সংগ্রামে তাই মানুষ কখনো নতি স্বীকার করতে পারে না। আমরা তথা আমাদের তরুণরাও তাই নতি স্বীকার করেনি—তারাও জীবন দিয়েই জীবন প্রতিষ্ঠা করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি সে প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন আমাদের ইতিহাসে তাই চিরস্মরণীয়। এ এক আমাদের শাশ্বত উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকারের জন্য আমরা একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের কাছে ঋণী।

এ উত্তরাধিকারের অর্থ ও তাৎপর্য যদি আমরা অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা না করি আর সেভাবে ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ না করি তাহলে এ দিবস পালনের আসল উদ্দেশ্যই হয়ে যাবে ব্যর্থ।

স্রেফ খাওয়া-পরা বা ভাত-কাপড় মানুষকে মানুষ করতে পারে না। মানুষের অন্তর্জীবন, ভাব-জীবন তথা মন-মানসকে কেন্দ্র করে যে জীবন, তাই মানুষকে করে তোলে মানুষ। ভাষা এসবের একমাত্র বাহন আর সে ভাষা যে মাতৃভাষা তাতে দ্বিমত নেই পৃথিবীব্যাপী কোথাও। তাই ভাষার দাবি ও সংগ্রাম যুগপৎ ব্যক্তিগত ও জাতিগত।

একুশে ফেব্রুয়ারি এ দাবির কথা আমাদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় আর স্মরণ করিয়ে দেয় প্রয়োজন হলে এ দাবির লড়াইয়ে আমরাও যেন প্রাণ দিতে পেছপাও না হই। আমাদের ভাষার ওপর আবারও যদি আঘাত আসে আমরা আবারও প্রাণ দিতে এগিয়ে যাবো। একুশে ফেব্রুয়ারির এ দাবি আর এ বাণী—আমাদের সকলের প্রতি।

যে কোন মহৎ দাবি ও উদ্দেশ্যের পেছনে ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস অনিবার্য আর তার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু স্রেফ আবেগ-উচ্ছ্বাস আর বক্তৃতা-স্লোগানেই যদি তার সমাপ্তি ঘটে তাহলে মশা মারতে কামান দাগার শামিল হয়ে পড়ে—তাতে মশাও মরে না আর অনর্থক গোলা-বারুদের ঘটে অপচয়। আবেগ, উচ্ছ্বাস ও শক্তির অকারণ অপব্যবহারে পরিণত হতে বাধ্য যদি না, তা বাস্তবভিত্তিক হয়। তাই যে কোন দাবির

শুধু স্বীকৃতি কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হতে পারে না যদি তার পেছনে যথেষ্ট আন্তরিকতা আর বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা না থাকে। শুধু পরিকল্পনা নয়—সে পরিকল্পনাকে ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা না হলে কোন দাবির লড়াই যথার্থ সার্থকতায় পৌছতে অক্ষম। আমরাও আমাদের দাবির লড়াইয়ে জিতেছি—আমাদের ভাষার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এ ভাষাকে প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী করে আজো আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, আজো আমাদের ভাষা আমাদের জীবনের সর্বস্তরে পায়নি ঠাঁই। এর জন্য দায়ী আমরা নিজেরা—যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারাই। আমরা আজও আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে আমাদের জীবনের সামগ্রী করিনি। আমাদের দেশে, আমাদের রচিত সাহিত্যের প্রতি আমাদের অনেকের আজো একটা উন্নাসিক মনোভাব রয়েছে। যার ফলে ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও বিকাশ হতে পারছে না ত্বরান্বিত। ইংরেজ তার ভাষার বই-পুস্তককে যতখানি ভালবাসে আমরা আমাদের ভাষার বই-পুস্তককে তার শতাংশও ভালোবাসি না। ইংরেজের ঘরে ইংরেজি বই-পুস্তক আর জার্নেল-ম্যাগাজিন চারদিকে ছড়িয়ে থাকে—আমাদের কয়টা শিক্ষিত বিত্তবানের ঘরে বাংলা বই-পুস্তক আর পত্র-পত্রিকা বা সাময়িকী তেমনভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়?

এসব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে—কারণ এর সঙ্গে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি একান্তভাবে জড়িত। এসব প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করছে একুশে ফেব্রুয়ারি তথা শহীদ-দিবস পালনের সার্থকতা।

একুশে ফেব্রুয়ারির এও একটি বাণী—তোমরা বাংলা বই পড়ো, বাংলা বই কেনো, নিজের ভাষায় রচিত বই-পুস্তককে ভালোবাসো, ভালবাসো প্রিয়জনের মতো, নিত্যব্যবহার্য প্রিয় বস্তুর মতো।

১৯৬৩, '৬৪ '৬৫

সমাজতন্ত্র : জাতীয় চরিত্র ও সমাজ বিপ্লব

(ক)

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—এ তিন একই অর্থনৈতিক সূত্রে বাঁধা। দেশের বৃহত্তর পটভূমি পরিপ্রেক্ষিত থেকে এর একটাকে অন্যটার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এবং সে দেখার ওপর নির্ভর করে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হলে তা কখনো দেশের সার্বিক উন্ন ও অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে না। এ যুগের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করেন যে আধুনিক রাষ্ট্র মানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশ ও রাষ্ট্র ভেদে, বৃহ জনসংখ্যার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সমাজতন্ত্রের নাম ও বিশেষণ ভিন্নতর হতে পারে কিন্তু লক্ষ্য এক—বৃহত্তম সংখ্যক নাগরিকের কল্যাণ সাধন। আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য যা ইসলামী সমাজতন্ত্রও হয়—তারও উদ্দেশ্য পাকিস্তানের সব নাগরিকের কল্যাণ ও সুখ সুবিধার বাস্তবায়ন।

সমাজতন্ত্রের নাম না নিয়ে আজ যাকে ওয়েলফেয়ার বা মঙ্গল রাষ্ট্র বলা হচ্ছে তার লক্ষ্য রাষ্ট্রের সুখ-সুবিধা ও সম্পদকে স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবানের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে দিয়ে তাকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। উৎপাদন ও ধনবণ্টনের সামঞ্জস্য বিধান করে রাষ্ট্র কাঠামোয় ভারসাম্য নিয়ে আসা। এ ব্যবস্থা করা ও একে সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তোলার জন্যই 'সমবায়'। সমবায় পদ্ধতির সাহায্যে অধিক সংখ্যক মানুষকে একই সংস্থার আওতায় নিয়ে এসে যে কোন সার্বিক কর্মসূচীর অঙ্গ করে তোলা যায়। এভাবে যৌথভাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌথশক্তির সাহায্যে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ যত সহজ ও দ্রুততর করে তোলা সম্ভব তেমন আর কিছুতেই নয়। বিশেষ করে আজকের দিনে যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করা যায় ও করা হচ্ছে সেখানে ব্যক্তি বা পরিবার-বিশেষের শক্তি ও পুঁজি হালে পানি পাওয়ার কথা নয়। তাই মানুষ আজ সংঘবদ্ধ হতে শিখেছে— সমবায় সে পথেরই নির্দেশ এবং দীক্ষা দিচ্ছে। সমবায় আজ কোন দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই—এখন তা এক বৈশ্বিক আন্দোলনে পরিণত।

উল্লম্ফন নীতি কোথাও সফল হতে পারে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা আরো নিষ্ফল হতে বাধ্য। ক্রমবিবর্তনের পথে ছাড়া এক পদ্ধতি পেরিয়ে অন্য পদ্ধতিতে উত্তরণ কখনো সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেতে হলে—প্রথম সোপান হিসেবে 'সমবায়'কে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সমবায় হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা বিশেষত আমাদের মতো গরিব অনুন্নত ও কৃষিনির্ভর দেশে।

পূর্ব পাকিস্তানের বৃত্তিজীবীদের অধিকাংশই দরিদ্র ও পুঁজিহীন। অথচ আজকের দিনে এ তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে সংগঠন ও বৃহৎ পুঁজির আশ্রয় ছাড়া কোন বৃত্তিজীবীর পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। সমবায় একাধারে সংগঠন ও পুঁজি এ দুয়েরই ব্যবস্থা

করতে সক্ষম এবং সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্যও তাই।

কথায় বলে 'দশের লাঠি একের বোঝা'। গরিব চাষী, তাঁতি, জেলে এরা যদি কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানের আওতায় সংঘবদ্ধ হয় তাহলে এদের সমবেত শক্তি নিজ নিজ পেশা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম। যা একার পক্ষে, বিচ্ছিন্ন পুঁজি বা তৌফিক দিয়ে কখনো সম্ভব নয়।

যন্ত্রের সাহায্য ও ব্যাপক ব্যবহার ছাড়া কোন বৃত্তিরই উন্নতি আর প্রসার আজকের দিনে শুধু যে অসাধ্য তা নয়—প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে এসব বৃত্তিজীবী একদিন হয়তো সবংশে নিশ্চিহ্নও হয়ে যেতে পারে। পুঁজিবাদী দেশে পুঁজির অপ্রতিহত ক্ষমতা আর এ ক্ষমতা অত্যন্ত হৃদয়হীন ও নির্মম। নিজের পুঁজির জোরে পুঁজিহীনকে নির্মূল করে নিশ্চিহ্ন করে নিজের কায়েমী স্বার্থকে আরো কায়েমী করার পথ রচনা করতে তার এতটুকুও বাধে না। এ সর্বনাশের হাত থেকে একমাত্র সমবায়ই দেশের সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে পারে—দেখিয়ে দিতে পারে বাঁচার পথ— জোগাতে পারে বাঁচার হাতিয়ার।

বলেছি পূর্ব পাকিস্তান কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গঠন করার শিক্ষা ও উপায় জনসাধারণকে শিখাতে হবে। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নতি কখনো হতে পারে না; কারণ এরাই দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। এ বৈজ্ঞানিক যুগেও সামান্য অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে এ দেশের কৃষক তার সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত হয়। সামান্য সামান্য Irrigation work-এর দ্বারা অনেক ফসলই বাঁচানো যায়। কিন্তু কোন কৃষকের পক্ষেই একা এ দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই প্রতি এলাকায় কৃষক সমাজকে এক একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সংঘবদ্ধ করে তাদের যৌথশক্তিকে এসব কাজে লাগাতে হবে। সমবায় প্রতিষ্ঠানই এর উপযুক্ত ক্ষেত্র—সমবায়ের সাহায্যেই এলাকা বিশেষের মানব-শক্তি (Manpower) ও পুঁজিকে সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। বিশেষ করে আমাদের এ পুঁজিহীন দেশে সমবায় ছাড়া পুঁজি সরবরাহও একরকম অসম্ভব বল্লেই চলে। তার ওপর আমাদের কৃষকরা কৃষিজাত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য মোটেও পায় না। বর্তমান অর্থনীতি ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করে তুলতে হলেও সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, কারণ একমাত্র এ প্রতিষ্ঠানই গ্রামে গ্রামে বিশেষজ্ঞ সরবরাহ করতে সক্ষম। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে পরিবার হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সমবায়, তার থেকে বড় সমবায় হচ্ছে সমাজ আর বৃহত্তম সমবায় হচ্ছে রাষ্ট্র, আজ পৃথিবীব্যাপী অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার লক্ষ্য এ তিন সমবায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন। সুস্থ, সুষ্ঠু ও দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্ ছাড়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কিছুই টিকতে পারে না—অর্থনৈতিক ভিত্ নড়বড়ে হলে এ সবে ভাঙ্গন দেখা দেবেই।

সমবায় মানে সম-উদ্দেশ্যে সকলের সমসহযোগিতা। এ সহযোগিতার ওপরই নির্ভর করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও স্থিতিশীলতা। আমাদের দেশে অন্যদিক থেকেও সমবায়ের এক বিশেষ মূল্য রয়েছে—একসঙ্গে মিলেমিশে সমবেতভাবে কোন একটা সাধারণ স্বার্থের জন্য কাজ করার সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশে নেই বলে মানুষ সাধারণত ব্যক্তি-স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। ফলে, মানুষের মনে একটা বিচ্ছিন্ন ও

আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের সঞ্চার হয়। তখন সে আর সমাজের কথা, দেশ বা রাষ্ট্রের কথা ভাবতেই পারে না। ভাবতে চায়ও না। এ রকম মানুষ সহজেই স্বার্থপরতা আর কূপমণ্ডুকতার শিকার হয়ে পড়ে। সমবায় এ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা ও কূপমণ্ডুকতার হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে পারে—দিতে পারে তাকে সহযোগিতার মন্ত্রে দীক্ষা। শিখাতে পারে মানুষকে কি করে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হয়, যে সব ব্যয়বহুল বড় বড় কাজ তার স্বপ্নেরও অগোচর তার অঙ্গ হয়ে সে কাজেও সে কি করে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। এভাবে সকলের যৌথ শক্তি প্রয়োগে যে কাজ সমাধা হয় তাতে সে যে শুধু ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয় তা নয়—সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নও তাতে ত্বরান্বিত হয়।

এভাবে সমবায়ের ফলে দেশের সব মানুষেরই উপকার সাধিত হয়। একার শক্তিতে যা অসম্ভব ও অকল্পনীয় ছিল তা আজ বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সহজ ও বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে।

বলেছি আধুনিক গণতান্ত্রিক সব রাষ্ট্রেরই আদর্শ হচ্ছে—সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্র মানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের উপকার সাধন, সবাইকে রাষ্ট্রের সব সুযোগ-সুবিধার অংশীদার করে তোলা। একমাত্র সমবায়ের পথে এ করা সম্ভব বলে—আমাদের দেশেও সমবায়ের ক্ষেত্র ও পরিধিকে আরো প্রসারিত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে সহজ ও সুগম করে তুলতে হবে।

(খ)

'সমবায়' বলতে কি বুঝায় তা আমরা প্রায় সকলেই বুঝি। বিশেষত সমবায় আন্দোলনের ফলে কথাটা গ্রাম দেশেও আজ সুপরিচিত। কিন্তু জাতীয় চরিত্র কথাটা একদিকে যেমন খুব গভীর অন্যদিকে তার অর্থব্যাপ্তি এত সুদূর-প্রসারী যে তা আজো আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ও অনুপলব্ধ রয়ে গেছে। অবশ্য এর পেছনে বহুতর স্বাভাবিক কারণ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরাও।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে আমরা ছিলাম এক একটি সম্প্রদায়—হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। স্বাধীনতার পরেই আমরা হয়েছি একটা জাতি—আমাদের জাতীয়তার সংজ্ঞা হয়েছে নিরূপিত। কাজেই এত অল্পকালের মধ্যে যদি আমাদের জাতীয়-চরিত্র একটা সুনির্দিষ্ট ও সহজ নির্ণিত রূপ না নিয়ে থাকে তা খুব বিস্ময়ের বিষয় নয়। জাতি তথা জাতীয় চরিত্র খুব দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার—একদিনে, দু'দিনে তা গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠা সম্ভবও নয়। দীর্ঘদিনের সাধনা, সংগ্রাম ও প্রস্তুতির ফলে যেমন অগণিত বিচ্ছিন্ন মানুষ একটা জাতি হয়ে ওঠে তেমনি একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত জনসঙ্ঘ কর্ম ও পেশার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে করতেই লাভ করে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সমতা ও ঐক্য। এ সমতা ও ঐক্যবোধ যখন বহুব্যাপক হয়ে একটা দেশগত রূপ নেয় তখনই তা 'জাতীয়' হয়ে ওঠে।

একবার কোন এক ইংরেজ মুদিকে নাকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : তোমার টাকা পয়সা কোথায় জমা রাখো?

উত্তর দিয়েছিল : লন্ডন ব্যাঙ্কে।

আবার জিজ্ঞাসা করা হলো : যদি লন্ডন ব্যাঙ্ক ফেল্ করে?

এমন বেয়াড়া ও তার কাছে অবিশ্বাস্য প্রশ্ন শুনে বিস্মিত মুদি বলে উঠেছিল : অসম্ভব। লন্ডন ব্যাঙ্ক ফেল্ করতেই পারে না।

প্রশ্নকর্তাও মুদির এমন একরোখা দৃঢ়-বিশ্বাসে বিস্মিত হয়ে বলে উঠল : কেন?

: সবচেয়ে বড় কারণ কোন ইংরেজই এ কথা বিশ্বাস করে না।

অর্থাৎ লন্ডন ব্যাঙ্ক যে ফেল্ হতে পারে কোন দিন এ কথা কোন ইংরেজের মনেই উদয় হয়নি। যে প্রতিষ্ঠানের ওপর সমস্ত জাতির বিশ্বাস ন্যস্ত তা ফেল হয় কি করে? এ হচ্ছে ইংরেজের জাতীয় চরিত্র—নিজেদের যৌথ প্রতিষ্ঠানের ওপর আপামর সকলের সর্বাত্মক বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ বিশ্বাস একদিনে বা একটা দু'টা যৌথ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। বহুকাল ধরে বহু প্রতিষ্ঠানে বহু মানুষ একসঙ্গে সহযোগিতার হাত মিলিয়ে কাজ করতে করতেই তা গড়ে উঠেছে।

এতকাল আমাদের দেশের সব প্রতিষ্ঠানই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক—ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যক্তির খেয়াল খুশিমতোই তা হতো পরিচালিত। দেশের বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের ভালো-মন্দ, তাদের লাভ-লোকসানের প্রতি তার কোন লক্ষ্যই ছিল না। ফলে সমাজের ভারসাম্যও হতো নষ্ট। মুষ্টিমেয় ধনী আর অগণিত দরিদ্রের এমন সমাজ কখনো সামনে এগুতে পারে না—কখনো গড়ে উঠতে পারে না সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে। আর যেহেতু ব্যক্তির পুঁজি স্বভাবতই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে—এ পুঁজি আর উদ্যম নিঃশেষ হ'লে প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। সমবায় হচ্ছে এ-সবের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিষেধক।

সমবায়ের ফলে একদিকে পুঁজির ভাবনা যেমন দূর হয় তেমনি ধন ব্যক্তি-বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে সমাজের ভারসাম্যও এতে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যেখানে পুঁজি ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেখানে চরিত্রও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে—অর্থাৎ মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। সমবায়ের মূল কথাই হলো এক নয় দশ—একের কথা না ভেবে ভাবতে হবে দশের কথা। দশের অভাব-অভিযোগ আর চাহিদাকেই দিতে হবে অগ্রাধিকার। এভাবে পরস্পর সম-স্বার্থের ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে করতেই মানুষের সংকীর্ণ আর গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে ওঠে উদার ও সার্বজনীন। তখন নিজের থেকে সমাজ আর সমাজ থেকে নিজের দেশ ও জাতিকে মনে হয় বড়। জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠে এ সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সমবায়ের সাংসারিক অন্য সুবিধা ছাড়াও এভাবে জাতীয় চরিত্র গঠনের ব্যাপারে তার এক বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। সমবায়ের ফলে শুধু যে সহযোগিতার শিক্ষা ও অভ্যাস গড়ে ওঠে তা নয় একই উদ্দেশ্যে একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমরা একে অন্যকে বিশ্বাস করতেও শিখি এবং শিখি বিশ্বাস রাখতেও।

আমাদের দেশে যেখানে সর্বত্র একটা সার্বিক সন্দেহ বিরাজ করছে—যেখানে ধনী-নির্ধনে শুধু যে-কোন সহযোগিতা নেই তা নয়, রয়েছে একটা অহি-নকুল সম্পর্ক, সেখানে

জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠা সত্যই অসম্ভব। এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পা… সমবায়—সমবায় আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান যত প্রসার লাভ করবে—ততই এ দুস্তর ব্যব… সংকীর্ণ হয়ে আসবে। অন্তত জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষ একটা জাতীয় ঐক্যসূত্রের সন্ধা… পাবে। যা একদিন পরিণতি লাভ করবে জাতীয় চরিত্রে।

(গ)

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বিচ্ছিন্ন একক, খণ্ডিত আর অসহায়। দু'খান… হাত আর মাথায় কিছুটা মগজ—এ তার একমাত্র হাতিয়ার, এটুকু হাতিয়ার নিয়েই … জন্মায়। আর এ সবেরও বিকাশের পথ দীর্ঘ—এমন দীর্ঘ নয় মানুষ ছাড়া অন্য কো… প্রাণীর শৈশব। বহুজনের বহু রকম সহায়তায় এ শৈশব ছাড়িয়ে সে ওঠে বেড়ে, … দু'খানা হাত হয়ে ওঠে কর্মক্ষম, মগজ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় বুদ্ধিতে। এ বুদ্ধি… আলোয় সে শেখে তার হাত দু'খানাকে খাটাতে। বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হাতই মানুষকে ক… তোলে জীবন-যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক করে। কিন্তু এ যুদ্ধ একদিকে যেমন বিরাট অন্যদিকে… তেমনি জটিল— এ যুদ্ধক্ষেত্রে একা সে একক, দুর্বল, স্রেফ তৃণখণ্ড মাত্র, প্রতিকূল স্রোতে… ভেসে গিয়ে অকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই যেন তার বিধিলিপি। পায়ের তলার মা… চারদিকের প্রকৃতি আর ওপরকার আকাশ সবই তার প্রতিকূলে—তার বিরুদ্ধে। সব… যেন তার, তার জীবনের দুশমন। সে নিশ্চিহ্ন হয়ে নির্বংশ হয়ে গেলেই যেন প্রকৃ… খুশি—অজস্র সম্ভাবনায় ভরা পৃথিবী কিছুই দেয় না তাকে হাত বাড়িয়ে—যা দিয়ে … বাঁচতে পারে, পারে রক্ষা করতে নিজের জৈব অস্তিত্বটুকু। তাকে দাঁড়াতে হয় নিজে… শ্রমে—নিজের শক্তি আর বুদ্ধি খাটিয়ে হয় বাঁচতে। স্বাবলম্বন ছাড়া তার গতি নেই… বাঁচতে হলে চাই কিছু অন্নবস্ত্র আর একখানা মাথা গোঁজার ঠাঁই—বাঁচার এ নিম্ন… প্রয়োজনটুকু সবারই দরকার। কিন্তু এর কোনটাই একা একজনের পক্ষে জোগাড় ক… উৎপন্ন করা কি তৈয়ের করে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই একজনকে আর একজনের স… মিলাতে হয় হাত। আদিকাল থেকেই দেখা গেছে মানুষ বাঁচতে পারে শুধু এ ভাবেই অ… একে অপরের ওপর নির্ভর করে, পরস্পর সহযোগিতা করে, একই উদ্দেশ্যে সংঘ… হয়ে। এভাবে গড়ে উঠেছে সমাজ। একা মানুষ দুর্বল, অসহায়, ব্যর্থ—এক এক ফো… জল-বিন্দুর মতো, সামান্য উত্তাপেই যা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আবার এ জল বি… যেমন একের সঙ্গে এক মিলে বিরাট সমুদ্র হয়ে দাঁড়ায় তেমনি মানুষও একের সঙ্গে … মিলে এক অসাধ্যসাধনপটিয়সী শক্তিতে হয় পরিণত। সে শক্তি সমুদ্রের মতই বিশাল … সমুদ্রের মতোই দুর্বার। কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, লক্ষ্যে পৌঁছার … মানুষ যখন সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয় তখনই মানুষের এ অসীম সম্ভাবনাময় শ… ঘটে উদ্বোধন। এ সহযোগিতার জন্য চাই একটা পথ, একটা হাতল—যা ধরে ম… পরস্পর হাত মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সামনের দিকে—জীবনের বিচিত্র পথে। সম… আর সমবায় আন্দোলন হচ্ছে এ সহযোগিতার পথ—নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্রি… পারস্পরিক নির্ভরতার অসীম শক্তিতে রূপান্তরিত করার এক অমোঘ নির্দেশিকা। বিশে… আমাদের মতো অনুন্নত দেশে। যেখানে শিক্ষার অভাব, পুঁজির অভাব আর সংগ… অভাব যৌথ সংগঠনের।

আমাদের দেশকে কাব্য করে বলা হয় 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা'—তবুও আমাদের চারদিকে এত অভাব আর এমন দুঃসহ দারিদ্র্য কেন? কেন মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, পায় না শীতাতপ নিবারণের উপযোগী বস্ত্র? পারে না কেন ঝড়-তুফান বা বন্যার মোকাবেলা করতে? এর একমাত্র কারণ আমাদের দেশের মানুষ এখনো সংঘবদ্ধ হয়ে পরস্পর মিলে কাজ করতে শেখেনি। কাজেই যে কোন বড় বিপদের সামনে আমাদের দেশের মানুষ হয়ে পড়ে অত্যন্ত অসহায়। শুধু তাকিয়ে থাকে সরকার বা অন্যের সাহায্যের দিকে। সাহায্য তো ভিক্ষার আর এক নাম। ভিক্ষায় মানুষের কয়দিন চলে? ভিক্ষায় সমাধান হয় না জীবনের কোন বড় সমস্যাই। তার চেয়েও ক্ষতিকর সাহায্য বা ভিক্ষা গ্রহণে মানুষ একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে সে হারিয়ে বসে নিজের ওপর সব রকম আস্থা—পদে পদে হয়ে পড়ে পরমুখাপেক্ষী। সমবায় মানুষকে এ-জিল্লতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে, ফিরে দিতে পারে নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস ও আস্থা। নিজের মতো আরো অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে করতে অপরকে যেমন মানুষ বিশ্বাস করতে শেখে, তেমনি নিজের ওপরও ফিরে আসে আস্থা—এ যেন নিজেকে আবিষ্কার করা নতুন করে।

আমাদের চরিত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি আমরা একে অপরকে বিশ্বাস করি না—পরস্পর মিলে আমাদের যৌথ শক্তি আর যৌথ পুঁজি নিয়োগ করে পারি না বড় কিছু করতে। এ কারণে এখানে—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে বড় কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি এযাবৎ। সমবায় আমাদের এ ত্রুটি সংশোধনের একটি শিক্ষা-কেন্দ্র। সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করতে করতেই মানুষ পরস্পরকে জানতে পারে, পারে এক জনকে আর একজন বিশ্বাস করতে। এ বিশ্বাসটুকু মহামূল্যবান—সমাজ গড়ে ওঠে এ বিশ্বাসের ফলে, জাতিও বড় হয় এ বিশ্বাসের জোরেই। এ বিশ্বাস সমবায়ের দান।

আমাদের দেশে পুঁজি নেই একথা হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়, হালে আমাদের দেশেও অনেকেই কি বিত্তবান হয়ে ওঠেনি? যেটুকু পুঁজি আমাদের আছে তাও হয় ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে আত্মগোপন করে আছে, না হয় ছড়িয়ে আছে নানাভাবে, নানা হাতে। এসবকে নানা সংস্থায় মিলাতে পারলে অর্থাৎ একটা যৌথ পুঁজিতে পরিণত করা গেলেই এ দিয়েও অসাধ্য সাধন করা যেতে পারে। এ করা গেলে একদিকে যেমন অলস পুঁজির সদ্ব্যবহার হবে, অন্যদিকে দেশের আর্থিক অগ্রগতিও হবে ত্বরান্বিত। আর ব্যক্তিগতভাবে পুঁজি নিয়োগকারীরাও হবে লাভবান। ওপরে যে অবিশ্বাসের কথা বলেছি, এতকাল এ অবিশ্বাসের ফলেই তা সম্ভব হয়নি। সমবায় এ অবিশ্বাস দূর করতে সক্ষম কারণ সমবায়ের পরিচালকরা সবাই স্থানীয় লোক—সবাই পরিচিত, জনসাধারণের জানাশোনা। এর ওপর হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করে দেখার একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি রয়েছে বলে এখানে চুরি-চুরি অসম্ভব। ফলে, জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে এ হয়ে উঠতে পারে এক লাভজনক প্রতিষ্ঠানও। কাজেই পুঁজি নিয়োগকারীরও আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। আমাদের দেশের সর্বত্র অফুরন্ত সম্পদ পড়ে আছে—নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, পাহাড়-পর্বত সবই সম্পদের আকর। সমবায়ের সাহায্যে এ সম্পদের ব্যবহার আর যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা গেলে দেশের আর্থিক চেহারা বদলে যেতে

বাধ্য। এর ফলে কর্মনিয়োগের সুযোগও যাবে বেড়ে। বেকার সমস্যা হয়ে উঠবে সঙ্কুচিত। মানুষের সামনে খুলে যাবে জীবিকার নতুন নতুন দিগন্ত।

পূর্ব পাকিস্তান প্রধানত আজো কৃষিভিত্তিক আর গ্রামবহুল—গ্রামেই বাস করে আমাদের অধিকাংশ মানুষ। এদের অন্নবস্ত্রের সমস্যাই দেশের বড় সমস্যা। আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি কিছুমাত্র সুসংহত বা সংঘবদ্ধ নয়। সমবায় ছাড়া এ অর্থনীতিকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার দ্বিতীয় পথ আছে বলে মনে হয় না। এভাবে সমবায়ের সাহায্যে সব গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্‌টাকে যদি পাকা করে তোলা যায় তাহলে আমার বিশ্বাস সমাজের সার্বিক উন্নতিও হবে সহজ। শিক্ষা আর সাংস্কৃতিক জীবনও আর্থিক উন্নতি-অবনতির সঙ্গে এক যোগসূত্রে বাঁধা। সমাজের আর্থিক জীবনে যদি সংগতি আর সংহতি আসে তাহলে জীবনের অন্যদিকেও তা না এসে পারে না।

রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে সমাজ-বিপ্লব বলা হয়, আমার বিশ্বাস তারও পথ সমবায়। বিশেষ করে আমাদের দেশে। আর্থিক আর মানসিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের যে অবস্থা তাতে সে পরিবর্তনের পথে এগুতে হলে সমবায়ের পথেই এগুতে হবে। সমাজ আর অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে যে বিপ্লব তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। এ অবস্থায় রাজনৈতিক বিপ্লব আরো ভয়াবহ। এমন বিপ্লব জনসাধারণের জীবনে নিয়ে আসে অসীম দুর্দশা। এ দুর্দশা আমরা ফরাসি বিপ্লবে দেখেছি—দেখেছি তার শোচনীয় ব্যর্থতাও। এখন দেখছি কংগো থেকে ভিয়েৎনাম পর্যন্ত অনেক অনুন্নত দেশে। কাজেই সর্বাগ্রে চাই সামাজিক বিবর্তন তথা সামাজিক বিপ্লব—এ বিপ্লবের উদ্দেশ্য সমাজকে আরো সুন্দর, আরো শক্ত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা করা। সমাজের প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে নিয়ে আসা আর্থিক স্বাধীনতা—প্রতিজনকে সুযোগ দেওয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার। সমবায় এ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ

আমরা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। স্রেফ সম্মানটুকু জীবিতের জন্য নিঃসন্দেহে মূল্যবান কিন্তু যাঁরা এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করে গেছেন তাঁদের জন্য তা অর্থহীন, মূল্যহীনও। রেওয়াজ রক্ষার জন্য যাঁরা তেমন সম্মান দেখান তাঁদের জন্যও তা কোন ফায়দা বহন করে আনে না। বিশেষ করে যাঁরা ঐতিহাসিক মানুষ—দেশ ও জাতির ইতিহাসের কোন না কোন পালাবদলে যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁদের স্মৃতির প্রতি মামুলি সম্মান দেখানোর কোন মানেই হয় না। ইতিহাসের বিচারেই তাঁদের বিচার—ইতিহাসের মূল্যায়নেই তাঁদের যথার্থ মূল্যায়ন। সে মূল্যায়ন আর বিচারের ধোপে তাঁদের যা কিছু টেকে তার জন্যই তাঁরা স্মরণীয় আর তা নিয়েই দেশ ও জাতি হয় উপকৃত। উত্তরসূরীদের ব্যক্তিগত জীবনও সে উপকার থেকে বঞ্চিত থাকে না।

মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীও আজ ইতিহাসের অন্তর্গত। ইতিহাসের মাপকাঠি দিয়ে এখন তাঁর কর্ম ও আদর্শের মূল্যায়ন করাই উচিত। আমরা না করলেও ইতিহাস একদিন তা না করে ছাড়বে না। আমাদের দুঃখ—আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের সমাজে এমন রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব খুবই কম ঘটেছে যাঁরা ইতিহাসের চালুনির ছিদ্রপথে গলে পড়ে যান না। আরো দুঃখের কথা আমাদের রাজনৈতিক কর্মী আর নেতারা ইতিহাসের এ চালুনির কথা একদম বেমালুম ভুলে যান—ক্ষমতায় বসার পর আরো বেশি করে ভুলে থাকেন। এ ভুলে থাকার ফলে তাঁদের পক্ষে ছোট ও ক্ষুদ্র হয়ে পড়তে বাধে না, তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ক্ষমতা থেকে নামতে না নামতেই তাঁরা এ চালুনির ছিদ্রপথে গলে পড়ে হারিয়ে যান। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে যান না একটি ক্ষীণ রেখাও। কেউ কেউ অবশ্য রেখে যান কিছু কাল দাগ। ইতিহাস অত্যন্ত নির্মম বিচারক—ওখানে পক্ষপাত নেই, ঘুষ বা ঘুষি দুই-ই অচল ওখানে। এ পরম সত্যটুকু আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতা আদৌও বুঝতে পারেন না—পারলেও আপাত দাপট আর চাকচিক্যের মোহ কাটিয়ে তাঁরা উঠতে পারেন না তার উর্ধ্বে।

ইতিহাসের আলোয় সোহরাওয়ার্দী সাহেবেরও জীবন আর কর্মের মূল্যায়ন আবশ্যক। তাহলেই তাঁর স্মৃতি-বার্ষিকী পালন দেশের জন্য—বিশেষ করে আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য কিছু ফলপ্রসূ হতে পারে। আমি তাই আমার আজকের আলোচ্য বিষয়ের নাম দিয়েছি : শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ। এত বড় বিষয়ের প্রতি আমার পক্ষে সুবিচার করা যে সম্ভব হবে তেমন দাবি আমার নয়। সম্ভব না হওয়ার বড় কারণ—আমি সোহরওয়ার্দী সাহেবের নিকটের মানুষ ছিলাম না, রাজনীতিবিদও নই আমি। তিনি দেশ-বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন আমি তাও নই। এমনকি তিনি ক্ষমতায় থাকতে তাঁর সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে সঠিক আলোচনা করতে পারার সব রকম অযোগ্যতাই আমার রয়েছে। তবুও এ সভার উদ্যোক্তারা তাঁর সম্বন্ধে বলার জন্য আমাকেই কেন প্রধান বক্তা হিসাবে নির্বাচিত করেছেন

তা তাঁরাই জানেন। তাঁদের দাওয়াৎ পেয়ে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম—হয়তো আপনারাও কম বিস্মিত হননি। আমার পক্ষে এ এক অপ্রত্যাশিত সম্মান—কারণ আমার নিজস্ব এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে এ প্রায় উড়ে আসা ইজ্জত। তাই বোধকরি প্রত্যাখ্যান করতেও পারিনি।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে জীবনে আমার কোন সংযোগ ছিল না সে কথা সত্য। তবে দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে, দূর থেকে হলেও দেশের রাজনীতি-সমাজনীতির খবর আমরাও রাখতাম বইকি। সে রাজনীতিতে যাঁরা কুশীলবের ভূমিকা অভিনয় করতেন তাঁদের সম্বন্ধেও আমরা একদম না-ওয়াকেব ছিলাম না। তবে আমাদের জানাশোনা একেবারে ভিতর থেকে জানাশোনা নয়। বাইরে থেকে, আর এ রকম বেশ দূর থেকে জানাশোনার ওপর নির্ভর করে যে মূল্যায়ন তাতে ভুল-ত্রুটির অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক। আবার এসব মূল্যায়ন বা বিচারে বিচারকের ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা আর পছন্দ-অপছন্দের প্রতিফলন না ঘটেও পারে না। তাই কোন মূল্যায়ন বা বিচারই সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁত হওয়ার কথা নয়। আমার বক্তব্যও নয় এর ব্যতিক্রম। যত বড় রাজনৈতিক নেতাই হোন সোহরাওয়ার্দী সাহেবও মানবীয় দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। ভক্তির আতিশয্যে তা মনে করা মানে তাঁকে মানুষের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে ফেলা আর তা তাঁর প্রতি অবিচার করাই। মানুষকে দোষেগুণে নেওয়াই মানুষের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।

সোহরাওয়ার্দী রাজনীতিবিদ ছিলেন—তাঁর খ্যাতি, অখ্যাতি, সাফল্য অসাফল্যও বেশিরভাগ রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমিত। তাই তাঁর মূল্যায়ন আর বিচারও রাজনীতিবিদ হিসেবেই হওয়া সঙ্গত। তাঁর রাজনীতি আর অর্থনৈতিক আদর্শ দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলপ্রসূ না ক্ষতিকর ছিল তা-ই বিচার্য। উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর জীবন পর্যালোচনার মূল্যও এখানে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কি ছিলেন বা কি ছিলেন না তা আজকের দিনে সম্পূর্ণ অবান্তর।

॥ ২ ॥

স্বাধীনতার আগে পাক-ভারতে মুসলমানেরা ছিল সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘুর রাজনীতি আর সংখ্যাগুরুর রাজনীতি এক হতে পারে না, কারণ দুইয়ের সমস্যা এক নয়। বিশেষত প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এদেশে তা এক রকম অসম্ভবই ছিল। তখন সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু বিভাগটা ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক। আর তখন এ দুই পক্ষই সব কিছু দেখত— এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আর তার সমাধানও খুঁজত সেভাবেই। এ অবস্থায় যা হওয়ার তাই হতো। অর্থাৎ সংখ্যালঘুর স্বার্থ হতো পদে পদে উপেক্ষিত। বিশেষ করে রাজনীতি, অর্থনীতি আর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ উপেক্ষা ও বিরোধিতা ছিল সবচেয়ে প্রকট। ওপরন্তু সমাজ-দেহের উন্নত আর অনুন্নত অংশের রাজনীতিও কিছুটা ভিন্নতর হতে বাধ্য। কারণ এখানে উভয়ের স্বার্থ এক নয়—তাই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। উন্নত অংশের সমস্যা প্রসার ও বিস্তৃতির অর্থাৎ আরো বাড়ার সমস্যা—অনুন্নত অংশের সমস্যা বাঁচা বা আত্মরক্ষার সমস্যা, আত্মরক্ষা করে যতটুকু প্রসার সম্ভব ততটুকু প্রসারিত হওয়াই তার লক্ষ্য। কিন্তু তার প্রাথমিক সমস্যা আত্মরক্ষার সমস্যা—এটি অনেক ক্ষেত্রে স্রেফ জৈবিক আত্মরক্ষা

সমাজেরই শামিল। রাজনীতি আর সামাজিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা মানে নিজের জীবন-দর্শন বজায় রেখেই আত্মরক্ষা। জীবন-দর্শন মানে নিজের ধর্ম-কর্ম, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আশা আকাঙ্ক্ষা অভীপ্সা সব কিছুই। অবিভক্ত ভারতে মুসলমানরা যেমন ছিল সংখ্যালঘু তেমনি সংখ্যাগুরু সমাজের তুলনায় ছিল অনুন্নত। কাজেই সেদিন মুসলমানের আত্মরক্ষার প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত গুরুতর—এ গুরুতর সমস্যার মোকাবেলা করতে গিয়েই স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনীতির হয়েছে উদ্ভব। বিরাট এক প্রতিকূল সংখ্যাগুরুর সঙ্গে নিত্য বিরোধের ফলে এর গতিপথ বন্ধুর ও ভিন্নমুখী না হয়ে পারেনি। সংখ্যাগুরু সমাজ কিছুটা উদার, সহিষ্ণু আর উদারমনা হলে, আমার বিশ্বাস এ বিরোধ আর সংঘর্ষ এতখানি তীব্র ও তিক্ত হয়ে ওঠার রূপ পেত না। যাই হোক সেদিন ভারতীয় রাজনীতির এ ছিল স্বরূপ। সোহরওয়ার্দীর জন্ম রাজনৈতিক পরিবেশে, এতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু ও বিকাশ। মুসলমান তথা সংখ্যালঘুর জন্য সেদিন এ রাজনীতি ছিল আত্মরক্ষার তথা Defensive হাতিয়ার। সোহরাওয়ার্দী এ রাজনীতিরই কর্মী, পরে নেতা ও নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিলেন স্রেফ নিজের প্রতিভা আর কর্ম-দক্ষতার জোরে। মুসলমানেরা এ আত্মরক্ষা বা Defensive রাজনীতি নাম দিয়ে নিন্দা করে এসেছে। সোহরওয়ার্দী তাতে কখনো বিচলিত হননি। তাঁর সাম্প্রদায়িক অনেক নেতাই বিচলিত হয়েছেন—অনেকে বারবার মত ও পথ বদলে ভিন্ন পথের পথিক হয়েছেন। অবস্থার নানা হেরফেরেও সোহরাওয়ার্দী কিন্তু নিজের মত বা পথ কোনটাই কোন দিন বিসর্জন দেননি। কালক্রমে মুসলমানের এ আত্মরক্ষামূলক তথা Defensive রাজনীতি কি করে Offensive রাজনীতিতে পরিণত হলো—যার ফলশ্রুতি আমাদের এ পাকিস্তান, তা বর্ণনা করে আমি আপনাদের সময় নষ্ট করব না। তাতে সোহরওয়ার্দীর কি ভূমিকা ছিল তা কারো অজানা নয়। জনতার স্মৃতি ক্ষণজীবী হতে পারে কিন্তু সে যুগের যেসব বুদ্ধিজীবী আজো বেঁচে আছেন তাঁরা সোহরওয়ার্দীর এ অবদানের কথা বোধকরি আজো ভুলে যাননি। চিরজাগ্রত ও চিরসচেতন ইতিহাসও তা ভুলে যাবে না। মুসলমানের এ আত্মরক্ষামূলক রাজনীতির প্রতিভূ হতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে কি খেসারত না দিতে হয়েছে! রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র হয়েছিলেন—হয়েছিলেন সংখ্যাগুরুর সমর্থনেই। মেয়রের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক নিয়মে সব নীতি অনুসারেই তাঁরই মেয়র হওয়ার কথা। সংখ্যাগুরু সমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠল অব্যবহিত পূর্বে কলকাতায় যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেছে তাতে সোহরাওয়ার্দী সংখ্যালঘু মুসলমানদের আত্মরক্ষায় সহায়তা করেছেন অতএব তিনি সাম্প্রদায়িক! ফলে মেয়র তিনি হলেন না—প্রাপ্য সম্মান থেকে তাঁকে এভাবে করা হলো বঞ্চিত। তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নেও তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগই উত্থাপিত হয়েছিল—যার ফলে বিচারপতিও তিনি হননি। মুসলমান সমাজের জন্য এ অবশ্য শাপে বর হয়েছিল—সমাজ তাঁকে তাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামে পেয়েছিল ফিরে। কিন্তু সাময়িকভাবে তাঁর নিজের তো ক্ষতি হয়েছিল অনেক—হানি হয়েছিল সম্মানের। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানের আত্মরক্ষার সংগ্রাম বা আত্মরক্ষামূলক রাজনীতি ছেড়ে অন্যত্র অধিকতর খ্যাতি-প্রতিপত্তির সন্ধান তিনি করেননি। কলকাতায় সেদিন মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ২২ কি ২৩—The great Calcutta killing নামে যে বিরাট হত্যাযজ্ঞ ঘটেছিল তখন এ শতকরা ২২ কি

২৩—শতকরা ৭৭।৭৮-এর সঙ্গে সমানে সংগ্রাম করে যে আত্মরক্ষা করেছিল, মরণপণ করে নিজের সমাজের অস্তিত্বকে যে টিকিয়ে রেখেছিল তার পেছনে সোহরাওয়ার্দী-অসন্দিগ্ধ নেতৃত্বের কথা আজ ভুলে গেলে চরম অকৃতজ্ঞতা হবে। বিরাট সংখ্যাগুরুর নির্মম চাপে সেদিন সংখ্যালঘু মুসলমান যে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে যায়নি তার কারণ সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য ও অকুতোভয় নেতৃত্ব। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান হাসিল হয়েছে—লীগবিরোধী মন্ত্রিসভার আমলে সে লীগ বাংলাদেশে প্রায় ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেদিন মন্ত্রীসভার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার মুসলমান হয়ে পড়েছিল দ্বিধা-বিভক্ত ও খণ্ডিত। সে দুঃসময়ে বাংলাদেশে সোহরাওয়ার্দীই রেখেছিলেন লীগ তথা পাকিস্তান সংগ্রামের পতাকাকে উর্ধ্বে উড্ডীয়মান। তিনিই বিচ্ছিন্ন ও দ্বিধা-বিভক্ত মুসলমানকে করে তুলেছিলেন ঐক্যবদ্ধ ও সংহত—তাদের সুপ্ত শক্তিকে রূপান্তরিত করেছিলেন এক দুর্বার শক্তিতে। যে শক্তির যৌবন জোয়ারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছে ত্বরান্বিত। এসব ইতিহাস এবং ইতিহাসের কথা। পরিতাপের বিষয় এ ইতিহাসকে বিস্মৃত হওয়ার অপচেষ্টা পরবর্তীকালে বারবারই করা হয়েছে। করা হয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভেই। ক্ষমতাসীনরা গোড়া থেকেই তাঁকে মনে করতেন তাঁদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ ছিল তাঁর প্রতি এক শ্রেণীর ক্ষমতাসীনের মনোভাব। আমাদের রাজনীতির এ এক মস্ত বড় ট্রেজেডি।

॥ ৩ ॥

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের রাজনীতির পটভূমি ও চেহারাসুরত অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই রাতারাতি একদম বদলে গেল। স্বাধীনতার আগে আমরা ছিলাম সংখ্যালঘু এখন হয়ে পড়লাম সংখ্যাগুরু—ছিলাম সম্প্রদায় এখন হয়ে পড়লাম জাতি। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিকানা আমাদের সামনে খুলে দিলে সুযোগ-সুবিধার এস্তার দরজা—প্রায় হাতে আমরা পেলাম অসীম ক্ষমতার অধিকার। সুযোগ-সুবিধা আর ক্ষমতা ধরাধরি করেও চলে—এতে অন্য কেউ হাত দেয় বা ভাগ বসায় এ ভয়ে আমাদের সেদিনের ক্ষমতাসীনরা হয়ে পড়েছিলেন শঙ্কিত। তাই চালু হলো একদলীয় শাসন ও একদলীয় রাজনীতি। ফলে স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র—যে গণতন্ত্র তথা মুসলিম জনমতের দোহাই দিয়ে আমরা পাকিস্তান হাসিল করেছি তা জনগণের মনে ও জীবনে কোথাও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারল না। আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছি : গণতন্ত্র হচ্ছে দুই পা বিশিষ্ট জীব। এর এক পা না থাকলে গণতন্ত্র খোঁড়া ও অচল হয়ে পড়তে বাধ্য। বিরোধী দল গণতন্ত্রের অন্যতম অপরিহার্য পা বা অঙ্গ—ঐ ছাড়া গণতন্ত্র আর একনায়কত্বে কোন বেশ-কম থাকে না। বলাবাহুল্য দলীয় একনায়কত্ব আরো মারাত্মক, আরো ভয়াবহ। তখন একের হাতের লাঠি দশের হাতে হয়েই দেখা দেয়। দল ভারি হলে লাঠির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বর্তমানে আমরা সরকার ও সরকারি দলের হাতে আশি হাজার লাঠি তুলে দিয়েছি—সরকার এখন ইচ্ছামতো সে লাঠি দেশের মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে! এ অপূর্ব লাঠিখেলা দেখে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ আজ রীতিমতো হতভম্ব ও হতবাক! ভীত ও সন্ত্রস্ত।

সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে এসেই দেখলেন দেশে গণতন্ত্রের নাম-নিশানা কোথাও নেই। কায়েম হয়েছে একদলীয় সরকার—রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে সরকারি প্রতিষ্ঠান

মুসলিম লীগ ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নাস্তি। ছলে-বলে-কৌশলে দেওয়া হচ্ছিল না অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। Mr. W. Norman Brown লিখেছেন : "By mid-September, 1950 the Government of Pakistan was not only strongly supporting the League but was demanding that it will have a monopoly of the political situation. (The United States India & Pakistan, p. 249) সাড়ে ন' কোটি মানুষের এত বড় দেশে গণতন্ত্রের সতর্ক প্রহরী বলতে যে বিরোধী দলকে বুঝায় তার কোন চিহ্ন কোথাও নেই। অথচ শাসনতান্ত্রিক আদর্শ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি গণতন্ত্র— আর গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকারের পথ বেয়েই আমরা এসে পৌছেছি আমাদের গন্তব্য পাকিস্তানে। সে পাকিস্তানে এসে সোহরাওয়ার্দী দেখতে পেলেন গণতন্ত্র এখানে রূপ নিয়েছে এক পা বিশিষ্ট দৈত্যের—সব বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর অর্থাৎ সরকারি নীতি-রীতির সমালোচনা পড়েছে এ দৈত্যের থাবার নিচে চাপা। সোহরাওয়ার্দীকে সর্বাগ্রে মোকাবেলা করতে হলো এ দৈত্যের সঙ্গে। সে মোকাবেলা করতে গিয়ে তাঁকে যে দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে—যে কঠোর বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়েছে সে ইতিহাস আজ কারো অজানা নয়। তখনকার অবস্থা নর্মান ব্রাউনের ভাষায় "He (মরহুম লিয়াকত আলী খান তখন একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ সভাপতি ছিলেন) assailed in the most vigorous terms those who would found other parties, calling them, "traitors, liars and hypocrites" and singled out for specific attack Hussyen Shaheed Suhrawardy and the Awami Muslim League." (p. 250) যে দিন ভারতভূমি ছেড়ে তিনি পাকিস্তানে আসেন সেদিন না ছিল তাঁর অর্থ-বিত্ত, না ছিল কোন সাঙ্গ-পাঙ্গো বা সহযোগী। এসেছিলেন অনেকটা রিক্তহাতে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। শুধু সাথে করে এনেছিলেন তাঁর অপূর্ব সংগঠনী শক্তি, অমিত সাহস, গভীর স্বজাতি প্রেম আর গণতন্ত্রে অটল বিশ্বাস। এ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মক্ষেত্রে—গোড়া পত্তন করলেন নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের। খুঁজে বার করলেন অখ্যাত অজ্ঞাত স্থান থেকে নাম-না জানা অপরিচিত কর্মীদের। নিজের হাতে গড়ে-পিটে এদের পরিণত করলেন দুর্ধর্ষ সৈনিকে। এ সৈনিকদের নিয়েই তিনি পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের অবহেলিত মানুষের কথা বলতে গিয়ে এ সৈনিকদের অনেকে আজ পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আমার নিজের ছাত্রও কম নেই।

কায়েদে আজম পাকিস্তানকে দিয়েছেন সরকার ও সরকারি দল—সোহরাওয়ার্দী দিয়েছেন বিরোধী দল। এ দুয়ের যুগপৎ অস্তিত্বেই গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক রাজনীতি সফল আর সার্থক হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। এ দুই পায়ের ওপর ভর না দিয়ে কোন গণতন্ত্রই দাঁড়াতে পারে না—পারে না চলিষ্ণু বা গতিশীল হতে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতালোভীরা আমাদের দেশে এর একটি পা ভেঙ্গে গণতন্ত্রকে বারবার খোঁড়া করে দিতে চেয়েছে—দিয়েছেও। এর ফলে পাকিস্তানে রাজনীতির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ বারবারই হয়েছে প্রতিহত। এখন অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। এখন সরকার অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বাইরে সরকারের মুখ রক্ষার জন্য যতটুকু বিরোধী দল সরকারের নিজের স্বার্থে প্রয়োজন

ততটুকুই সরকার বরদাস্ত করতে প্রস্তুত, তার বেশি বিরোধী দলের বৃদ্ধি ঘটুক কিংবা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি বাড়ুক সরকার তা চায় না। সরকার না চাইলে বর্তমান শাসনব্যবস্থা আর রাজনৈতিক কাঠামোর তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন মৌলিক গণতন্ত্রের ভোট শুধু সরকারের নয়, যে-কোন সাধারণ বিত্তবানেরও ক্রয় ক্ষমতার আয়ত্তাধীন। ফলে গরিব সৎলোকের এখন রাজনীতিতে প্রবেশ এক রকম অসম্ভব বল্লেই চলে। দেশের প্রতি মৌলিক গণতন্ত্রের এ হচ্ছে চরম আঘাত। তার ওপর প্রদেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক অধিনায়কও যেখানে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সক্ষম সেখানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোট আশা করা মানে মানব স্বভাবকেই অস্বীকার করা। ফলে দেশে গণতন্ত্রের বুলি আছে কিন্তু অস্তিত্ব নেই। আবার আমরা আঠারো বছর পেছনে চলে গেছি। তখন যেমন সরকার-প্রধান আর সরকার সমর্থক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-প্রধান এক ছিল এখনো অবিকল তাই হয়েছে। ফলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সরকারের ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করতেই অক্ষম বরং সরকার নিজের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ইচ্ছামতো মোচড়াচ্ছে, ঘোরাচ্ছে ও দুমড়াচ্ছে। মুসলিম লীগ রাজনীতির আজ এ করুণ দশা।

পাকিস্তান রাষ্ট্র-নীতিতে সোহরাওয়ার্দীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান আছে তার মধ্যে আমার বিশ্বাস, একটি সুসংগঠিত, বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ বিরোধী দল প্রতিষ্ঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্তমান শাসনব্যবস্থায় সে বিরোধী দল নিষ্ক্রিয় ও দুর্বল। তা হওয়ার কারণ উপরে উল্লিখিত হয়েছে। তাই মনে হয় সোহরাওয়ার্দীর সংগ্রাম আজো শেষ হয়নি—গণতন্ত্রে যাঁদের বিশ্বাস আজো অটল, যাঁরা দেশে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ চেহারা দেখতে চান, তাঁদের আবার নতুন করে সংগ্রাম শুরু করতে হবে। শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ বিরোধী দল গঠনের সংগ্রাম—যে বিরোধী দলে ঘটবে জনমতের প্রতিফলন। সরকার যেখানে জনমত-বিচ্ছিন্ন সেখানে বিরোধী দলকেই নিতে হবে জনমতের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। শুধু বিরোধিতার জন্য বা বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধী দল গঠনের কোন মানে হয় না—সংখ্যায়, শক্তিতে ও কর্মসূচিতে বিরোধী দল এমন হওয়া চাই যেন প্রয়োজনের সময় তারাই সরকার গঠন করতে সক্ষম—সক্ষম জনমতের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে। বর্তমান শাসনব্যবস্থায় তেমন বিরোধী দল গঠন সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। তাই শাসনতন্ত্রের এমন সংশোধন চাই যাতে ভোট স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে পারে—আর তা করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভোটাধিকারকে সার্বজনীন করে প্রার্থী বা দল বিশেষের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া। জানি এ দাবি যতই ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক হোক না কেন সরকার তা কিছুতেই স্বেচ্ছায় মেনে নিয়ে স্বখাত সলিলে ডুবতে রাজি হবে না—জনগণের এসব গণতান্ত্রিক অধিকার একমাত্র শক্তিশালী বিরোধী দল যদি দেশব্যাপী গড়ে ওঠে তখনই আদায় করা সম্ভব হতে পারে। এ কারণেই আমি বলেছিলাম সোহরাওয়ার্দীর সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি।

॥ ৪ ॥

বিরোধী দল গঠন ছাড়াও সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টা আর উদ্যোগে তাঁর আমলে যুক্ত নির্বাচন, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠন আর সংখ্যা-সাম্য নীতি গৃহীত হয়েছিল। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে এ তিনটিই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ তিনের জন্য তাঁকে কঠোর বাধা আর

সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি বিচলিত হননি—হননি তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত। শেষোক্ত দুটি বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার আজো ইতি ঘটেনি। যুক্ত নির্বাচন যে রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি সম্মুখ পদক্ষেপ এ বিষয়ে বোধকরি দ্বিমত নেই। বলাবাহুল্য পরাধীনতা-যুগের রাজনীতি আর স্বাধীনতা-যুগের রাজনীতি ভিন্নতর না হয়ে পারে না; কারণ তখন অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির লক্ষ্য আর আদর্শ যায় সম্পূর্ণ পাল্টে। পরাধীনতার যুগে জাতির একমাত্র লক্ষ্য থাকে স্বাধীনতা অর্জন, স্বাধীনতার পর জাতির লক্ষ্য হয়ে পড়ে বিভিন্নমুখী। যার উদ্দেশ্য সুসংহতভাবে জাতি গঠন, জাতির সমৃদ্ধি, জাতির নিরাপত্তা আর জাতির সর্বাঙ্গিন বিকাশ। এ সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এক না হলে দেশের প্রতি আনুগত্যহীনতার কোন লক্ষণ কোথাও দেখা দিলে জাতির নিরাপত্তা আর স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়ার কথা। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের স্বাভাবিক পরিণতি রাজনীতি ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক দল-উপদলের উৎপত্তি। পরাধীনতার যুগে তেমন দল-উপদলের মূল্য যে একেবারে ছিল না তা নয়। ভারতে মুসলমানের বেলায় তা আমরা দেখেছি। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে যেখানে সুসংহত ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনই বড় কথা, সেখানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনীতি সমূহ বিপদের কারণ। তাই স্বাধীন ভারত আর স্বাধীন পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন তুলে দেওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে। এর ফলে এখন রাজনৈতিক স্তরে দলবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যহীনতার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত হয়ে গেছে। পৃথক নির্বাচন থাকাকালীন অবস্থায় আমরা দেখেছি প্রাদেশিক আইনসভায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম দলে ভারসাম্য রক্ষা বা না-রক্ষার চাবিকাঠি থাকত সংখ্যালঘু দলের হাতে আর তাঁরা তা প্রয়োগ করতেন নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী। যুক্ত নির্বাচন সে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে আমাদেরকে রেহাই দিয়েছে। এটি সোহরাওয়ার্দী আর তাঁর দলেরই কৃতিত্ব। এজন্য তাঁর ওপর নিন্দার মুষলধারা কিভাবে বর্ষিত হয়েছিল তাও বোধকরি উপস্থিত অনেকের জানা।

পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট প্রদেশগুলিকে নিয়ে এক ইউনিট গঠনও আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এক পাঞ্জাব ছাড়া ওখানকার প্রদেশগুলি ছিল লোকসংখ্যার দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও ছোট আর অনুন্নত—রাজস্বের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। ওসব প্রদেশে এক একটা গভর্নর, এক একটা মন্ত্রিসভা আর এক একটা আইন পরিষদ রীতিমতো বিলাসিতা। এক ইউনিট গঠনের আগে প্রদেশে প্রদেশে রেষারেষি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। সে সবের এখন অবসান হয়েছে—অবসান না হলেও ধীরে ধীরে অবসানের পথে। সব ক্ষেত্রে অগ্রগামী প্রদেশ হিসেবে পাঞ্জাব হয়তো আজো কিছুটা বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, এ না হয়ে পারে না। পারিবারিক জীবনেও তা ঘটে থাকে। সব প্রদেশের প্রতি এখন যদি সমভাবে সুবিচার না হয়ে থাকে কোন এলাকা বিশেষ যদি অবহেলিত হয় তার জন্য আমাদের বর্তমান সরকার আর তার নীতি নির্ধারণই দায়ী এবং এর যথাযথ প্রতিকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আয়ত্তাধীন বলেই আমার বিশ্বাস। সে চাপ সৃষ্টির অধিকার জনসাধারণ আর জনসাধারণের প্রতিনিধিদেরই হাতে। এক ইউনিট গঠনের ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে আমাদের অনেক সমস্যা এখন একটিমাত্র সমস্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যা—রাষ্ট্রের দুই অংশের সমস্যা। এখানে যদি আমরা সমঝোতায় আসতে পারি তাহলে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংহতি যে ত্বরান্বিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের রাষ্ট্রের

দুই অংশের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্যও চাই কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলির সমাধান আর যথাসম্ভব সেগুলিকে কমিয়ে আনা। এক ইউনিট কেন্দ্রীয় সরকারকে তেমন একটি সুযোগ দিয়েছে। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার দায়িত্ব রাষ্ট্র পরিচালকদের।

পাকিস্তানের দুই অংশের সমস্যাকেও সোহরাওয়ার্দী অনেকখানি সহজ করে দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সংখ্যা সাম্যনীতি প্রবর্তন করে—যা বর্তমান শাসনতন্ত্রেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেদিন এজন্যও সোহরাওয়ার্দীকে কম নিন্দা শুনতে হয়নি। এতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কিছুটা অবিচার যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নে- কিন্তু বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার না করে তো উপায় নেই—রাষ্ট্রীয় সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের জন্য এরকম একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। এ নীতি যদি যথাযথভাবে, সুবিচারের সাথে পালিত হতো তাহলে—আমার বিশ্বাস এ ত্যাগ স্বীকারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে কোন অসন্তোষই দেখা দিত না। দুঃখের বিষয় এ সংখ্যা-সাম্য নীতি আজো কাগজে-কলমেই সীমিত হয়ে রয়েছে। দেশের দুই অংশের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষেরও মূল কারণ এটি। সংখ্যা-সাম্য-নীতি ব্যাপক অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্তরে গৃহীত না হলে এ-নীতির আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরতলার কয়েকটি চাকরিতে সংখ্যা-সাম্য বজায় রেখে অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পে আর রাষ্ট্রীয় আওতাভুক্ত অন্য সব ক্ষেত্রে অসাম্য নীতি চালিয়ে গেলে দুই অংশের মধ্যে সমতা অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়—ফলে অসন্তোষেরও ঘটবে না অবসান। শুধু শাসনতান্ত্রিক বিধানের কিছুমাত্র মূল্য নেই যদি সে সবকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা না হয়। এখন কোন প্রশাসনিক বিভাগ কিংবা কোন খামখেয়ালী অফিসার যদি সংখ্যা-সাম্য-নীতি ভঙ্গ করে আইনের সাহায্যে তার প্রতিকারের কোন উপায় নেই। ফলে সংখ্যা-সাম্য অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হচ্ছে না জাতীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তরেও তার দেদার পরিচয় রয়েছে। সংখ্যা-সাম্য-নীতি লঙ্ঘনের জন্য এযাবৎ সরকার কোন কর্মচারীকে অভিযুক্ত করেছেন শোনা যায়নি। বরং সরকার এসব ক্ষেত্রে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা নীতিই গ্রহণ করে থাকেন। ক্ষমতার ক্ষেত্রে সংখ্যা-সাম্য-নীতি গৃহীত ন হলে সংখ্যা-সাম্য-নীতি—যার ওপর পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্যবদ্ধ সংহতি নির্ভর করে, তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা এখন প্রেসিডেন্টেই কেন্দ্রীভূত কাজেই সেই প্রেসিডেন্টের বেলায় কঠোরভাবে সংখ্যা-সাম্য-নীতি গৃহীত না হলে এ নীতি কখনো পুরোপুরি অর্থপূর্ণ হতে পারে না—পারে না হতে সফল। মানবীয় দুর্বলতার হাত থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেই একটা মানুষ মুহূর্তে অতি-মানব হয়ে যাবেন, তাঁর এলাকা, তাঁর পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-কন্যা, ভাই-বেরাদর কারো প্রতি তাঁর কোন পক্ষপাত থাকবে না এ আশা স্রেফ দুরাশা ছাড়া কিছুই না। কাজেই প্রেসিডেন্ট পালাক্রমে একবার পূর্ব ও অন্যবার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে না হলে সংখ্যা সাম্য নীতি কিছুতেই অর্থপূর্ণ হবে না—হবে না অর্জিত কোনকালেই। ক্ষমতার সম-বণ্টন না হলে সংখ্যা-সাম্য-নীতি চিরকালই একটা ফাঁকা বুলি হয়েই থাকবে আর তাহলে জাতীয় সংহতি পদে পদে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও যাবে বেড়ে।

প্রেসিডেন্টের বেলায় সংখ্যা-সাম্য-নীতি কায়েম হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংখ্যা-সাম্য স্বাভাবিক নিয়মেই নেমে আসবে। তখন যদি কোন প্রেসিডেন্টের শাসনামলে দেশের কোন অংশের প্রতি অবিচার ঘটে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট সহজেই তার প্রতিকার করতে সক্ষম হবেন। এতে দুই অংশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর অভীপ্সাও চরিতার্থ হওয়ার একটা সুযোগ পাবে। প্রেসিডেন্ট একলাগা একাধিকবার যদি শুধু দেশের একটা অংশ থেকেই নির্বাচিত হন তাহলে অন্য অংশে স্বভাবতই তখন অসন্তোষের সৃষ্টি না হয়ে পারে না। দেশব্যাপী অসন্তোষ থাকলেও বর্তমান শাসনতন্ত্রানুযায়ী নির্বাচিত হওয়া বা সমর্থক সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়—বিশেষ করে যিনি ক্ষমতায় আছেন বা থাকবেন তাঁর পক্ষে। একই প্রেসিডেন্ট একাধিকবার নির্বাচিত হতে পারার বিধান থাকলে যিনি ক্ষমতায় থাকবেন তিনি আবারও নির্বাচিত হওয়ার ফন্দি-ফিকির করতে পারবেন—করবেনও। বর্তমান শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্ট ইচ্ছামতো তাঁর ক্ষমতায় থাকার অনুকূলে শাসনতন্ত্রের যে-কোন Amendment বা রদবদল করে নিতে সক্ষম। জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সংগ্রহ করা এখন প্রেসিডেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে প্রেসিডেন্টের পদকে পালাক্রমে এক একবার করে পাওয়ার শাসনতান্ত্রিক বিধান করা হলে তখন দীর্ঘকাল একই ব্যক্তির ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার অভিসন্ধি আর ফন্দি-ফিকিরের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এ করলেই সোহরাওয়ার্দী কল্পিত সংখ্যা-সাম্য-নীতি যথার্থ সংখ্যা-সাম্য-নীতি হয়ে উঠবে এবং রাষ্ট্রের দুই অংশের রেষারেষিরও ঘটবে অবসান। সংখ্যা-সাম্য-নীতিকে আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি সেটাই আপনাদের কাছে বর্ণনা করলাম।

॥ ৫ ॥

সোহরাওয়ার্দী রাজনীতিবিদ ছিলেন, ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। নেতার কাজ জনতা আর অনুবর্তীদের পরিচালিত করা—জনতার আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে জনতার সুরে সুর মেলানো নেতার কর্তব্য নয়। সোহরাওয়ার্দী জীবনে অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—তাঁর বিরুদ্ধে বিরাট জনতার বিক্ষোভও আমি দেখেছি। তাতে তাঁকে ভীত বা বিচলিত হতে দেখিনি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল গভীর—ছিলেন তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অধিকারী। জানতেন দেশ আর জাতির জন্য কি ভালো কি মন্দ—জনতার সামনে তিনি সেভাবেই দিতেন নেতৃত্ব। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত, তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এমন নয় যে গভীর ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সমস্যার মূল্যায়নে তারা সক্ষম। তাই জনতাকে তিনি কখনো নিজের চালক হতে দেননি—প্রকৃত নেতার মতো তিনিই জনতাকে চালিয়েছেন, করেছেন নিয়ন্ত্রণ। কখনো জনতার হাতে তুলে দেননি নিজের বিবেক। জনতা অভ্রান্ত, বিশেষ করে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এ মানা যায় না। সব সময় তাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন—তাদের নেতৃত্ব দিতে হয়। সোহরাওয়ার্দী সে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সততার জন্যও তাঁর নেতৃত্ব স্মরণীয়। তিনি অবিভক্ত বাংলায় 'চিপ্ মিনিস্টার' ছিলেন—স্বল্পকালের জন্য হলেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

হয়েছিলেন। মন্ত্রী না থাকা অবস্থায়ও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কম ছিল না। কিন্তু কখনো আত্মীয়-তোষণ নীতিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। একাধিক চিপ মিনিস্টার ও প্রধানমন্ত্রীকে নিজেদের অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনকে মন্ত্রী বানাতে আমরা দেখেছি। সোহরাওয়ার্দী কিন্তু তা কখনো করেননি। ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তিনি তাঁর বড় ভাই শাহেদ সোহরাওয়ার্দীকে মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারতেন আর করলে কেউ টু শব্দটিও করত না; কারণ শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক আর তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরও ছিল না অবকাশ। তবুও তেমন প্রলোভনের শিকার তিনি হননি কোন দিন। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই ছোট-খাটো চাকরি করতেন, এখনো করেন কিন্তু কাউকে তিনি অন্যায়ভাবে প্রমোশন দেননি— দেওয়াবার ব্যবস্থা করেননি, অন্যত্র নিয়ে দিয়ে দেননি বড় কোন পদও।

অবশ্য ওঁদের প্রয়োজন আর অভাবের সময় তিনি গোপনে ওঁদের অর্থ-সাহায্য করতেন—মোচন করতেন ওঁদের অভাব-অভিযোগ। এমন করে সাহায্য করার কোন কোন ঘটনা আমার নিজেরও জানা আছে।

আজ সমাজে আর রাষ্ট্রে ব্যাপক দুর্নীতি আর আত্মীয় তোষণ অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বেড়ে গেছে—তাই আমাদের ভাবী রাজনীতিবিদদের সামনে আমি সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব আর রাজনীতির এ বৈশিষ্ট্যটুকু বেশি করে তুলে ধরতে চাই, চাই এর ওপর বেশি করে জোর দিতে। দেশ আজ সৎ নেতৃত্বের জন্য উদগ্রীব ও উন্মুখ। আমি জানি বর্তমানে দেশে যে রাজনীতি চলছে এ রাজনীতি অত্যন্ত প্রলোভনের। এ রাজনীতি রাতারাতি ধনী হওয়ার রাজনীতি— টাকার রাজনীতি। দুনিয়ায় টাকার লোভের চেয়ে বড় লোভ আর নেই—সরকার এ লোভেরই রাজনৈতিক জাল সর্বত্র পেতে দিয়েছেন। সরকারি রাজনীতি করে আজ কারো গরিব থাকার উপায় নেই, গরিব কেউ নেইও। এ রাজনীতি দেশকে একটিমাত্র ছবকই শিখিয়েছে— সে হচ্ছে টাকার ছবক। নির্লজ্জভাবে টাকার মালিক হওয়ার ছবক।

সোহরাওয়ার্দী আজীবন রাজনীতি করেছেন—রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁর অজানা ছিল না। সর্বোচ্চ ক্ষমতারও তিনি অধিকারী ছিলেন। তবুও প্রচুর অর্থ-বিত্তের তিনি মালিক ছিলেন বা মৃত্যুকালে ধন-সম্পদ রেখে গেছেন তেমন কথা শুনিনি। বরং শুনেছি তাঁর শেষ জীবন অর্থ-কষ্টেই কেটেছে। এ যুগে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। সোহরাওয়ার্দী মাত্র তের মাসের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—তের মাস এত স্বল্প সময় যে এতে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও কৃতিত্ব আশা করা যায় না। তার ওপর আমাদের রাষ্ট্রের—দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান যে শুধু দুস্তর তা নয়—দুই অংশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেও রয়েছে তফাৎ। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে রয়েছে রীতিমতো বিরোধ। এ সবকে সামলে দুই অংশের সমর্থকদের সমঝোতায় এনে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করতেই তো এক বছর কি তের মাস কেটে যায়। এখন যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁরা যদি তাঁদের শাসনকালের প্রাথমিক তের মাসের খতিয়ান নেন তাহলেই বুঝতে পারবেন তের মাস রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পক্ষে কত সংক্ষিপ্ত। তবে একটি ক্ষেত্রে তাঁর শাসনকাল পাকিস্তানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—আইনের শাসনকে তিনি কখনো

সহসেনে পরিণত করেননি। আইনের নামে বেআইনি জুলুম চালাননি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র আর বিরোধী দল বা নেতার ওপর। তাঁর সময় পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারে কোন রাজবন্দিই ছিলেন না—তাঁর সমর্থন না থাকলে আতায়োর রহমান খাঁর পক্ষে এমন দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হতো না। তাঁর সময়—যতদূর মনে পড়ে কোন সংবাদপত্র বা প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়নি। আজ কোন কোন বিরোধী নেতার ওপর একে একে যেভাবে আইনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলছে তাকে Trial and error method-ই বলা যায়। অর্থাৎ কোন্ আইনে রাজনৈতিক শত্রুকে বেশি করে জব্দ করা যাবে—আটকে রাখা যাবে বেশি দিন ধরে জেলে, আইনের নামে তারই Trial and error-নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। সোহরাওয়ার্দীর আমলে আইন আর বিচার নিয়ে এমন বন্দুক খেলা কখনো দেখা যায়নি।

এককালে বিচার বিভাগের ভয়ে প্রশাসনিক বিভাগ সন্ত্রস্ত ছিল। এখন অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সৎ মানুষের একমাত্র আশ্রয় আইন, আইনের শাসন। মানুষ যদি সে আইনের আশ্রয় ও নিরাপত্তা সম্বন্ধেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তাই আজ সৎ মানুষের সামনে নেমে এসেছে এক চরম হতাশা।

সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের এও এক বৈশিষ্ট। আইনের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা। অথচ শেষ জীবনে তিনিই হয়েছিলেন বেআইনের শিকার। তখনকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে Norman Brown তাঁর বইতে লিখেছে "On January 30, 1962 Suhrawardy was taken into detention. The Home Ministry said that his 'Activities in the recent past have been fraught with such danger to the security and safety of Pakistan that one could fairly describe them as treasonable" বে-আইনি বলেছি এ কারণে যে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এ অভিযোগ কোন বিচারকের সামনে পেশ করা হয়নি—আর তাঁর বিচারও হয়নি কোন আইনের সাহায্যে। পরবর্তী বাক্য কয়টিও Brown-এর "Many members of the Awami League were arrested in February, whereupon student demonstrations followed. Suharwardy was released on August 19, 1962 the official announcement said, The Government is now satisfied that Mr. Suhrawardy will not henceforth participate in any disruptive activities." (PP 232-33)

কোন ভদ্র রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার জন্য আইন আর রাজনীতি নিয়ে এমন ডিগবাজি খেলে না। আর এ ডিগবাজির শিকারে পরিণতি হয়েছেন এমন একজন নেতা—পাকিস্তান হাসিলের সংগ্রামে যাঁর অবিসংবাদিত ভূমিকা সম্বন্ধে দেশের কোথাও দ্বিমত নেই। ক্ষমতার রাজনীতি এমনি হীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও নির্লজ্জ।

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যেতে চায়—সোহরওয়ার্দী যেদিন পাকিস্তানের মাটিতে পা দিয়েছেন সেদিন থেকেই এ অভিযোগের উৎপত্তি—তাঁর মৃত্যুর পরও সে অভিযোগের মৃত্যু ঘটেনি। তাঁকে যেসব লাঠি দিয়ে আঘাত করা হতো তার

অন্যতম হচ্ছে এটি। তিনি নেই—এখন তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্বিচারে এ লাঠি চালানো হচ্ছে। এ প্রায় মেষশাবক আর নেকড়েবাঘের কাহিনী। এখন দেশে যে রাজনীতি চলছে সে রাজনীতি ক্ষমতাসীনদের এমনি যুক্তিহীন নেকড়েবাঘ বানিয়েই ছেড়েছে। মুসলমানরা কেন পাকিস্তান চেয়েছিল তার একটা সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন উত্তর ছিল : নিজেদের জান-মাল, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্যই মুসলমানরা পাকিস্তান দাবি করেছিল—করেছিল তার জন্য সংগ্রাম। এ সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সংখ্যায়ও পাকিস্তানের অনুকূলে—তাদের ভোট ছিল সমপরিমাণ অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি। হঠাৎ এমন কি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে পশ্চিম বঙ্গ তথা ভারতের সঙ্গে মিলে যেতে চাইবে? তাতে তাদের কি উপকার বা ফায়দা হবে? পাকিস্তান চাওয়ার পেছনে যেমন একটা কারণ ছিল তেমনি নস্যাৎ করার পেছনেও তো একটা কারণ থাকা চাই। সে কারণ কি? আমাদের রাজনৈতিক নেকড়েবাঘেরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর আজো দেননি, নেই বলেই বোধকরি দেওয়ার কোন প্রয়োজনও বোধ করেননি। ভারতের সামাজিক পরিবেশ আর আবহাওয়া বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য এখন যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে আমার বিশ্বাস অতিবড় উগ্র ভারত-প্রেমিকও ভারতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কিছুমাত্র প্রলুব্ধ বোধ করবে না। যে দেশে এ যুগেও গো-হত্যার নামে তাণ্ডব নৃত্য চলে পূর্ব পাকিস্তানের গরুখোর মুসলমান সে দেশের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যেতে চাইবে এ স্রেফ গো মস্তিষ্কেরই কল্পনা। অবিভক্ত ভারতে এক গো-কোরবানির জন্য কম মুসলমান কি জান কোরবান দিয়েছে? আবারও তারা সে পরিত্যক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে যাবে কোন দুঃখে? একটুখানি যুক্তি-বিচারের আশ্রয় নিলেই পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের সঙ্গে মিলিত হতে চাওয়ার অসারতা মুহূর্তেই ধরা পড়বে। কিন্তু গল্পের নেকড়েবাঘের মতো আমাদের ক্ষমতাসীন নেকড়েবাঘেরাও যুক্তি বা কোন লজিকের ধার ধারেন না। নেকড়েবাঘের মতো তাঁদেরও একমাত্র যুক্তি Might is right কিন্তু এ যুক্তি বড্ড ক্ষণস্থায়ী। এ যুক্তির সাহায্যে যাঁরা ক্ষমতায় থাকতে চান আর এখানে ওখানে নিজের নাম খোদাই করে চান অমর হতে ইতিহাসের চালুনির ছিদ্র পথে—সর্বাগ্রে তাঁরাই গলে পড়বেন—অচিরে ইতিহাসের ভাঙা কুলা তাঁদের নাম আর স্মৃতি দুই-ই নিক্ষেপ করবে বিস্মৃতির ভস্মাস্তূপে। আমরা জানি সোহরাওয়ার্দীর নামে কোন রাস্তাঘাট হয়নি, হয়নি স্কুল কলেজ বা হল, হয়নি তাঁর নামে গেট, হয়নি মাঠ-ময়দান। কিন্তু পাক-ভারতের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আর রেখে গেছেন যে রাজনৈতিক ঐতিহ্য-ইতিহাস তা কখনো ভুলবে না।

১৯৬৬

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

প্রথমেই নিবেদন করে রাখি, বেশ কিছুটা শঙ্কিত মনেই আমি এখানে, আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। শঙ্কার প্রথম কারণ—আমার অযোগ্যতা। দ্বিতীয় কারণ দুটি প্রশ্ন : আমার বক্তব্য কি কাকেও খুশি করতে পারবে? আর আমাকে এ সম্মানের আসনে বসানো কি ঠিক হয়েছে? প্রথম প্রশ্নটি আমার নিজেরই নিজের প্রতি, দ্বিতীয়টি হয়তো আপনাদেরই।

আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ—এ ব্যাপারে আমার নিজের কোন দায়িত্ব নেই। এ সম্মান অপ্রত্যাশিতভাবেই আরোপিত। দীর্ঘকাল ছাত্রদের সংসর্গে জীবন কাটিয়েছি, আহরণ করেছি তাদের কাছ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর প্রাণচাঞ্চল্য। তাই তাদের কাছ থেকে ডাক এলে অনেক সময় সাড়া না দিয়ে পারি না। ভুলে যাই নিজের সামর্থ্য-অসামর্থ্যের কথা।

এ অনুষ্ঠানকে সুধী সমাবেশ বলা হলেও এর উদ্যোক্তারা ছাত্র-শিক্ষার্থী। পেশায় আমি শিক্ষক ছিলাম—সব মানুষেরই কিছু না কিছু নেশা থাকে, কারণ শুধু পেশায় মানুষের মন ভরে না—আমারও কিছুটা নেশা ছিল সাহিত্যের, সে নেশা আজও অব্যাহত।

তাই আমার কাছ থেকে শিক্ষা আর সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য শোনার দাবি হয়তো অসঙ্গত নয়। এ দুই বিষয়ে আমি যা কিছু এখানে অতি সংক্ষেপে নিবেদন করব তা আমার ব্যক্তিগত মতামত—রাজনীতি সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হয়তো প্রসঙ্গক্রমে আমার অভিভাষণের আওতায় এসে যাবে। বলাবাহুল্য তাও আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য হিসেবেই গ্রহণীয়। কোন অর্থেই আমি রাজনীতিবিদ নই—কাকেও গদিচ্যুত করে সে গদিটা নিজে দখল করে নেওয়ার এমন বদ-খেয়াল আমার মনে কোন দিনই জাগেনি। অতএব আমার কথা স্রেফ এক সাধারণ নাগরিকেরই কথা। এ সভা এক ছাত্র প্রতিষ্ঠান দ্বারা আহূত হলেও আমার মতামতের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই—আমার মতামতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই।

শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা শুরু করা যাক। রাজনীতি আজ জীবনের এক অচ্ছেদ্য অংশ বলে এ আলোচনা আমাদের রাজনীতির অলি-গলিতেও টেনে নিয়ে যাবে। ভিতর আর বাইর—আভ্যন্তরীণ সত্তা আর বাহ্যিক সত্তা এ দুই নিয়েই মানুষ, এ দুইয়ের সঙ্গতি সাধন করে মানব-সন্তানকে বড় করে, বাড়িয়ে আর ফুটিয়ে তোলাই শিক্ষার এক সার্বজনীন উদ্দেশ্য। এভাবে মানুষ অর্জন করে জীবনযুদ্ধের উপযোগিতা। ভিতর আর বাইরের এ সমন্বয় তত্ত্ব মোটামুটি সত্য হলেও প্রধান ভূমিকা কিন্তু ভিতর বা আভ্যন্তরিক সত্তার। যেমন কারো দেহটা অক্ষত বা অক্ষুণ্ণ থাকলেও যখন তার দেহে প্রাণের অভাব ঘটে তখন আমরা বলে থাকি লোকটার মৃত্যু হয়েছে। কাজেই আভ্যন্তরিক সত্তার গুরুত্ব আর মূল্য যে কতখানি এ সরল তথ্য থেকে তা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের মন, মানস, চরিত্র—এ সবকিছু নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ জীবনের ওপর। ইংরেজিতে যাকে Character আর আরবিতে যাকে 'আখলাক' বলা হয়, বাংলায় 'চরিত্র'

শব্দ দিয়ে যার শুধু আংশিক দ্যোতনাই আমরা প্রকাশ করতে সক্ষম, তা পুরোপুরি ভিতরের বস্তু—সভাপতিত্ব বা প্রধান অতিথির ভূমিকার মতো তা বাইরে থেকে আরোপ করা যায় না। বহু আয়াসে, বহু শ্রমে ও বহু সাধনায় তা ভিতর থেকে গড়ে তুলতে হয়। এ গড়ে-ওঠা বা গড়ে তোলার জন্য শুধু ভালো বীজ বা চারা হলে চলে না—চাই অনুকূল পরিবেশ আর আবহাওয়া। বীজটা অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য যদি তার গোড়ায় মাটি আর পানি না দিয়ে লাখ লাখ কি কোটি কোটি টাকার নোট কাগজ দেওয়া হয় তাহলে বীজটা যে শুধু অঙ্কুরিত হবে না তা নয়, কাগজ-খেকো পোকারা নোট কাগজের সঙ্গে সঙ্গে বীজটাকেও অগৌণে খেয়ে সাবাড় করে দেবে। তেমনি মানুষের অর্থাৎ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনের খোরাক চাই, চাই অন্তরের খাদ্য আর অনুকূল পরিবেশ। বলাবাহুল্য পাঁচতলা-সাততলা ইমারৎ বা কোটি কোটি টাকার কাগজী পরিকল্পনা সে খোরাক নয়—গাছেরও নয়, নয় মানুষেরও। গাছে আর মানুষে উপমা দিলাম সত্য—কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। গাছ জড়বস্তু—সে যা কিছু গ্রহণ করে, সে মাটি থেকে কি শূন্যমণ্ডল থেকে, যেখান থেকেই হোক, তা করে একান্ত জড়-ভাবে, তাতে বিচার-বিবেচনার স্থান নেই। কিন্তু মানব-সন্তান জীবন্ত প্রাণী—তার ভিতর মন আছে, আছে বিচার-বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি, দীপ্ত হয়ে ওঠার অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এসব দিয়েই সে গ্রহণ করে। তাই তার গ্রহণ বিচার-বুদ্ধি আর হৃদয় দিয়ে গ্রহণ। এখানে বাইরের জবরদস্তি অচল—এ এক ভিতরের স্বয়ংস্ফূর্ত সচেতন প্রয়াস।

সমাজ চায় ছাত্ররা শ্রদ্ধাশীল হোক, গুরুজনদের মান্য করতে শিখুক, শিক্ষক-অধ্যাপক আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের প্রতি দেখাক সসম্মান আনুগত্য। সুষ্ঠু লেখাপড়া আর সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চালাবার জন্য এসব যে অত্যাবশ্যক তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদ্যা এবং জ্ঞান যেমন অর্জন করতে হয় তেমনি অর্জন করতে হয় শ্রদ্ধা-ভক্তিও। সর্বত্র অধিকারীভেদ স্বীকৃতযোগ্য ছাত্র হওয়ার জন্য যেমন সাধনা অত্যাবশ্যক তেমনি যোগ্য শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ার জন্যও অসীম সাধনার প্রয়োজন, প্রয়োজন সীমাহীন ত্যাগের। অন্ধভক্তি কোন কাজের কথা নয়— তা ফলপ্রসূ যেমন নয় তেমনি নয় দীর্ঘায়ুও, ছাত্রদের যেমন আমরা বিচার করে নিতে চাই, তারাও তেমনি বিচার করেই আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্পণ করতে চায়। আমরা তাদের পরীক্ষা করব, তারা আমাদের পরীক্ষা করবে না, এ কিছুমাত্র যুক্তির কথা নয়, নয় স্বভাবের কথাও। যতই অপরিণত হোক ছাত্ররাও বিচার-বুদ্ধির অধিকারী। আমরা যারা আজ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হয়ে বসে আছি বা দৈবানুগ্রহে বসবার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যে কয়জন আমরা সত্য সত্যই শ্রদ্ধার পাত্র? আজকের দিনে এ আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। কারণ, ছাত্র অসন্তোষের সঙ্গে এ প্রশ্নেরও যে সম্পর্ক নেই তা কিছুতেই বলা যায় না। আজকের দিনে ক্ষমতার দাপট বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক— তাই যে কোন ক্ষমতাসীন লোককেই মানুষ ভয় করে থাকে। কিন্তু ভয় আর শ্রদ্ধা তো এক বস্তু নয়। আগে পিছে সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে যারা ঘুরে বেড়াবার অধিকার পেয়েছে সে অধিকার সাময়িক হলেও তাদেরে ভয় করে চলতে হয় বইকি— আমি নিজেও ভয় করে চলি। আপনাদের জীবনে তেমন দুর্ভোগ ঘটেছে কিনা জানি না, আমাকে কিন্তু বহুবার রাস্তার এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে এ ভয়ের মূল্য দিতে হয়েছে। ক্ষমতার এ মাশুলটুকু দিতে আমি প্রস্তুত কিন্তু

ক্ষমতার পথ বেয়ে তিনি যদি আমার শ্রদ্ধাটুকুও দাবি করেন, চান আমার হাতের সালামটুকুও, তখনই বাধে মুশকিল। সব মানুষের মধ্যেই একটা চিরন্তন বিদ্রোহী সত্তা আছে— পৃথিবীর তাবৎ মহাপুরুষই বিদ্রোহী। স্বর্গভ্রষ্ট বাবা আদম থেকে মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে এ বিদ্রোহী সত্তাটুকু পেয়েছে। সে সত্তাটুকু মানুষকে স্রেফ ক্ষমতার কাছে, অন্যায় আর শঠতার কাছে মাথা নোয়াতে দেয় না। মানুষের এ এক পরম সম্পদ— এ সম্পদ দিয়ে মানুষ যুগে যুগে অসাধ্য সাধন করেছে। আমাদের এ স্বল্পকালীন ইতিহাসে- ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি গুটিকয়েক তরুণ ক্ষমতার কাছে মাথা নোওয়াতে অস্বীকার করে, চরম মূল্য দিয়ে অসাধ্য সাধনের এক নজির কি রেখে যায়নি? যে-কোন জাতির জন্য মৃত্যুর উত্তরাধিকার হচ্ছে সবচেয়ে মহত্তম উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকার যাঁরা জাতিকে দিয়ে গেছেন তাঁরা চিরস্মরণীয়।

তবে মহৎ সংকল্প সাধনেই মহৎ সম্পদের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। মশা মারতে কামান দাগা যুক্তিহীন বলেই হাস্যাস্পদ। তাই যে-কোন তুচ্ছ কারণে এ সম্পদকে হাতিয়ারে পরিণত করা সঙ্গত নয়। পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া বা প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে এসব অজুহাতে ছাত্ররা যে মাঝে মাঝে আন্দোলন করে বসে তা শক্তির অহেতুক অপব্যবহার বলেই আমার বিশ্বাস। পরীক্ষা পিছিয়ে নেওয়া মানে স্বয়ং ছাত্রদেরই পিছিয়ে পড়া। আর প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে কি সহজ হয়েছে সে বিচারের দায়িত্ব ছাত্রদের নিজের স্বার্থের ছাত্রদের ওপর দেওয়া যায় না। তাহলে খাতা দেখার দায়িত্বও তাদের ওপর দেওয়া হবে না কেন? আমি যে যুক্তি-বিচারের কথা বলেছি ছাত্ররা যেন সে যুক্তি-বিচারের আশ্রয় নেন প্রতিটি সমস্যার ব্যাপারে। তাহলে আপাতদৃষ্টিতে যাকে অবিচার বলে মনে হচ্ছে তা আর তখন অবিচার মনে হবে না।

আজ থেকে প্রায় উনচল্লিশ বছর আগে— ১৯২৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আমরা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলাম। সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচারবুদ্ধির চর্চা করা— সবকিছুকে যথাসম্ভব বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করা। তাই এর নাম দাঁড়িয়েছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন বলে। আজো এ আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি— প্রতিষ্ঠান না থাকতে পারে কিন্তু বুদ্ধির নিরিখে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখার যে আবেদন তা চিরন্তন— অন্তত বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে। জানি, আবেগ আর অনুভূতির মূল্য অপরিসীম, তবে এ আবেগ-অনুভূতি হওয়া চাই বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত— যুক্তির অনুসারী। আমাদের রাষ্ট্রিক আর সামাজিক জীবনের অনেক ব্যর্থতার কারণ বুদ্ধিহীন আবেগ সর্বস্বতা। আমি আজ সবিনয়ে আমাদের ফেলে আসা দিনের 'বুদ্ধির মুক্তি' কথাটা আবার নতুন করে আমাদের তরুণ-তরুণীদের সামনে তুলে ধরছি। আশা করি বুদ্ধির মুক্তি বা Imancipation of the Intellect কথাটার অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের এখানকার সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় পরিবেশে তাঁরা নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করবেন।

এ বিচারবুদ্ধি চর্চার অভাবে সমাজে আজ স্তুতি আর স্তাবকতা এত বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে যে, তা প্রায় সব রকম রুচি আর শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর এ স্তুতি-স্তাবকতার মূল উৎসও একমাত্র ক্ষমতা— চরিত্র, ত্যাগ, জ্ঞান বা মানসিক কোন গুণাবলীর

সঙ্গে এর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, কোন ক্ষমতাসীন লোক যদি একবার করাচি কি রাওয়ালপিন্ডি কি কোন বিদেশ সফর করে ফিরে আসেন— তিনি হয়তো তাঁর রুটিন-বাঁধা কাজই করেছেন, বহন করে আনেননি দেশের জন্য বা মানুষের জন্য কোন বিজয়-গৌরব, তবুও তাঁর জন্য মিছিল করা চাই, তোরণ বানানো চাই, লাগানো চাই জিন্দাবাদের প্রতিযোগিতা। এসব অত্যন্ত অনুন্নত মানসিকতারই পরিচায়ক। আমরা ধন-সম্পদে শুধু যে অনুন্নত তা নয়, মনের দিক দিয়েও যে আমরা অনুন্নত এসব তারই নিদর্শন। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী কি প্রধানমন্ত্রী স্বদেশ বা বিদেশ ঘুরে আসার পর ইংরেজ এমন কাণ্ড করবে তা কল্পনা করাও যায় না। সুদের মতোই স্তাবকতা এক দু'ধারী করাৎ— স্তবকতা যে করে আর যে তা গ্রহণ করে উভয়ের জন্যই তা আত্ম-বিনাশী ও আত্ম-অবমাননাকর। আমি সূচনায় যে চরিত্রের কথা বলেছি তার সঙ্গে এ সবেরই সম্পর্ক রয়েছে। তাই বারে বারেই আমি প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে যাচ্ছি বা যেতে বাধ্য হচ্ছি। আর যারা ছাত্র একদিন তাদেরই কেউ কেউ ক্ষমতাসীন হবেই— দেশের শাসনতন্ত্র যাই হোক, ঘটনা স্রোতের অমোঘ বিধানে তা ঘটতে বাধ্য।

কাজেই এ ব্যাধি সম্বন্ধে এখন থেকেই তাদের সাবধান হওয়া উচিত। এসব হাওয়াইবাজির দীপ্তি যে অত্যন্ত ক্ষণ-বিলীয়মান এ বোধটুকু ছাত্রদের মনে জাগ্রত হোক। সম্প্রতি আর একটা ব্যাধি অত্যন্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আমাদের দেশে— যার নাম দেওয়া যায় জেলাওয়ারি স্বদেশ-প্রেম। এ জেলা সমিতি, ঐ জেলা সংঘ ইত্যাদি প্রায় ব্যাঙের ছাতার মতোই অহরহ গজিয়ে উঠে মানুষের দৃষ্টিকে দেশের সার্বিক স্বার্থ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজ নিজ জেলার সীমিত স্বার্থের দিকে। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও দৌড় হচ্ছে নিজ নিজ জেলার দিকে। তাঁরা যে সমগ্র দেশের মন্ত্রী— দেশের সামগ্রিক স্বার্থের প্রতিভূ জেলাওয়ারি স্বদেশপ্রেমের সর্বনাশা সংকীর্ণতা এ বোধটুকুও তাঁদের মনে দানা বাঁধতে দিচ্ছে না। এ সংকীর্ণতা ধীরে ধীরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ঢুকে পড়তে বাধ্য। ঢুকে পড়েছেও— এখনই দেখা যায় কোন জেলাবাসী যদি কোন উচ্চপদ পেয়ে যান তখন সুযোগ পেলেই যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার না করে বা স্থানিক স্বার্থকে কোন আমল না দিয়েই তাঁর নিজের জেলা থেকে লোক আমদানি করে তাঁর অধীনস্থ পদে বা অফিসে বসিয়ে দেন। এসব কু-দৃষ্টান্তের জন্য জেলাওয়ারি স্বদেশপ্রেমই দায়ী। আর সংকীর্ণ-চিত্ততা সব সময় নিম্নগামী— ফলে আজকের জেলাওয়ারি স্বদেশপ্রেম যে একদিন থানাওয়ারি কি গ্রামওয়ারি অবশেষে পরিবারওয়ারি স্বদেশপ্রেমে পরিণত হবে না তা কে বলতে পারে? তখন দেশের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখুন।

সম্প্রতি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমরা যে অর্বাচীনতার পরিচয় দিয়েছি তার কথা মনে হলেই লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দায়িত্ব কি ছাত্রদের বা আপামর জনসাধারণের? সে বিচারের যোগ্যতা কি এদের আছে? বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতম জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র— তা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের অধিক সংখ্যক মানুষ তার ফলভোগী হবে সে বিচারের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের। নির্বিচারে সব কিছুকে যদি আমরা মিছিল-স্লোগান আর জনসভার ব্যাপার করে তুলি তা হলে সুস্থ মস্তিষ্কে কোন গুরুতর সমস্যারই সমাধান আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। এ তো

প্রায় প্রকাশ্য গোপন কথা যে, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যেসব অবাঞ্ছিত কাণ্ডকারখানা ঘটেছে তার জন্য কোন কোন কর্তা ব্যক্তিই দায়ী— তাঁরা নেপথ্য থেকে সূত্র টেনে বা উস্কানি জুগিয়ে তিলকে তাল করে, সাধারণ ব্যাপারকে অসাধারণ করে তুলেছেন, ছড়িয়ে দিয়েছেন জেলায় জেলায় বিদ্বেষ আর হিংসা। আর সে হিংসার কি লজ্জাকর অভিব্যক্তি! জেলাওয়ারি স্বদেশপ্রেমের এ এক সাম্প্রতিককালের কুকীর্তি! ঢাকা বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তো সে যুগের ছাত্র-সমাজ বা জনসাধারণ জেলাওয়ারি স্বদেশপ্রেমের এমন লজ্জাকর অন্ধ আবেগে উত্তেজিত হয়ে ওঠেনি। এসব ব্যাপারে এখন জনসাধারণ কি অধিকতর সচেতন? মোটেও নয়, বরং বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড দৃষ্টিরই এ আর এক প্রকাশ। আজ মানুষের দৃষ্টি দেশগত বা জাতিগত সীমা ছাড়িয়ে সার্বজনীন হতে চাচ্ছে— আজ মানুষ স্বপ্ন দেখছে এক বিশ্ব আর এক মানব জাতীয়তার আর সেখানে আমরা দেশগত এক জাতীয়তা বা তার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনেও হচ্ছি ব্যর্থ। দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম মুক্ত এক সুখী বিশ্বের স্বপ্নে যেখানে মানুষের মন উদ্বুদ্ধ সেখানে কিনা আমরা পা বাড়াচ্ছি বৃহত্তর দেশ-চেতনা ছেড়ে জেলা, থানা আর নিজ নিজ গ্রামের দিকে। আর এ দৃষ্টিভঙ্গিটা দ্রুত প্রসার লাভ করছে নেহায়েৎ হাল আমলেই। এর কারণ কি? আমার বিশ্বাস বর্তমান শাসনতন্ত্রই এর জন্য অংশত দায়ী! কারণ এ শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা, পৃথক পৃথক করে দেখা, ঐক্যবদ্ধ সংহত শক্তিতে রূপান্তরিত হতে না দেওয়া। কারণ তাহলে যে কোন মুহূর্তে তা তার নিজেরই মৃত্যু-বাণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই এ শাসনতন্ত্র সংহত-শক্তির বিরোধী— তাই এ একজনকে লাগায় অন্যজনের বিরুদ্ধে, ব্যবহার করে একদলকে অন্য দলের বিপক্ষে, এমনকি বন্ধুকেও ব্যবহার করে বন্ধুর প্রতিকূলে। মৌলিক গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটিই এখানে—সে মানুষকে মিলতে দেয় না, করে বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক। একবার কোন রকমে মৌলিক গণতন্ত্রী হয়ে যেতে পারলে পাঁচ বছরে গোটা তিনেক রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সমাধানের পর সে হয়ে পড়ে নির্বীর্য আর নিষ্ক্রিয়, বৃহত্তর জনস্বার্থের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই থাকে না। যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের গলিতে-গলিতে বিচরণ করতে চায় তারা হয়ে পড়ে দ্রুত-গতি আর যারা ঐসব পথ মাড়াতে অনিচ্ছুক তারা হয়ে পড়ে বেকার বা ঘুমিয়ে পড়া সদস্য। ন' কোটি মানুষের আশি হাজার প্রতিনিধির এ তো অবস্থা। এ আশি হাজারের চল্লিশ হাজার একজনকে যিনি একবার বাগাতে পারবেন, তাঁকে আর পায় কে? ইচ্ছা করলে তিনি দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারেন। ভয় আর প্রলোভন—এ দুই হাতিয়ার ব্যবহারের সর্বময় ক্ষমতা একবার যিনি লাভ করবেন, তাকে স্থানচ্যুত করা কিছুতেই সম্ভব নয়—যদি না দৈব মেহেরবানি করেন। দেশের সব ক্ষমতা এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়া সমর্থন করা যেত যদি তা দেশের সর্বত্র, প্রতি মানুষের ঘরে ঘরে বর্ষার জলধারার মতো ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ থাকত—এখন তা হওয়ার জো নেই। ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হলে আর তা বিকিরণধর্মী হলে শক্ত-কেন্দ্রে আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই। তা নয় বলেই আমাদের আপত্তি।

দেশের সংহতি আর স্থিতিশীলতা কে না চায়? শাসনতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়েও কি তা অর্জন করা যায় না? প্রেসিডেন্ট যাতে একটানা পাঁচ বছর নির্বিঘ্নে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে পারেন আর আইন পরিষদের সদস্যরা যাতে ইচ্ছামতো দলত্যাগ করে সংকট সৃষ্টি করতে অক্ষম হন তার কঠোর বিধান শাসনতন্ত্রে সংযোজন করা হলে স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ন

হওয়ার কোন আশঙ্কাই তো থাকে না। আর এ সংযোজন কিছুমাত্র অসাধ্য ব্যাপার নয় তাহলে জনগণ সহজেই দেশের শাসনতন্ত্রের অংশীদার হয়ে দেশ গঠনে নিয়োগ করতে পারেন নিজেদের। তখন ভয় আর প্রলোভনের সন্দেহ আর আশঙ্কাও হবে দূরীভূত। কারণ ন'কোটি মানুষকে ভয় বা প্রলোভনে বশীভূত করা কখনো সম্ভব নয়—এমনকি নির্বাচনী এলাকা বিশেষের চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার ভোটারকেও তা করা দুঃসাধ্য। এখনকার ব্যাপক ইলেক্‌শনি দুর্নীতির হাত থেকেও তাহলে দেশ রক্ষা পায়। দুর্নীতির সুযোগ ও সুবিধাই অনেক সময় দুর্নীতিকে দেয় প্রশ্রয়। সমাজে দুর্নীতি সব সময়ই ছিল কিন্তু বর্তমান শাসনযন্ত্রে তা প্রসারের সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত দরাজ বলেই আমাদের আপত্তি।

আমি অন্যত্র বলেছি গণতন্ত্র হচ্ছে দুই পা বিশিষ্ট জীব—তার এক পা সরকার অন্য পা বিরোধী দল। বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র খোঁড়া আর চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়তে বাধ্য।

যাঁরা বিরোধী দলকে রাষ্ট্রের শত্রু বলেন বা মনে করেন তাঁরা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়ে থাকেন শুধু। আধুনিক গণতন্ত্রের জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডে বিরোধী দলকে সসম্মানে His Majesty's or Her Majesty's Opposition বলে অভিহিত করা হয়। বিরোধী দলের প্রতি এরকম সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছাড়া গণতন্ত্র যে শুধু পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না তা নয়—একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথও তাতে হয় সুগম। বলাবাহুল্য দলীয় একনায়কত্বও কম ভয়াবহ নয়। তখন এক হাতের লাঠি জনসাধারণের মাথায় পড়ে দশ হাতের লাঠি হয়েই।

নির্বাচনে যারা বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন বা দুর্বল করে দিয়েছেন বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করছেন তাঁদের বিজয়ের পদ্ধতি বা বিরোধী দলের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে, বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যেটুকু গণতন্ত্র স্বীকৃত, তাকেও খঞ্জ আর দুর্বল করে ছেড়েছেন। গণতন্ত্র দুর্বল হওয়া মানে দেশ দুর্বল হওয়া। এ ক্ষতি সমগ্র জাতির—দলীয় বা খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে যাঁরা দেশের দিকে তাকাচ্ছেন তারা এ সত্যটুকু হয়তো আজ বুঝতে পারছেন না। সরকারি দল সে মুসলিম লীগই হোক বা বিরোধী অন্য কোন দলই হোক—শতকরা একশটা সিটও যদি দখল করে তাতে দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথটাই শুধু দখল করা হয়। বৃহত্তর দেশের কোন ফায়দা হয় না তাতে। এখন যেখানে ১২০ কি ১৩০ জন সদস্য যা ফায়দা পাচ্ছেন বা পাবেন তখন না হয় তা দেড় শ'জনেই ভোগ করবেন। কিন্তু তাতেই কি জনগণের বৃহত্তর স্বার্থ সাধিত হবে? দেশের কোন মঙ্গল কর্মের বাস্তবায়নের পথে বিরোধীদল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমন অভিযোগ, যারা রাজনীতিবিদদের একচোট গালাগালি না করে অন্ন গ্রহণও করেন না তাঁদের মুখেও শোনা যায়নি। দেশ আর জাতির সমস্যা সম্বন্ধে জাগ্রতচিত্ততা বা সচেতনতার অভাব ঘটলে দেশ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় সুপ্তির দিকেই এগিয়ে যাবে। জাতির সচেতনতাকে জাগিয়ে রাখা বিরোধী দলের এক প্রধান ভূমিকা। এ ভূমিকা সরকারি দল কিছুতেই পালন করতে পারে না। বিশেষত যেখানে রাষ্ট্র প্রধান আর পার্টিপ্রধান এক সেখানে এমন ভূমিকা পালন আরো অসম্ভব। এ পর্যন্ত কোন সরকারদলীয় সদস্য নেহাৎ আনুষ্ঠানিকভাবেও রাষ্ট্রপ্রধান তথা সরকারি নীতির কোন সমালোচনা করেছেন তার কোন নজির নেই। এ অবস্থায় সরকারি দল দেশকে ঘুম পাড়াতে পারে—জাগাতে পারে না। দেশ আজ তাই

সর্বতোভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন। বর্তমান শাসনতন্ত্র মানুষকে প্রায় যন্ত্রে পরিণত করেছে—তার নেই নিজস্ব কোন উদ্যোগ কি উদ্যম। তার সব রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বিচিত্র সব নিয়মযন্ত্রে বাঁধা, তাকে সব সময় তাকিয়ে থাকতে হয় রাওলপিন্ডি বা গভর্নর হাউসের দিকে।

মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করা কোন রাষ্ট্রেরই আদর্শ হতে পারে না—যান্ত্রিক 'স্থিতিশীলতার' যে শান্তি, তা কবরস্থানেরই শান্তি। কবরস্থানের সীমা বাড়ানো কখনো উন্নতির লক্ষণ নয়। বরং তা মহামারীরই ইঙ্গিতবহ। উন্নয়নের নামে কবরস্থানের ওপর কয়েকটি কুতুবমিনার কি তাজমহল বানাবার চেষ্টা একদিন ইতিহাসে চরম বোকামি বলেই ধিক্কৃত হবে। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে আমি যে কিছুটা দীর্ঘ আলোচনা করলাম তার কারণ ছাত্র অসন্তোষের মূল কারণ এ রাজনীতি। রাজনীতি আজ সব শক্তির মূল উৎস বলে তার প্রভাব কেউই এড়াতে পারে না—ছাত্ররা তো পারেই না। কারণ তারাই হচ্ছে দেশের সবচেয়ে সচেতন অংশ—আপাতত জীবিকার দায়মুক্ত বলে পারে তারা কিছুটা বেপরওয়া হতেও আর দেশের জন্য বা আদর্শের জন্য নিতে পারে সব রকম বিপদের ঝুঁকিও তারাই। ছাত্রদের প্রতি রাজনীতি সম্বন্ধে নির্লিপ্ত বা উদাসীন থাকার যে উপদেশ দেওয়া হয় তা নানা কারণে অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। আগেই বলেছি, রাজনীতি আজ এমন এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে যে, তার হাত থেকে কারো রেহাই নেই। দ্বিতীয়ত এ উপদেশ যারা দিচ্ছেন—তাঁরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের হয়েও রাজনীতির কুটিল সিঁড়ি বেয়ে নিজেরা কি করে পদ ও ক্ষমতার আসন দখল করেছেন তা তো ছাত্রদের অজানা নয়, নয় অদেখা—তাঁদের নিজের জীবনই তো তাঁদের উপদেশের মূর্তিমান স্ববিরোধিতা। যে দরবেশ এক বালককে চিনি কম খেতে উপদেশ দিয়েছিলেন, উপদেশ দেওয়ার আগে তিনি নিজেই চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। এভাবে অর্জন করেছিলেন উপদেশ দানের যোগ্যতা। যে নেতা-উপনেতারা আজ ছাত্রদের রাজনীতি না করার উপদেশ দিচ্ছেন তাঁরা উক্ত দরবেশের এ সহজ নীতিটুকু পালন করেন না কেন? একমাত্র তখনই তাঁদের উপদেশ শোনার উপযুক্ততা লাভ করতে পারে।

শিক্ষার জন্য সুস্থ আর অনুকূল পরিবেশ অত্যাবশ্যক—সে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সমাজ আর রাষ্ট্রের। ছাত্র অসন্তোষের সমাধান নির্ভর করে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ওপর। সমাজ বা রাষ্ট্র ছাত্র-সমাজের কোন্ সমস্যাটার সমাধান করেছে? রাষ্ট্র কি ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল-কলেজ, যথাসময় যথোপযুক্ত পাঠ্যবই বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক অধ্যাপক দিয়েছে না দিতে পেরেছে? আজো অনেক সরকারি স্কুল কলেজেও শিক্ষক বা অধ্যাপকের অভাবে অনেক ক্লাস খালি পড়ে থাকে। 'এক শ্রেণী এক শিক্ষক' এ প্রাথমিক নীতিটুকুও অনেক শিক্ষায়তনে পালিত হয় না আজ। শুনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক নেই। আমি এক সরকারি কলেজের কথা জানি—সেখানে অর্থনীতিতে অনার্স পড়ানো হয়, যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রও অনার্স ক্লাসে ভর্তি হয়েছে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নেই কোন বিভাগীয় অধ্যাপক, এমনকি নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যার চতুর্থাংশ শিক্ষকও। সে কলেজে ভূগোলও পড়ানো হয়, কিন্তু আছেন একজন মাত্র লেকচারার। তিনি আবার অর্ধেক সময় এ কলেজে আর এক অর্ধেক সময় সরকারি অন্য একটা প্রতিষ্ঠানে পড়াতে যান। ফলে অনেক ক্লাসই খালি পড়ে থাকে। কোন কলেজ থেকে কোন অধ্যাপক যদি একবার বদলি হন বা অন্যত্র চলে যান, দীর্ঘকাল

সে শূন্যস্থান আর পূরণই হয় না। অধ্যক্ষরা ওপরওয়ালাদের কাছে লিখে লিখে হয়রান হয়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে 'কর্তার ইচ্ছয় কর্ম' বলে স্বস্তি খোঁজেন। ক্লাসের পর ক্লাস খালি পড়ে থাকে—নিরুপায় ছাত্রদের তখন এখানে ওখানে জটলা করে সময় কাটানো ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগে এমন হওয়ার কি কোন সম্ভাবনা ছিল? তখন অধ্যক্ষরাই অস্থায়ী ব্যবস্থা করে নিয়ে পড়াশোনার ধারাটা অব্যাহত রাখতে পারতেন। এখন সে ক্ষমতা অধ্যক্ষদের নেই। এখন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করারই যুগ—ক্ষমতা এখন কেন্দ্রে তথা হেড্ অফিসে। কোথায় কোন্ স্কুলে কি কলেজে ক্লাস হচ্ছে কি হচ্ছে না এ নিয়ে হেড অফিসের কোন মাথাব্যথা নেই। দুই শিফ্টের নামে যে গোঁজামিলের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়াটা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের মুখে শুনেছি—এ হচ্ছে স্রেফ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো—কোন শিফ্টেই লেখাপড়া হয় না, আসা-যাওয়াই শুধু সার। স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক নিয়মেই দেশের লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে— ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাও বেড়েছে বহুগুণ। অথচ সে অনুপাতে সরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যাও মোটেও বাড়েনি। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আমলে মেয়েদের একটিমাত্র সরকারি হাই স্কুল ছিল, আজো সে একটিই আছে। ছেলেদের দুটি হাইস্কুল ছিল আজো সে দু'টির ওপর তিনটি হয়নি। কলেজের বেলায়ও তাই। হোস্টেল আর হলগুলিতে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তার সম্বন্ধে এ শাসনামলের এক প্রাক্তন গভর্নরের উক্তি হচ্ছে 'এসব গরু ছাগলেরও অখাদ্য'। তিনি বোধকরি Cattle শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন। মনের আর দেহের খোরাকের ব্যাপারে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এই তো অবস্থা। এ অবস্থায় শিক্ষা খাতে একশ' ত্রিশ কোটি টাকার পরিকল্পনা আর ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে গর্ব করার কোন মানে হয় কি? ব্যয়-বহুল ক্যাডেট কলেজে কয়টা অভিভাবক ছেলে পাঠাতে পারে? ক্যাডেট কলেজের দ্বারা দেশের শিক্ষা সমস্যার শত ভাগের এক ভাগ মেটানো সম্ভব নয়। আর সেখানে জীবনযাত্রায় এমন একটা কৃত্রিম মান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় যে, যার সঙ্গে চারদিকের সমাজের নেই কোন সম্পর্ক—অনেক পিতামাতার মানের সঙ্গেও রয়েছে তার বিরোধ। 'কোন ছেলে-মেয়েই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে না আর কোন ক্লাসই থাকবে না খালি' কোটি টাকার পেনিসিলিন কাহিনী না শুনিয়ে সরকার যদি এ সঙ্কল্পটাই গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন তাহলে ছাত্র অসন্তোষের অনেক কারণই তিরোহিত হবে আর ব্যাপক অশিক্ষা বা নিরক্ষরতারও ঘটবে অবসান।

শিক্ষার জন্য সুস্থ পরিবেশ যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি অত্যাবশ্যক শৃঙ্খলা-বোধ ও শৃঙ্খলা-রক্ষাও। গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে রাজনৈতিক দল স্বীকৃত—সেখানে রাজনীতিতে রকম-ফের আর বৈপরিত্য স্বাভাবিক ঘটনা। ছাত্রদের ওপরও এ বৈপরিত্যের প্রভাব অনিবার্য বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। কিন্তু দলীয় রাজনীতিকে বিশ্ববিদ্যালয় কি অন্য শিক্ষায়তনে ঢুকতে দিলে শৃঙ্খলা রক্ষা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে—ফলে ছাত্ররাই হবে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, বিঘ্নিত হবে তাদের বৃহত্তর স্বার্থ। তাই সব ছাত্র প্রতিষ্ঠানেরই সংকল্প হওয়া উচিত—দলীয় রাজনীতিকে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষায়তনের প্রাঙ্গণে ঢুকতে না দেওয়া। এবার সাহিত্য সম্বন্ধে আমার নিজের কথারই কিছুটা পুনরাবৃত্তি করে আমার বক্তব্য শেষ করব।

পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্যের আয়ু খুব দীর্ঘ নয়—স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তার আগে বাংলা সাহিত্য ছিল পুরোপুরি কলকাতাকেন্দ্রিক। তখন লেখকরাও নানা অছিলায় জড়ো হতেন কলকাতায় গিয়ে, স্বপ্নও দেখতেন কলকাতা থেকে বই প্রকাশের। কলকাতার বাইরে একটিও উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা-সংস্থা ছিল না। তাই বাংলা সাহিত্যের যা কিছু প্রসার ও সমৃদ্ধি তা কলকাতাকে কেন্দ্র করেই।

সাহিত্য এক দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার—অন্যান্য ব্যবহারিক শিল্প, প্রয়োজনের তাড়নায় রাতারাতি গড়ে ওঠা হয়তো সম্ভব, কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের তেমন কোন তাৎক্ষণিক-তাড়না নেই বলে তার গতি স্বভাবতই মন্থর। সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্ব যেমন দীর্ঘ তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ-মনে তার চাহিদা-তাড়নার সৃষ্টিও সময়-সাপেক্ষ আর তা আরো বহু কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাহিত্যের সমস্যা শুধু লেখককেন্দ্রিক নয় পাঠককেন্দ্রিকও। পাঠকের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মানেরও উন্নয়ন না হয়ে পারে না। অবশ্য উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আরো যে শর্ত নেই তা নয়, যেমন সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্যবোধ, সমাজের সার্বিক সংস্কৃতি চেতনা ইত্যাদি। তবুও পাঠক ছাড়া আজকের দিনে সাহিত্য আর সাহিত্যিকের বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। সাহিত্যকে বাদ দিয়ে বরং পাঠক বাঁচতে পারে, তবে সে বাঁচা মনের বিকাশ আর মূল্যবোধকে শিকেয় তুলে রেখে বাঁচা। প্রাচীনকালে যে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তার বড় কারণ তখন সাহিত্য আর সাহিত্যিক এমন পাঠকনির্ভর ছিল না; তখন রচিত হতো শুধু কবিতাই আর কবি মাত্র ছিলেন সভা-কবি। রাজাই ছিলেন তখন সাহিত্যের একাধারে রক্ষক ও সমঝদার। এখন সে আসন জনসাধারণের। জনসাধারণ যদি সাহিত্যের রসগ্রাহী না হন, তাহলে সাহিত্যের ফুলফোটা বিলম্বিত হবেই। সাহিত্য তো আর কোন বনফুল নয় যে আপনা-আপনি ফুটে আপনা-আপনি ঝরে পড়বে।

সতেরো বছরে সাহিত্য-শিল্পের মতো দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপারে খুব বেশি আশা করা সম্ভব নয়। তবে দেখতে হবে গোড়াপত্তন ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা অর্থাৎ সাহিত্য-শিল্পের যে বুনিয়াদি শর্ত তা আমরা পালন করছি কিনা। আমাদের পদক্ষেপটা পড়ছে কিনা ঠিকভাবে।

খাঁটি সাহিত্যের কাছে শাস্ত্রকে এমনকি রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও একদিন মাথা নোওয়াতে হবে—এ বিশ্বাসে আমি বিশ্বাসী। আধুনিকমনা পাঠক সংখ্যা অগুণিত হলে শাস্ত্রের পশ্চাদ গতি যে দ্রুত ও ত্বরান্বিত হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাময়িকভাবে সবকিছুই রাহুগ্রস্ত হতে পারে। সাহিত্য একটা বন্ধনমুক্ত ব্যাপার প্রথমে এ বোধটা থাকা চাই। তারপর চাই তার জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি।

সাহিত্য অপ্রাকৃত, অপার্থিব বা অলৌকিক কিছু নয়—নয় কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার। অন্য দশটা পার্থিব আর লৌকিক ব্যাপারের মতো তারো বিকাশের ধারা একই। অর্থাৎ তারও পৃষ্ঠপোষক তথা ক্রেতা, পাঠক চাই। আমরা কয়জনে বই কিনি? দেশের বই, স্বদেশের লেখক আর প্রকাশকের বই? সাহিত্য আর তো উর্বশী নয় যে, 'বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি' উঠবে।

দেশের সাহিত্যের প্রতি যদি একটা অকৃত্রিম মমতা আমাদের মনে না জন্মে, আমরা যদি আমাদের দেশের বই-পুস্তককে নিজের সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ করে নিতে না পারি তাহলে

মহৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র রচনা বিলম্বিত হবেই। এখন আমাদের অনেকের স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি একটা উন্নাসিক মনোভাব রয়েছে। অন্যান্য দেশে সাহিত্য কিভাবে গড়ে উঠেছে সে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ মনোভাব অনেকখানি দূর হবে। প্রাথমিক অবস্থায় মহৎ সব কিছুর প্রতি একটা অটল নিষ্ঠা থাকা চাই। অনেক সময় সে নিষ্ঠা গোঁড়ামির কাছাকাছি গিয়েও পৌঁছে। তাতে ভীত হওয়ার কারণ নেই, কারণ সাহিত্যই জোগায় সব রকম গোঁড়ামির সীমা পেরিয়ে উদার সূর্যালোকে পৌঁছার প্রেরণা।

পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য অচল বা বন্ধ্যা হয়ে আছে আমি তা বিশ্বাস করি না। এখনো আশানুরূপ প্রাচুর্য হয়তো দেখা দেয়নি, কিন্তু তার পেছনে বহুতর কারণ রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকরা আজ শুধু পাঠকের মুখাপেক্ষী নয়। প্রকাশক আর গ্রন্থবিক্রেতাদেরও মুখাপেক্ষী। লেখক, পাঠক আর প্রকাশক— এ তিনের যোগসূত্রে সাহিত্যের গতি আর সমৃদ্ধি বাঁধা ও গাঁথা। এ শৃঙ্খলের একটি কড়ার অনুপস্থিতেও সাহিত্যের গতি বিঘ্নিত হতে বাধ্য। প্রকাশক আর ক্রেতার সহযোগিতা পেলে, এখানকার সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায়, আমাদের সাহিত্যের যে দারিদ্র্য দেখে আজ আমার কিছুটা হতাশা বোধ করছি তা আর থাকবে না। সাহিত্যের শৈশব দীর্ঘ বলে তার জন্য মাতৃস্নেহও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া উচিত। মাত্র সতেরো বছরে এর বেশি সুফলের নজির অন্য কোন সাহিত্যের ইতিহাসেও নেই। আমাদের অনেকের মনে একটা হীনম্মন্যতাবোধ আছে—হীনম্মন্যতা কিন্তু আত্মবিনাশী।

শিক্ষা, সাহিত্য আর রাজনীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা গেল। কিন্তু রয়ে গেল আসল কথা—আমরা কি চাই, আমাদের আদর্শ কি? আমরা সামনের জন্য কি ধরনের স্বপ্ন দেখছি অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থা কি হবে? শিক্ষা, সাহিত্য আর রাজনীতির পথ বেয়েই আমাদের সে সমাজ-ব্যবস্থায় পৌঁছতে হবে এগুলি তার ভিত রচনার উপাদান-উপকরণ—সমাজ মনের কাঠামো তৈরি এর ওপর। যে সমাজ আমরা চাই সে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক আমাদের হতে হবে—গড়ে তুলতে হবে তেমন নাগরিক জন্মাবার ক্ষেত্র আর পরিবেশ। সাহিত্যকে পুরোপুরি না হলেও শিক্ষা আর রাজনীতিকে সে ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবেই। সাহিত্য চিরকালই মানবতার বাণী—বাহক কাজেই কোন রকম ছকবাঁধা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও তার পদক্ষেপ হবে মানবতার দিকে।

আগে একটুখানি ইঙ্গিত করেছি—আধুনিক মানুষের স্বপ্ন হচ্ছে এক বিশ্ব আর এক মানব জাতীয়তার। হয়তো তার জন্য বহু বছর ধরে দুস্তর পথ মানুষকে অতিক্রম করে আসতে হবে। তবে এ তো এক স্বপ্ন—আজো এক ইউটোপিয়া। এতে পৌঁছার পথ কি? কোন একটা বিশেষ পথ ধরেই মানুষকে তার গন্তব্যের দিকে এগুতে হয়। আমরা কোন পথ ধরে এগিয়ে যাব? আমার নিজের মনের সামনে যে পথ ভেসে ওঠে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথ। এ পথের কথা আমি আমার সাহিত্যেও কিছু বলেছি। একে যদি কেউ ইসলামী সমাজতন্ত্র বলতে চায়—তাতেও আপত্তি নেই। আধুনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের বহু বিষয়ে মিল রয়েছে। নাম বড় কথা নয়, লক্ষ্যে পৌঁছানোই বড় কথা। আজ পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে যে ভারসাম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থা আমার দেখতে পাচ্ছি তা ধনবাদের

আর সুযোগ-সুবিধার অসাম্যেরই ফল। যার জন্য অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ আর ধ্বংসের হাত থেকে মানুষ পাচ্ছে রেহাই। এর ক্রমবর্ধমান স্ফীতি রুদ্ধ না হলে হয়তো একদিন এ মানব জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সব মানুষেরই এক জন্মগত অধিকার—সে সুযোগ একমাত্র সমাজতন্ত্রই দিতে পারে। মানুষের যে যৌথ-শক্তি অসাধ্য সাধনে সক্ষম তার পূর্ণ বিকাশ আর পূর্ণ ব্যবহার সেখানেই সম্ভব। আজ যে কয়টা দেশে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সেখানে কি কোন রকম বৈষম্য নেই? হয়তো আছে—কারণ সমাজতন্ত্র আজো কোন দেশেই পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারেনি—আজো চলেছে তার বিবর্তন। এ অপূর্ণ অবস্থায়ও সমাজতন্ত্র মানুষকে ভিক্ষা, পতিতাবৃত্তি ও ক্ষুধার গ্লানি থেকে দিয়েছে মুক্তি— ধন আর রক্তের আভিজাত্যকে অস্বীকার করে সব নাগরিকদের প্রতিভা-বিকাশের দিয়েছে সুযোগ— এ তো কম সাফল্য নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় রথ আজ সমাজতন্ত্রের বিপরীতগামী—আমরা যদি ক্রমে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য আর রাজনীতির মোড় ফেরাতে পারি, আমাদের রাষ্ট্রও একদিন সমাজতন্ত্রের দিকে পা না বাড়িয়ে পারবে না। তখন এ দেশের মানুষ ধন-বৈষম্যের বহু গ্লানির হাত থেকেই পাবে মুক্তি। এখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে যে মন কষাকষি চলছে তারও ঘটবে তখন অবসান। কারণ তখন পূর্ব আর পশ্চিম নির্বিশেষে সবাই হবে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। তখন দেশের এ অংশ বা ঐ অংশ বড় না হয়ে মানুষই হয়ে উঠবে বড়—তখন সমস্ত রাষ্ট্র-যন্ত্র সেভাবে মানুষকে অর্থাৎ মানুষের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই হবে চালিত। আসলে মানুষই তো যে কোন রাষ্ট্রের কেন্দ্র-বিন্দু।

আমাদের এ স্বপ্ন হয়তো দীর্ঘকাল স্বপ্নই থেকে যাবে। তবুও স্বপ্ন আমরা দেখবই। দেশের তরুণ-তরুণীরা এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সংকল্প নিক। এ আশাটুকু জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

১৯৬৫

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রসঙ্গে

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—এ শুধু একটি নাম বা ব্যক্তিত্ব নয়। তিনি একটি যুগ, একটি ইতিহাস—একটি বিলীয়মান আদর্শের প্রতীক ও প্রতিনিধি। কোন একটি বিশেষ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় নন—তবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও জীবনের বহুবিধ বিষয়ে এতখানি কৌতূহল, উদ্যোগ ও উদ্যম আর নানা বিষয়ে এমন অনলস কর্ম-প্রচেষ্টার যৌথরূপ তাঁর সমসাময়িকদের অন্য কারো জীবনে দেখা যায় না। এদিক দিয়ে তিনি অনন্য ও একক।

নিজের আত্ম-লব্ধ জীবন-দর্শনের প্রতি এমন আন্তরিক নিষ্ঠা ও তার সাধনায় এমন একাগ্রতার নজিরও এ যুগে বিরল বলা চলে। কালের রদ-বদলের সাথে সাথে অনেকের আদর্শেরও রদ-বদল ঘটে—যুগের সঙ্গে সুর মিলাতে অনেকে হয়ে ওঠেন আগ্রহান্বিত ও অতি মাত্রায় উৎসুক। এ ক্ষেত্রেও শহীদুল্লাহ সাহেব ব্যতিক্রম—যুগের গড্ডলিকায় তিনি গা ভাসাননি কোন দিন। নিজের জীবনাদর্শে চিরদিন রয়েছেন স্থির ও অচঞ্চল। যদিও তাঁর সঙ্গে কোন দিক দিয়েই আমাদের মিল নেই, তবুও এসব কারণে তাঁকে আমরা কোন দিন অশ্রদ্ধা করতে পারিনি।

সুদীর্ঘ আশি বছরের জীবন ও তার স্বাভাবিক ভার সত্ত্বেও তিনি আজো সক্রিয়—নিজের মতো, পথ ও আদর্শে অবিচলিত থেকে আজো তিনি আত্মনিষ্ঠ নিজের কর্তব্যে ও দায়িত্বে। এ নিষ্ঠাটুকুও তো কম শ্রদ্ধেয় নয়। আচার-ব্যবহারে, পোশাকে লেবাসে, দৈহিক গঠন ও বচন-বাচনে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নিজস্ব একটা বিশিষ্টতা আছে সারা জীবন নানা উত্থান-পতনেও এ বিশিষ্টতার কোন ইতর-বিশেষ ঘটেনি। তাঁর বাহ্যিক অবয়বটুকুও আজ দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত—আর এর মধ্যে শহীদুল্লাহ সাহেবের স্বরূপও নিহিত। বলাবাহুল্য face is the index of mind কথাটা নিরর্থক নয়। তাঁর বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদে যে স্থির-গাম্ভীর্য ও শালীন জ্ঞান প্রবীণতার পরিচয় রয়েছে তা অনেকখানি তাঁর মন ও চরিত্রেরও বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। যৌবনেও আমি তাঁকে দূর থেকে দেখেছি, তখনো তাঁর মধ্যে চঞ্চল-বাচালতা বা অস্থির মতিত্ব দেখিনি। তখনো তিনি ছিলেন আমাদের সামনে সাধুতা, সততা ও সজ্জীবনের প্রতীক। যতদূর জানি—ইসলামী আবহাওয়া ও পরিবেশেই তিনি মানুষ, আর তার প্রভাবেই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবন ও চরিত্র। যদিও পেশা আর জ্ঞান-স্পৃহা তাঁকে সারাজীবনই ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়-বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করেছে বারবার, তবু স্বধর্ম-চর্চা আর তার শাস্ত্র ও সাহিত্য চিরকালই তাঁর এক প্রিয় সাধনা। তাঁর জীবন সে সাধনা ও ঐতিহ্যেরই যেন এক মূর্তিমান ও চলিষ্ণু প্রকাশ।

শহীদুল্লাহ সাহেব পণ্ডিত, সংস্কৃতজ্ঞ, ভাষাতাত্ত্বিক, বহু ভাষাবিদ, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ— এসব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও পরিধি কারো অজানা নয়। তবুও মনে হয়, এহো বাহ্য—আসলে তাঁর বাইর ও ভিতরের জীবন রেঙে উঠেছে ইসলামের রঙে। তার সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদে তিনি আজো মশগুল ও আত্মহারা। সেখানেই তিনি পেয়েছেন শান্তি ও স্বস্তি—প্রত্যয় ও আশ্রয়। তাই ইসলামী জীবনদর্শনকে বাদ দিয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে কল্পনা করা যায় না। এ যুগে ইসলামী জীবন-দর্শনের এমন

একটা মূর্তরূপ সাধারণত দেখা যায় না কোথাও।

জ্ঞানের কোন সীমা-সরহদ নেই—এমনকি চিন দেশে গিয়েও জ্ঞান আহরণ করো—এ সব আমাদের কাছে একটা সস্তা বুলি মাত্র, শহীদুল্লাহ সাহেব ছাড়া এ যুগে অন্য কোন অধ্যাপক বা জ্ঞানী এভাবে জ্ঞানের সাধনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। জ্ঞানের জাত নেই, ধর্ম নেই, নেই দেশ বা কাল, কোন ভাষা বিশেষেও নেই তা সীমিত হয়ে—আমাদের বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে একমাত্র শহীদুল্লাহ সাহেবই জীবনসূচনায় এ মহাসত্যের উপলব্ধি করেছিলেন। অর্থকরী পথে আমরা অনেকেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি—জ্ঞান-সাধনা ও চর্চার ক্ষেত্রে আমরা কেউ-ই হইনি তাঁর অনুগামী।

আশ্চর্য, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পরে আজো আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় কোন সংস্কৃতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেনি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যাঁদের একটা বিজাতীয় বিরূপ মনোভাব রয়েছে আমি সে দলের নই। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর অমূল্য সম্পদ না থাকলে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তাঁর পেছনে কখনো এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন না—আলবেরুনী কি ইবনে বতুতাও তা শেখার জন্য স্বীকার করতেন না অতখানি শ্রম। কোন জ্ঞানই তুচ্ছ নয়, কোন ভাষাই অস্পৃশ্য নয়—সারা জীবনের সাধনা দিয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেব এ পরম সত্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরা শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছ থেকে এ পাঠটুকু অন্তত গ্রহণ করতে পারেন। একমাত্র এ পথেই আমাদের সংস্কৃতি-চর্চা হতে পারবে বহু শাখায়িত ও বিচিত্রমুখী। যে-কোন দেশের সংস্কৃতি এভাবেই হয় সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বিচিত্র অবদান ওয়াকিবহালদের সবিনয়ে স্বীকার করতেই হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় তিনি পণ্ডিত— তাঁর জীবন এ উভয় বিদ্যার এক সমন্বয়-ক্ষেত্র। এমন জীবন অন্য দেশেও আজ দুর্লভ। পাশ্চাত্য-বিদ্যা মনে যে সংশয় ও জিজ্ঞাসার সঞ্চার করে যার ফলে অনেকে পূর্ব বিশ্বাস ও সংস্কার সম্বন্ধে হয়ে ওঠেন অসহিষ্ণু ও সন্দিহান মনে হয় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জীবনে তেমন বিপর্যয় কখনও দেখা দেয়নি। কারণ তাঁর ধর্ম-বোধ আর শাস্ত্র-বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়-মূল আর তা বংশানুক্রমিক রক্তধারার মতোই স্বাভাবিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসার আগে তাঁর জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায় কেটেছে কলকাতায় তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মুখপত্র ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন, চালাতেন আর সম্পাদনা করতেন তার অন্যতম ছিলেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্। অবশ্য তখন তিনি ছিলেন স্রেফ এম. এ. বি. এল.। বলাবাহুল্য ঐ ত্রৈমাসিকের পৃষ্ঠাতেই সাহিত্যক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের প্রথম আবির্ভাব। 'আঞ্জুমান ওলেমায়ে বাঙলা', বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি ইত্যাদি সে যুগের সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। তাঁর সম্পাদিত শিশু মাসিক 'আঙুর'-এর স্মৃতি আজো অনেকের মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জন্ম আজ তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিও গেছে বদলে। নানা মতাদর্শের সংঘর্ষে আজ আমাদের অনেকের মন আলোড়িত—ঐতিহ্যের দিক দিয়ে আমরা অনেকেই প্রায়

ছিন্নমূল। এ সার্বিক আবর্তের মাঝেও শহীদুল্লাহ্ সাহেব রয়েছেন স্থির ও অচঞ্চল—একক জীবন-বোধ ও আদর্শের মহীরুহই তাঁকে বলা যায়। তবে এর ছায়ায় আজকের দিনে আশ্রয় নেওয়া যায় কিনা, নিয়ে যুগের অপ্রতিরোধ্য সংকট আবর্তের থেকে গা বাঁচানো সম্ভব কিনা, স্বভাবতই এসব প্রশ্ন দেখা দেয়। তাঁর মতো পুরোনো ঐতিহ্য ও আদর্শে আত্মতৃপ্তির সন্ধান আজকের দিনে অনেকের পক্ষেই হয়তো কঠিন। তাই শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ছাত্র-সংখ্যা অগণ্য কিন্তু অনুসারীর সংখ্যা নগণ্য। এ কারো অপরাধ নয়—মুখে পুরানো ঐতিহ্য ও শাস্ত্র-নির্দেশিত ধর্ম-জীবনের যত গুণ-কীর্তনই আমরা করি না কেন আদতে তো গ্রহণের জন্য যে মনোবল ও চরিত্র-শক্তির প্রয়োজন তা আমাদের অনেকেরই নেই। এ যুগে শহীদুল্লাহ্ সাহেব সে মনোবল ও চরিত্র-শক্তির এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। দ্রুত ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল এ যুগের সব মতাদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে অপরিচিত তা নয়—কিন্তু তাঁর জীবন-তরীর নোঙর যে বন্দরে পোঁতা হয়েছে তা প্রায় তাঁর সারা অস্তিত্বেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। ফলে যুগের তাড়ায় তাগাদায় কি আকর্ষণ—প্রলোভনেও তাঁর পক্ষে তা থেকে এতটুকু বিচ্যুতি সম্ভব নয়।

তিনি যে আদর্শ আমাদের সামনে স্থাপন করেছেন ও যে জাগ্রত আদর্শ হয়ে তিনি এখনো রয়েছেন, এ যুগের তরুণদের সামনে তা নিয়ে আমর যুগের মুখোমুখি হতে পারব কিনা—যুগ-জিজ্ঞাসার উত্তর তাতে মিলবে কিনা, যে বিচিত্র ও জটিল সমস্যা-জালে আজ আমরা জড়িত এতে তা থেকে মুক্তির কুঞ্জি নিহিত কিনা এসব প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান আমি এখানে করতে চাই না। ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান আর ধর্মভিত্তিক জ্ঞান এ দুয়ের এক পরমাশ্চর্য সমন্বয় শহীদুল্লাহ্ সাহেব ও তাঁর জীবন। এমন দুই বিপরীতধর্মী জ্ঞানের এমন অপরূপ ভারসাম্য কদাচিত দেখা যায়।

• সৃষ্টিশীল প্রতিভা বলতে যা বুঝায় তা সব সময়ই দুর্লভ—মৌসুমী ফুলের মতো তার আবির্ভাব ঘটে না। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ধারাকে সব দেশে সাধারণ সাধক আর চর্চাকারীরাই অব্যাহত রাখেন ও রাখেন জারি। একাগ্র নিষ্ঠা আর অবিচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা শহীদুল্লাহ্ সাহেব ও আমাদের সংস্কৃতিচর্চার বহু ধারাকে জারি বা প্রবহমান রেখেছেন। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান নেই, বর্তমানকে বাদ দিয়েও নেই ভবিষ্যৎ—তাই অতীত চর্চা অগ্রগতিরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সব দেশে, সব যুগেই এ সত্য স্বীকৃত। এ নিয়ে গড়ে উঠেছে, গড়ে ওঠে দেশ ও জাতির ইতিহাস। আমাদের এ যুগের ইতিহাস নির্মাণে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের দান শুধু মূল্যবান নয়, আমার বিশ্বাস, আগামীকালের জন্যও তা স্মরণীয়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা, ব্যাকরণ রচনা ও অভিধান সংকলন, সাহিত্যের এসব বুনিয়াদি ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা নিঃসন্দেহে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রাপ্য।

তাঁর চির-প্রিয় ধর্মের মর্ম-কথা ও শিক্ষা তিনি যে শুধু মুখে মুখে নানা মিলাদ-মাহফিলে প্রচার করেছেন তা নয়, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের মারফৎ ভাষায়ও সে সবকে স্থায়িত্ব দিতে চেয়েছেন। ইংরেজি শিক্ষিতদের কাছে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের বাণী পৌছাবার জন্য একদা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে তিনি 'Peace' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। একক চেষ্টায়, নিজের খরচায় দীর্ঘকাল তা চালিয়েছিলেনও। সম্পাদনা, প্রুফ দেখা, দপ্তরীর বাড়ি হাঁটা আর বিলি করা সব একাই করতেন। ধর্মের জন্য এমন শ্রম আর যাকে বলে Labour for Love করতেও শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতো আমি আর কাউকে

দেখিনি। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মুসলিম হলের হাউস টিউটর। সে সঙ্গে চালাতেন এ পত্রিকা—নিছক work for love তদুপরি তাঁর নিজস্ব গবেষণা ছিল—লিখতে হতো নানা পত্র-পত্রিকায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অনলস কর্মী আমাদের সমাজে সত্যই দুর্লভ। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তারও তুলনা নেই—তাঁর বয়স ও অবস্থায় আর কেউই তেমন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেননি। ক্ষেত্র বা বিষয় বিশেষে তাঁর চেয়ে জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তি যে আমাদের নেই তা নয় কিন্তু এমন all rounder—নানা বিষয়ের এত বড় বিদ্বান আর দ্বিতীয় জন আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর শ্রম ও জ্ঞান চর্চা শুধু প্রাচীনের বা অতীত উপকরণের গবেষণায় কোন সময় আবদ্ধ ছিল না—ওমর খৈয়াম, হাফিজ ও ইকবালকেও তিনি আমাদের কাছে কারো পরিচিত ও ঘরোয়া করে তুলতে চেয়েছেন—তাঁর এসব অনুবাদ খুব কাব্যধর্মী না হলেও মূল লেখকদের যথাযথ ভাবানুকূল যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধেও তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন—নিঃসন্দেহে তা আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য সাধন করেছে। সত্য অর্থেই শহীদুল্লাহ্ আমাদের দেশে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্যক্তি। আজ যদিও এক শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা অর্ধশিক্ষিতদের কাছে পণ্ডিত আর পাণ্ডিত্য উপহাসের বস্তু তবুও একথা বলতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই যে, যদি উচ্চাঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের কাম্য হয় তাহলে পণ্ডিতের কদর আর পাণ্ডিত্যের সাধনা আমাদের করতেই হবে। এ ছাড়া নান্য পন্থা। 'নিম হাকিম যেমন খতরে জান' তেমনি 'নিম মোল্লারাও খতরে ইমান'। আজ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিম-মোল্লাদের দৌরাত্ম্য কিভাবে বেড়ে গেছে তা আপনাদের অজানা নয় বিশেষ করে এ কারণেও ডক্টর শহীদুল্লার মতো পণ্ডিত ব্যক্তিদের আমাদের নতুন করে স্মরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রচারণা বা Publicity ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিজ্ঞাপনী মোহ আছে—অনেক সময় শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও এর খপ্পরে পড়ে বৃহত্তর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কি ভাবে এবং কিসের ওপর রচিত হয় তা বেমালুম ভুলে বসেন। কোন সভ্যতাই ত্রিশঙ্কু নয়—নয় আরোপিত। বহু সাধকের সাধনায় তা গড়ে ওঠে, ধীরে ধীরে কালক্রমে পায় স্থিতি ও স্থায়িত্ব। তার মধ্যে সেরা সাধক হচ্ছেন পণ্ডিত আর সংস্কৃতি-কর্মীরা। বলাবাহুল্য সব সভ্যতারই প্রধান পাদপীঠ ভাষা ও সাহিত্য। পণ্ডিতেরাই সে ভাষা ও সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন, ইতিহাস রচনা করেন, ব্যাকরণ নির্মাণ করেন, স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন—এক কথায় ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান রচনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের তেমন একজন সর্বজনস্বীকৃত বিজ্ঞানী। পণ্ডিতজনেরা যে ক্ষেত্র রচনা করেন তাতে ফসল ফলানোর দায়িত্ব কবি, গল্প ও উপন্যাস লেখক, নাট্যকার আর সংগীতকারদের। ইতিহাসে এমন কোন সভ্যতার উল্লেখ নেই যার পেছনে জ্ঞানসাধক পণ্ডিতদের সাধনা নেই। পণ্ডিতদের অবদান ছাড়া আজ পর্যন্ত প্রাচীন কি আধুনিক কোন সভ্যতাই গড়ে ওঠেনি। তাদের বিচিত্রমুখী সাধনা আর অবদানের ওপরই রচিত হয় সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ। প্রাসাদের যেমন স্তম্ভ তেমনি চরিত্রবান পণ্ডিতজনেরাও সভ্যতা সংস্কৃতির স্তম্ভস্বরূপ। এঁদের বাদ দিয়ে সভ্যতা নিরলম্ব, আশ্রয়চ্যুত ঘূর্ণি হাওয়ায় বিক্ষিপ্ত ঝরাপাতা এবং তাসের ঘরের মতো নড়বড়ে।

আমাদের সভ্যতা আর সংস্কৃতি আজ এমন দুর্দিনের সম্মুখীন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবদের দিন শেষ হয়ে গেছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো স্বাভাবিক কারণেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর যে বিরাট শূন্যতা তার মোকাবেলা আমরা কিভাবে করব আমাদের বুদ্ধিজীবী

শ্রেণী আর সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের সামনে সে জিজ্ঞাসাই এখন বড় হয়ে উঠুক।

কালক্রমে সভ্যতার চেহারা আর অবয়বে যে রূপান্তর ঘটবে না তা নয়—যে রূপান্তরই ঘটুক সেদিনও সভ্যতা গড়ার জন্য, তার উপকরণ সংগ্রহ করে ইমারত গেঁথে তোলার জন্য সর্বাগ্রে ডাক পড়বে পণ্ডিতদের, জ্ঞানসাধকদের, অবিচলিতমনা সংস্কৃতি সেবকদের। আমাদের পরম সৌভাগ্য, তেমন একজন আত্মনিষ্ঠ পণ্ডিতজনকে আজো আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের তরুণ বিদ্যার্থীদের যদি নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা থাকে আর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ার স্বপ্ন যদি তাঁরা দেখে থাকেন তাহলে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের জীবন তাদের সামনে এক আলোকবর্তিকা হয়েই থাকবে—অন্তত আরও বহুকাল।

বলেছি তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে আমাদের মতভেদ রয়েছে। মতভেদ কথাটাও উপক্ষেণীয় নয়—আর এতে প্রকাশ পায় না কিছুমাত্র অশ্রদ্ধার লক্ষণ। আমার বিশ্বাস মতভেদ বুদ্ধিজীবীদের একটি চিরন্তম অধিকার। ভক্তির আতিশয্যে বা ভয়ে কোন অবস্থাতেই এ অধিকার আমি ত্যাগ করতে রাজি নই। আজ আমাদের যুগ আর সংস্কৃতি দুই-ই ছন্নছাড়া। পুরোনো মূল্যবোধ আজ ক্ষয়িতধসিত। নতুন কোন মূল্যবোধের সন্ধানও পাইনি আমরা আজো। ফলে আমরা আজ আশ্রয়চ্যুত—কিসের ওপর পা রাখছি তা আমরা নিজেরাই যেন জানি না। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখন রীতিমতো এক জগাখিচুড়ি অবস্থাই চলেছে। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের দিকে তাকালে বুঝতে পারি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা নেমে গেছি, নেমে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি চারদিকে অবক্ষয়ের লক্ষণ। মূল্যবোধ আস্থা ছাড়া কোন সংস্কৃতিই টিকে থাকতে পারে না—এখন আমাদের সব মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার। আমাদের এ যুগের চলমান ইতিহাসে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ চরিত্র আর ব্যক্তিত্ব এক ব্যতিক্রম—সবদিক দিয়েই তিনি আমাদের চেয়ে আলাদা।

আমরা অনেকে নিজের মতো নই, অন্যের মতো। অস্কার ওয়াইল্ডের ভাষায় Most people are other people। আমাদের মধ্যে শহীদুল্লাহ্ সাহেব কিন্তু এর ব্যতিক্রম। তিনি সর্বতোভাবে নিজের মতো—কখনো চেষ্টা করেননি বা চাননি অন্যের মতো হতে। তিনি এক বিশেষ বৈদগ্ধ্যের উত্তরাধিকারী—যার ফলে তাঁর জীবন হয়েছে সুন্দর ও মধুর। এ শোভনতা আর মাধুর্যের বিকীরণ তাঁর সর্বঅবয়বে লক্ষ্য করার মতো। আমাদের কোন বৈদগ্ধ্য নেই, কোন বৈদগ্ধ্যের ওপর আমরা আমাদের জীবনকে গড়ে তুলিনি। তাই জীবনের শোভন মাধুর্য থেকেও আমরা বঞ্চিত।

তাঁর বিশ্বাস আছে, প্রত্যয় আছে, আছে একটা জীবন-দর্শন, একটা বিশেষ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অবিচলিত আস্থা। যা আমার অর্থাৎ যে আধুনিকতার আমি প্রতিনিধি তার কিছুই নেই—আমরা ফাঁকা, আমরা শূন্যগর্ভ, আমরা ছিন্নমূল ও আশ্রয়হীন এবং অনেকটা 'অবিশ্বাসী'ও। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে এখানেই আমাদের বড় পরাজয়।

আজ তাঁর এ শুভ জন্মদিবসে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আমাদের এ পরাজয়টুকু, সে সঙ্গে এ যুগের কিছুটা 'অবিশ্বাস'ও তাঁকে উপহার দিয়ে আমি সর্বান্তকরণে তাঁর আরো বহু শুভ জন্মদিনের পুনরাবৃত্তি কামনা করছি।

১৯৬৭

কবিয়াল রমেশ শীল

এ যুগের চট্টগ্রাম যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারে তার মধ্যে অন্যতম কবিয়াল রমেশ শীল। তিনি আমাদের জনজীবনের এমন একটি দিক পূর্ণ করে রেখেছিলেন যা তাঁর পরে আর কারো দ্বারা পূর্ণ হবে কিনা সন্দেহ। তিনি খুব উচ্চশিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন না— এটা তাঁর পক্ষে বাধা যেটুকু হয়েছে তার চেয়ে তাঁর প্রতিভা বিকাশ ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা সাধনের অনুকূল হয়েছে অনেক বেশি।

আমাদের দেশের সমাজ বিন্যাস এক বিচিত্র ব্যাপার— শুধু ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে এ সমাজ যে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন তা নয়, ধনী নিধন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাকরিজীবী ও অ-চাকরিজীবী ইত্যাদি আরো হরেক রকমে এ সমাজ বহুধা বিভক্ত। এমন সমাজে মনের প্রসারতা ও সার্বজনীন একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা আর তা রক্ষা করা এক রকম অসম্ভব বল্লেই চলে। কারণ পরিবেশ ও সংস্কারের শত বাধা ও বন্ধন কেটে তার উর্ধ্বে ওঠার মনোবল খুব কম লোকেরই থাকে। আমাদের এ যুগে কবিয়াল রমেশ শীল তেমন দুর্লভ মনোবলের অধিকারী ছিলেন— তাঁর রচনা ও তাঁর কবিয়াল-জীবন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বোধকরি এ সমাজে বিন্যাস ও হ্রস্ব দৃষ্টির ফলেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মাঝখানে আমাদের দেশে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্ট হয় তা জীবনের সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ করে তাকে এক রকম দুর্লঙ্ঘ্য করে তোলে। বলাবাহুল্য শিক্ষিত মানে ইংরেজি শিক্ষিত, মোটামুটি যাঁরা চাকরিজীবী। জীবিকা যাঁদের সুনিশ্চিত— মাস পয়লা যাঁরা কম-বেশি কিছু নগদ পয়সা পেয়ে থাকেন। জীবন এঁদের নগরকেন্দ্রিক, দৃষ্টি বর্হিমুখী। দেশের জনজীবন থেকে এঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সংখ্যায় এঁরা নগণ্য কিন্তু দাপটে এঁরাই অগ্রগণ্য। এঁদের দাপটের মূলে ইংরেজি শিক্ষা আর নগদ পয়সা। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিরই বাহন ইংরেজি শিক্ষা আর ক্ষমতার অভিব্যক্তি নগদ পয়সায়। অথচ দেশের বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে এঁদের কোন সম্পর্ক নেই। এঁদের মননশীলতার ক্ষেত্র আর রস-জীবনও ভিন্ন। তার সঙ্গে দেশের মাটির কোন নাড়ির যোগ ঘটে না কোন কালেই। এঁরা যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করেন তা এ কারণে ফাঁকা ও কৃত্রিম। অনেকটা মূলহীন।

আমাদের দেশ পল্লী-প্রধান। অধিকাংশ মানুষের জীবন পল্লীকেন্দ্রিক। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে এরা বঞ্চিত। ইংরেজি শিক্ষার খাল বেয়ে আমাদের শহরে, নগরে, বন্দরে যে এক উৎকেন্দ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার প্রবেশ ঘটেছে তার সঙ্গে দেশের শতকরা নিরানব্বই জনের জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে শুধু জীবিকার ক্ষেত্রে নয় মন-মানস ও রসের ক্ষেত্রেও আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। একদিকে আমরা মুষ্টিমেয় ইংরেজি শিক্ষিত অন্যদিকে বিপুল জনগণ। ইংরেজি শিক্ষিতরা যে সাহিত্য-রচনা করে তার লক্ষ্য ও আদর্শ ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ— ইংরেজি শিক্ষিতের দ্বারা, ইংরেজি শিক্ষিতের জন্যই তা রচিতও। এ সাহিত্যে দেশের জনজীবন প্রতিফলিত হয়নি, জন-মনের কোন জিজ্ঞাসাই এতে পায়নি স্থান। ফলে বৃহত্তর জনতা এতে পায় না ওদের মন-

মানসের খোরাক, পায় না রসের সন্ধান।

কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষই একই সঙ্গে দেহ ও মনের অধিকারী। দৈহিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যেমন খোরাক আর আলো-হাওয়া-তাপের প্রয়োজন তেমনি মনকে বাঁচিয়ে রাখা ও তাজা রাখার জন্যও মনের খোরাক অত্যাবশ্যক—মনেরও আলো হাওয়া-তাপ প্রয়োজন। সাহিত্য-শিল্প-সংগীত মনের সে খোরাক—সে হাওয়া আর উত্তাপ। আবহমানকাল থেকে পল্লীকবি ও কবিয়ালেরা অগণিত পল্লীবাসীর মনে এ খোরাক জুগিয়ে এসেছে। এদের মনকে রেখেছে বাঁচিয়ে। রেখেছে তাজা। আমরা উন্নাসিক নগরবাসীরা পল্লী ও পল্লীর মানুষকে উপেক্ষা করেছি—ওদের মনের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি আমাদের ঔদাসিন্য আজও ঘোচেনি। কিন্তু পল্লীর ভিতর থেকে, সে মাটির মানুষের মধ্যে থেকেই এমন দুর্লভ মানুষের আবির্ভাব সব সময় ঘটেছে যারা পল্লী-জীবনের সাংস্কৃতিক ধারাটাকে অব্যাহত রেখেছেন। সব রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেও ওখানকার মানুষের খোরাক জুগিয়েছেন তাঁরা। চারদিকের জীবন ও জীবনের সমস্যাকে নিজেদের কবিতা ও গানে তুলেছেন ফুটিয়ে। নাগরিক সাহিত্যের মানদণ্ড বিচার করলে এসব রচনার মান হয়তো খুব উঁচু দরের মনে হবে না কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনের চাহিদা ও মনের খোরাক পরিবেশনের দিক থেকে বিচার করলে এর মূল্য ও গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে। এযুগে পল্লীকবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কবিয়াল রমেশ শীল প্রধানতম ব্যক্তি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন সাধনারই ইতিহাস। তাঁর সাধনায় কখনো ছেদ পড়েনি, দেখা দেয়নি কোন শৈথিল্য। সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে তিনি নিজের শিল্পের প্রতি যে অবিচলিত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তারও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এ যুগে বিরল।

শিল্পী হিসেবে তাঁকে সার্থক করে তুলেছে তাঁর মনের সচলতা। অন্যান্য লোকশিল্পীদের মতো তিনি কোন ছক-বাঁধা বিষয় নিয়ে আবদ্ধ থাকেননি। দেশের ইতিহাসের যে অচল ধারা তার সঙ্গে তাঁর শিল্পসত্তা এক হয়ে মিশে গেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ— যা মানুষের হাতের তৈরি তাতে যেমন তাঁর মন সাড়া দিয়েছে তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগেও তাঁর কবিমন বারে বারে আলোড়িত হয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কবি তাঁদের একজন হিসেবেই তিনি দেখেছেন ও দিয়েছেন ভাষা। তাঁর রচনা দূর থেকে বা পাখির চোখে দেখা ছবি নয়—তা অন্তরঙ্গ-জনের অন্তরের ছবি, ব্যক্তিগত অনুভূতি উপলব্ধির রসে তা জারিত। তাই তাতে ভাবে কি আঙ্গিকে কোন বিদেশিয়ানার ছোঁয়া নেই। একদিকে তা তাঁর নিজস্ব অন্যদিকে তা খাঁটি দেশী। আজকের দিনে দেশ বা সমাজ কিছুই স্থিতিশীল নয়— বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ইতিহাসের ঘটনাস্রোত সব দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ওলটপালট ত্বরান্বিত করেছে—অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দেশ ও সমাজের চেহারাই দিয়েছে ও দিচ্ছে পাল্টে। এসবই কবিয়াল রমেশ শীলের কবি-গানের বিষয় হয়েছে। আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙ্গন ধরেছে নানাভাবে—বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। এঁদের জীবনের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনও এক হয়ে মিশেছিল। এঁদের সুখ-দুঃখের তিনি একাধারে অংশীদার ও ভাষ্যকার। তাঁর কবিতা ও গানে এঁদের জীবনই প্রতিফলিত।

দিক দিয়ে তিনি আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির এক সার্থক প্রতিনিধি ও মুখপাত্র।

সাধারণ মানুষ, বিশেষত আমাদের প্রাচ্যদেশে— শুধু জীবিকার ধান্দায় যে জীবন কাটিয়ে দেয় তা নয়, তারা রসের সন্ধান করে, আনন্দের সন্ধান করে, তার জন্য রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দেয়। কবিয়াল রমেশ শীল সারা জীবন এ আনন্দ-রস বিতরণ করেছেন অসংখ্য জনসমাবেশে। এদেশের মানুষের মনে ধর্মীয় উপলব্ধি বা আধ্যাত্মিক ক্ষুধাও কম প্রবল নয়। তারও অভিব্যক্তি ঘটেছে নানা স্থানে নানা ভাবে, নানা আয়োজন ও আনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। তার মধ্যে চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার সুপরিচিত। এ মাইজভাণ্ডারও কবিয়াল রমেশ শীলের বহু ভক্তিমূলক কবিতা ও গানের যে প্রেরণা জুগিয়েছে তাও সর্বজনবিদিত। আর এসব গানের জনপ্রিয়তাও কারো অজানা নয়। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গণ্ডীরেখা অতিক্রম করে এসব গানে তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম ভক্তি রসধারা যেভাবে প্রবাহিত হয়েছে তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এমন নির্লিপ্ত ও সর্ব সংস্কারমুক্ত শিল্পীমন এযুগে সত্যই দুর্লভ। নজরুল ইসলাম ছাড়া এমন শিল্পী-মন বাংলাদেশে আর দেখা যায়নি। নজরুলের সঙ্গে আর একটা বিষয়েও তাঁর সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। নজরুলের মতো তিনিও তাঁর অনুভূতি-উপলব্ধির অভিজ্ঞতাকে নির্ভয়ে ও অকুণ্ঠ ভাষায় সারা জীবন ধরে প্রকাশ করে এসেছেন। যা দেশের জন্য আর মানুষের জন্য ভালো মনে করেছেন তা অকুতোভয়ে প্রকাশ করেছেন। সমাজের ভয়ে যেমন হননি ভীত তেমনি রাজভয়েও হননি শঙ্কিত। নিজের বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের জন্য বৃদ্ধ বয়সেও কারাবরণ করতে দ্বিধা করেননি। জীবনে কোন কারণে তাঁর কণ্ঠস্বর যেমন হয়নি দ্বিধাজড়িত তেমনি কোন রকম প্রলোভনেও হননি তিনি প্রলুব্ধ। কবিয়াল রমেশ শীলের জীবন ও আদর্শ আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পীদের জন্য এক মহৎ উত্তরাধিকার। খাঁটি শিল্পীকে ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠতে হয়— কবিয়াল রমেশ শীলের জীবন ও রচনা তার এক দিগদর্শন। আমাদের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি আজ মৃত্যুর পথে। কিছুদিন আগে স্বয়ং রমেশ শীলই এদিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন :

কবি সাহিত্যিক যারা সমাজের দিশারী তারা
এ জগতে সাহিত্য অমর।
আমাদের লোক-সাহিত্য মৃত প্রায় পুনঃ প্রাণ সঞ্চার আশায়,
কেউ দেয় না সেদিকে নজর।
ফলে, তাঁর কথায় : লোক-সংস্কৃতি যত ক্রমে ক্রমে তিরোহিত
রসশূন্য নগর বন্দর।

এ রসশূন্যতাই ধীরে ধীরে নিয়ে আসে জীবন-শূন্যতা। শুধু চট্টগ্রামে নয়— সারা পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে আজ এক নিরানন্দ জীবন-শূন্যতারই আভাস। আজ কবিয়াল রমেশ শীলের সংবর্ধনার সুযোগে আমাদের দৃষ্টি যদি নতুন করে আমাদের মরণোন্মুখ গ্রাম-সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হয় আর তাকে সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবনের কোন ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তাহলে রমেশ শীল মহাশয় যে শুধু খুশি হবেন তা নয়, আমাদের আজকের আয়োজনও তাহলে অর্থপূর্ণ হবে। তিনি তাঁর একক সাধনায় আমাদের লোক-

সাহিত্যের ধারাকে যেভাবে বিচিত্রমুখী করে তুলেছেন তাকে বহমান রাখা তাঁর শিষ্য ও নবাগত তরুণ শিল্পীদের এক মহৎ দায়িত্ব।

কবিয়াল রমেশ শীলের সংবর্ধনা চট্টগ্রামের কোন পল্লীগ্রামে, পল্লী-পরিবেশে তাঁর অনুরাগী শ্রোতাদের মাঝখানেই হওয়া উচিত ছিল কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই। এযুগে কয়টা উচিত কাজইবা হয়? বিশেষত আমাদের সামাজিক জীবন আজ এক দুঃসহ পরীক্ষার সম্মুখীন— সন্দেহ, অবিশ্বাস, আতঙ্ক আর নৈরাশ্যে আমাদের অনেকেই আজ দিশেহারা। এ অবস্থায়ও কিছু সংখ্যক সংস্কৃতি অনুরাগী কর্মী যে এ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনে এগিয়ে এসেছেন এটা সত্যই আনন্দের কথা এবং চারদিকে মর্মান্তিক হতাশার মাঝে এ এক আশার ক্ষীণ রেখা। বিলম্বে হলেও যে সব তরুণ ও প্রবীণ কর্মীর অক্লান্ত শ্রমের ফলে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়ে কবিয়াল রমেশ শীল মহাশয়কে সাদর সম্ভাষণ জানাবার সুযোগ পেয়েছি তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। কবিয়াল রমেশ শীল দীর্ঘজীবী হোন—তাকে আমি আপনাদের সকলের হয়ে এবং সমগ্র দেশের পক্ষ থেকে আমাদের সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাচ্ছি।

১৯৬৪

হবীব উল্লাহ্ বাহার

হবীব উল্লাহ্ বাহারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের একটি ধারাও নিঃশেষিত হলো। যে ধারার বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতনতা আর গঠনমূলক। অথচ তাতে ছিল না কোন রকম সংকীর্ণতার ছোঁয়া। মনে হয় এ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত— নানা খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বি.এ. সাহেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাহার ও তাঁর বোন পরলোকগতা শামসুন্নাহার মাহমুদ, একই সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছেন, বেড়ে উঠেছেন ও হয়েছেন মানুষ। আবদুল আজিজ সাহেব ছিলেন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যানুরাগী, অসাম্প্রদায়িক ও উদারমনা, কিন্তু স্বসমাজের হিতকর্মে আত্মনিবেদিত। জীবনে বাহার আর নাহারেরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনুরূপ। আজ ভাইবোন দুজনেই গতায়ু। দশ-বারো বছর আগেও হবীব উল্লাহ্ বাহার আমাদের সমাজে এক গণনীয় ব্যক্তি ছিলেন। আমরা যারা তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি তারা সব সময় তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহন অনুভব না করে পারিনি। নানা আবদুল আজিজের মতো বাহারেরাও ছিলেন মূলত নোয়াখালীর অধিবাসী। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর আজিজ সাহেব চট্টগ্রামেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। শৈশবে পিতৃ-বিয়োগের পর বাহার ও নাহার মায়ের সঙ্গে চট্টগ্রামে নানা-নানির কাছে চলে আসেন। এভাবে চট্টগ্রামের না হয়েও তাঁরা হয়ে পড়েন চট্টগ্রামের। পরবর্তীকালে তাঁদের চট্টগ্রামের এ বাসাতেই (তখন এলাকার নাম ছিল তামাকুমুণ্ডী, এখন এ নাম বিলুপ্ত) নজরুল ইসলাম একাধিকবার আস্তানা গেড়েছেন। যার সবিস্তার বর্ণনা শামসুন্নাহার তাঁর 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' গ্রন্থে দিয়েছেন। আমরাও মধুলুব্ধ ভ্রমরের মতো তখন ওখানে এসে আড্ডা জমাতাম। সে আড্ডাতেই বাহারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত। বাহারের প্রথম প্রতিষ্ঠা আর খ্যাতি অর্জনও চট্টগ্রামে। জীবনে ছিল তাঁর তিনটি নেশা— খেলাধুলা, সাহিত্য ও রাজনীতি। এ তিন ক্ষেত্রেই তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। ক্রীড়া জগতে তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ চট্টগ্রামে ছাত্রজীবনেই ঘটে। তখনো চট্টগ্রাম কলেজের মুসলমান ছাত্র সংখ্যা নগণ্য— কিন্তু সব সম্প্রদায়ের ছাত্রসমাজে বাহার এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তিনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন ক্যাপটেন বা কলেজের ক্রীড়া-অধিনায়ক। নির্বাচিত হয়েছিলেন কলেজ ম্যাগাজিনেরও সম্পাদক। সেদিন স্বল্পসংখ্যক মুসলমান ছেলেদের জন্য এসব পদ ছিল অকল্পনীয়। চট্টগ্রাম কলেজ ফুটবল টিমের যে সুনাম তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেদিন তা আজো রয়ে গেছে অনতিক্রম্য। পরে বাহার এ একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। তিনি যখন প্রথম এ ক্লাবের ভার নেন অর্থাৎ অধিনায়ক নির্বাচিত হন তখন তা ছিল স্রেফ দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সাধারণ টিম। বাহার নিজে খেলে যত না তার অনেক বেশি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন খেলোয়াড় গড়ে তোলায়। প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের নাড়ী-নক্ষত্র ছিল তাঁর নখদর্পণে— কার কোথায় শক্তি ও দুর্বলতা একবার খেলা দেখেই তিনি তা বুঝে ফেলতেন এবং সে ভাবে গড়ে-পিঠে নিতেন সবাইকে। তাঁর

হাতে খেলোয়াড়েরা হয়ে উঠত এক একটি সৈনিক, এক একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। এভাবেই গড়ে তুলেছিলেন তিনি তাঁর কলেজ টিমকে যেমন তেমনি কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকেও। অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে প্রথম বছরেই যে তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার পেছনে তাঁর এ অসাধারণ সংগঠনী-শক্তিই সক্রিয় ছিল। তার পর থেকে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের যে অবিস্মরণীয় একটানা দিগ্বিজয়ের সূচনা তা তো আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় হয়েই আছে। সেদিন মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলোয়াড়েরা নিজেদের স্রেফ খেলোয়াড় মনে করতেন না— মনে করতেন তাঁরা জাতির সৈনিক, জাতির জয়-পরাজয় তাঁদের হাতে, জাতির ভাগ্য বিজয়ের গুরুদায়িত্ব পড়েছে তাঁদের স্কন্ধে। তাঁরা জানতেন সারা পাক-ভারতের মুসলমানের চোখ রয়েছে তাঁদের দিকে, জাতি তাকিয়ে আছে তাঁদের গতিবিধি ও সাফল্য-অসাফল্যের পানে। তাঁদের জয় মানে মুসলমান জাতির জয়—এ মনোভাব নিয়েই সেদিন প্রতিটি খেলোয়াড় নামতেন মাঠে। জাতীয় জীবনে আবেগ, উচ্ছ্বাসের এক দু'কূলভাঙ্গা কি ভয়ঙ্কর জোয়ারই না দেখেছিলাম সেদিন আমরা। আজ ভাষায় তার আভাস দেওয়াও অসম্ভব। বলাবাহুল্য এর গোড়াপত্তন বাহারের হাতে। বাহার গোড়াতেই খেলোয়াড়দের মনে এমন একটি জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন যে তিনি নিজে খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরও দীর্ঘকাল তা নতুন নতুন খেলোয়াড়দের মনেও জুগিয়েছে প্রেরণা। কলকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব যে জাতীয় টিম হয়ে উঠেছিল তার পেছনে বাহারের একক অবদান অনেকখানি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে যে কয়জন তরুণ সেদিন সারাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন নিঃসন্দেহে হবীব উল্লাহ্ বাহার তার মধ্যে অন্যতম। অন্যদের কৃতিত্ব নিজ নিজ একক ক্ষেত্রেই ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু বাহারের মতো একসঙ্গে তিনটা ক্ষেত্রে দক্ষতার দাবিদার আর কেউ ছিল না। আর কেউ নেই আজো। তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, হচ্ছিল নানাভাবে আবর্তিত। রাজনীতি সচেতন হবীব উল্লাহ্ বাহারও তাই মুসলিম লীগ ছাড়া সেদিন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে পারেননি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এ প্রতিষ্ঠানের সেবায় তাঁর অনেক সময় শ্রম ও শক্তি ব্যয় করেছেন— রোগাক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি মুসলিম লীগের সেবা করে নানা ক্ষেত্রে তার সাফল্যের পথ রচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অলঙ্কৃত করেছেন এ প্রতিষ্ঠানের অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদ। সিলেট গণভোটের সময় তিনি যে অসাধারণ কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, মুসলিম লীগ কর্মীদের যে রকম সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করেছিলেন পরিচালিত তাও ভুলবার নয়। সিলেট গণভোট জয়ের পেছনে আরো অনেকের সঙ্গে হবীব উল্লাহ্ বাহারের অবদানও কম ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারও তুলনা নেই। তাঁর আমলেই ঢাকার বিশ্ববিখ্যাত মশককুল হয়েছিল নির্বংশ। তাঁর সেদিনের এ কৃতিত্ব আজো একটা অবিশ্বাস্য কিংবদন্তি হয়েই আছে। আমাদের দেশে রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে অনেকে বড় লোক হয়েছেন; কিন্তু দীর্ঘদিন রাজনীতি করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েও হবীব

উল্লাহ্ বাহার যে মধ্যবিত্ত ছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে মধ্যবিত্তই রয়ে গেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সততা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কোনদিন শোনা যায়নি। এ যুগে এর চেয়ে বড় প্রশংসাপত্র আর কি হতে পারে?

তাঁর সময় ও শক্তি ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল বলে সাহিত্যের প্রতি যথোচিত সুবিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। না হয় সাহিত্যানুরাগ ছিল তাঁর সহজাত। নানা আবদুল আজিজের কাছ থেকে সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁরা ভাই-বোন দুজনেই পেয়েছিলেন যথেষ্ট প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা। বলেছি তাঁর আর শামসুন্নাহারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জাতি গঠনমূলক—আমাদের মতো সদ্য গড়ে-ওঠা জাতির জন্য তার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। জাতির কর্মী ও মনীষীদের জীবন-চরিত এ পথের উপযুক্ত পাথেয়। তাই তাঁরা ভাই-বোন সাহিত্যের এ পথেই বেশি করে করেছেন বিচরণ— উভয়ে রচনা করেছেন কয়েকটি সুখপাঠ্য জীবন-কাহিনী। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে হবীব উল্লাহ্ বাহার ছিলেন সাক্ষাৎভাবে জড়িত—তাই এ আন্দোলনের ইতিহাস ও তার পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণের অধিকারও ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি। সীমিতভাবে সে কর্তব্যও তিনি পালন করেছেন।

সে যুগে তাঁরা ভাই-বোন যুক্তভাবে 'বুলবুল' নামে যে সাহিত্য-মাসিক সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছিলেন তার মতো উচ্চমানের মাসিক তখন বিরল ছিল। একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে তুলনা করা হতে 'বুলবুলে'র। বাহারের সব ব্যাপারে ফুটে উঠত একটা সহজাত সুরুচির পরিচয়। তাঁকে আমি কখনো কোন রকম অশোভন আচরণ বা নোংরামিতে অংশগ্রহণ করতে দেখিনি। সুস্থ অবস্থায় তিনি ছিলেন এক উচ্ছল প্রাণবন্ত জীবনের প্রতীক। তাঁর সাহিত্যের ভাষা আর প্রকাশশৈলীও ছিল তাই। সুগঠিত, উন্নত বলিষ্ঠ-দেহ বাহার ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ। শারীরিক শক্তিতেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। অথচ পরিণত বয়সে তিনিই হয়ে পড়েছিলেন সবচেয়ে রোগ-জর্জর। আজ সে রোগ-জর্জর দেহখানি, আমাদের চোখের সামনে থেকে লুপ্ত হলো চিরতরে। আমর যাঁরা তাঁর সমকালীন, তাঁর বন্ধু ও সহযাত্রী আমাদের জন্য এ যে কতখানি বেদনাদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মাত্র গত বছর—এখনো এক বছরও পূর্ণ হয়নি, ১৯৬৫-এর ১৭ই মে বাহার আর আমি বুলবুল একাডেমির বার্ষিক উৎসবে একসঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেদিন তাঁর সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলেছিলাম তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি আশা করি অবান্তর বিবেচিত হবে না :

"আমাদের বন্ধু হবীব উল্লাহ্ বাহারকে যাঁরা সুস্থ অবস্থায় দেখেছেন তাঁরা জানেন আজকের অভিনন্দনপত্রের জবাব তিনি কত যথাযথভাবে, এমনকি যথাযথের চেয়েও বেশি করে দিতে সক্ষম ছিলেন। যে হবীব উল্লাহ্ বাহারকে আজ আপনারা চোখের সামনে দেখছেন এ প্রকৃত হবীব উল্লাহ্ বাহার নন্—এ তাঁর এক ছায়া বা কংকাল মূর্তি। এমন একদিন ছিল যেদিন হবীব উল্লাহ্ বাহার কোন সভায় উপস্থিত থাকলে আমাদের কিছু বলারই সুযোগ হতো না, হতো না তার প্রয়োজনও। আমাদের সব বক্তব্য তিনি একাই এক অপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ওজস্বী ভাষায় বলে যেতেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস সে হবীব উল্লাহ্ বাহারের পক্ষে আজ আমাকেই কিনা দিতে হচ্ছে জবাব! জানাতে হচ্ছে তাঁর মূক-মনের কৃতজ্ঞতা। চির প্রাণ-চঞ্চল, সদা কর্মব্যস্ত, ঘরে-বাইরে

সভাসমিতি আর বন্ধুমহলে যিনি ছিলেন বাক-মুখর, যাঁর মুখের কথা একদিন বাঁধ ভাঙা জলস্রোতের মতো ছিল প্রবাহিত—আজ তিনি নীরব, মৌন, সুশৃঙ্খলভাবে কথা বলতে অক্ষম। তাঁর প্রিয় কবির মতো তিনিও আজ রোগক্লিষ্ট, কর্মশক্তি রহিত, স্তব্ধ আর হতবাক। হবীব উল্লাহ্ বাহারের এ মূর্তি আমাদের অপরিচিত, অজানা—এ দৃশ্য তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর কাছে অসহ্য। কিন্তু মানব-ভাগ্য এমনি এক রহস্যময় ব্যাপার যে, অনেক সময় অসহ্যকেও সহ্য না করে উপায় থাকে না। নজরুলের মতো মহাপ্রতিভার অপমৃত্যুকেও তাই আমরা সহ্য করে গেছি। হবীব উল্লাহ্ বাহারের এ করুণ দশাও আমরা নীরবে সয়ে যাচ্ছি।

মুসলিম নবজাগরণের ইতিহাস আর পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসে হবীব উল্লাহ্ বাহারের নাম কোন দিন মুছে যাবার নয়। সারা পাক-ভারতের মুসলমান সমাজে নব জাগরণের যে ঢেউ উঠেছিল বিশেষ করে বাংলাদেশে রাজনৈতিক চেতনার যে প্লাবন এসেছিল তার তরুণ অগ্রনায়কদের মধ্যে হবীব উল্লাহ্ বাহারের আসন ছিল প্রথম সারিতে। এ জাগরণ আর জাতীয় চেতনাকে বিভিন্ন দিকে সার্থক করে তোলার জন্য তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সেদিন মুসলমান সমাজ ছিল সব ব্যাপারে পেছনে পড়ে, রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শুধু নয়, শিক্ষা-দীক্ষায়, খেলাধুলায়, সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় সর্বত্রই আমাদের চেহারা ছিল ক্ষীণ ও দুর্বল। সমস্ত সমাজটাই যেন ভুগছিল এক হীনম্মন্যতা রোগে। হবীব উল্লাহ্ বাহার কিন্তু কোন দিনই হীনম্মন্যতার শিকার হননি। নিজের অটুট আত্মবিশ্বাস তিনি সব সময় সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন দেশের তরুণদের প্রাণে, বন্ধু ও সহকর্মীদের মনে।"

লেখক হবীব উল্লাহ্ বাহারকে অনেকেই ভুলে গেছেন ; আর রচনার নমুনা ছাড়া কোন লেখকেরই পরিচয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই প্রায় চল্লিশ বছর আগে রচিত হবীব উল্লাহ্ বাহারের একটি ক্ষুদ্র রচনা, এ যুগের পাঠকদের অবগতির জন্য নিতে উদ্ধৃত হলো। রচনাটির নাম 'ঘরের বৌ'—প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ বাংলার কার্তিক সংখ্যা মাসিক সওগাতে। এ ধরনের একাধিক চমৎকার কথিকা তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে 'লাল টুপি' আজো আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলে তা এখানে উদ্ধৃত করলাম না।

ঘরের বৌ

খেলার মাঠ থেকে চিৎপুর যাচ্ছিলাম। রাস্তা গাড়ি-ঘোড়া-বাস-মটরে ভর্তি, এতটুকু ফাঁক ছিল না কোথাও, ট্রাম চলছিল থেমে থেমে। মাঝে মাঝে কালিমাখা কুলির ঝাঁক এসে ভিড় করছিল। মানুষের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম সত্যি।

ট্রামের রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি চলেছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। ড্রাইভার ঘণ্টা দিচ্ছিল জোরে—খুব জোরে। কিন্তু গাড়ি পাশ কাটিয়ে যেতে পাচ্ছে না কিছুতেই। চেয়ে দেখলাম গরু দুটোর দিকে—শীর্ণ, প্রাণহীন দেহ, হাড় ক'খানা আছে শুধু; ঘাড়ের দু'পাশে ঘা-পুঁজ পড়ছে— মাছি ভন্ ভন্ করছে। গাড়ি টানবার শক্তি তাদের ছিল না— কিন্তু চলা কি তবু থামে? পথ কি ফুরোয়? টলতে টলতে চলেছে ছোট্ট দুটো মেশিনের মতো।

রাগ হচ্ছিল আমার ঐ গাড়োয়ানটার ওপর। কশাই বেটা পারে না নিরীহ জীবজন্তুকে কাজ থেকে অবসর দিতে?

সি.এস.পি.সি.এ. এসে হাজির হলো। হুড়হুড় করে টেনে নিয়ে চল্ল গাড়িসুদ্ধ গাড়োয়ানকে। বেটার এতক্ষণে চৈতন্য হলো। কাঁদতে লাগলো বাবু সাহেবের পায়ে পড়ে।

বল্লে, "আমার কলিজার টুকরো, বাবু ঐ গরু দুটো; দশ দিন বসিয়ে বসিয়ে খাইয়েছি— আর যে চলে না বাবু। আমি না হয় উপোষ করব কিন্তু আমার ঐ কাচ্চা-বাচ্চাগুলো? তাদের কান্না যে সহ্য হয় না। দোহাই বাবু, আমায় বাঁচাও— আমায় রক্ষা কর।"

কিছুতেই কিছু হলো না; কর্তাসাহেব গাড়োয়ানকে টেনে নিয়ে গেলেন থানায়।

আমাদের পাশের বাড়ি থেকে রোজই একটা হাঙ্গামার আওয়াজ কানে আসে,— সঙ্গে সঙ্গে কোন সর্বহারা মজলুমের বুকফাটা কান্না। একদিন খবর নিয়ে জানলুম— বাড়ির কর্তা কোথায় বিদেশে কাজ করেন— ঘরে থাকেন না। জামাই মিয়ার হাতেই সঁপে দিয়েছেন তিনি— বাড়িঘর, স্ত্রী-কন্যা সব কিছু। জামাই মিয়া কিছুদিন ধরে অসুখে ভুগছেন— শারীরিক-মানসিক দুইই।

শরীরের খাতিরে তিনি লাল-পানি সেবন শুরু করেছেন আর মানসিক শান্তির জন্য যেতে হয় মাঝে মাঝে এক দেশী মেম সাহেবের কাছে।

দুষ্ট লোকে নানা কথা বলে। ভাবে না তারা— পুরুষ মানুষ এতে আর দোষ কি? জামাতা মিয়া ক'দিন থেকে আর ঘরে আসছেন না। আসেন যখন টাকার দরকার হয়। একদিন একটু বুক ব্যথা করছিল— দুপুর বেলা বাসায় শুয়েছিলাম। হঠাৎ একটা গোঙ্গানীর আওয়াজ কানে এলো। পাশের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখি, একটা মেয়েমানুষ মাটিতে পড়ে আছে— আর আমাদের জামাই মিয়া লাঠি দিয়ে তার ওপর শক্তি পরীক্ষা করছেন খুব করে। মারের চোটে মাথা ফেটে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে ঝারা ঝারা।

ঝোঁকের মাথায় ছুটলুম রাস্তার দিকে। ইচ্ছা— সি.এস.পি.সি.এ.-কে ডেকে এনে

এক্ষুণি ধরিয়ে দেব ঐ কশাইটাকে।

রাস্তায় নেমে হঠাৎ মনে হলো, সি.এস.পি.সি.এ. পশুক্লেশ নিবারণের কাজ করে— ও তো ঘরের বৌ-এর জন্য নয়।"

হবীব উল্লাহ্ বাহার ব্যঙ্গ রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লিখেছেন জীবনীগ্রন্থ, প্রবন্ধ আর কথিকা জাতীয় রচনা। তাঁর রচনাগুলি সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যকর্মের একটা সঠিক পরিচয় পাওয়া যেত— তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যায়নও হতো সহজ। আশা করি আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান এ দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসবেন।

১৯৬৬

কবি দৌলত-উজির বাহরাম খান

বাংলা সাহিত্যের এক বড় অংশ পুঁথি তথা প্রাচীন সাহিত্য— যার ভাষা পদ্য আর বিষয়বস্তু গল্প। সুর করেই এগুলি পড়া হতো, শোনা হতো মজলিস ডেকে, রাত জেগে। মেয়েরাও শুনত আড়ালে থেকে, বেড়ার ফাঁকে কান রেখে। গল্পের সেরা গল্প হচ্ছে, প্রেমের কাহিনী— এ কাহিনীর আদিও নেই অন্তও নেই। নর-নারীর প্রেম এমনি এক চিরন্তন বস্তু— আদিমকাল থেকেই তো মানুষকে আকর্ষণ করেছে, আনন্দ দিয়েছে কৌতূহলী ও উৎসুক করে তুলেছে। এমনকি অসম্ভব ও অবাস্তব প্রেমের কাহিনীও মানুষের কাছে কোন দিন নিরানন্দকর বা উপেক্ষণীয় মনে হয়নি।

পুঁথি-সাহিত্য যখন রচিত হয়েছে, যখন তার কদর ও প্রসার ছিল ব্যাপক, তখন মানুষের জীবন এবং মন দুই-ই ছিল সরল ও সহজ-বিশ্বাসী। তখনো মানুষ এতখানি বিজ্ঞানমুখী হয়নি— হয়নি যুক্তি ও বাস্তববাদী। তাই নর-নারী সম্পর্কে যে-কোন ঘটনা ও কাহিনী বিশ্বাস করে তারা সহজেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। এ কারণেই সে যুগের কবি ও পুঁথিকারেরা— দেশে-বিদেশে যেখানেই প্রেমের গল্প ও তার উপকরণের সন্ধান পেয়েছেন তা নিয়েই বাংলা ভাষায় পুঁথি রচনা করেছেন। আর সে যুগের অধিকাংশ পুঁথিরই বিষয়বস্তু হয়েছে নর-নারীর প্রেম। গল্পে অসম্ভবের ছোঁয়া লাগলে তা সরল-বিশ্বাসী শ্রোতা ও পাঠকের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, কারণ তাতে কল্পনা পায় স্বচ্ছন্দ বিহারের একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র। বলাবাহুল্য কল্পনা পছন্দমতো খোরাক পায় বলেই গল্প, উপন্যাস, বিশেষত প্রেমের কাহিনী মানুষের কাছে এত বেশি উপভোগ্য। প্রেমের ব্যাপারে মানুষ তাই সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, মাথা ঘামায়নি কোন দিন। প্রাচীন সাহিত্যে যত প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, এ পটভূমিতেই তার বিচার ও মূল্যায়ন করতে হবে।

শুধু আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর তাবৎ প্রেমকাহিনীর মধ্যে 'লায়লী-মজনু'র কাহিনী এক বিরাট স্থান দখল করে আছে। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এ কাহিনী নানাভাবে— পদ্যে ও গদ্যে রূপ লাভ করেছে। মুসলিম ধর্ম, ইতিহাস ও কিংবদন্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত 'ইউসুফ জোলেখা', 'শিরি-ফরহাদ' ও 'লায়লী-মজনু'– এই তিনটি অবিস্মরণীয় প্রেমের কাহিনী যুগে যুগে বহু ভাষার বহু কবিকেই আকর্ষণ করেছে—তাদের কৌতূহল ও কল্পনাকে করেছে উদ্দীপিত। ইরানের একাধিক খ্যাতনামা কবি এসব কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এক সময় ফারসি ছিল এদেশের রাজভাষা— ফলে ফারসির চর্চা এদেশে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত ছিল। উল্লেখিত প্রেমের কাহিনীগুলিও এদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে ফারসি-পড়া ও ফারসি-জানা লোকদের দ্বারাই। যে যুগে এ পুঁথিগুলি লেখ হয়েছে তখন ফারসিতেই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হতো— ঐ ছিল ব্যাপক রেওয়াজ বিশেষত পাক-ভারতের সব মুসলিম পরিবারে। লায়লী-মজনু কাহিনীও এভাবে ফারসির মাধ্যমেই এদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। ইরানে ইরানি তথা ফারসি ভাষায় একাধিক কবি এ কাহিনী

অবলম্বনে স্মরণীয় কাব্য লিখেছেন। তার মধ্যে জামী ও আমির খসরু সমধিক প্রসিদ্ধ। উভয়ের কাব্য এক সময় ব্যাপকভাবে এদেশে পঠিত হতো। সাবেকি মাদ্রাসাগুলিতে এখনো বোধকরি পড়ানো হয়।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখক দৌলত উজির বাহরাম খাঁও ইরানি কবিদের কাব্য থেকেই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য কবির নিজস্ব কল্পনা যে তার সঙ্গে যুক্ত হয়নি তা নয়। বিশেষ করে এদেশের প্রকৃতি যে তাঁর রচনার অনেক স্থলে ছায়াপাত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ঘটনা ও কাহিনী আরব দেশের হলেও কবি মজনু ও লায়লীর মক্তব বা পাঠশালার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে পূর্ব পাকিস্তানেরই নিসর্গ শোভা রূপায়িত হয়ে উঠেছে :

চারিদিক উদ্যানসমূহ কুসুমিত।
জাতী জুতি মালতী লবঙ্গ আমোদিত॥
বিকশিত নাগেশ্বর চাঁপা বকুল॥
মধুপিয়া মাতল ভ্রমএ অলিকুল॥
শারিশুক কোকিল রবএ সুললিত।
ফল ভারে বৃক্ষ সব ললিত লম্বিত॥

আজকাল ফারসির পাঠ অনেকখানি কমে কমে এসেছে আমাদের দেশে— আধুনিক পাঠকের সঙ্গে পুঁথি-সাহিত্যের সম্পর্কও একরকম বিচ্ছিন্ন বল্লেই চলে। ফলে লায়লী-মজনুর কাহিনীর গল্পাংশ আজ হয়তো অনেকখানি বিস্মৃতির পথে। তাই দৌলত উজির বাহরাম খানের পুঁথি অনুসরণে সে গল্পাংশ অতি সংক্ষেপে পাঠকের সুবিধার্থে এখানে বর্ণিত হলো :

পুণ্যভূমি আরব দেশে এক ধনী ও শরীফ আমীর বাস করতেন। তাঁর কিছুরই অভাব ছিল না— অভাব ছিল শুধু একটি পুত্রের। বহু দোয়া-দরুদ ও দান-খয়রাতের পর একদিন আল্লাহর মেহেরবানীতে তাঁর সে অভাবও পূর্ণ হলো। ঘরে এক অপূর্ব সুন্দর শিশু এলো। তিনি আদর করে পুত্রের নাম রাখলেন 'কয়েস'। শৈশব থেকেই দেখা গেল, এ শিশুর সৌন্দর্যের প্রতি, বিশেষ করে নারী-সৌন্দর্যের প্রতি রয়েছে অস্বাভাবিক আকর্ষণ। দেখা গেল কোন সুন্দরী তাকে কোলে নিলেই তার কান্নাকাটি থেমে যায় মুহূর্তে— আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। শুধু তা নয়, গান-বাজনার প্রতিও তার অনুরাগ যে অত্যন্ত বেশি তাও লক্ষ্য করা গেল ঐ বয়সেই।

বয়স যখন তার সাত, তখন তার পিতা সুশিক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে সমর্পণ করলেন এক উপযুক্ত ওস্তাদের হাতে। এ ওস্তাদ একটি মক্তব চালাতেন— তাতে আশেপাশের সব ছেলেমেয়েরাই শিক্ষালাভ করত।

সে দেশে মালিক নামে এক নবাব ছিল। তার কন্যা লায়লী ছিল অপূর্ব সুন্দরী। লায়লীও পড়ত ঐ মক্তবে। এখানে কয়েস ও লায়লী একে অন্যকে দেখলো, হলো পরস্পর পরিচিত— মুগ্ধ হলো একে অপরের রূপে-গুণে। এভাবে উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হলো প্রেম, গভীর প্রেম, অচ্ছেদ্য প্রেম। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন হলো যে একজন আর

একজনকে না দেখে এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। স্বভাবতই তাদের এ গভীর প্রণয়-কাহিনী বেশিদিন আর চাপা রইল না— জানাজানি হয়ে গেল চারদিকে। প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীরা করল কানাঘুষা, স্বয়ং ওস্তাদের কানেও উঠল কথাটা। পরে কয়েস ও লায়লীর মা-বাপও শুনল। ফলে লায়লীর মক্তবে যাওয়া হলো বন্ধ— এমনকি, বন্ধ করা হলো চিঠিপত্র লেখা ও পাঠানোরও সব রকম পথ। নিযুক্ত হলো মেয়ে পাহারাদার— পরিয়ে দেওয়া হলো তার পায়ে নূপুর। ঘর থেকে বের হলেই যেন পাওয়া যায় পায়ের আওয়াজ।

ঐদিকে কয়েসেরও দুঃখের অন্ত নেই। তখনও মক্তব ত্যাগ করেনি বটে কিন্তু লায়লী দর্শন-বঞ্চিত হয়ে তার অবস্থা প্রায় উন্মাদের মতো। লায়লীর নাম আর লায়লীর ধ্যান ছাড়া মুখে আর কোন কথা নেই, মনে আর কোন স্মৃতি নেই। একদিন এভাবে লায়লীর কথা ভাবতে ভাবতে এক মনে ওর মূর্তি ধ্যান করতে করতেই পথ চলছিল কয়েস। লায়লীদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই সম্বিৎহারা কয়েস হঠাৎ পড়ে গেল এক কুয়ায়। তার চিৎকার শুনে লায়লী ছুটে এলো এবং কুয়া থেকে ওকে টেনে তুলল। এর পর থেকে কয়েসের নাম হলো মজনু বা উন্মাদ। লায়লীর পিতামাতা এবার আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন— উভয়ের দেখাশোনা হলো বন্ধ। অসম্ভব হলো মেলামেশা। অগত্যা মজনু এবার সাজল ভিখারী, পরল ছেঁড়া কাপড়, হাতে নিল ভিক্ষা-পাত্র। মনের কোণে আশা, ভিক্ষার ছলে প্রিয়াকে এক নজর দেখা।

মজনুর পিতামাতার মনেও নেই কোন শান্তি— একমাত্র পুত্রের এ দশা দেখে তাঁদেরও দিল ভেঙ্গে খান খান। পুত্রকে কাছে ডেকে কত ভাবেই বুঝালেন, সান্ত্বনা দিলেন নানাভাবে। কিন্তু কিছুতেই পুত্রকে ধরে রাখতে পারলেন না ঘরে। এখন লোকালয় ত্যাগ করে নজদের অরণ্যভূমিই হলো মজনুর বিচরণ ক্ষেত্র। সেখানে বসেই দিন-রাত্রি সে ধ্যান করতে লাগল লায়লীর। সত্যি সত্যি এখন থেকে মজনু হলো প্রেমযোগী— লায়লী-প্রেমে মাতোয়ারা।

পুত্রগত-প্রাণ পিতামাতা খোঁজ করতে করতে নজদের বনভূমিতে পুত্রের সন্ধান পেলেন। একরকম জোর করেই নিয়ে এলেন বাড়ি। নিয়ে এলে কি হবে— মজনুর পাগলামি যেন এখন থেকে আরো গেল বেড়ে। চোখের জলে বুক তার যায় ভেসে, গায়ের কাপড় ছিড়ে করে টুকরো টুকরো। গ্রামে ছিল এক বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী। তিনি পরামর্শ দিলেন :

লায়লীর পদরেণু আনিয়া যতনে।
অঞ্জন করিয়া রাখ মজনু-নয়নে॥
কি জানি নয়নজলে রেণু ধুই যায়।
এই ভয়ে রোদন ত্যজিবে সর্ব্বথায়॥

আর কাপড় ছেঁড়ার প্রতিকার বাৎলালেন তিনি এ বলে :

লায়লীর সুনের গলের এক ডোর।
মজনুর বসন সহিতে কর জোড়।
বিদার করিতে বস্ত্র সে ডোর ছিঁড়িবে॥
এই ভয়ে বসন বিদায় না করিবে॥

বলাবাহুল্য 'সুন' মানে কুকুর। বৃদ্ধের নির্দেশ মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো বটে, কিন্তু ফল হলো হিতে বিপরীত। পাছে চোখের জলে লায়লীর পদরেণু মুছে যায়, এ ভয়ে মজনু চোখের জল রুদ্ধ করে রাখল সত্যি, কিন্তু নখাঘাতে নিজের বক্ষ করতে লাগল বিদীর্ণ। আর লায়লীর কুকুরের গলার ডোরটা বাঁচিয়ে গায়ের বাকি কাপড়-চোপড় সব ছিঁড়ে করে ফেল্লো টুকরো টুকরো। এবার মজনুর পিতা ভালো করেই বুঝতে পারলেন লায়লীর সঙ্গে বিয়ে ছাড়া পুত্রকে কিছুতেই করা যাবে না সুস্থ, যাবে না বাঁচানো। তাই এবার তিনি লায়লীর পিতার কাছে পাঠালেন বিয়ের পয়গাম। লোভ দেখালেন, কন্যার পিতা যদি রাজি হন তাহলে তাঁকে তিনি দেবেন অনেক ধনরত্ন, দেবেন দাসদাসী, দেবেন শত শত উট, ঘোড়া ইত্যাদি।

কিন্তু লায়লীর পিতা একটি পাগলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে করতে লাগলেন ইতস্তত। কয়েসের পিতা আমীর অত্যন্ত ধনী ও প্রতিপত্তিশালী— অমন লোকের সঙ্গে সম্বন্ধে করতে মনে মনে কিছুটা লোভ জাগাও স্বাভাবিক। তাই মালিক বল্লেন, আমি আগে ছেলেকে একবার স্বচক্ষে দেখব, পরে জানাব চূড়ান্ত মতামত। কয়েসের পিতা তাতেই রাজি।

মালিকের বাড়িতেই বসল মজলিস— আত্মীয়স্বজন নিয়ে স্বয়ং মালিক হাজির, কয়েসকে নিয়ে আমীরও এসে পৌছলেন। মজনুর চেহারা দেখে মালিক ও মালিকের আত্মীয়স্বজনেরা সবাই খুশি হলেন খুব। একবাক্যে সবাই স্বীকার করলেন, হ্যাঁ লায়লীর বর বটে। বিয়ে হলে উভয়কে মানাবে চমৎকার।

বিয়ের আলোচনা প্রায় শেষ। এমন সময় হঠাৎ অন্তঃপুর থেকে এক কুকুর ছুটে এসে কেউ বাধা দেওয়ার আগেই ঢুকে পড়ল মজলিসে। দেখেই মজনু বুঝতে পারল এ লায়লীরই কুকুর। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রেমোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শুরু করে দিল কুকুরের প্রশস্তি বন্দনা। শুধু তা নয়, ছুটে গিয়ে কুকুরটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, এমনকি কুকুরটির পায়ের ধুলো নিয়ে মাখতে লাগল নিজের চোখে।

এ দৃশ্য দেখে স্বভাবতই লায়লীর পিতা মালিকের মন গেল বিগড়ে। এমন একটা আস্ত-পাগলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। ফলে বিয়ের আলাপ ওখানেই হলো খতম।

এবার মজনুর এতদিনকার দৈহিক প্রেম এখন থেকে আধ্যাত্মিক প্রেমে হলো রূপান্তরিত। নিজের অন্তরের মধ্যেই এবার সে যেন লায়লীকে করতে লাগল উপলব্ধি নিজের মনের মুকুরেই দেখতে লাগল অনুক্ষণ লায়লীকে। নজদের বনে ফিরে গিয়ে নিজের মনকেই সাধনক্ষেত্র করে মজনু এবার লায়লীপ্রেমে হলো আত্মমগ্ন।

বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর লায়লীর দিনও কাটতে লাগল নিদারুণ দুঃখকষ্টে। অনাদর অবহেলায় তার বিকশিত যৌবন নিদাঘের তপ্ত দাহনে ফুল যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যেতে লাগল শুকিয়ে।

এই সময় আরবের এক ধনী সন্তান লায়লীর অতুল রূপযৌবনের কথা শুনে তাকে বিয়ে করতে প্রস্তাব পাঠাল। লায়লীর পিতাও রাজি হয়ে বিয়ের দিন-ক্ষণ ধার্য করে

ফেল্লো। লায়লীর কানে এ কথা যেতেই সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টার পর মূর্ছা তার ভাঙল— কিন্তু বিয়ে ভাঙলো না। এক রকম জোর করেই লায়লীর বাপ এবার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিল সে ধনী সন্তানের সংগে। কথায় বলে, ঘোড়াকে জোর করে পানির ধারে নেওয়া যায় বটে, কিন্তু পানি পান করানো যায় না। লায়লীর বেলায়ও হলো তাই। বিয়ে হলো বটে, কিন্তু স্বামীকে সে ঘেঁষতে দিল না কাছে। স্বামী একদিন জোর খাটাতে গিয়ে লাথি খেয়েই গেল ফিরে। অগত্যা সে লায়লীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো লায়লীও পিতৃ-গৃহে ফিরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এবং এখন থেকে তারও একমাত্র ধ্যান হলো মজনু।

এভাবে মাসের পর মাস যেতে লাগল কেটে। হঠাৎ একদিন এক কুব্জা কুৎসিত কুটনি বুড়ি নজদের বনে মজনুর কাছে এসে খবর দিলে : তুমি তো এদিকে লায়লী লায়লী করে তোমার জীবন-যৌবন খতম করছ, ঐদিকে লায়লী তো বিয়ে করে স্বামী নিয়ে দিব্যি মৌজে আছে।

ভগ্ন-হৃদয় মজনু তক্ষুণি :
লইয়া অঙ্গের চর্ম হৃদয় শোণিত।
আঙ্গুলে লিখয়ে পত্র চরম দুঃখিত।

বনে থাকতে থাকতে মজনুও বনের একজন হয়ে গেছে। বনের পশুপাখিও এখন তার বন্ধু। তেমন এক বন্ধু পাখিকে দিয়ে সে তার এ চিঠি পাঠিয়ে দিলে লায়লীর কাছে। প্রত্যুত্তরে লায়লীও সব কথা খুলে প্রকৃত ঘটনা মজনুকে জানিয়ে দিলে। লায়লীর হাতের পত্র পেয়ে মজনুর মর্ম-বেদনা কিছুটা শান্ত হলো এবং ঐ পত্রখানি হলো তার এক মহামূল্যবান সম্পদ— প্রেমাস্পদার হাতের একমাত্র চিহ্ন। নতুন করে সে আবার তার প্রেম-সাধনায় দিল ডুব। এবার সে আরো তন্ময়— সমস্ত বনভূমির সঙ্গেই সে হয়ে গেল একাত্ম, পশুপাখি হিংস্র শ্বাপদ সবাই এখন তার আপনজন।

হঠাৎ এক রাত্রে লায়লীর সঙ্গে স্বপ্নে তার ঘটল মিলন— উভয়েই স্বপ্নে বদল করলো মালা। আশ্চর্য, ঘুম ভাঙ্গার পর সত্য সত্যই মজনু দেখতে পেল তার গলায় দুলছে লায়লীর হার। এবার থেকে সে আরো কঠোরতম সাধনায় হলো নিমগ্ন। এ সময় একদিন আরব-সর্দার নয়ফল নজদের বনভূমিতে শিকারে এসে মজনুকে দেখতে পেল। তার সঙ্গে আলাপ করে আর ওর দুঃখের কথা শুনে তার প্রতি তিনি হয়ে পড়লেন সহানুভূতিশীল এবং তার সঙ্গে লায়লীর মিলন ঘটিয়ে দেবেন এ আশ্বাস দিয়ে তাকে নিয়ে এলেন নিজ পুরীতে। নয়ফল প্রথমে লায়লীর পিতাকে পত্র মারফৎ মজনুর সঙ্গে লায়লীর বিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। লায়লীর পিতা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় নয়ফল এবার মালিকের বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধ ঘোষণা। যুদ্ধে মালিক পরাজিত হলো— লায়লীকে সর্দার জোর করে নিয়ে এলেন নিজ পুরীতে। লায়লীর অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখে সর্দার নিজেই গেলেন ভুলে। ভুলে গেলেন মজনুর কথা— মজনুর সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন সে সব কথাও। মজনুকে বল্লেন— লায়লীর মতো কুৎসিত মেয়েকে কেন খামখা বিয়ে করবে, তুমি তার চেয়ে আমার রাজপুরীতে কত সব সুন্দরী রয়েছে সেখান থেকে বেছে নিয়ে একটাকে বিয়ে করে ফেল। আমি সবই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। উত্তরে মজনু শুধু বল্লে :

প্রবেশ করিয়া মোর নয়ন অন্তর।
লায়লীকে নিরক্ষিয়া দেখ নৃপবর॥
তবে যে দেখে লবে লায়লীর রূপ।
রূপে অপ্সরা হেন জানিবে স্বরূপ।

নয়ফল বুঝলে, এ পাগলকে খতম না করলে তার ভাগ্যে লায়লী-লাভ ঘটবে না। এবার তিনি তাঁর এক অনুচরকে বলে রাখলেন— তুমি দু'গ্লাস সরবৎ তৈরি করে রেখো, এক গ্লাস তৈরি করবে মধু দিয়ে অন্য গ্লাস বিষ দিয়ে। মজনু এলে বিষেরটা দেবে ওকে আর মধুরটা আমাকে। দৈবক্রমে ঘটে গেল বিপরীত। অনুচর ভুল করে বিষেরটা দিল সর্দারের হাতে আর মধুরটা মজনুর। ফলে মুহূর্তে নয়ফলের ঘটল মৃত্যু।

এ সংবাদ পেয়ে লায়লীর পিতা মালিক এসে মেয়েকে নয়ফল-পুরী থেকে উদ্ধার করে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। আর মজনু ফিরে গেল তার সাধনক্ষেত্র নজদের বনে— প্রকৃতির কোলে।

এ সময় কি মনে করে লায়লীর পিতা একবার সপরিবারে শাম দেশ বেড়াতে যাওয়ার সংকল্প করলেন। স্থান বদলে মেয়ের দেহ-মন ভালো হতে পারে মনে করে মেয়েকেও নিলেন সঙ্গে। তাঁরা আরব দেশের সে যুগের একমাত্র বাহন উটে চড়েই করলেন যাত্রা। লায়লীর উট ছিল পিছনে। কিছুদূর যাওয়ার পর সে উট দিক ভুল করে ঢুকে পড়ল নজদের বনে। এভাবে হঠাৎ সে বনভূমিতে নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে লায়লীর সাথে দেখা হয়ে গেল মজনুর।

লায়লী বল্লো : আর তো কোন বাধা নেই আমাদের মিলনের পথে, চলো আমরা এবার আবদ্ধ হই বিবাহ-বন্ধনে।

মজনু এখন সাধক— সাধনার পথে আধ্যাত্মিক মার্গে অনেকদূর হয়েছে অগ্রসর। দেহের তাড়না এখন গেছে কমে— ইন্দ্রিয়-লালসা এখন দমিত, প্রশমিত। এখানে গোপন মিলন তার কাছে মনে হলো অন্যায় ও অসামাজিক। তাই মজনু রাজি হলো না। তার মতে এভাবে বিয়ে হলে উভয়ের পবিত্র ভালোবাস হবে কলুষিত আর লোক-নিন্দা পাবে প্রশ্রয়। অগত্যা লায়লীকেও আত্মদমন করতে হলো। লায়লীকে তার গন্তব্যপথে পৌঁছে দিয়ে কয়েস নিজর সাধন-স্থানে ফিরে এলো। এরপর উভয়ের বাকি জীবন কেটেছে বিরহ-সংগীত রচনায়, যার নাম 'চৌতিশা'। উভয়ের এই শেষ দেখা। অল্পকালের মধ্যেই শোক-তাপে জর্জরিতা লায়লীর হলো মৃত্যু। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মজনু সব সাধন ভজন ও ধ্যান-ধারণা ছেড়ে ছুটে এলো লায়লীর কবরের পাশে কিন্তু পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তারও ঘটল মৃত্যু। আর সঙ্গে সঙ্গে লায়লীর কবর দু'ফাঁক হয়ে তাতে মজনুর দেহকেও দিল আশ্রয়। এ অবিস্মরণীয় প্রেমিক-যুগলের জীবনে মিলন না ঘটলেও এভাবে মৃত্যুতে ঘটল চিরমিলন।

লায়লী-মজনু কাব্যের এ সংক্ষিপ্তসার। এ কাহিনী অবলম্বনে মধ্যযুগের কবি দৌলত উজির বাহরাম খাঁ বাংলা সাহিত্যে এ স্মরণীয় কাব্যটি রচনা করেছেন। এ কাব্যের বড় কথা— প্রেমে একনিষ্ঠা। সুখে-দুঃখে, অবস্থার অজস্র বিপর্যয়েও এসব কাহিনীর নায়ক

নায়িকাদের নিষ্ঠায় ভাঙ্গন ধরেনি— মন হয়নি মুহূর্তের জন্যও বিচলিত। প্রথম জীবনে হৃদয়ে প্রেমের যে দীপ-শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে, আমৃত্যু সে দীপ-শিখাকে তারা অনির্বাণ রেখেছে। সে দীপ-শিখার আগুনে তাদের দেহমন তিলে তিলে পুড়েছে, খাক খাক হয়েছে, তবুও প্রেমের সে দীপ-শিখাকে তারা নিভতে দেয়নি— দেয়নি এতটুকু নিষ্প্রভ হতে। এ নিষ্ঠাই যুগে যুগে মানুষকে বিস্মিত করেছে, করেছে মুগ্ধ। বাংলা ভাষার কবি বাহরাম খানও লায়লী-মজনুর একনিষ্ঠ প্রেমে মুগ্ধ হয়েই এ কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও গবেষকরা অনুমান করেছেন 'লায়লী-মজনুর' রচনাকাল ১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ। কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন আর সুর বংশীয় নেজাম শাহ সুর ছিলেন তখন চট্টগ্রামের অধিপতি। কবির নাম বাহরাম খান কিন্তু 'দৌলত উজির' কথাটা উপাধি। সম্ভবত তিনি নেজাম শাহ সুরের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। 'দৌলত উজির' কথার শব্দগত অর্থও তাই।

গ্রন্থের সূচনায় কবি বলেছেন :

চট্টগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহ সুর।

সেকালে রচনার প্রারম্ভে আল্লাহ-রসূলের বন্দনা যেমন প্রথাসিদ্ধ তেমনি রাজবন্দনা আর পৃষ্ঠপোষক-স্তুতিরও ছিল প্রচলিত রীতি। সেকালের রাজা-বাদশাহরা অনেকেই কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন— দিতেন রচনায় উৎসাহ ও প্রেরণা, এমনকি অনেকে বিষয়বস্তুরও দিতেন নির্দেশ। বাংলা সাহিত্যে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। লায়লী-মজনুর কবি বাহরাম খানও ব্যতিক্রম নন।

ব্যতিক্রম হচ্ছে সে যুগে— ষোড়শ শতাব্দীতে যখন বাংলা সাহিত্যের শৈশব অবস্থা, সাহিত্যের ভাষা যখন পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি তখন এমন একটা চমৎকার কাব্য রচনা করা। বাহরাম খানের ভাষায় কোথাও জড়তা নেই, নেই আড়ষ্টতা। তাঁর ভাষা যেমন অর্থবহ তেমনি তার গতিপ্রবাহও অক্ষুণ্ন। সে যুগে এমন ভাষা অন্যত্র দুর্লভ। তখন বাংলা ভাষায় যে 'গ্রাম্যতা' ছিল বাহরামের ভাষায় তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাঁর হাতে বাংলা ভাষা বিশুদ্ধ সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে। এ কারণেও 'লায়লী-মজনু' বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় গ্রন্থ।

বিষয়বস্তুতে এবং কাহিনী বর্ণনায় সর্বত্র একটা মানবীয় সুর ফুটে উঠেছে। মূল ঘটনায় সে যুগের অন্যান্য কাব্যের মতো, এ কাব্যে কোথাও অলৌকিকতা আমদানি করা হয়নি। শুধু শেষের দিকে বনের পাখিকে পত্রবাহক করা, লায়লীর কবরের কাছে পৌঁছামাত্রই মজনুর মৃত্যুঘটন আর কবর দু'ফাঁক হয়ে তাকে আশ্রয় দান— এতে মাত্র অলৌকিকতার কিছুটা ছোঁয়া লেগেছে মাত্র। মনে হয় এটা যুগেরই প্রভাব, হয়তো যুগের চাহিদাও ছিল তাই। আগেই বলেছি তখন শ্রোতা বা পাঠক ছিল সরল-বিশ্বাসী— অসম্ভব বা অলৌকিকের ছোঁয়া সহজে তাদের মনে লাগাত চমক— কল্পনা হয়ে উঠত উদ্দীপিত।

তখন বাংলা সাহিত্যে বিয়োগান্ত কাহিনীরও ছিল প্রভাব। দৌলত উজির বাহরাম খান সে অভাবও পূরণ করেছেন। অবশ্য মূল গল্পও বিয়োগান্ত— বাংলা ভাষার কবি জনপ্রিয়তার লোভে সে পরিণতিকে বিকৃত করেননি। মূল ঘটনা ও তার পরিণতিকে রেখেছেন অক্ষুণ্ন।

এ কবির অন্য কোন রচনা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এখন পর্যন্ত এটিই তাঁর একমাত্র বই। এ বই পড়লে তিনি যে একজন সুকবি ছিলেন, শুধু তা নয়, তিনি যে জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাও বুঝতে পারা যায়। আরবি ফারসি ও ইসলামি ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আর সংস্কৃতের সঙ্গেও ছিলেন পরিচিত। মনে হয় রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গেও ছিল তাঁর পরিচয়। তাঁর পরবর্তী মুসলমান কবিদের অনেকের মধ্যে এ গুণ দেখা গেছে, অর্থাৎ এঁরা একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। কবির নিম্নলিখিত পদগুলি যে কোরানের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে :

মাতাপিতা নাহি তান মহিমা অপার।
উদরে ঔরসে জন্ম না হৈছে যাহার॥

আবার :

রাজাএ মাগএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।
ভিক্ষুকের প্রতি করে রাজ্য অধিকারী॥

ইসলামের নবী সম্বন্ধে তাঁর এ পদগুলি নজরুলের সুবিখ্যাত কবিতা 'খেয়াপারের তরণী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় :

নুরনবী কাণ্ডারী আছে যেই নাএ।
সাগর তরঙ্গ ভয় নাহিক তথাএ॥
তুমি হেন নিধি যার সহায় সম্পদ।
তিল অর্দ্ধ নাহি তার আপদ বিপদ॥

লায়লীর রূপ বর্ণনায় কবি যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা কোন অংশেই আলাওলের পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনার ভাষা থেকে নিকৃষ্ট নয়। বরং অধিকতর প্রাঞ্জল ও আরো সহজবোধ্য :

লায়লী তাহান নাম মালিক নন্দিনী।
পূর্ণ শশী জিনি মুখ জগত মোহিনী॥
জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধর রঙ্গিমা॥
রতিপতি-ধনু জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা॥
নয়ান কটাক্ষবাণে হানিল তপসী।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি পরম রূপসী।

দৌলত উজির বাহরাম খান শুধু যে প্রতিভাবান কবি ছিলেন তা নয়, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানীও ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে কবিত্ব-মণ্ডিত ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে বহু জ্ঞান-গর্ভ বাণীও দেখতে পাওয়া যায়— যেগুলি সহজেই প্রবাদ বাক্যের মর্যাদার দাবি রাখে। তেমন কয়েকটি বাণী নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

বিপদ সময়ে বৈরী হয় বন্ধুগণ।
শুভ দশা হৈলে হয় অমিল মিলন॥
পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভয় বিবাদ।

মূর্খের সহিত খেলা বিষম প্রমাদ॥
যুবতী বাখানি যার পতিব্রতা নাম।
পুরুষ বাখানি যদি হয় গুণধাম।
এক নারী দুই পতি নাহিক সুগতি।
এক দেশে দুই নৃপ না হয় বসতি।
ঘরে বড় জঞ্জাল বাহিরে গেলে দুখ।
পীরিতি করিলে জীবনে নাহি সুখ॥
চন্দ্র বিনে গগন, প্রদীপ বিনে ঘর।
পুত্র বিনে জগত লাগয়ে ঘোরতর॥

এ রকম বহু অর্থ-গর্ভ উক্তি 'লায়লী-মজনুর' এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

লায়লী-মজনুর ভাষা যেমন গ্রাম্যতাদোষ-বর্জিত তেমনি অশ্লীলতা দোষমুক্ত। সে যুগের পক্ষে এও কম প্রশংসনীয় নয়। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, গ্রন্থ-বর্ণিত চরিত্রগুলি অনেকাংশে বাস্তবানুগ হয়েছে। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে চরিত্র। নর-নারীর মনস্তত্ত্বও হয়েছে রক্ষিত। লায়লী-মজনুর যখন দেখা হলো তখন মজনু নয় লায়লীই মিলনের তথা বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। মজনু করেছিল প্রত্যাখ্যান। মজনু নিজের সাধনা ত্যাগ করতে হয়নি রাজি, রাজি হয়নি সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করতে। সাধনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষের নিষ্ঠা যে দৃঢ়তর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেহ ও মনে পুরুষ যতখানি কৃচ্ছ্র সাধনায় সক্ষম, নারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুরুষেরই বেশি। এ হিসেবে লায়লী-মজনুর এ প্রতিক্রিয়া হয়েছে যথাযথ ও স্বাভাবিক। এ যুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'বিদায় অভিশাপে' এ একই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। সেখানেও দেবযানী উপযাচিকা হয়েও কচকে সাধনাচ্যুত করতে পারেনি। কচ ও মজনু যে পুরুষ আর পুরুষের অনেক দায়িত্ব। সুকঠোর দায়িত্বের সামনে তাকে হৃদয়ের ভাবাবেগ অনেক সময় রাখতে হয় প্রদমিত। দৌলত উজির বাহরাম খান ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে এ জীবন-বোধের পরিচয় দিয়েছেন 'লায়লী-মজনু' আর 'বিদায়-অভিশাপে'।

লায়লী-মজনুকে নর-নারীর শাশ্বত প্রেমের রূপক হিসেবেও দেখা হয়ে থাকে। কেউ কেউ সেভাবেও এ কাব্যের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। দৌলত উজির বাহরাম খান কিন্তু মানবীয় কাহিনী হিসেবেই একে গ্রহণ করেছেন ও সেভাবে করেছেন বর্ণনা। মনে হয় কাহিনীর এই মানবীয়তাই তাঁর কবি-প্রতিভাকে বেশি করে করেছে উদ্বুদ্ধ। তাই তাঁর কাব্যের কাহিনীতে অতিমানবীয়তা মোটেও পায়নি স্থান। সেদিক থেকেও লায়লী-মজনু এক বিশিষ্ট রচনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণে ও পুনর্গঠনে 'লায়লী-মজনু' ও তার কবিকে এক বিশেষ স্থান দিতেই হবে।

দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব ও পরবর্তী সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র। নিঃসন্দেহে তিনি আলাওয়াল-দৌলত কাজীর অগ্রদূত।

দেশ ও দেশের ছাত্র সমাজ

তোমরা জানো সাহিত্যে কিংবা রাজনীতিতে আমার কোন দল নেই— নই আমি কোন দলভুক্ত। ছাত্র-রাজনীতি বা প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও আমার এ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি। তোমরা সাগ্রহে আহ্বান জানাও তাই তোমাদের অনুষ্ঠানে আমি আসি— অন্য প্রতিষ্ঠান আহ্বান জানালে সেখানে যেতেও আমার বাধা নেই। তবে যারা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে ডাকে না, তাদের কথা স্বতন্ত্র। এমনকি খাস সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক এলেও তা আমি গ্রহণ করি; কিন্তু সেখানে গিয়েও আমি আমার নিজের কথাই বলি। দেশের কোন সরকারকেই আমি শত্রু মনে করি না। তেমনি মনে করি না সরকার-বিরোধী পক্ষকেও। আমার বক্তব্য তো এক অর্থাৎ আমি যা বিশ্বাস আর অনুভব করি তাই আমি বলে থাকি, করে থাকি প্রকাশ। রাজভয় কি লোকভয়ে আমি আজো আমার কথাকে গলা টিপে মারিনি। এমনকি এ'করে সাহিত্যেও জনপ্রিয় হতে চাইনি।

যে প্রতিষ্ঠানেরই আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমি শরিক হই না কেন, আমার ব্যক্তিগত মতামত বিসর্জন দিয়ে আমি সে প্রতিষ্ঠানের বুলি আওড়াই না। আজ তোমাদের আহ্বানে তোমাদের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে এসেছি সত্য, কিন্তু তোমাদের বা তোমাদের প্রতিষ্ঠানের যদি কোন বিশেষ বক্তব্য থাকে তা আমার অজানা আর তা বলতেও আমি আসিনি। আমি স্রেফ আমার কথা বা বক্তব্যই শোনাবো— শোনাবো তোমাদের মারফৎ আমার দেশের সমস্ত তরুণ আর ছাত্র সমাজকে। দেশে বা ছাত্র সমাজে হাজারো দল-উপদল থাকতে পারে, আছেও; কিন্তু শিক্ষক আর লেখক হিসেবে আমি যেমন কোন দলের নই তেমনি বিচ্ছিন্নও নই কোন দল থেকে। দেশ আর দেশের মানুষের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক— অবস্থার নানা হেরফেরও এ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি।

এদেশ সরকারেরও নয়, সরকার-বিরোধীদেরও নয়, সমগ্র জাতির— এর ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী আর এর প্রতি আনুগত্যশীল সব মানুষেরই। সবাই এদেশের সন্তান, এদেশের সম্পদ। সবাই এদেশের মালিকানার হকদার। এদেশের ভালো-মন্দ, উন্নতি-অবনতি ও নিরাপত্তার সঙ্গে সবাই আমরা জড়িত। এ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই এই নাম জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্য দেশ বা জাতির প্রতি বিদ্বেষের স্থান নেই। জাতীয় চেতনার বাইরে আমরা একটি বৃহত্তর মানবিক চেতনারও অধিকারী। মানবিক সত্তায় বিশ্বের তাবৎ মানুষ এক ও অখণ্ড— এখানে সব মানুষের সঙ্গে সব মানুষ সম্পর্কিত। বিদ্বেষ সে মানবিক চেতনা আর সে মূল্যবোধের ওপর মানব সভ্যতার ভিত্ রচিত সে সবকেই নস্যাৎ করে দেয়। যে উপলব্ধির জন্য মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলা হয়, বিদ্বেষ সে উপলব্ধিরই মৃত্যু ঘটায়। দেশগত ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্বেষেরও এ ফল না হয়ে যায় না। বরং এর ক্ষেত্রটা সংকীর্ণ বলে এর ফল আরো বিষময় হতে বাধ্য। যেমন সমুদ্রের

তুলনায় পুকুরের পানি সহজেই ঘোলাটে হয়। ছাত্র ইউনিয়ন তথ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরাও যদি অন্য ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিদ্বেষের চোখে দেখে তারাও এ পরিণতির হাত থেকে রেহাই পাবে না। আশা করি তোমরা সংকীর্ণ দলীয় বা উপদলীয় মনোভাব ত্যাগ করে সামগ্রিকভাবে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তোমাদের প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলবে। সামগ্রিকভাবে দেশের আর দলমত নির্বিশেষে ছাত্রসমাজের মঙ্গল সাধন আর সেবাই হোক তোমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। অন্য ছাত্র প্রতিষ্ঠান আর তার সদস্য-সদস্যরা তোমাদের শত্রু নয়— বরং সহযোগী। তাদের কর্মসূচি আর মতামত তোমাদের থেকে ভিন্নতর হতে পারে— আমার বিশ্বাস, তারাও দেশের আর ছাত্র সমাজেরই মঙ্গল কামনা করে। মঙ্গল সাধনের ধারণা আর উপলব্ধি সকলের সমান নয়। না হওয়ারই কথা। ভিন্ন মতাবলম্বীকে শত্রু মনে করার মধ্যে একটা হীনম্মন্যতার পরিচয় রয়েছে। তোমরা সে হীনম্মন্যতার শিকার হয়ো না। পরমসহিষ্ণুতা শুধু যে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত তা নয়, ব্যক্তিগত আত্মমর্যাদা আর শালীনতাবোধেরও পরিচয় এতে নিহিত। তোমাদের প্রতিষ্ঠান তেমন একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক। তোমাদের কর্মী আর সদস্য-সদস্যাদের আমি এ আত্মমর্যাদা মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। তোমাদের প্রতিষ্ঠান কোন দলের নয়, প্রদেশের সমগ্র ছাত্র সমাজেরই প্রতিভূ— এ মনোভাব নিয়ে যদি কাজ করতে পারো তহলে অনেক ক্ষুদ্রতা আর গ্লানির হাত থেকে তোমরা নিজেদের মুক্ত রাখতে পারবে। দুঃখের বিষয় দেশে আজ আত্মমর্যাদার একান্তই অভাব। আত্মমর্যাদার সাথে আচরণ তথা Dignified ব্যবহার দেশে আজ কোথাও লক্ষিত হয় না। জাতি হিসেবে আজ আমাদের এ এক শোচনীয় চেহারা। রাজনীতি আজ এমন এক সার্বিক অক্টোপাসি রূপ নিয়েছে যে, তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা আজ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। হোটেল-রেস্তোরাঁর বাবুর্চি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী পর্যন্ত সবাই আজ এর শিকারে পরিণত। ক্ষমতামুখী রাজনীতির ধর্মই হলো ভিন্ন মতাবলম্বী তথা বিরোধীপক্ষকে সহ্য না করা, কারণে-অকারণে এলোপাথাড়ি গাল দেওয়া। আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরে সরকারি মুখপাত্ররা এ করে এসেছেন। গ্রাম দেশের কোন কোন ঝগড়াটে বুড়ি যেমন হাওয়াকে লক্ষ্য করেও গাল পাড়ে, দূর আকাশে একটা ভাসমান চিল দেখলেও তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে, মনে করে এ বুঝি চিলটা ছোঁ মেরে ওর মুরগির ছানাটা নিয়ে গেল! আমাদের দেশে ক্ষমতাসীনদের আচরণও অবিকল তাই। একটা গ্রাম্য বুড়ির আত্মমর্যাদা জ্ঞান না থাকলেও হয়তো চলে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালক আর রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের আত্মমর্যাদা-জ্ঞান আর শোভনতা-বোধ না থাকলে, সুরুচিবোধের অভাব ঘটলে সমস্ত জাতিরই মর্যাদাহানি ঘটে। এখন রাষ্ট্র সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী বলে রাষ্ট্র-প্রতিনিধিদের প্রভাব সমস্ত দেশের ওপর না পড়ে পারে না। ফলে আজ কোথাও সুরুচি, পরিমিতিবোধ, আত্মমর্যাদা বা Dignityর কোন বালাই নেই। তোমরা শিক্ষার্থী, সব বিষয়ে আগে শিক্ষানবীশ— বিরুদ্ধ দলকে গাল পাড়া দেওয়ার এ যে রীতি বা রেওয়াজ দেশে চালু হয়েছে তার থেকে তোমরা নিজেদের দূরে রেখো। সরকারি বা বেসরকারি কোন পক্ষের কাছ থেকেই এ কু-শিক্ষাটি যেন তোমরা গ্রহণ করো না। করলে

তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সমূহ ক্ষতি হবে— বিরুদ্ধপক্ষের যত না তার চেয়ে বেশি তোমাদের। দেশের বা ছাত্র সমাজের পক্ষে যা ক্ষতিকর অবশ্যই তার প্রতিবাদ তোমরা করবে— সে সবকে বাধা দেওয়া তোমাদের জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু তা করবে শৃঙ্খলার সাথে শোভন পরিমিতবোধ আর আত্মমর্যাদা বজায় রেখেই। তোমাদের প্রতিষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি এ কথাগুলি বলছি বটে কিন্তু আমার কথার লক্ষ্য অন্যান্য ছাত্র প্রতিষ্ঠানও। তাদের প্রতিও আমার আবেদন সরকারি মুখপাত্রদের অনুকরণে বিরুদ্ধপক্ষকে শত্রু মনে করো না। অন্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের প্রতি করো না অশোভন আচরণ। এতে তোমাদের বিকাশোন্মুখ মনের বিকাশ যে শুধু বাধাপ্রাপ্ত হবে তা নয়, জীবনের সামগ্রিক বোধটুকুও তোমরা হারিয়ে বসবে। তখন তোমাদের দশা হবে একচক্ষু হরিণের মতো।

তোমরা আমাদের দেশের, আমাদের জাতির পুষ্পস্তবক— তোমরা থাকবে ঊর্ধ্বমুখী, সূর্যালোক অভিসারী।

তোমাদের যদি অধঃপতন ঘটে, তোমরা যদি মন ও চরিত্রের দিক দিয়ে নেমে যাও তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতিই যে নেমে যাবে। আমরা হয়ে পড়ব নিম্নস্তরের মানুষ।

শুধু মতবিরোধের জন্য তোমাদের এক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যদি অন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মাথায় হকিস্টিক ভাঙতে থাকো তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ ভেবে আমাদের শিউরে উঠতে হয়। তোমরা যে প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য হও না কেন, আমরা চাই তোমরা সুস্থ, স্বাভাবিক আর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হয়েই গড়ে ওঠো। তোমাদের প্রতিষ্ঠান তোমাদের এ নাগরিকত্বেরই শিক্ষা-শিবির হোক।

আজ বিভিন্ন স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ইউনিয়ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজ যেভাবে অশুভ ও অস্বাস্থ্যকর দলাদলি, গালাগাল, ঝগড়াঝাটি এমনকি মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত করে বসে তা দেখে আমরা রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠি। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমাদের আয়ুও বা কতটুকু? এ স্বল্পায়ু ছাত্র-জীবনে তোমরা যে সামান্য নির্বাচনী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হও, তাতে হার-জিতে যদি তোমরা এভাবে বিচলিত হয়ে পড়ো তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা সরকার তোমরা কি করে গঠন করবে, কি করে পরিচালিত করবে? হার-জিত গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য অনুষঙ্গ, প্রথম ও প্রধান শর্ত। যে-কোন নির্বাচনে যে জয়-পরাজয়কে সমভাবে মেনে নিতে পারে না, সে গণতন্ত্রের যোগ্য নয়। স্কুল-কলেজের সীমিত নির্বাচনে জাতীয় স্বার্থ বা বৃহত্তর কোন সমস্যা জড়িত থাকে না— মোটামুটি স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কয়েকটি দাবি-দাওয়া নিয়েই এসব নির্বাচন হয়ে থাকে। এসব ব্যাপারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে মতভেদ দেখা দিলে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকেরা মিলে তা মীমাংসা করতে না পারার কথা নয়। তবুও দেখা যায়, এসব সামান্য কারণেই দুই দল ছাত্রে মারামারি হয় এমনকি পুলিশ আর আদালত পর্যন্ত ঘটনা গড়ায়। একাধিক, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে। তাই এদিকে ছাত্র সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি আমার কর্তব্য মনে করছি। এ সবকে কিছুতেই Dignified বা শোভন ও আত্মমর্যাদাজনক

আচরণ বলা যায় না। বিরুদ্ধপক্ষের ছাত্রীদের অপমান বা গায়ে হাত তোলার সংবাদও মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। কোন কোন ছাত্রের শোভনতাবোধ আর পৌরুষ কোথায় নেমে গেছে একবার ভেবে দেখ? আবার কোন কোন ছাত্রদল আইন-শৃঙ্খলা আর কাণ্ডজ্ঞানের সব সীমা ছাড়িয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি নষ্ট করতেও দ্বিধা করে না। সে সব সম্পত্তির মালিক তো বিরোধীপক্ষ বা ঐসব শিক্ষায়তনের কর্মচারীরা নন— তুমি, আমি, সবাই, সমস্ত জাতিই সে সবের মালিক। আর ঐ ধরনের কাজের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান বা কোন কিছুর প্রতিকার আজো হয়েছে কি? ছাত্রেরা তো গুণ্ডা-বদমাইস নয়— তারা দেশের শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হতে যাচ্ছে। তাদের সব রকম আন্দোলন আর বাদ-প্রতিবাদও সে ভাবেই হওয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন ছাত্রদল সে রকম আচরণ করে না বলেই আমাদের দুঃখ। আমি জানি সব ছাত্র প্রতিষ্ঠান বা অধিকাংশ ছাত্র এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করে না। তবুও স্বল্পসংখ্যকের এ ধরনের কার্যকলাপের খবর মাঝে মাঝে কাগজে পড়ে আমাদের মর্মপীড়ার অন্ত থাকে না। আমরা যারা ছাত্র সমাজকে ভালোবাসি দেখতে চাই তাদের সুস্থ বিকাশ আর জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদাবান বলিষ্ঠ ভূমিকা— এ ধরনের খবরে আমরাই পেয়ে থাকি অধিকতর মনোকষ্ট। আজ ছাত্র ইউনিয়নের এ মঞ্চ থেকে আমি প্রদেশের সব ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের এ দুঃখটা জানিয়ে রাখলাম।

সব শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে বিচারমুখী আর যুক্তিবাদী করে গড়ে তোলা। লেখক হিসেবে আমার নিজেরও যুক্তিবাদী বলে সুনাম-বদনাম দুই-ই আছে। বদনাম বললাম এ কারণে যে, আমার এ যুক্তিবাদের নিন্দা করার লোকেরও অভাব নেই। তাঁদের ধারণা, যুক্তির চেয়ে শাস্ত্র অনেক বড়। ব্যবহারিক জীবনে আমি তা মানতে রাজি নই। এ কারণে অনেকের নিন্দা আমাকে শুনতে হয়েছে। তবুও যুক্তির পথ আমি ছাড়িনি— যুক্তি বিচারে আজো আমার বিশ্বাস অটল। প্রদেশের ছাত্র-সমাজের প্রতিও আমার আবেদন, তোমরা যুক্তি-বিচার তথা র‍্যাশনেলিজমের পথেরই অনুগামী হও— সে পথ ধরেই তোমাদের নিজেদের জীবন আর তোমাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলো। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে যুক্তির আলোকে বিচার করে দেখো— এর ফলে ছাত্র হিসেবে তোমার বিকাশে বাধা ঘটবে কিনা? আর জাতীয় বা দেশের কোন বৃহত্তর স্বার্থ হবে কি-না বিঘ্নিত। এ করার জন্যই মানুষকে বলা হয় Rational being। অবশ্য দেশে-বিদেশে আজ Irrationalism তথা যুক্তিহীনতার চরম যে ঘটছে না, তা নয়। তবুও আমার বিশ্বাস, সভ্য মানুষের চিরদিনের অভীপ্সা থাকবে বুদ্ধি-বিবেচনা আর যুক্তি-বিচারের পথে বিচরণ। এ ছাড়া সভ্য জীবন অসম্ভব।

বিকাশের কথা যে বলেছি ছাত্রজীবনে তা অত্যন্ত জরুরি ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিকাশের পথেই মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে। বিকাশ ছাড়া মানুষও আর একটা পশু বই আর কিছু নয়। আর বিকাশের সর্বোত্তম ক্ষেত্র আর সময় ছাত্রজীবন। তাই তোমাদের রাজনীতি আর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি সবই এ বিকাশের অনুকূল হওয়া চাই। যা কিছু তোমাদের দৈহিক, মানবিক বা চারিত্রিক বিকাশের অন্তরায় তা সর্বোতোভাবে তোমাদের শত্রু, আর

যা কিছু সহায়ক তা তোমাদের বন্ধু আর গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়। দাসত্ব মানুষকে পঙ্গু করে রাখে আর স্বাধীনতা বিকাশের অনন্ত পথ খুলে দেয়। এ কারণেই স্বাধীনতা এতখানি মূল্যবান। আর এ কারণেই স্বাধীনতা অর্জন আর তা রক্ষার জন্য মানুষ অকাতরে প্রাণ দিয়ে থাকে। স্বাধীনতা যে প্রাণের চেয়েও প্রিয় তার সাক্ষাৎ পরিচয় আজ ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমরা প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছি। অনেক সংগ্রামের পর অনেক প্রাণের বিনিময়ে আমরাও স্বাধীন হয়েছি। আমাদের স্বাধীনতার আয়ু উনিশ বছর পার হতে চলেছে। স্বাধীনতাকে যে বিকাশের অনন্ত পথ বলেছি— সে পথ কি সাধারণের সামনে খুলে গেছে আমাদের দেশে? সরকারের সঙ্গে সচেতন আর জিজ্ঞাসু নাগরিকদের এখানেই বিরোধ। সরকারি ভ্রান্ত নীতির ফলে বিকাশের সুযোগ-সুবিধা এখন অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে অতি স্বল্প সংখ্যকের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে— বৃহত্তর জনতা বিকাশের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকার এখানে ওখানে কয়েকটি বটবৃক্ষ রোপণে বিশ্বাসী আর ওটাকেই মনে করে উন্নয়নের একমাত্র পথ। আমরা ব্যাপক ফসল চাষে বিশ্বাসী আর ওটাকেই মনে করি দেশের সার্বিক উন্নয়ন আর সব মানুষের বিকাশের উপায়। বটবৃক্ষের সংখ্যা আরো বাড়ালেও দেশের সর্বসাধারণের উন্নয়ন ও বিকাশের পথ খুলে যাবে না। বরং তাতে নিচের ক্ষেত-খামার আর ফসল দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ারই আশঙ্কা। দুঃখের বিষয়, আমাদের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি এখন বটবৃক্ষমুখীন আর বটবৃক্ষ নির্ভরশীল। বলাবাহুল্য, বটবৃক্ষের নিচে ফুল কি ফসলের বাগান জন্মায় না— তার ধর্মই হচ্ছে ক্ষুদ্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। অথচ আমাদের দেশ হলো ক্ষুদ্রের দেশ, চাষী-মজুরের দেশ— সাধারণ মানুষের দেশ। এ বটবৃক্ষমুখী অর্থনীতি সাধারণ মানুষের সামনে বিকাশের কোন পথই খুলে দেয়নি, বরং নানাভাবে তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই স্বাধীনতা আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য আজো অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সমাজ আর সমাজ-জীবনের ওপর না হয়ে পারে না। ফলে সমাজ হয়ে পড়েছে আজ ভারসাম্যহীন। পা আছে, মাথা আছে, মাঝখানে ধড়টাই নেই। আমাদের সমাজের আজ এ চেহারা! এ অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবেই আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলছি। গতবারও তোমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনে আমি এ কথা বলেছিলাম। সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বড় কথা হলো তাতে বিকাশের সুযোগ-সুবিধার দরজা সকলের সামনে খুলে দেওয়া হয়। অবশ্য সকলে যে সমভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে তা নয়, কিন্তু সুযোগের পথটা থাকে অবারিত। আমাদের বটবৃক্ষমুখী অর্থনীতিকে গণমুখী করে তোলার এ একমাত্র পথ বলেই আমার বিশ্বাস আর তখনই স্বাধীনতার স্বাভাবিক পরিণতি বিকাশের অনন্ত পথ জনসাধারণের সামনে খুলে যেতে পারে। এর সঙ্গে ইসলামী সমাজবাদের কোন বিরোধ আছে বলে আমার মনে হয় না।

ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা যারা বলেন, তাঁরা কি অন্তরে তা বিশ্বাস করেন? বিশ্বাস করলে বটবৃক্ষমুখী অর্থনীতিকে তাঁরা সমর্থন করে যাচ্ছেন কি করে? কি করে তাঁরা হয়ে পড়েছেন সে অর্থনীতির অংশ ও অংশীদার? ইসলামের নামে জনমতকে খুশি করা আর খুশি রাখা খুবই সহজ— তাই তাঁরা অনবরত নিজের মনকে চোখ মেরে চলেছেন। যা

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আজ আত্মবঞ্চনা আর আত্মপ্রতারণা অসম্ভব বেড়ে গেছে। এরই এক নাম ভাবের ঘরে চুরি। এ চুরি আমাদের অনেক ক্ষমতাসীনের এক মস্তবড় গুণে পরিণত হয়েছে! এখন অনবরত নির্জলা মিথ্যা বলার শক্তিকেই গণ্য করা হয় যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। বিকাশের পথ না খুললেও দুর্নীতির দরজা খুলে গেছে এন্তার। আমাদের দেশে এখন ছাত্রদের রাজনীতি না করার যে পরামর্শ দেওয়া হয় তাতে যে সততা আর আন্তরিকতাটুকু অনুপস্থিত। আমি ওপরে যে আত্মপ্রবঞ্চনার কথা বলেছি এও তার আর এক দৃষ্টান্ত। না হয় আমি নিজেই চাই ছাত্ররা সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকুক— দেশ বা জাতীয় স্বার্থ যেখানে জড়িত নেই, তাদের শিক্ষা জীবনের বাইরে সে সবে তাদের নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু সারাদেশ আর গোটা সমাজকে যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রাজনীতির খপ্পরে নিয়ে আসা হয় তাহলে সে খপ্পর থেকে ছাত্ররা নিজেদের গা বাঁচাবে কি করে? তারাও তো সামাজিক জীব— সমাজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সমাজ জীবনের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

আজ দেশ শাসনের ভার যাঁদের হাতে তাঁরা যদি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন— তাঁরা যদি মনে করতেন আমরা সমস্ত দেশের, সমস্ত জাতির প্রতিনিধি; দলমত নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্যই আমরা দায়ী, দলীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠতে হতেন সক্ষম তাহলে আমার বিশ্বাস, দেশের সর্বস্তরে এমন শোচনীয় পরিণতি নেমে আসত না। ছাত্রদের মধ্যেও যে দলীয় মনোবৃত্তি দেখা যায়, মনে হয় তারও কারণ এখানে নিহিত।

সহজ পথে বা স্বল্পায়াসে অর্জিত ধনের পথ বেয়ে— কোন রকম রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই কেউ কেউ আজ এমন স্তরে পৌঁছেছেন, যার ফলে দেশ বা সমাজের অন্য একটা কুটো না ছিঁড়েও ঘরে বসেই তারা মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করতে পারেন এবং পারেন অত্যন্ত আইনসঙ্গতভাবেই। আমাদের দেশে রাজনীতি চর্চা মানে তো এম. পি.এ. এম. এন. এ. হওয়া। মাইনে ছাড়াও এদের আরো কতদিকে কত পোওয়াবারো তা কারো অজানা নয়। এমন ভাগ্য কোন শিক্ষক, কোন অধ্যাপক, কোন বিজ্ঞানী, কোন সাহিত্যিক-শিল্পী বা কোন সমাজকর্মী কি আশা করতে পারেন? সমাজ আর রাষ্ট্র মিলে রাজনীতিকে আজ যেভাবে লোভনীয় করে তুলেছে তার লোভ আর আকর্ষণ ছাড়তে হলে নিষ্কাম সাধুপুরুষ হতে হয়। এ যুগে তা আশা করা কি বাতুলতা নয়? ছাত্ররাও রক্ত-মাংসের মানুষ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-মোহ আর তার আকর্ষণ, অন্য দশ মনুষের মতো তাদেরও থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাবৎ দুনিয়া সাপ্লাই আর ডিমেন্ড-এর সূত্রে বাঁধা। আমাদের দেশ বা সমাজেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই। সমাজে যদি সৎ আর পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষের আদর-কদর আর ইজ্জত-সম্মান থাকত, দেওয়া হতো সে সবকে অগ্রাধিকার তাহলে স্বভাবতই দেশের উদীয়মান তরুণ সমাজের মনও সেদিকেই ঝুঁকত আর অবস্থা যদি তার বিপরীত হয় অর্থাৎ অসৎ আর দুর্নীতিবাজ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদকেই যদি ইজ্জত-কদর বেশি করা হয়, সাধারণ সৌজন্য প্রকাশের বেলায়ও যদি ঐ রকম লোককেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিক জৈবিক

নিয়মেই তরুণরা সেদিকে প্রলুব্ধ না হয়ে পারে না। সমাজ যা চায় তা-ই পাবে। ছাত্রদের প্রতি, রাজনীতি করো না— এ হিতোপদেশের মধ্যেই একটি চরম আত্মবঞ্চনা রয়েছে। আত্মবঞ্চনার দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্ভব নয়— পরিণামে কিছুতেই আত্মপ্রবঞ্চনা সুফলপ্রসূ হতে পারে না।

এ আত্মবঞ্চনার ফলে ভালো আজ আমাদের দেশে দ্বিধাবিভক্ত। ভালোকে সরকারি ভালো আর বেসরকারি ভালোয় ভাগ করতে গেলে বিবেকের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। সে সংঘর্ষের ফলে আজ অনেকের অবস্থা বেসামাল। আইনের নামে বেআইনের ভয় না থাকলেও বেসামাল অবস্থার বহু দৃষ্টান্তই আমি উল্লেখ করতে পারতাম। উপরে জাতীয় দৃষ্টি প্রসঙ্গে আমি বলেছি বিজাতি বিদ্বেষ কখনো আমাদের কাম্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় আজাদী রক্ষার সংগ্রামকে কিছুতেই জাতি-বিদ্বেষ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। তা হচ্ছে আত্মরক্ষার, নিজের বিকাশের ক্ষেত্র আর অধিকার রক্ষারই সংগ্রাম। পরম বন্ধু যদি কারো বাসগৃহখানি জোর করে দখল করে নিতে চায় কেউ কি তা ছেড়ে দেবে? প্রাণ দিয়েও সে কি তার বাস্তুভিটাটা রক্ষা করবে না? স্বদেশরক্ষা বা আজাদির সংগ্রামেও তাই জাতি-বিদ্বেষের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ কারণে আত্মরক্ষার সংগ্রামকে সব দেশে জেহাদ আর তাতে নিহতকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোন বিরোধ নেই। তবে জাতীয় কথাটাকে মেয়াদি হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত— তাহলে পরিপ্রেক্ষিতটুকু বুঝতে সহজ হবে। একদিন দেশগত তথা জাতিগত বিদ্বেষের অবসান ঘটবেই— তার আগে সভ্যতার বহু স্তর, বহু ধাপ যে পার হতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা সে সুদিনে তথা বিশ্ব মানবিক ঐক্য আর বিশ্ব-শান্তিতে বিশ্বাসী। তোমাদের প্রতিষ্ঠানের শান্তি-কপোত হয়তো সে দূর ভবিষ্যতেরই প্রতীক। মানবতা আর শান্তি এক অখণ্ড ব্যাপার। এ বোধ ছাড়া শান্তি কখনও নির্বিঘ্ন হতে পারে না। আমরা জানি এ ঘরে আগুন লাগলে অন্য ঘরে তা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না— প্রতিবেশী হলে তো কথাই নেই। এর ফলেই দু'দুটা বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও চলছে পাঁয়তারা। আমরা বাস করছি আজ এক সর্বনাশা যুগে— আণবিক বোমার অভাবনীয় ধ্বংসকর রূপ দেখে মানুষ আজ আতঙ্কে দিশাহারা। তাই বিশ্ব-মানবতা আর বিশ্ব-শান্তি ছাড়া মানুষের পরিত্রাণ নেই— মানুষের জন্য এ এক পরম লক্ষ্য ও চরম আদর্শ। কিন্তু তার আগে চাই জাতীয় ঐক্য— ঘর সামলাবার আগে বাইরে সামলাবার কথা বলা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ারই শামিল। এ এক প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা।

মাঝে মাঝে রাস্তায় পোস্টার দেখা যায় 'বিশ্ব মুসলিম এক হও'— ঘরের বা দেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা না করে এখানে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মুসলমানের উদ্দেশে ফাঁকা আওয়াজ করলেই কি বিশ্ব মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হবে? বিশ্ব মুসলিম কি মুহূর্তে এসে সারিতে এসে দাঁড়াবে? আসল কথা, ঘরের মুসলমানদের মধ্যে একতা স্থাপন অনেক কঠিন— সে কঠিন কাজটাকে এড়াবার সহজ পন্থা হচ্ছে পোস্টার লেখা আর পোস্টার মারা! এভাবে সহজে কেল্লা ফতে করা। তা না হলে আমাদের দেশে দুই মুসলিম লীগ

আর এক হয় না কেন? জামাতে ইসলাম আর নেজামে ইসলামেও হয় না কেন মিল? জামাৎ আর নেজাম কথা দুটি বাদ দিলে শুধু একটিমাত্র কথাই তো বাকি থাকে, আর তাতে কোন মুসলমানের অমিল হওয়ার কথা নয়। আর প্রথমোক্ত দলের তো কোন কথাই বাদ দেওয়ার নেই। তবুও মিল হয় কই? কাজেই 'বিশ্ব মুসলিম এক হও' কথাটার আগে ঘরের বা দেশের মুসলমান এক হও কথাটা বলা কি অধিকতর সঙ্গত নয়? কোন দল বা প্রতিষ্ঠানকে কটাক্ষ করার জন্যই এ কথাটা বলছি না— আমরা যে কতখানি যুক্তিহীন ভাববিলাসী তা দেখাবার জন্যই প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটার উল্লেখ করলাম মাত্র।

তোমরা তোমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে 'ঐক্য' কথাটা রেখেছ। কিন্তু বাস্তবে এ ঐক্য কতটুকু হাসেল করতে পেরেছ? নিজের মনকেই নিজে জিজ্ঞাসা কর। গত প্রাদেশিক সম্মেলনেই তোমাদের এক প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দুই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে! এবারও তেমন দুর্ঘটনা ঘটবে কি না জানি না— না ঘটলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না।

সমৃদ্ধ গ্রিক সভ্যতার কথা তোমরা জানো— এ সভ্যতা থেকেই ইউরোপে রেনেসাঁসের আবির্ভাব। যার ফলশ্রুতি আধুনিক ইউরোপের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা সবকিছু। গ্রিক সভ্যতা দুই মূল নীতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল— সে দুই মূল নীতি হচ্ছে শরীর আর মনের যুগপৎ চর্চা। এ ছিল গ্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। তার অমন সার্বিক বিকাশেরও ঐ কারণ। পরে মনের চর্চা অব্যাহত থাকলেও শরীরের চর্চা হয়েছিল উপেক্ষিত। ফলে অত বড় সভ্যতার পতন হতে দেরি লাগেনি। সব উন্নত সভ্যতারই এ লক্ষণ— শরীর আর মনের যুগপৎ চর্চা আর বিকাশ সাধন। আমাদের ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি নানা সাংস্কৃতিক বিচিত্রানুষ্ঠানের মারফত মনের চর্চা কিছুটা করলেও শরীর চর্চার প্রতি মোটেও গুরুত্ব দেয় না। ফলে আমাদের দেশের মতো স্বাস্থ্যহীন ছেলেমেয়ে অন্য কোথাও দেখা যায় না। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য আর শারীরিক বিকাশ দেখে মন-চোখ কোনটাই তৃপ্তি পায় না। বলাবাহুল্য Sound mind in sound body কথাটা মোটেও মিথ্যা নয়। খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য। ছাত্র ইউনিয়নের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমাদের প্রত্যেক শাখা-কেন্দ্রে তোমরা এক একটি পাঠাগার আর একটি ব্যায়ামাগার অন্তত গড়ে তোলো— তোমাদের সদস্য-সদস্যাদের শুধু নয় স্থানীয় সব বালক-বালিকাদেরও তাতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করো। যে-কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আর গুরুত্ব গঠনমূলক কাজেই নিহিত। তোমাদের প্রত্যেক বার্ষিক অনুষ্ঠানে শারীরিক কসরতকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্থান দিয়ো। কৈশোর-যৌবনের প্রারম্ভে দেহ-মন দুয়েরই পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। সমাজ ও সভ্যতা কতকগুলি স্বীকৃত মূল্যবোধকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে ও টিকে থাকে। তোমাদেরও সে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে আর চলতে হবে সে সবকে মেনে। তা না হলে সমাজে নৈরাজ্য অনিবার্য। নৈরাজ্যের দিনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর ছাত্র সমাজ। শোনা যায় এখন অনেক ছাত্র শিক্ষক আর অধ্যাপকদের আগের দিনের মতো শ্রদ্ধার চোখে দেখে না, এমনকি অপমান করতেও বাধে না। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কও এক আদি সম্পর্ক এবং

সব দেশের সব কালের সভ্যতার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। আগে সে সম্পর্ক সভ্য-অসভ্য সব সমাজেরই অব্যাহত ছিল— এ সম্পর্ক অশেষ প্রীতি আর শ্রদ্ধার সম্পর্ক। আমাদেরও যা কিছু সভ্যতা তারও ভিত্তিমূলে এ সম্পর্ক। এ মূল্যবোধ আমাদের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য— এ ঐতিহ্যের মূলে যারা কুঠারাঘাত করতে চায়, তারা শুধু ছাত্র সমাজের শত্রু নয়— শিক্ষা সভ্যতারও শত্রু। যে মূল্যবোধের ওপর ব্যক্তি আর সমাজের মহত্তম বিকাশ নির্ভরশীল— এর থেকে শ্রেয়তর পাল্টা মূল্যবোধ যতদিন তুমি দিতে না পারো ততদিন এর গায়ে হাত দেওয়ার তোমার কোন অধিকার নেই। ছাত্র হয়ে শিক্ষা সভ্যতার শত্রুর ভূমিকায় নেমো না— বিসর্জন দিয়ো না জীবনের মূল্যবোধকে। শুধু ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের প্রতি নয়, প্রদেশের সব প্রতিষ্ঠানের সব ছাত্রের প্রতি আমার এ আবেদন। তুমি কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য, এটি বড় কথা নয়— তার চেয়ে বড় কথা তুমি ছাত্র। প্রাতিষ্ঠানিক আবেগ উত্তেজনার ফাঁদে পড়ে এ বোধটুকু হারিয়ে দেশের শিক্ষা জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনো না। শিক্ষক-অধ্যাপক তোমার আর তুমি শিক্ষক অধ্যাপকদের সব ব্যাপারে সম মতাবলম্বী হবে, তা আশা করা যায় না— তার দরকারও নেই। কিন্তু উভয়ের জন্য স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে তোমার মন আর চরিত্রের বিকাশের জন্য এ অপরিহার্য।

বলাবাহুল্য, অশ্রদ্ধা আধুনিকতা নয়— যদি কেউ একে আধুনিকতার লক্ষণ বলে মনে করে, তার উপযুক্ত স্থান পাবনার মানসিক হাসপাতাল।

দেশের আর সমাজের যা কিছু মহত্তর উত্তরাধিকার অকারণে তা নষ্ট করো না— যদি শ্রেয়তর কোন নতুন মূল্যবোধ তুমি দিতে পারো দেশ তা সাদরেই গ্রহণ করবে ভবিষ্যতের ইতিহাস তা মেনে নেবে।

দেশের আজ চরম দুর্দশা। দেশ স্বাধীন বটে; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা অনেক দিকেই খর্বিত। আজ আমাদের সংবাদপত্রের নিজস্ব কোন কণ্ঠস্বর নেই, নেই নিজস্ব কোন চরিত্র। জনমতের বাহন আজ জনমতের বাহন নয়। স্তব-স্তুতিরই গ্রামোফোন রেকর্ড। এক সময় আমাদের সংবাদপত্রের সুনাম দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল— ভাষা আর প্রকাশের ঐশ্বর্যে, তীক্ষ্ণ ভঙ্গি আর অর্থবহ দ্যুতিময়তায় পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র শুধু যে বিশিষ্ট ছিল তা নয়— আমাদের সাংবাদিকরা নিজস্ব একটা ঐতিহ্যও গড়ে তুলেছিল। আজ সে সব নিশ্চিহ্ন, মিসমার— সংবাদপত্রের ভাষা আর বক্তব্য এখন অত্যন্ত জলো আর নির্বীর্য হয়ে পড়েছে বল্লে খুব কমই বলা হয়। আইনের সতর্ক পাহারা বাঁচিয়ে এখন সবাইকে ভয়ে ভয়েই লিখতে হয়। এ অবস্থায় নিজস্ব ভাষা বা বক্তব্য কিছুই আশা করা যায় না। দেশের এ যে কত বড় ক্ষতি (ব্যক্তিগতভাবে সংবাদপত্রের মালিক বা সম্পাদকের ক্ষতি তো তুচ্ছ) দেশের মানুষ হয়েও যাঁরা বুঝতে চান না, আমরা বিশ্বাস ইতিহাস তাঁদের কিছুতেই রেহাই দেবে না। নিরোকে সবাই অত্যাচারী বলেই জানে, কেউই মনে করে না হিরো। নিরোদের ভাগ্যে চিরকালই জুটেছে ইতিহাসের ধিক্কার। সৎ মানুষের একমাত্র নির্ভর দেশের আইন— আজ আইন নিয়েও চলছে খেলা, আইনের শাসন আজ প্রহসনে পরিণত। তাই চারদিকে আজ হতাশা আর নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। দু'বছর আগেও যেখানে ছাত্র-বেতন ছিল চার টাকা, এখন সেখানে হয়েছে ছ'টাকা, ছ'টাকার

জায়গায় হয়েছে আট আর আটের জায়গায় হয়েছে দশ। পরীক্ষার ফি বেড়েছে দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। হল-হোস্টেলে খোরাকি যেখানে ছিল ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেখানে হয়েছে এখন পঞ্চাশ অথবা তার কাছাকাছি। আর খাবার যা দেওয়া হয় তা দেখে এ শাসন ব্যবস্থারই একজন প্রাক্তন গভর্নরই তো বলেছিলেন : এ গরু-বাছুরেরও উপযুক্ত নয়। এ অবস্থায় শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে বড়াই করার কোন মানে হয় কি? বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে, রাজস্ব বর্ধিত হয়েছে বহুগুণ; ফলে ব্যয়-বরাদ্দ সব খাতেই বেড়েছে, না বেড়ে উপায় নেই। একক শিক্ষার খাতে শুধু বাড়েনি। মৌলিক গণতন্ত্রী খাতে বরাদ্দের হিসেব সরকারি মুখপাত্ররা সাধারণত দেন না। অন্যান্য অশেষ সুবিধা ছাড়াও এম.পি.এ.-দের বেতন হয়েছে দু'শ থেকে বেড়ে চারশ', চার'শ থেকে এখন আটশ' আর এম. এন. এদের পাঁচশ' থেকে হয়েছে এক লাফে দেড় হাজার। এ অনুপাতে শিক্ষক-অধ্যাপকদের বেতন বেড়েছে কি? আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা স্বাধীনতা ছিল— শিক্ষক-অধ্যাপকেরা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইচ্ছামতো যোগ দিতে পারতেন, সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় পারতেন অংশগ্রহণ করতে। এমনকি আইনসভার সদস্যও হতে পারতেন। ফলে সব আলাপ-আলোচনায় মানোন্নয়নের একটা সম্ভাবনা ছিল। এখন তাও তিরোহিত। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও এখন ছাত্র আয়োজিত সাহিত্যসভায় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইতস্তত করেন— ছাত্ররা দাওয়াত দিতে গেলে তাঁদের সর্ব অবয়বে নেমে আসে কালো ছায়া। তাঁদের প্রিয় বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে তাঁরা নিজেরা কম উৎসুক নন। কিন্তু জীবিকার কথা ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা ছাত্রদের বিমুখ করতে বাধ্য হন। এ তো দেশের বুদ্ধিজীবী আর সংস্কৃতিসেবীদের অবস্থা। শুনেছি ডানে-বাঁয়ে নজর রেখে একটা অবিশ্বাস্য আতঙ্কের মধ্যেই এঁদের অনেককে বিচরণ করতে হয়। এখন দেওয়ালের শুধু নয় হাওয়ারও কান গাজিয়েছে। আমাদের Academic Freedom আজ এ পর্যায়েই নেমে এসেছে। এ অবস্থায় মননশীলতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় অনিবার্য। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ কয় বছর যে উল্লেখযোগ্য কিছুই সৃষ্টি হয়নি তার কারণ দেশের এ সার্বিক পরিবেশ। আমার বক্তব্য শেষ হয়ে এসেছে। শেষ করার আগে কয়েকটি অনুরোধ তোমাদের জানাই। এর আগেও এসব অনুরোধ বহুবার জানিয়েছি। আবারও পুনরাবৃত্তি করছি :

(১) তোমাদের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বাইরের রাজনীতিকে ঢুকতে দিয়ো না।

(২) জেলা কিংবা এলাকা-প্রীতিকে দিয়ো না প্রশ্রয়।

(৩) প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে কিংবা পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ধর্মঘট করে বসো না; কারণ এ সব ছাত্রজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এতে তোমাদের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি।

(৪) নৈতিক কারণ ছাড়া শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ো না।

(৫) কোন ব্যাপারেই করো না বাড়াবাড়ি। পরিমিতবোধ আত্মমর্যাদার লক্ষণ।

ছাত্র সমাজের প্রতি এ পাঁচটি অনুরোধ আমার রইল।

অতীতে দেশের ছাত্র সমাজ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়— ভাষা আন্দোলনেও তারা হয়েছে জয়ী। শিক্ষা কমিশনের কয়েকটি অযৌক্তিক ধারার রদবদল সাধনেও তারা হয়েছে সক্ষম। এসব ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেরই ফল। সেদিন তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল, সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই সেদিন প্রাতিষ্ঠানিক মতভেদ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই সাফল্য হয়েছিল তাদের করায়ত্ত।

আজ ছাত্র সমাজ নানা দলে, নানা প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত— তাদের সংহত শক্তি আজ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। শত্রুপক্ষ তাই তাদের এক দলকে অনায়াসে ব্যবহার করছে অন্য দলের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় কোন দলের পক্ষেই একক সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

ছাত্ররা যদি দেশের আর জাতির কোন বৃহত্তর মঙ্গল সাধন করতে চায়, তাহলে সব বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে নিম্নতম কর্মসূচিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। গতবারও আমি তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলাম। এবারও জানাচ্ছি। শুধু ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি নয়— দেশের সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিই আমার আহ্বান : তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও— তোমরা এক হও, এক হও, এক হও। এ কণ্ঠস্বর আমার বটে— কিন্তু এ আহ্বান দেশের, সমস্ত জাতির, তোমাদের প্রিয় জন্মভূমির।

১৯৬৫

নববর্ষের বাণী

নববর্ষ যেমন পুরাতন বৎসরের জীর্ণতাকে ঝেড়ে নূতনের আবির্ভাব ঘটায় তেমনি আমাদের তরুণদেরও প্রাচীন প্রবীণের জীর্ণতার বাঁধ ভেঙ্গে সমস্ত জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। নববর্ষ এ বাণী-ই সকলের সামনে বহন করে নিয়ে এসেছে।

নব জাতি গঠনের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব প্রাচীন-প্রবীণদের হাত থেকে তাঁরা ছিনিয়ে নিক, যেমনভাবে নববর্ষ ছিনিয়ে নেয় প্রাচীন বৎসরের হাত থেকে আগে চলার নতুন পতাকা। প্রবীণ জীর্ণতা আজ দেশের বুকের ওপর এক জগদ্দল পাথর হয়ে বসেছে। দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হলে তার প্রতি নবীনদের কিছুটা নির্মমও হতে হবে। নির্মম হওয়া মানে শ্রদ্ধাহীন হওয়া নয়। এও নববর্ষের বাণী- নববর্ষ কখনো পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জাবর কাটে না— করে না হা-হুতাশ বা ফেলে না দীর্ঘশ্বাস। খোলস বদলাতে বদলাতেই সে এগিয়ে যায় আগামীর বিচিত্র সম্ভাবনাময় জীবনের দিকে।

যথাসময় এ নববর্ষও পুরনো হয়ে বিদায় নেয়, নতুনকে দেয় পথ ছেড়ে— এতে এতটুকু কুণ্ঠা নেই তার। আমাদের প্রবীণদেরও নববর্ষের কাছ থেকে এক বাণী ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তরুণের প্রতি যেমন নববর্ষের বাণী হচ্ছে : আগে চলো, আগে চলো, নতুন পথ ধরো, পা বাড়াও নবদিগন্তের পানে তেমনি প্রবীণের প্রতিও নববর্ষের বাণী হচ্ছে : পথ ছাড়ো, নতুনকে স্বীকার করে নাও, মেনে নাও নবাগতদের, পথ ছেড়ে দাও নবীন পথিকদের।

জন্ম-মৃত্যুর রহস্যে ঘেরা জীবনেরও বাণী এটি। বিশ্ব-প্রকৃতির অমোঘ বিধানের সঙ্গেও রয়েছে এর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি। তাই মনে হয় নববর্ষে নবীন-প্রবীণ সকলের জন্য রয়েছে এক সার্থকতার ইংগিত। এ দিন নতুনকে স্বীকার ও নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণের দিন— এ যেন নবজাতকের জন্মোৎসব।

বলা হয়, আমাদের দেশে বারো মাসে তের পার্বণ। কিন্তু এসব পার্বণ বা উৎসব সবই ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গ। তাই এসবের চেহারা সাম্প্রদায়িক। ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের চেহারা এ না হয়ে যায় না। ধর্মের মূল বিশ্বাস ও ভিত্তি নিয়ে হয়তো মতভেদের অবকাশ নেই কিন্তু তার বাহ্যিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অনেক রকম ছ্যুৎমার্গ ও সীমাবদ্ধতা যে ঢুকে পড়েছে তাতেও সন্দেহ নেই। আর সীমাবদ্ধতা মানেই গোঁড়ামী। এসব গোঁড়ামীই দেশে ও সমাজে নিয়ে আসে বিচ্ছিন্ন মনোভাব। এ মনোভাব যে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের পরিপন্থী তা বোধকরি নতুন করে বলার দরকার নেই।

দেশের মানুষের মনে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ জাগাতে হলে নববর্ষের মতো সার্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবের পত্তন উচিত। এভাবে ধর্ম, মত ও দল নির্বিশেষে দেশের সব মানুষের অনুরাগ আনন্দের মিলনক্ষেত্র রচনা করতে হবে, করতে হবে তার প্রসার সাধন। সীমাবদ্ধতার সীমা ভাঙ্গাই নববর্ষের অন্যতম বাণী। আজ হোক কাল হোক এ

বাণী আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। আনন্দের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ যেমন অবাধে মিশতে পারে, একে অপরকে করতে পারে আপন তেমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। আরো বড় কথা এমন আন্দোৎসবে মানুষের মন পায় সব রকম সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি আর সুযোগ পায় অন্যের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করার। নববর্ষের উৎসব দেশভিত্তিক ও সার্বজনীন। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে নেই এর কোন সম্পর্ক। আমাদের চারদিকের প্রকৃতি যেমন আমার, আপনার, সকলের, তেমনি এ ধরনের উৎসবও দেশের আপামর সকলের। এখানে নিষিদ্ধ মূর্তি ও নিষিদ্ধ খাদ্য দেখে আঁৎকে ওঠার কোন আশঙ্কা নেই। ধর্ম যাই হোক একমাত্র এ ধরনের অনুষ্ঠান উৎসবেই মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে বইতে পারে। একমাত্র এ ধরনের উৎসবই জাতীয় উৎসবরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য যেমন ইরানে 'নওরোজ' আর বার্মায় নববর্ষ দিবস হয় গণ্য।

আমাদের অন্য কোন সার্বজনীন উৎসব নেই। তাই নববর্ষ পালনের ওপর অধিকতর জোর দেওয়া উচিত। বিচ্ছিন্ন মনোভাব ও বিচ্ছিন্ন জীবন নিয়ে আমরা কিছুতেই জাতীয়তা গড়ে তুলতে পারব না। জাতীয়তা গড়ে না উঠলে দেশের ঐক্য ও সংহতি যে শুধু নষ্ট হবে তা নয় সব রকম উন্নতি আর প্রগতিও পদে পদে হবে প্রতিহত। কাজেই শুধু সংস্কৃতির দিক থেকেই যে নববর্ষ পালনের মূল্য আছে তা নয় রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিক থেকেও এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়।

আমিত্বহীন আমি

তক্তপোষের চাদরটা অতখানি ঝুলিয়ে দিয়েছ কেন? মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে যে!

স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়ে বল্লেন : সব বাসায় ঐ রকমই দিয়ে থাকে, দেখে এসো গে অন্যদের বসবার ঘর।

ছেলেদের বল্লাম : শার্টে পকেট থাকলে কত সুবিধা—পেন্সিলটা, বাসের পয়সাটা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

ওরা সমস্বরে হেসে বল্লে : আজকাল কেউ শার্টে পকেট দেয় নাকি?

: সুবিধার জন্যই বলছি—কিছুটা হতাশ কণ্ঠেই বল্লাম।

ছেলেদের হয়ে ছেলেদের মা-ই উত্তর দিলেন : তাই বলে আমার ছেলেরা বুঝি তোমাদের সে পুরোনো আমলের জামা গায়ে দিয়েই রাস্তায় বেরুবে!

বল্লাম : প্যান্টটা আর একটু ঢোলা করলেই তো ভালো দেখাতো!

উত্তর এলো : আজকাল কোন ছেলে বুঝি ঢোলা পেন্ট পরে?

: চুলটা পেছনের দিকে অমন একটা ঝোপের মতো করে না রাখলেই তো দেখতে বেশ মানাতো—।

: কলেজের সব ছেলেই আজকাল এভাবে চুল রাখে—! বড় ছেলেটিই জবাব দিল।

মরিয়া হয়ে বল্লাম : কিসে সুন্দর দেখায় তাও দেখবে না?

ওদের মা-ই আবার ঝঙ্কার তুল্লেন : সুন্দরের জন্য আমার ছেলেরা বুঝি আর এক রকম হয়ে চলবে?

মেয়েটাকে বল্লাম : মা এমন ধারা ব্লাউজ পরেছ—পিঠের আর্ধেকটাই দেখা যাচ্ছে, পেটের বেশ কিছুটা অংশ ফাঁকা, বগলটাও—বগল দেখা গেলে মেয়েদের ভারি বিশ্রী দেখায়—

মা ও মেয়ের সাথে সাথে সারাদেশের নারী সমাজই যেন একসঙ্গে অট্টহাস্য করে উঠল।

আগে জানতাম আর এক রকম হতে পারাটাই বড় কথা—ওতে পরিচয় পাওয়া যায় চরিত্রের আর নিজস্বতার। এখন একাকার হতে পারাটাই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড় আদর্শ। নিজস্ব রুচি আর পছন্দের স্থান নেই আজ জীবনে। সমুদ্রের বারি বিন্দুর মতো মিশে যাওয়াই হয়েছে এখন মোক্ষলাভ। আজ সবাই আমরা অপরের মতো— কেউ নেই নিজের মতো।

স্রোতে গা ভাসানো সহজ—নকলনবিশী কিছুমাত্র কঠিন নয়। আমরা সবাই আজ এ সহজ পথের যাত্রী। বাহ্যিক নকলনবিশীকেও এহ বাহ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ভিতরটাই আদত মানুষ, অর তারই প্রতিফলন বাইরে। অর্থাৎ মনের দিক থেকেও আমরা সবাই আজ নোঙর ছেঁড়া। জীবনে কোন হাতলই আজ আমরা পাচ্ছি না

খুঁজে—পাচ্ছি না ঐতিহ্যের কোন পাদপীঠ, পা রাখবার কোন স্থান। আমাদে সমাজজীবনের আজ এ এক ত্রিশঙ্কু দশা।

নিজের মতো সহজে হওয়া যায় না। যে মন মানুষকে গড়ে তোলে তার চা দেহচর্চার চেয়ে কম কঠিন নয়। সে কঠিনের সাধনা পরিহার করে চলতে গিয়েই আম হারিয়ে বসি নিজের ব্যক্তিসত্তা—খুঁজে পাই না ভিতরে বাইরে নিজের কোন জীবন-দৃষ্টি।

জীবিকার চেহারা-বদলের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও বদল অনিবার্য, তবে সে বদলের অ অন্যের মতো হওয়া নয়। প্রত্যেকটা মানুষই স্বতন্ত্র—কারণ সে স্বতন্ত্র মনের অধিকারী জমি কর্ষণের পরই যেমন বুঝতে পারা যায় কোন জমিতে কি ফসল ফলবে তেমনি মনেরও স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে ওঠে কর্ষণ তথা যথাযোগ্য চর্চার পর। এভাবে গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি—তখন পরের মতো হওয়ার বিড়ম্বনা ছেড়ে মানুষ হয়ে ওঠে নিজের মতো।

মানুষ যা তার চেয়েও মানুষ অনেক বড়—এ এক মস্ত বড় চেতনা, এক নতু আবিষ্কার—এক নতুন উদ্বোধন। এ সত্য ব্যক্তি-মনের আবিষ্কার— ব্যক্তিত্ব মন-চর্চার ফসল। সংঘ বা সমাজের দান এ নয়। এখানে ব্যক্তি সংঘ বা সমাজের চেয়ে বড় সাহিত্য-শিল্প আর সব রকম ধর্ম-দর্শনের উৎস-মূলও এখানে। এসব ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধি— বিশিষ্টতাই আকর্ষণ। এ বিশিষ্টতার পরিবেশ আর পটভূমি রচনা করে মন—তা প্রয়োজন মনের চর্চার, তার যথাযথ পরিশীলনের।

আজ আমরা 'আমিত্বহীন' আমিতে পরিণত। তাই আমাদের শিল্প-সাহিত্য আর স রকম সংস্কৃতি চর্চার আদর্শ হওয়া চাই আজ আমাদের এ আমিত্বের সন্ধান।

বলাবাহুল্য, 'আমিত্ব' মানে বাঙালিত্ব বা হিন্দুত্ব-মুসলমানিত্ব নয়—এ মনে করা হ আমার কথার ঠিক বিপরীত কথাই মনে করা হবে। মন স্বতন্ত্র আর বিশিষ্ট বটে কিন্তু গ আর শিকলের পরম শত্রু।

১৯৬৫

লেনিন

ইতিহাস যেমন মানুষ তৈরি করে, দেয় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ, তেমনি মানুষও ইতিহাসকে সৃষ্টি করে, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যের পথে। লেনিন ছিলেন তেমন একজন মানুষ। তাঁর জন্মভূমির বহু যুগের ইতিহাসকে তিনি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছেন, ঘুরিয়ে দিয়েছেন তার মোড়—দীর্ঘদিনের সঞ্চিত আবর্জনা স্তূপের ওপর গড়ে তুলেছেন অবহেলিত মানুষের জন্য শান্তি, সুখ আর নিরাপত্তার ইমারত। হয়তো নিজের জীবদ্দশায় এই ইমারত পুরোপুরি গড়ে তুলতে তিনি পারেননি। না পারার বড় কারণ তিনি ছিলেন স্বল্পায়ু, ১৯৭০ থেকে ১৯২৪– এ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকাল। আবার এরও বেশিরভাগ কেটেছে নির্বাসিত অবস্থায়, দেশান্তরে বাস্তুহারা ভবঘুরে দশায়। মাত্র ১৯১৭-য় জন্মভূমি রাশিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ তিনি পান—তাও একটা ট্রেনের অবরুদ্ধ কামরায় আত্মগোপন করে। কাজেই মুক্ত আর স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি মাত্র জীবনের শেষ সাতটি বছর, তারও পুরো শেষ বছরটি ছিলেন অসুস্থ। এ স্বল্প সময়ে রাশিয়ার মতো এত বিরাট ও জনবহুল দেশে—যে দেশ তখন সারা ইউরোপে ছিল সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া, সবচেয়ে নিরক্ষর আর সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শুধু নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একটা সম্পূর্ণ অভিনব জীবন-দর্শনের ইমারত রচনার ভিৎপত্তন কত যে দুরূহ ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। কি করে এ অসম্ভব সম্ভব হলো? সম্ভব হলো এত স্বল্প সময়ে? সম্ভব হয়েছে লেনিনের চারিত্রিক সততার জন্য। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর ইতিহাস চেতনার জন্য। আর নিজের আদর্শের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠার জন্য।

ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করেছেন তিনি মার্ক্সের রচনা আর মার্ক্সীয় দর্শন থেকে। যদিও মার্ক্সের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তিনি কখনও পাননি। কারণ, মার্ক্সের মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন মাত্র তের বছরের বালক। মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর যে ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় ইস্তেহার—যা সেদিন যেমন আজো তেমনি বিশ্বের তাবৎ ধনতান্ত্রিক দেশের আতঙ্ক—তা প্রকাশের বাইশ বছর পরেই তাঁর জন্ম। তবুও ইতিহাস বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবে যে, সে ইস্তেহারের শ্রেষ্ঠতম ভাব-সন্তান হচ্ছে লেনিন। সে ইস্তেহারের মর্মবাণী সর্বাগ্রে লেনিনের জীবনে আর সাধনায় হয়েছে বাস্তবায়িত। 'জমি, পুঁজি আর শ্রম'–এ তিনই সব ধন-সম্পদের মূল আর এ তিনের মালিকানা ও তার অপব্যবহারের ওপরই ধনতন্ত্রের বুনিয়াদ রচিত। যে ধন-রত্ন বিশ্বের অগণিত মানুষের অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা আর নিপীড়নের কারণ আর কারণ যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীরও। এমনকি জাতি বিদ্বেষেরও। ১৯৪৮-এ প্রকাশিত উক্ত ইস্তেহার ধনতন্ত্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির এক অমোঘ সনদ। এ সনদেরই সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি লেনিন। এ সনদই হয়েছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। মানব জাতির মুক্তির সন্ধান তিনি এ ইস্তেহারেই পেয়েছিলেন খুঁজে। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছিলেন, এ মুক্তি সংগ্রাম হাওয়াই কিংবা কেতাবি হয়ে থাকলে তাতে মানুষের কোন ফায়দাই হবে না। তাই তার সূচনা আর বাস্তবায়নের জন্যে চাই বিশেষ স্থান-কাল-পাত্র। বলাবাহুল্য, এ

বিশেষ স্থান-কাল-পাত্র যে নিজের দেশ, নিজের কাল ও নিজের জাতি তাতে সন্দেহ নেই তাই স্বদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে দেখে তিনি ১৯১৭ গোপনে এসে জন্মভূমি রাশিয়ার মাটিতে পা রাখলেন। ইতি টানলেন দেশান্তরি জীবনের। এখন থেকে কায়মনোবাক্যে শুরু করলেন সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনা। লেনিন শুধু আজকের সোভিয়েত রাশিয়ার জনক নন—সমাজতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণও ঘটেছে তাঁর হাতে। সে সূচনার যুগে কি অসীম দুঃখই না তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে— প্রতিক্রিয়াশীল আর প্রতিবিপ্লবীদের সাথে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে পদে পদে। কায়েমী স্বার্থের দুর্গ তখনো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েনি রাশিয়ায়— যে দুর্গ থেকে আততায়ীর গুলি হয়েছে তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত— দেশে ফিরে আসার মাত্র এক বছর পরে। লেনিন তাতেও বিন্দুমাত্র দমেননি, নিরুৎসাহ হননি এতটুকু। হারাননি সর্বহারার মুক্তি সনদ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস। তাই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের সম্বোধন করে সেদিন তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠেছিলেন "We have only one way out comrades, victory or death"—আমাদের সামনে একটিমাত্র পথ খোলা—জয় অথবা মৃত্যু। এ হচ্ছে লেনিন—নীতি আর আদর্শ নিয়ে আপোষ করেননি কোনদিন জীবনে। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর এক প্রাক্তন সহকর্মী লিখেছেন : "There is no other man who is absorved by the Revolution twenty four hours a day, who has no other thoughts but the thought of the revolution and who even when he sleeps dreams of nothing but the revolution." বিপ্লব মানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এ বিপ্লবের চিন্তায় তাঁর মতো আর কেউই দিনের চব্বিশ ঘণ্টা ডুবে থাকতেন না—বিপ্লবের চিন্তা ছাড়া যাঁর আর কোন চিন্তাই ছিল না। এমনকি ঘুমের মধ্যেও যিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন।

খ্রিষ্টের যেমন সেন্ট্ পল, মার্ক্সের তেমনি লেনিন—এমন উপমাও দিয়েছেন কোন কোন ঐতিহাসিক। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হ্যাবার্ট জে. মুলার লিখেছেন :

"He was as selfless as Paul in his devotion, or even in his egoism : his fierce self-righteousness never sprang from vanity or selfishness, but always from the holy righteousness of his cause." অন্যত্র "He was himself entirely free from jealousy, vanity, personal ambition, or the neurotic motives of a Hitler : in one respect he appears even nobler than St. Paul, in that he dedicated his entire life to his cause without benefit of mystical experience or promise of personal salvation" (The Uses of the Past P. 295) মুলার মন্তব্য করেছেন : "There is no questioning the sincerity of Lenin's desire to keep the revolution democratic" তরুণ ট্রটস্কি যখন অন্যভাবে দলীয় ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন তখন লেনিন তাঁকে সাবধান করে লিখে পাঠিয়েছিলেন : "Whoever wants to approach socialism by any other path than that of political democracy will inevitably arrive at absurd and reactionary conclusions both

economic and political." এসবের লেখক সমাজতন্ত্র আর সমাজতান্ত্রিক দেশের নির্ভেজাল শত্রু দেশের মানুষ—তাই তাঁর মন্তব্যে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব ঘটেছে তেমন সন্দেহ পোষণ করার কারণ নেই। এখানে তাঁর মতামত কিছুটা বেশি করে উদ্ধৃতির কারণও এটি।

লেনিন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর আরব্ধ সৎকাজ কেউ নষ্ট করে দিক— এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর অন্যতম সহকর্মী লুনাচরস্কি বলেছেন : "He does his work imperiously, not because power is sweet to him but because he is sure that he is right, and cannot endure to have anybody spoil his work." এ প্রসঙ্গে হর্বার্ট মুলারের মন্তব্য : "And in this tremendous sureness Lenin transformed the gospel of Marx as profoundly as St. Paul transformed the gospel of Jesus অর্থাৎ সেন্ট পল যেমন খ্রিস্ট বাণীকে তেমনি লেনিন মার্কসের বাণীকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন, সঞ্চারিত করেছেন জনগণের জীবনে। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমরাও আজ দেখতে পাচ্ছি এ ব্যাপারে গুরুর চেয়ে শিষ্যের মতই সঠিক পথের নির্দেশক। কারণ, ক্ষমতার চাবিকাঠি থাকে রাজনীতির হাতে অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালকদের দখলে। রাজনীতি ইচ্ছা করলে অর্থনীতির যে কোন গণমুখী সৎ পরিকল্পনাকেও বানচাল করে দিতে সক্ষম। তাই, সমাজতন্ত্রের পথকে সুগম করার জন্য আগে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেওয়া প্রয়োজন। লেনিন নিজেও তাই করেছেন—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিয়েই তিনি চালিয়েছেন সমাজতন্ত্রের অভিযান, তাঁর স্বদেশ সোভিয়েত রাশিয়ায়। কিন্তু কোন রকম ব্যক্তিগত স্বার্থে তিনি দলীয় কি রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষমতারই অপব্যবহার করেননি। শত্রুপক্ষও কোন দিন করেনি তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার অভিযোগ। এ যুগের ইতিহাসে লেনিনের মতো এমন নিঃস্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের নাম শোনা যায়নি। চব্বিশ ঘণ্টা রাজনীতিতে ডুবে থেকেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে নৈতিক কলুষতা থেকে মুক্ত আর ছিলেন সর্বতোভাবে মানবিক। নিজের সম্বন্ধে ভুলে থাকতেন সব সময়। ১৯১৮-র আগস্ট মাসে প্রতি-বিপ্লবীদের গুলিতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন —সে কথা উল্লেখ করেছি। খবর পেয়ে আতঙ্কিতা স্ত্রী ক্রুপস্কায়া ছুটে এসে তাঁর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াতেই স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথম কথাই বল্লেন লেনিন : "Here you are...you're looking tired. Go and lie down" কোন কাতরোক্তি করলেন না, বল্লেন না নিজের যন্ত্রণার কথা। বল্লেন: 'তুমি এসেছো... .. তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শুয়ে থেকে একটু বিশ্রাম করোগে।' বলাবাহুল্য, ক্রুপস্কায়া লেনিনের শুধু নর্ম সহচরী ছিলেন না, কর্ম-সঙ্গিনীও ছিলেন। শুধু স্ত্রীর বেলায় নয়—সহকর্মীদের প্রতিও ছিল তাঁর এ মনোভাব। নিজের ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ ও দুঃখের ঊর্ধ্বে তিনি স্থান দিতেন অন্যের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখের, সর্বাগ্রে চেষ্টা করতেন ওদের অভাব ও দুঃখ দূর করতে। এভাবেই তিনি জয় করেছিলেন সহকর্মী আর মেহনতি মানুষের হৃদয়। তাঁর সহকর্মী আর পরিচিতজনেরা যেসব স্মৃতিকথা লিখেছেন তাতে তাঁর মানবসুলভ গুণের অসংখ্য নজিরের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর চেহারা আর দৈহিক অবয়ব যেমন ছিল সাধারণ তেমনি চালচলন আর মেলামেশাও ছিল সাধারণ মানুষের।

মতো। রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার পরও নিজেকে সাধারণ থেকে পৃথক মনে করতেন না তিনি। রাষ্ট্রনায়ক আর জনগণের প্রিয় নেতা হিসেবে স্বভাবতই তিনি অনেক উপহার-উপঢৌকন পেতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য তা রাখতেন না—বিলিয়ে দিতেন জনগণের সেবায়। ক্লারা সেৎকিন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "এ কথা সবাই ভালো করে জানে যে, 'তাদের প্রিয় ইলিচে'র জন্য কৃষকরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ময়দা, চর্বি, ডিম, ফল ইত্যাদি ভেট নিয়ে আসত। কিন্তু একথাও সবাই জানেন যে, উক্ত ভালো জিনিসগুলোর কোনটিই লেনিনের ভাঁড়ারে থাকত না। সবকিছুই হাসপাতাল ও শিশু প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হতো। কারণ, শ্রমিক শ্রেণীর জনগণ যে রকম মিতব্যয়ীভাবে থাকে সেইভাবে থাকার নীতি লেনিনের পরিবারবর্গও অনুসরণ করতেন" প্রলেটারিয়েট তথা শ্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা যাঁর জীবনের ব্রত ও সাধনা তিনি শ্রমিক শ্রেণী থেকে আলাদা জীবনযাপন করার কথা হয়তো ভাবতেই পারেননি। একমাত্র ধনতান্ত্রিক দেশেই দেখা যায় রাষ্ট্রনায়ক কিংবা মন্ত্রীরা যে সব উপঢৌকন পেয়ে থাকেন, তা জমা হয় তাঁদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে। জনগণকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই ভাবতে পারতেন না লেনিন। সাহিত্য-শিল্পকেও মুষ্টিমেয়র উপভোগ্য করে রাখার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তিনি বলেছেন : "শিল্প জনগণের জন্য। মেহনতকারী জনগণের ঠিক মাঝখানেই তার শিকড় গভীরভাবে যাওয়া দরকার। শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় হল তাকে যেন এসব সাধারণ মানুষ ভালবাসতে ও বুঝতে পারে।" এ প্রসঙ্গে একটি উপমা দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—আমরা কি শুধু স্বল্প সংখ্যক মানুষের সামনে বেশ দামি আর সুন্দর সুন্দর কেক পরিবেশন করব, যখন শ্রমিক আর কৃষক জনগণের প্রয়োজন কালো রুটির?' অর্থাৎ জনগণকে বাঁচার উপকরণ দিতে হবে সর্বাগ্রে আর শিল্পকে পরিণত করতে হবে বাঁচার হাতিয়ারে। এ প্রসঙ্গে তাঁর এ উক্তিও স্মরণীয় : 'শিল্প যাতে জনগণের নিকটতর হয় আর জনগণ যাতে নিকটতর হয় শিল্পের, তার জন্যে সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানকে উন্নত করতে হবে।' বলাবাহুল্য, এছাড়া সত্যিকার শিল্পের উন্নতি ও প্রসার কিছুতেই সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্পীর যে দুরবস্থা সে সম্বন্ধে লেনিনের বক্তব্য : "ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তির ওপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সেখানে শিল্পকাজ সৃষ্টি করে বাজার ও ক্রেতাদের চাহিদানুসারে। আমাদের বিপ্লব এই গদ্যময় অবস্থার জোয়াল থেকে শিল্পীদের মুক্ত করেছে।' (ক্লারা সেৎকিন) কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্পীকে নিজের ভরণ-পোষণের জন্য ভাবতে হয় না। নিজের শিল্পকাজ বিক্রি হবে কি হবে না এমন দুর্ভাবনায় হয় না পড়তে। আমাদের শিল্পীদের প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা কারো অজানা নয়। ওখানে রাষ্ট্রই পৃষ্ঠপোষকতা করে শিল্প আর শিল্পীর। রাষ্ট্রই শিল্পকর্মের বড় খরিদ্দার। শিল্প ও সাহিত্য মানুষের ওপর বিশ্বাসকে বাড়ায়। মানুষের ইচ্ছাশক্তি যে অপরাজেয় আর সত্যের জয় যে অবশ্যম্ভাবী যে শিল্প তা ঘোষণা করে আর সে সবের প্রেরণা দেয়, তেমন শিল্প-সাহিত্যকেই তিনি মনে করতেন অপরিহার্য।

লেনিন মানুষকে ভালবাসতেন, মানুষের ওপর বিশ্বাস কখনো হারাননি। তাই মানুষের মুক্তির জন্য অশেষ দুঃখের বরণেও তিনি হননি পশ্চাদপদ। আজ তিনি নেই, তেতাল্লিশ বছর আগে তিনি গতায়ু হয়েছেন। কিন্তু সারা জীবন ধরে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নির্যাতন সয়ে যে অভিনব জীবন-দর্শনকে বাস্তবায়নের পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তার দিকে আজ পৃথিবীর কোটি কোটি সর্বহারা মানুষ আশা-উন্মেদ নিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে

আছে। কারণ, তারা জানে তাদেরও মুক্তির দর্শন এটি—বুঝতে পারে ঐ সড়ক বেয়েই মুক্তির এক একটি ধাপ তাদেরও পার হয়ে এগুতে হবে সমাজতন্ত্রের দিকে।

মনে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার যখন অতর্কিত রাশিয়া আক্রমণ করে বসে, তখন আমার পরিচিত একজন গোঁড়া ও রক্ষণশীল অধ্যক্ষ হু হু করে কেঁদে উঠেছিলেন। অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতেই বল্লেন, "রাশিয়ার পরাজয় মানে তো একটা দেশের পরাজয় নয়—একটা আদর্শের পরাজয়, যে আদর্শের চারপাশে বিশ্বের সর্বহারারা নিজেদের আশা-ভরসার নীড় রচনা করতে চাইছে।" সত্যিই রাশিয়া মানে একটা দেশ নয়—একটা জাত নয়, রাশিয়া মানে একটি আদর্শ—মানব-ভাগ্য বিবর্তনের একটি আদর্শ। সে আদর্শের উজ্জ্বলতম ও অনির্বাণ শিখা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। ইতিহাসের পাতা থেকে এ নাম কখনো মুছে যাবে না, মুক্তিকামী মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে চিরকালই স্মরণ করবে এ নাম। আজ তাঁর জন্মদিবসে তাঁর জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে থেকেও—বহু দূরের মানুষ হয়েও আমরা স্মরণ করছি তাঁকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি। এ শ্রদ্ধা শুধু একটি ব্যক্তির প্রতি নয়, একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে মহৎ আদর্শ গড়ে উঠতে চেয়েছে তার প্রতি-ই।

তাঁর জীবন ও আদর্শ আমাদেরও প্রেরণা দিক।

১৯৬৭

মওলানা মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী

যে-কোন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস বিচিত্র, বহু ধারা-উপধারায় তা বিভক্ত। বিশেষ করে রাজনৈতিক সংকট আর বিপর্যয়ের ফলে যে জাতির ভাগ্য বারবার বিড়ম্বিত হয়েছে তার ইতিহাসের গতি কিছুতেই একটা সরলরেখানুসারী হতে পারে না। বাঙালি মুসলমানের, বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানের ইতিহাসও তাই বিচিত্র আর নানা জটিলতায় আবর্তিত। ব্রিটিশ আমলে পাক-ভারতের প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেমন সুস্পষ্ট ছিল তেমনি প্রাদেশিক সমস্যাগুলির চেহারা-চরিত্রেও ছিল যথেষ্ট পার্থক্য। সব প্রদেশের সমস্যা সমধর্মী কিংবা সমপর্যায়ের ছিল না। মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর সত্তার দিক থেকেও দেখলে দেখা যাবে এত মুসলমান অন্য কোন প্রদেশে ছিল না—আর এরা ঐক্যবদ্ধ ছিল একই ভাষা আর একই রকম আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে। স্বাধীনতার আগেও এ প্রদেশের মুসলমানরা মোটামুটি একটা সমজীবনাচারী সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে এ প্রদেশের মুসলিম জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল দেশীয় জনসাধারণ থেকে ধর্মান্তরিত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ ধর্মান্তরীকরণ সম্পূর্ণতা পায়নি এ কারণে যে এদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধর্ম-শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থাই তখন এ প্রদেশে ছিল না। এ অবস্থায় পূর্বসংস্কার তথা পূর্বপুরুষের জীবনাচরণ আর আচার-বিচার সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া কিংবা মন-মানস থেকে মুছে ফেলা আশা করা যায় না। সব দেশেই সমাজের নিম্নস্তরে সংস্কৃতি একটা বিশেষ লৌকিক রূপ নিয়েই দানা বেঁধে ওঠে। দেশীয় খ্রিস্টানদের বেলায়ও এটা দেখা গেছে। ধর্মান্তরিত মুসলমান কি খ্রিস্টান কেউ-ই আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি। এ কারণে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জনসাধারণের জীবনাচরণে তখন অনেক ক্ষেত্রে ঐক্য লক্ষ্য করা যেত। মনে হয় অন্য প্রদেশেও এর ব্যতিক্রম ছিল না—সাধারণ উড়িয়া কি বিহারি থেকে নিম্নস্তরের বৃত্তিজীবি উড়িয়া বা বিহারি মুসলমানকে ফরক করাই অসম্ভব ছিল, চেহারা সুরতে—লেবাছে-জবানে মুসলিম-অ-মুসলিম এরা প্রায়ই একই রকম দেখতে। স্বাধীনতার আগে এ আমরা কলকাতা আর অন্যত্র দেখেছি।

মুসলিম শাসনামলে রাজধানীকে কেন্দ্র করে যে আভিজাত্য আর সংস্কৃতি এ দেশে গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব প্রসার কখনো বাংলার গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার তেমন সুযোগ পায়নি। যেটুকু পড়েছিল তাও একান্তভাবে সীমিত ছিল মুষ্টিমেয় শাসক আর ভূস্বামী পরিবারেই।

রাজধানী দিল্লি-আগ্রা থেকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অনেক দূরে আর ঘোড়ার চেয়ে সহজলভ্য দ্রুততর অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থাও তখন দেখা দেয়নি দেশে। এ কারণে দিল্লি-আগ্রার সাংস্কৃতিক জীবন বাংলাদেশে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যেমন পেরেছিল উত্তর প্রদেশে, পাঞ্জাবে আর রাজধানীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে। ফলে বাংলাদেশের মুসলমানের সামাজিক জীবনে ইসলামের সংস্পর্শে

বিরোধও যে ছিল না তা নয়।

দেশে ইংরেজ শাসন কায়েমের সময় মোটামুটি এ ছিল এ দেশের মুসলমানের সম্প্রদায়গত অবস্থা। আর্থিক আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবস্থা হয়ে পড়ে আরো শোচনীয়। এতকাল রাজনৈতিক আর আর্থিক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এসেছে এবার অকস্মাৎ তারও সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এ সুযোগ-সুবিধা অনেকখানি সীমিত ছিল মধ্যবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই। এ প্রদেশে সমাজের নিম্নস্তরে মানুষের অবস্থা কখনো তেমন সচ্ছল ছিল না। এদেশের ধর্ম-চেতনায় যে আঞ্চলিকতার ভেজাল ছিল তার ইংগিত উপরে করা হয়েছে। দুটি তারিখ তথা দুটি ঘটনা বাঙালি মুসলমানের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক ইতিহাস-সন্ধানে বিশেষ জরুরি। এর একটি ১৭৫৭ অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধ আর দ্বিতীয়টি ১৮৫৭ তার মানে সিপাহি বিদ্রোহ। প্রথমটি নিয়ে এসেছিল এদেশের মুসলমানের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয়। ব্রিটিশের ধারণা সিপাহি বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা মুসলমান, প্রকারান্তরে হৃত-সাম্রাজ্য উদ্ধারেরই এ এক প্রচেষ্টা, এ কারণে গোড়া থেকেই ব্রিটিশ শাসন নীতিগতভাবে হয়ে পড়ে মুসলিমবিরোধী। সে যুগে শরাফতী বা আভিজাত্য ছিল ভূমি আর রাজপথ-নির্ভর। আর্থিক সঙ্গতিরও এ ছিল একমাত্র উৎস। দেশে শিল্প বাণিজ্য যেটুকু ছিল তার একচেটিয়া মালিকানা ছিল ইংরেজের হাতে, তাদের অধীনে যৎসামান্য সুযোগ-সুবিধা পেলেও তা পেত হিন্দু সমাজ-মুসলমানেরা সে সুযোগ থেকেও ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তার ওপর অচিরে ইংরেজ দেশে এমন এক ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করল যার ফলে মুসলমান ভূম্যাধিকারীরা ভূমির স্বত্ব হারাতেও হলো বাধ্য। রাজপদ তো ছিল তাদের জন্য প্রায় নিষিদ্ধ। ফলে মুসলমান উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভেঙ্গে ধীরে ধীরে স্রেফ কৃষক মজুরে গিয়েই দাঁড়াল। কিছুটা আর্থিক সংগতি ছাড়া সংস্কৃতি চর্চা তথা শিক্ষিত হওয়া আর শিক্ষিতের ভূমিকা পালন কিছুতেই সম্ভব নয়। এ সবের ফলে মুসলমানের আর্থিক আর সাংস্কৃতিক জীবনে নেমে এলো এক মহাবিপর্যয়। এ বিপর্যয়ের জের অল্প-বিস্তর পাকিস্তান হাসিল হওয়া পর্যন্তই অব্যাহত ছিল। এ বিপর্যয়ের এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন হান্টার সাহেব তাঁর 'The Indian Mussalmans' নামক গ্রন্থে। এ বিপর্যয়ের পটভূমিতেই, পরবর্তী যুগের মুসলমান সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা, লেখক আর সাংবাদিক প্রভৃতির আবির্ভাব। এ পটভূমির সঠিক পরিচয় ছাড়া এঁদের অবদানের যথাযথ মূল্য বিচার সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য এঁরা তৎকালীন সমাজের চাহিদা আর প্রয়োজনের পরিপূরক। এঁরা সব ক্ষেত্রে সমাজ-মনে একটা ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি না করলে পরবর্তীকালে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি আর শিল্প-সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় আমরা যে প্রাণোচ্ছ্বাস দেখেছি, যাকে সীমিত অর্থে যৌবন জল-তরঙ্গ বলা যায় তা আসত কিনা সন্দেহ। এ জল-তরঙ্গেরই সাক্ষাৎ পরিণতি যে পাকিস্তান তাও অনস্বীকার্য।

॥ ২ ॥

সব কিছুরই একটা প্রস্তুতি-পর্ব আছে। আমাদের জাতীয় জীবনেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত কালকে মোটামুটি এ প্রস্তুতি-পর্ব বলা যায়। একটা স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার চেতনা আর অনুভূতি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আবেগ আর

প্রেরণা এ যুগেই বাঙালি মুসলমানের মনে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছিল। এ প্রস্তুতি পর্বের নায়কদের অন্যতম ছিলেন মওলানা মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী। তাঁর জন্ম ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক আঠারো বছর পরে। উপরে সিপাহি বিদ্রোহের জের হিসাবে যে বিপর্যয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে সে বিপর্যয়ের মাঝখানেই ইসলামাবাদী আর তাঁর সহকর্মীদের জন্ম ও আবির্ভাব। এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন এ বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে আর করতে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সে সংগ্রামে মনীরুজ্জমান যুগপৎ সৈনিক আর সেনাপতির ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নিজের শিক্ষা-দীক্ষা আর জীবনের পরিবেশ ছিল ধর্মীয়। সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেনও ধর্মের পথ বেয়েই। তিনি আর তাঁর সহকর্মীরা বোধকরি এ কারণেই সব কিছু বিচার করে দেখতেন ধর্মের মাপকাঠি দিয়ে। আঞ্চলিক সংস্কার আর তার থেকে উদ্ভূত অনেক আচার-অনুষ্ঠান ইসলামের বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় রূপকে যে অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সে ইংগিতও উপরে করা হয়েছে। ইসলামাবাদী আর তাঁর সহকর্মীদের দৃষ্টি তাই সর্বাগ্রে এদিকেই আকৃষ্ট হয়—কর্মজীবনের সূচনায় একারণেই বেশি করে তাঁদের নিতে হয়েছিল সংস্কারক আর প্রচারকের ভূমিকা। এ অবস্থায় উজ্জীবনবাদী না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না। সব সংগ্রামেরই প্রাথমিক শর্ত—লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা আর জাগ্রত-চিত্ততা। এঁরাও তাই মুসলমানকে সর্বাগ্রে মুসলমান হিসেবে সচেতন আর জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিশুদ্ধ ধর্মশিক্ষার ওপর এ কারণেই এঁরা দিয়েছিলেন বেশি জোর। যেসব লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ ছিল তার প্রতি এঁরা ছিলেন আপোষহীন। এঁদের চেষ্টা ছিল শাস্ত্রীয় ইসলামকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। এঁরা এও দেখতে পেয়েছিলেন, শাস্ত্রীয় ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে যে শৈথিল্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে খ্রিস্টান পাদ্রিরা। যাদের পেছনে রয়েছে অর্থবল আর রাজানুকূল্য। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্বও নিতে হয়েছিল ইসলামাবাদী আর তাঁর সহকর্মীদের। সীমিত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও এ দায়িত্বও তাঁরা পালন করেছেন সাধ্যানুসারে। পাদ্রীদের খপ্পর থেকে সাধারণ মুসলমানকে বাঁচাবার প্রধান উপায় হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করা—তাই এ উদ্দেশ্যে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় এঁরা হাত দিয়েছিলেন। অন্যদিকে পাদ্রিদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য এরা গড়ে তুলেছিলেন ইসলাম মিশন, ইসলাম প্রচার সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। আর এ উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রচারণা চালাবার জন্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশেরও নিয়েছিলেন দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আঞ্জুমানে-ওলেমা-এ বাঙালা আর তার মুখপত্র আল-ইসলামের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ দুইয়েরও প্রধান কর্মী ছিলেন মনীরুজ্জুমান ইসলামাবাদী।

১৮৫৭-এর বিপর্যয়ের যে যুগ-সন্ধিক্ষণে মওলানা মনীরুজ্জামানদের আবির্ভাব তখন বাঙালি মুসলমান সমাজে মোটামুটি দুই শ্রেণীর নেতৃত্ব দেখা দিয়েছিল। এ দুই নেতৃত্ব ছিল সামাজিক চাহিদা আর প্রয়োজনেরই ফল। দুই নেতৃত্বেরই উদ্দেশ্যে একই ছিল, যদিও পথ ছিল ভিন্নতর। উভয় নেতৃত্বেরই আদর্শ ছিল সমাজকে জাতি-সচেতন করে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দেওয়া, যুগের মোকাবেলার পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র সমাজ হিসেবে মুসলমানকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। অন্য সমাজের তুলনায় স্ব-সমাজের হতশ্রী অবস্থা আর দুর্গতি দুর্গতি উভয় নেতৃত্বকে ব্যথিত বিচলিত ও কর্ম-ব্যাকুল করে তুলেছিল। এক নেতৃত্ব

চেয়েছিল ইংরেজি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রচনা করে সমাজের তরুণদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে আর দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানের প্রবেশ সহজ ও সুগম করে দিতে। এঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দেশের প্রশাসনকার্যে মুসলমান তার ন্যায্য অংশ পাক আর এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করুক। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আর তাঁর সহকর্মীরা যা করেছিলেন বাংলাদেশে এঁরাও প্রায় তাই করতে চেয়েছিলেন। এ নেতৃত্বের পুরুভাগে ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ, নবাব শামসুল হুদা, নবাব স্যার সলিমউল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী, সৈয়দ আমির আলী প্রভৃতি। এঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি সহায়তায় মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ আর অনুকূল পরিবেশ রচনা করা। কিছুটা ধীর গতিতে হলেও এঁদের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি এঁদের প্রচেষ্টারই যে সাক্ষাৎফল তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এ নেতৃত্ব পুরোপুরিই সরকার-সমর্থক আর সরকার-ভক্ত ছিল। সরকারি খেতাবে তা স্বীকৃতও। সমাজের জন্য তাঁরা যা কিছুই করতে চেয়েছেন বা করেছেন তার পেছনে সরকারি সহায়তা ও আনুকূল্য সক্রিয় ছিল। ফলে তাঁদের পথ তেমন দুর্গম ছিল না।

মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার পটভূমি যেমন এঁরাই রচনা করেছেন তেমনি সমাজ মনে তার প্রেরণাও জুগিয়েছেন এঁরাই সর্বাগ্রে। বলাবাহুল্য সে যুগের ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানরাও কিছুমাত্র কম ধর্মভীরু ছিলেন না—শাস্ত্রীয় ধর্ম শিক্ষার ওপর তাঁরাও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। ব্যক্তিগতভাবেও এঁদের অনেকে ছিলেন অত্যন্ত স্বধর্মনিষ্ঠ। এঁদেরই চেষ্টায় তখন সরকারিভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম আর হুগলিতে এক একটি উচ্চ পর্যায়ের মদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর সে সবের ব্যয়ভার যাতে মোহসিন ফান্ড থেকেই বহন করা হয় তার উদ্যোগও এঁরাই নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ঐ ফান্ডের অর্থ মুসলিম হিতার্থে ব্যয়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসার সঙ্গে অ্যাংলো-ফার্শিয়ান বিভাগের সংযোজনও এঁদেরই চেষ্টার ফল।

মোট কথা বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এঁদের অবদানও সেদিন কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় লের নেতা আর কর্মীরা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বে-সরকারি আর অনেকখানি বিত্তহীন। সরকারের সঙ্গে এঁদের যে শুধু কিছুমাত্র দহরম মহরম ছিল না তা নয় বরং এঁরা গোড়া থেকেই ছিলেন মনেপ্রাণে সরকারবিরোধী : কোন ব্যাপারেই এঁরা সরকারের মুখাপেক্ষী হননি। এঁরা যা কিছু করেছেন বা করার উদ্যোগ নিয়েছেন—একক কি যৌথভাবে, সে সবের পেছনে নিজেদের সীমিত সম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নির্ভর করেছেন এঁরা স্রেফ নিজেদের অমিত সাহস আর আত্মবিশ্বাসের ওপর! এঁদের অটুট বিশ্বাস ছিল নিঃস্বার্থ কর্মে আর সে কর্মে আল্লার সহায়তায়। এঁদের একমাত্র অবলম্বন ছিল মুসলিম জনসাধারণ আর তাঁদের সব কর্মের লক্ষ্যও ছিল এ জনসাধারণের হিতসাধন— তাদের মনে ধর্মবোধ আর জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করে দেওয়া। সত্যিকার অর্থে এঁরাই ছিলেন জনপ্রতিনিধি।

সে যুগের চাকরিজীবি ইংরেজি শিক্ষিত নেতাদের মতো এঁরা কেউ-ই অভিজাত আর বিত্তবান পরিবার থেকে আসেননি। জনসাধারণের মধ্যেই এঁদের জন্ম, উৎপত্তি ও সেখান থেকেই আর এঁদের নেতৃত্বের পাদপীঠও ছিল জনগণ তথা জনচিত্ত। এ দলের অধিকাংশ নেতা ছিলেন আলেম, তাঁদের জীবন আর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। এ কারণে এঁদের সব কর্মের গতিবিধিও ছিল ধর্মভিত্তিক। তাহলেও গোড়া থেকেই এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছাড়া কোন কর্ম-প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না। এতে যে তাঁরা শুধু অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, একটা ঐতিহাসিক বাস্তব চেতনারও দিয়েছেন পরিচয়। তা সে যুগের জন্য কিছুটা বিস্ময়কর ছিল বইকি।

তাই পুরোপুরি আলেম হওয়া সত্ত্বেও এঁদের অনেকে ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন—বাংলা ভাষার ওপর কারো কারো দখল ছিল অসামান্য ও বিস্ময়কর। এর জন্য নিঃসন্দেহে এঁদের কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, কারণ এঁদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাগুলিতে তখন বাংলা শিক্ষা দেওয়ার তেমন কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। এঁদের হাতেই যে সে যুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্য অনেকখানি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ধর্ম আর শাস্ত্রকেন্দ্রিক যে সাহিত্য তা এঁদেরই দান।

অধঃপতিত আর বিপর্যস্ত জাতি স্বভাবতই হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে থাকে, সে হীনম্মন্যতা দূর করে জাতিকে আত্মসচেতন করে তোলার একটি পরীক্ষিত উপায় হচ্ছে জাতির অতীত গৌরবের সন্ধান করা আর তা তুলে ধরা জাতির সামনে তার বোধগম্য ভাষায়। তার ফলে নিজের অতীত গৌরব সম্বন্ধে তারা যে শুধু সচেতন হয়ে উঠবে তা নয় তেমন গৌরবময় কর্মের একটা প্রেরণাও তারা বোধ করবে মনে মনে, মহত্তর আবেগে তাদের মন হবে তখন আন্দোলিত এ কর্ম-চঞ্চল। এসব নেতারা সে কর্তব্য পালন করেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। এঁদের অতীত ইতিহাস সন্ধান তারই দিগদর্শন।

আর এঁরা সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছিলেন, জাতিকে জাগিয়ে তোলার এক শ্রেষ্ঠতম বাহন হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র এ যুগের এক মোক্ষম হাতিয়ার আর জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ যুগ সত্যটিও এসব আলেম নেতারাই বুঝতে পেরেছিলেন সর্বাগ্রে জাতীয় চেতনা উন্মেষের সে আদি অবস্থায়। নিঃসন্দেহে তাঁদের শক্তি আর সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত ছিল তবুও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এঁরা সংবাদপত্র পরিচালনার মতো গুরুদায়িত্বও নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে দ্বিধা করেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে এঁদের হাতেই আমাদের সাংবাদিকতার সূচনা। এঁরা যে শুধু মাসিক আর সাপ্তাহিক প্রকাশের ঝুঁকি নিয়েছিলেন তা নয়, এমনকি সে যুগে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসও করেছিলেন এঁরাই। সমাজসেবা আর সমাজের ভালো করার উৎসাহে, সমাজ যে তখনো দৈনিক পত্রিকার ভার আর দায়িত্ব বহনের উপযোগী হয়নি সে মোটা সত্যটাও তাঁরা সেদিন ভুলে ছিলেন। যাই হোক, সেদিন এ আলেম নেতৃবৃন্দ যে স্বসমাজ-প্রীতি আর দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তা সত্যই এক স্মরণীয় অধ্যায়।

দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিপন্ন মুসলমানের সেবায়ও এঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন সর্বাগ্রে আর

দেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়হীন এতিম অনাথদের জন্য এঁরাই প্রতিষ্ঠা করেছেন একাধিক এতিমখানা, যার কোন কোনটা আজো রয়েছে চালু। এদেশের অধিকাংশ মানুষ চাষী-মজুর-কৃষক, এদের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামেও অগ্রভূমিকা নিয়েছেন এ আলেমেরাই। সমাজের মৌল ভিত যেখানে ইংরেজি শিক্ষিত নেতৃত্বের বহু আগে এঁদের দৃষ্টি সেখানে সম্প্রসারিত হয়েছিল, এঁরা পাকাপোক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন ভিতটাকে সর্বাগ্রে। আশ্চর্য, অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মতো দুঃস্থ আর নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় এঁরা কখনো নীরব দর্শক হয়ে থাকেননি। সর্বোপরি দেশের আজাদি সংগ্রামেও এঁরাই দিয়েছেন উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব। অকুতোভয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন সব রকম জেল-জুলুম আর অত্যাচার-নির্যাতন।

সংক্ষেপে এসব আলেম নেতা আর কর্মীদের কর্ম আর জাতিসেবার যে দিগন্তরেখা আমরা দেখতে পেলাম তার আলোয় মওলানা মনীরুজ্জুমান ইসলামাবাদীর কর্মজীবনের প্রতি যদি ফিরে তাকানো যায় তাহলে তাঁর অবদানের ব্যাপ্তি আর গুরুত্বের কিছুটা মূল্যায়ন হয়তো সহজ হবে।

ইংরেজি শিক্ষিত আর রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত সরকারমুখী নেতৃত্বের কর্মপরিধি আর দৃষ্টিসীমা ছিল অনেকখানি মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। পক্ষান্তরে আলেম-নেতৃবৃন্দের কর্মসূচি ছিল আরো ব্যাপক ও বহু বিস্তৃত। সমাজের সার্বিক চেতনা আর উন্নতিই ছিল এঁদের কাম্য।

সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব কাজকে রীতিমতো দুঃসাহসিক বলা যায় তেমন বহুতর গঠনমূলক কাজের দায়িত্বও এঁরা নিয়েছিলেন। সমাজ বা জাতি বলতে সর্বসাধারণ জনসমষ্টিকেই বুঝায়, ওরাই দেশের মেরুদণ্ড, সংখ্যায় ওরা প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন। ওদের জাগরণের ওপরই নির্ভর করে সমস্ত দেশ বা জাতির জাগরণ। ইসলামাবাদীদের প্রধানতম কর্মক্ষেত্র ছিল এ জনসাধারণ, জনসাধারণের জীবন আর জীবনের সমস্যা। এ কারণে এঁদের অবদানের মূল্য অনেক বেশি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ব্যাপক।

॥ ৪ ॥

মাদ্রাসা শিক্ষার জনপ্রিয়তা মুসলমান সমাজে বহুকালের। বিশেষ করে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে চরম উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই ছিল তখন এক-আধটা ছেলেকে কোন রকমে আলেম বানানো আর গ্রাম দেশে ঐ করতে পারাকে শুধু যে পুণ্য মনে করা হতো তা নয় অধিকন্তু মনে করা হতো পারিবারিক ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধিরও একটা পন্থা। বিশেষত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী অঞ্চলে এ প্রায় এক বদ্ধমূল সংস্কারে দাঁড়িয়েছিল। মনীরুজ্জমানও ছিলেন চট্টগ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁরও শিক্ষা শুরু হয়েছিল মাদ্রাসায়। পরে হুগলি আর কলকাতার বিখ্যাত আলীয়া মাদ্রাসায়ও তিনি এ ধারাতেই শিক্ষা লাভ করেছেন উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত। পাস করার পর শিক্ষকতাও শুরু করেছিলেন মাদ্রাসায়, নিজ জেলা থেকে অনেক দূরে রংপুরে গিয়ে।

মনীরুজ্জমানের পিতা মুন্সী মতিউল্লাহও ছিলেন শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। সেকালের পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার ওপর গভীর দখল রাখতেন। মনে হয় পিতার কাছেই

শৈশবে মনীরুজ্জমানের বাংলা শেখার গোড়াপত্তন হয়েছিল, পরে অবশ্য নিজের চেষ্টা আর সাধনায় তিনি তাতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আশ্চর্য সে যুগে আলেমরা যে ভাষায় লিখতেন আর যে ভাষায় বক্তৃতা দিতেন তা কোন অর্থেই খিচুড়ি ভাষা ছিল না, তা সর্বতোভাবে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ বাংলা ছিল। কারো কারো ভাষা ছিল পুরোদস্তুর সংস্কৃত-বহুল। রংপুরে শিক্ষকতা করার সময়েই বোধকরি ইসলামাবাদীর দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয় সমাজের সার্বিক দুর্দশার দিকে আর ওখানে থাকতেই সমাজ সচেতনতার বীজ তাঁর মনে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে অঙ্কুরিত আর তখন থেকেই যেন বুঝতে পেরেছিলেন তিনি, আলেমরাই হচ্ছেন মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক নেতা। আলেমদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়-জন্ম-মৃত্যুর অপরিহার্য কর্তব্য সূত্রেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁরা সব সময় থাকেন বাঁধা। তার ওপর রয়েছে অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যার পরিচালক স্বভাবতই আলেম সমাজ।

যে যুগের কথা বলা হচ্ছে, সে যুগে আলেম সমাজ ছিল জনগণের আদর্শ আর একান্তভাবে ভক্তির পাত্র। ধর্মীয় নেতা হিসেবে জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল অসীম। এ আলেম সমাজকে যদি সংঘবদ্ধ করে দেশের ও সমাজের আশু সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করে তোলা যায় তাহলে এঁদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যাবে। মুসলমান সমাজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন আর যে-সব অন্তহীন বাধা-বিপত্তি সমাজকে পঙ্গু আর নির্জীব করে রেখেছে ইচ্ছা করলে এঁরাই তার বন্ধন থেকে সমাজকে দিতে পারবে মুক্তির সন্ধান– কর্ম-জীবনের শুরুতে তরুণ ইসলামাবাদী মূলত এ বিশ্বাসেই হয়েছিলেন উদ্বুদ্ধ। তাই সর্বাগ্রে চাই আলেমদের সংগঠন যাতে আলেমরা একই মঞ্চে এসে সমবেত হতে পারে। ইসলামাবাদী আর তাঁর সহকর্মীদের এ সংকল্প আর পরিকল্পনারই প্রথম বাস্তব রূপায়ণ 'আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাঙালা'। এ সঙ্গে এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও তাঁরা পৌঁছেছিলেন যে তাঁদের যাবতীয় কর্মসূচি আর পরিকল্পনাকে বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের ভিতর দিয়েই রূপ দিতে হবে, এছাড়া জন-চিত্তে প্রবেশ যেমন সহজসাধ্য হবে না তেমনি সহজ হবে না ওদেরে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। এ কারণে এঁরা সংবাদপত্র চালিয়েছেন বাংলায়, সাহিত্য করেছেন বাংলায়, ধর্মের বাণী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন বাংলায়। এমনকি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী নিয়েছিলেন সক্রিয় অংশ। সাহিত্যই সব প্রকাশের বাহন– এ সত্য সম্বন্ধে মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী আর তাঁর সহকর্মীরা গোড়া থেকেই পুরোপুরি সচেতন ছিলেন, শুধু সচেতন নয়, এ বিষয়ে তাঁরা এত স্থির সিদ্ধান্ত ছিলেন যে এ সম্পর্কে তাঁদের মনে পরেও কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। তাই সত্যিকার অর্থে সাহিত্যিক বা সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী না হয়েও তাঁরা তাঁদের সব চিন্তা-ভাবনাকে মাতৃভাষার সাহিত্যের ভিতর দিয়েই রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের পরিচালিত আর সম্পাদিত সব মাসিক সাপ্তাহিক আর দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রধান সুর ধর্মীয় আর জাতি চেতনামূলক বটে কিন্তু ভাষা ছিল বাংলা।

আল-ইসলাম মাসিকের আবির্ভাব বাংলা ১৩২২ তথা ইংরেজি ১৯১৫। পত্রিকাটির অঙ্গে সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছাপা হতো না বটে তবে সবারই জানা ছিল নেপথ্যে থেকে মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদীই যাবতীয় সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করতেন।

বেনামিতে। প্রথম সংখ্যায় আল-ইসলামের আদর্শ আর উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল এভাবে– "ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা উপস্থাপিত সংশয়াদির খণ্ডন, সমাজ সংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাসাদির মূলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনুশীলন ও গবেষণা প্রবৃত্তির স্ফূর্তিসাধন প্রভৃতি 'আল-ইসলামের' প্রধানতম লক্ষ্য ও কর্তব্য।"

বাংলা ভাষার রূপ কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত এ সম্বন্ধেও যেন আল-ইসলামের পরিচালকমণ্ডলী চিন্তা করেছিলেন সেই দূর অতীতে যখন ভাষা নিয়ে কোন বিতর্কেরই সৃষ্টি হয়নি। ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এ সম্বন্ধে তাঁদের এ মন্তব্যটুকুও লক্ষ্য করার মতো "... ... পুঁথি-সাহিত্য ও সংস্কৃতমূলক বাংলা সাহিত্য, এ দুয়ের মাঝখানে হইবে আমাদের মাতৃভাষার স্থান।" ভাষার ব্যাপারে এঁরা যেমন গতানুগতিক ছিলেন না। তেমনি এঁরা প্রশ্রয় দেননি কোন রকম গোঁড়ামিকেও। এ প্রসঙ্গে ইসলামাবাদীর অন্যতম সহকর্মী মওলানা আকরাম খাঁর কথাও স্মরণীয়।

মওলানা মনীরুজ্জমান আর মওলানা আকরম খাঁ কর্মজীবনের গোড়া থেকেই সহকর্মী ছিলেন, একসাথে মিলে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, চালিয়েছেন এক জোটে। আঞ্জুমানে-ওলেমায়-এ বাঙালা, 'আল-ইসলাম' ইসলাম মিশন ইত্যাদি পরিচালিত হতো উভয়ের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। কিন্তু উভয়ের ভাষার প্রকৃতি আর রচনাশৈলী ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আকরম খাঁর ভাষা গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতবহুল, পক্ষান্তরে মনীরুজ্জমানের ভাষা হালকা আর সহজবোধ্য, অনেকখানি ঘরোয়া, বিশেষ করে তাঁর বক্তৃতা আর প্রচারপুস্তিকাগুলির ভাষা। রাজনীতি ক্ষেত্রেও উভয়ে দীর্ঘকাল ধরে সমমতাবলম্বী ও একই পথের পথিক ছিলেন। গোড়া থেকেই উভয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন, জেল-জুলুম ভোগ করেছেন একই সঙ্গে। পরে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তাঁরা হয়ে পড়েন ভিন্ন পথের পথিক। কর্মজীবনের সূচনায় দেশ আর সমাজ হিতার্থে উভয়ে ছিলেন আত্মোৎসর্গিত প্রাণ। তখন যেমন তাঁদের বিশ্বাস ছিল আন্তরিক পরবর্তীকালে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তাঁরা স্ব-স্ব মতাদর্শে ছিলেন অটল, রয়েছেন অটল। একমত না হলেও নিজ নিজ বিশ্বাসে তাঁরা যে আন্তরিক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নীতির ব্যাপারে ইসলামাবাদী জীবনে কোন দিন আপোষ করেননি—ফলে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি জীবনযাপন করতে হয়েছে। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ভোগ করতে হয়েছে আর্থিক অনটন। ইসলামাবাদী যে পথ বেছে নিয়েছিলেন সে পথে সাফল্য বা সমৃদ্ধি ছিল না, ছিল না মোটেও তা জনপ্রিয়। স্বাধীনতার পর মানুষের সামনে, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতা উপনেতাদের সামনে সুযোগ-সুবিধার যে এস্তার দরজা খুলে গিয়েছে, ইসলামাবাদী আর তাঁর অনুগামীরা তাই তা থেকেও বঞ্চিত থেকেছেন। এ কারণে এঁদের জীবনের সূচনা যেমন দারিদ্র্যে, তেমনি সমাপ্তিও ঘটেছে দারিদ্র্যে। সেদিন ক্ষমতা যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা এসব জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতি কিছুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না। শেষ বয়সে রুগ্ন ও শয্যাশায়ী মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদীকে দারুণভাবে অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিন কাটাতে দেখেছি। স্বাধীনতা এঁরা যেভাবে চেয়েছিলেন তার যৌক্তিকতা বা ভালোমন্দের প্রশ্ন এখন অবান্তর তবে দেশের আপামর মুসলিম জনসাধারণকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে এঁরা যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার ইতিহাস কিছুতেই ভুলবার নয়।

'আল-ইসলাম' ছাড়াও ইসলামাবাদী সাপ্তাহিক 'ছোলতান', দৈনিক 'ছোলতান', দৈনিক 'আমীর' পত্রিকাগুলিও পরিচালনা আর সম্পাদনা করেছেন। আর এর প্রতিটির ভূমিকা ছিল মুসলিম জাগরণ, মুসলমানের মনে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করে দেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা। তিনি যেমন সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন তেমনি কর্মী ছিলেন সারা জীবনের জন্যই। সমাজ আর দেশসেবা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করণীয় ছিল না তাঁর, সমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একেবারে নিচের ধাপ থেকে—যেখানে রয়েছে দেশের আর দেশের অর্থনীতির ভিত। তাই একদিকে কৃষক শ্রমিকের উন্নতি যেমন ইসলামাবাদীর কাম্য ছিল তেমনি যেসব অত্যাবশ্যকীয় বৃত্তির প্রতি মুসলমান সমাজের একটা অনীহা ছিল তার প্রতিও চেয়েছেন সমাজকে আগ্রহশীল করে তুলতে। তিনি প্রায়ই বলতেন 'মুসলমানেরা যদি কর্মকার, কুম্ভকার, গোয়ালা, ময়রা, বারুজীবীর ব্যবসায় অবলম্বন করে তাহাও দেশেরই সেবা ; ইহাতে হিন্দুদের অসন্তোষের কোন কারণ নাই' (ডক্টর আবদুর গফুর সিদ্দিকী)। দেশসেবাকে ইসলামাবাদী স্রেফ একটা আন্দোলন আলোচনায় সীমিত করে দেখতেন না। গঠনমূলক সব রকম কাজকে তিনি মনে করতেন দেশসেবা আর তারই অপরিহার্য অঙ্গ। সমাজের মঙ্গল চিন্তাই ছিল ইসলামাবাদীদের ধ্যান-জ্ঞান। এ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়—তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নামের দিকে তাকালে আমরা সহজে বুঝতে পারব তাঁর চিন্তার পরিধি কতখানি ব্যাপক ছিল আর বুঝতে পারব কি সব মানস খোরাকের দ্বারা তিনি চেয়েছিলেন সমাজকে উজ্জীবিত করে তুলতে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁর আরো বহু রচনা আজো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, অনেক রচনা পড়ে আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম : (১) ভারতের মুসলমান সভ্যতা (২) নেজামউদ্দিন আউলিয়া (৩) তুরস্কের সোলতান (৪) ভারতে ইসলাম প্রচার (৫) মুসলমানদের অভ্যুত্থান (৬) সমাজ সংস্কার (৭) খগোলশাস্ত্রে মুসলমান (৮) ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমান (৯) কনস্টানটিনোপোল (১০) আওরঙ্গজেব (১১) মোসলেম বীরাঙ্গনা (১২) কোরানের স্বাধীনতার বাণী (১৩) ইসলামের উপদেশ (১৪) ইসলামের পুণ্যকথা প্রভৃতি। এর কোন কোনটি আকারে ক্ষুদ্র, সাধারণ প্রচার পুস্তিকার উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত। ভারতের মুসলমান সভ্যতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটির দ্বিতীয় খণ্ড লেখারও তাঁর বাসনা ছিল কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবনে তার আর হয়ে ওঠেনি। মওলানা মনীরুজ্জামান আর তাঁর সহকর্মীদের জীবনের যা সব সাধ ছিল যার জন্য তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিকেও কিছুমাত্র আমল দেননি, ভূমিকায় যার আভাস দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে তাঁর রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ঐ সবের পুরোপুরি সংগতি রয়েছে।

কিন্তু তাঁদের যত সাধ ছিল তত সাধ্য ছিল না অথবা সমাজ তখনো তাঁদের সব সাধ স্বপ্নের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। মনীরুজ্জমান সারা জীবনই সমাজের সম্বন্ধে ভেবেছেন, চিন্তা করেছেন, স্বপ্নের বীজ বপন করতে চেয়েছেন বহুক্ষেত্রে। মাটি অনুকূল ছিল না বলে হয়তো এসব বীজের অনেকগুলিই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। [illegible]

বাহার একবার লিখেছিলেন, সমাজের কথা ভেবে—"মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী সারা জীবন কেঁদেছেন পাগলের মতো, কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ? মুসলমান লেখাপড়া শিখছে না, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আসছে না, খবরি কাগজ পড়ছে না। আসছে না রাজনীতি চর্চায়, উত্তর ভারতে যেমন স্যার সৈয়দ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজ করেছেন বাঙালায় তেমনি কাজ করবার চেষ্টা করেছেন ইসলামাবাদী। সাফল্য হয়তো আসেনি নানা কারণে কিন্তু তিল তিল করে বিলিয়েছেন তিনি নিজেকে।" (দৈনিক ইনসাফ, ১৭ কার্তিক, ১৩৫৭), আমার বিশ্বাস এসব কথা কিছুমাত্র অতিভাষণ নয়।

এতকাল দেশের বৃহত্তর পরিধিতে কাজ করে এসেছেন তিনি, শেষ বয়সে হঠাৎ যেন মনে হলো আমি নিজের জন্মস্থান স্বগ্রামের জন্য, ওখানকার দরিদ্র জনসাধারণের জন্য তো কিছুই করিনি। আগে খেশবাদ দরবেশ—এতকাল এ কথাটাই যেন ভুলে ছিলেন। লাহোর সেন্ট্রাল জেলের নিভৃত কক্ষে বন্দি অবস্থায় জন্মভূমির চেহারা যেন তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছিল। তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর—সময় ১৯৪৫, মনে মনে যে সংকল্প নিয়েছিলেন সেদিন তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন গদ্যে নয়, পদ্যে। নির্জন মুহূর্তে মানুষের মনে কবিতাই বুঝি উঁকি মারতে চায়। তিনি লিখেছেন :

ষাটের ওপর আরো দশ বছর
বৃথায় কেটেছে জীবন আমার।
দেশ-দেশান্তরে ভ্রমি সমাজ সেবায়
রাজনীতি, সমাজনীতি সাহিত্য চর্চায়।
ধর্মপ্রচারের কাজে বিস্তারে শিক্ষায়,
এসব কাজেতে মোর কেটেছ সময়।
কিন্তু হায়! জন্মস্থান নিজ বাসভূমে
সাধু কার্য করি নাই নিজ পল্লীধামে।
সংকল্প করিয়াছি জীবন সন্ধ্যায়,
জীবনের অবসান করিব এথায়।
কোরানের শিক্ষা দিব জনসাধারণে,
আধ্যাত্মিক দীক্ষা মন্ত্র দিব জনগণে।
দেশ-দেশান্তরবাসী রুগ্ন লোকজন
খোদার ফজলে হবে রোগ পরিত্রাণ।

বুজে আসা পুকুরের পঙ্ক উদ্ধার করে চারদিকে ঘাট বাঁধিয়ে দেবেন, স্কুল মাদ্রাসার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠা করবেন পাঠাগার, হাসপাতাল ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। আরো কত কিছু প্রতিষ্ঠার যে কল্পনা করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। সে সবের সঙ্গে সঙ্গে :

দেয়াঙ্গ পাহাড়ে উচ্চ বিস্তৃত চূড়ায়,
স্থাপিত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনি নিজে দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিলেন। কিন্তু আল্লায় বিশ্বাস ছিল অটুট। বহু ব্যর্থতায়ও

এ বিশ্বাসে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা দেয়নি তাই এ প্রসঙ্গে বিনা দ্বিধায় বলেছেন :

এসকল কাজে হবে লক্ষ লক্ষ ব্যয়,
আল্লার ভাণ্ডার তাতে হইবে না ক্ষয়।

এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলবর্তী দেয়াঙ্গ পাহাড়ে কয়েকশ একর জমি তিনি বন্দোবস্তি নিয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল ওখানে তাঁর দীর্ঘকালের পরিকল্পিত আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। তাঁর এ স্বপ্ন আজো স্বপ্নই রয়ে গেছে।

মুসলমান সমাজের এক দারুণ বিপর্যয়ের দিনে মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদীর আবির্ভাব। সে বিপর্যয়ের শোচনীয় দশা থেকে সমাজকে উদ্ধার করার সংকল্প নিয়েই তিনি আর তাঁর সহকর্মীরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তাঁদের সংকল্পে কিছুমাত্র আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সে দিন সমাজসেবার উদগ্র বাসনায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা মোটেও তাঁরা ভাবনায় আনেননি। সমাজ উন্নত হোক, সমৃদ্ধ হোক জীবন এ শুধু তাঁরা চেয়েছিলেন। ইসলামাবাদী সে যুগের এক খ্যাতনামা আলেম ছিলেন কিন্তু কোন ব্যাপারেই তিনি গোঁড়া কিংবা ধর্মান্ধ ছিলেন না, নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে ও বুঝতে হলে অন্য ধর্মের সঙ্গেও পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এভাবে তুলনামূলক বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য তিনি আলেমদের—বেদ-বেদান্ত বাইবেল জেন্দাবেস্তা, ধম্মপদ ইত্যাদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গ্রন্থ অধ্যয়নেরও উপদেশ দিয়েছিলেন। সে যুগে ব্যাঙ্কের সুদ আদান-প্রদানকে জায়েজ বা ধর্মবিরুদ্ধ নয় বলে ঘোষণা করে তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তারও কোন তুলনা নেই। আজ ব্যাঙ্কের মারফত সুদ আদান-প্রদান নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার তবুও প্রকাশ্যে কোন আলেম তা জায়েজ একথা ঘোষণা করতে সাহস করবেন কিনা সন্দেহ।

॥ ৬ ॥

এক সহজাত দুঃসাহসের অধিকারী ছিলেন মনীরুজ্জমান যার ফলে অতসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় তিনি হাত দিয়েছিলেন। হাত দিয়েছিলেন অনেকগুলি সংবাদপত্র পরিচালনায়, স্বপ্ন দেখেছেন আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। বলাবাহুল্য তাঁর বহুপরিকল্পনাই তাঁর জীবদ্দশায় যেমন তেমনি আজো অসমাপ্তই রয়ে গেছে। তাঁর বহু স্বপ্নই রয়ে গেছে এখনো আকাশকুসুম হয়ে। যুগের প্রয়োজন আর গতিধারা তিনি বুঝতেন, তাই নিজের সব পরিকল্পনাকে সেভাবেই চেয়েছিলেন রূপ দিতে। চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজকে সব দিকে জীবনে সংগ্রামের উপযোগী করে তুলতে। তিনি নিজেও খয়রাতী আলেম ছিলেন না অন্য আলেমদেরও তা করতে চাননি। আলেমরাও স্বাধীন আর স্বাবলম্বী হোক এই তিনি চেয়েছিলেন সর্বান্তকরণে। তাঁর সব পরিকল্পনার গুরুত্ব এদিক থেকেও বিবেচ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এতিমখানা, শুধু এতিমদের আশ্রয় কেন্দ্র নয়, সেখানে কেতাবি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার শিক্ষার্থীদেরও আধুনিক জীবনযুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

শেষ বয়সে দুরারোগ্য অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইসলামাবাদী সাহেব জীবনের বাকি সময়টুকু নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। মনে হয় এইটিই ছিল তাঁর

জীবনের সবচেয়ে দুঃসহকাল। কারণ কর্মীর জন্য কর্ম করতে না পারার চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না। সে বেদনা নিয়ে আর জীবনের বহু স্বপ্নসাধ অসমাপ্ত রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৫০-র ২৪ অক্টোবর। তাঁর নিজের সমাধিফলকের জন্য তিনি নিজেই দু'চরণ পার্সি কবিতা আর তার নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ রেখে গেছেন। তা উদ্ধৃত করেই আমরা এ অসাধারণ সমাজকর্মীর স্মৃতিচারণ এখানে শেষ করলাম।

পথিক; ক্ষণেকের তরে বস মোর শিরে,
'ফাতেহা' পড়িয়া যাও নিজ নিজ ঘরে।
যে জন আসিবে মোর সমাধি পাশে,
'ফাতেহা' পড়ে যাবে, মম মুক্তির আশে।
অধম মনীরুজ্জমান নাম আমার,
ইসলামাবাদী বলে সর্বত্র প্রচার।

১৯৬৭

সমাজ ও সাহিত্য

সব লেখক আর শিল্পীরই একটা ব্যক্তিগত অহংবোধ আছে, ইংরেজিতে যাকে Ego বলা হয়। সীমিত অর্থে আত্মোপলব্ধির জন্য এর যে প্রয়োজন একেবারে নেই তা নয় কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের লক্ষ্য আর আদর্শ ব্যাপক এবং বৃহত্তর সমাজ-মানস বলে—রচনার ক্ষেত্রে উগ্র অহং-চেতনা এক প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এমন লেখকের কণ্ঠ বহু মানুষের কানে পৌছার কথা নয়। আর সীমিত পাঠক নিয়ে, এমনকি তারা 'নির্বাচিত উচ্চগ্রামের বুদ্ধিজীবী' হলেও, কোন সত্যিকার লেখক সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। বহু মানুষের 'চোখের ভিতর দিয়ে মরমে' পৌছার সাধনাই তাঁর সাধনা। বিশেষত এ যুগে ব্যক্তি-মনের সমস্যা অনেকখানি তুচ্ছ, আজ লেখকদের সামনে সমাজ তথা বহু মানুষের সমষ্টিগত সমস্যাই বড় হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কোন সচেতন দায়িত্বশীল সৎ শিল্পীর পক্ষেই এ সবের প্রতি চোখ-কান বন্ধ করে থাকা আজ কিছুতেই সম্ভব নয়।

সমাজ বিবর্তনের বিচিত্র ইতিহাসের দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় কবি বা লেখকরা যে 'সমাজের অস্বীকৃত বিধান-রচয়িতা', শেলির এ কথাটা আজো সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। তবে তাঁরা যে আজ 'অস্বীকৃত' তাতে হয়তো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও তাঁদের সামাজিক দিগদর্শনের যে ভূমিকা তা থেকে যায়—মনে হয় চিরকাল থাকবে। কারণ ভবিষ্যৎ-সমাজের স্বপ্ন-ছবি দেখার সাহস যদি কারো থাকে তা আছে একমাত্র কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের। নবী আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে, এখন নবীদের সামাজিক কর্তব্য এসে বর্তেছে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর। তাই নবীদের মতো তাঁদেরও থাকতে হয় চির-সচেতন আর দায়িত্বশীল। এক হিসেবে নবীদের চেয়ে লেখকদের সামাজিক দায়িত্ব অনেক গুণ বেড়ে গেছে, কারণ নবীদের আমলে সমাজ ছিল গণ্ডিবদ্ধ, ঐ সমাজের কর্মকাণ্ড আর ক্রিয়াকলাপ ছিল অত্যন্ত সীমিত। এখন সমাজ হয়ে পড়েছে অসম্ভব জটিল, তার ক্রিয়াকাণ্ডেরও দিগন্ত গেছে অবিশ্বাস্য রকমে বেড়ে। সে অনুপাতে লেখকদের দায়িত্ব-সীমাও না বেড়ে পারে না। এ কারণে Laissez faire—নীতি এখন সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও অচল। ভবিষ্যতে কেমনতরো সমাজ আমরা চাই, কি ধরনের সমাজ আমাদের কাম্য তার ছবি লেখকরা যদি না দেখেন, না আঁকেন তাহলে যা আছে তাই থেকে যাবে, মানুষ তাকেই মেনে নেবে অদৃষ্ট কিংবা নিয়তির দোহাই দিয়ে—বিধির বিধান মনে করে। দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ মনে হলে মেথরের জীবনও মেথরের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠত। সুরভিত জীবনের কোন ছবি তার কল্পনায় জাগে না বলেই অভ্যাসের গোলাম হয়ে পড়তে তার বাধে না। জীবনের সব ব্যাপারেই একথা সত্য—'অভ্যাসের দাস' কথাটা কিছুমাত্র অর্থহীন নয়। সুরভিত তথা ভবিষ্যতের প্রার্থীত সমাজের ছবি দেখা ও আঁকার দায়িত্ব লেখক আর কবি-শিল্পীদের। স্মরণীয় : "Every great social upheaval of modern times has developed out of a background of intellectual causes. Before a movement can reach the proportion of an actual revolution, it is necessary that it be supported by a body of

ideas, providing not only a program of action but a glorious vision of the new order that is finally to be achieved." (World Civilization by E. M. Burns & P.L. Ralph p. 249).

ভবিষ্যৎ সমাজের উজ্জ্বল ভাব-রূপ ছাড়া সে সমাজে পৌছানো আমাদের পক্ষেও সম্ভব হবে না। আমরা এখন অহরহ সমাজ-প্রগতির কথা বলে থাকি। কিন্তু প্রগতি কথাটাও তো আপেক্ষিক, বহু বিষয়ের সঙ্গে তা যুক্ত, নিরপেক্ষ একক বিমূর্ত কিছু একটা নয় ওটা। সমাজ-প্রগতি বললে তাই সর্বাগ্রে সমাজ সম্বন্ধে অর্থাৎ বর্তমানে আমরা কোন সমাজে বাস করছি, তার চেহারা স্বরূপ কি এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা যেমন অত্যাবশ্যক প্রগতি সম্বন্ধেও তেমনি সুস্পষ্ট চেতনা ও উপলব্ধি অপরিহার্য। সব দেশ ও সব সমাজের জন্য প্রগতির একই অর্থ হতে পারে না—দেশ আর সমাজভেদে প্রগতির অর্থও ভিন্নতর হবেই। কারণ তাবৎ সমাজ এক স্তরে বিরাজ করছে না। আমাদের বর্তমান স্তর থেকেই আমাদের যাত্রা হবে শুরু। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ছেড়ে বা বদলে যে সমাজে উত্তরণ আমাদের কাম্য তার চেহারা আর স্বরূপ আমাদের পরিষ্কার জানা দরকার, তাহলেই সাহিত্য-শিল্পে তার রূপায়ণ হবে সহজ, যে রূপায়ণের বাস্তবধর্মিতা তথা বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের সব রকম সামাজিক অগ্রগতি।

প্রগতি মানেইবা কি? কোন কিছুই তো স্থির হয়ে নেই, সব কিছুরই অবস্থান্তর ঘটছে, সব কিছুই এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। আমাদের সমাজের অবস্থাও তাই। প্রগতি বা আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা না থাকলে, অগ্রগতি পশ্চাৎমুখিনতাও হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন আমাদের কেউ কেউ একালেও বলে থাকেন হেরা পাহাড়ের গুহা বা নয়া মদীনা গড়া বা তার আদর্শানুসরণই হবে আমাদের প্রগতি বা অগ্রগতির লক্ষ্য! চিন্তা করে না লেখার বা চিন্তা করে কথা না-বলার এ এক দৃষ্টান্ত। না হয় স্বভাবতই মনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে—এ কি কখনো সম্ভব? মাঝখানে যে দেড় হাজার বছর পার হয়ে গেছে তা ভুলে বসলে চলবে কেন? এ দেড় হাজার বছর তো ইতিহাস থমকে নেই, প্রতিদিনই পাতা উলটিয়েছে এবং মানুষ বা মানুষের সমাজও থাকেনি বসে বা স্থির হয়ে। প্লেটো এরিস্টটলের যুগ যতই গৌরবোজ্জ্বল হোক গ্রিসের পক্ষে যেমন সে যুগে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় তেমনি ইংল্যাণ্ডের পক্ষেও সম্ভব নয় এলিজাবেথীয় স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তন করা। এমনকি সেসব যুগের আদর্শের বাস্তবায়নও সম্ভব নয় এখন কিছুতেই। কারণ কালের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও বদল ঘটেছে, ঘটেছে জীবনের চাহিদা, তাগিদ আর প্রয়োজনেরও।

এখন কোন নবী এলে তিনিও এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই কথা বলতেন। অতীত যুগের নবীরাও তাই করেছেন। কেউই নিজের যুগ আর যুগ জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে যাননি— চাননি এড়িয়ে যেতে। আমাদের তথা মুসলমানদের এ দেড় হাজার বছরের ইতিহাসেও কত রদবদল ঘটেছে, কত নতুন এসে যোগ হয়েছে আর কত পুরাতন হয়েছে পরিত্যক্ত। সব কিছুরই একটা পরিবেশ, পরিবেশের তাগিদ আর চাহিদা থাকে, সেটা ফুরিয়ে গেলে তার চেহারা যায় বদলে। তাই খাস আরব দেশেও খোলাফায়ে-রাশেদীনের জীবনাদর্শ বা জীবনের মূল্যবোধ এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা খলিফাদের বংশধর হয়েও যদি

পূর্বপুরুষের পদাঙ্কানুসরণ তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে এত দূরে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের পক্ষে তা করা আরো বেশি অসম্ভব হওয়ারই তো কথা। একদিন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাও সাহেব হতে চেয়েছিল, কিন্তু হয়েছিল নকল সাহেব তথা ফিরিঙ্গি। তাতে তাদেরও কোন লাভ হয়নি, যে দেশে তারা জন্মেছে সে দেশেরও হয়নি কোন ফায়দা। মন, মনন আর সংস্কৃতির দিক থেকে তারা আজো বাস্তুহারা, আশ্রয়চ্যুত ও পরগাছা।

অতীতের সব ভালো আজো নীতিগতভাবে ভালো থাকতে পারে কিন্তু জীবনে তা গ্রহণ-প্রয়োগ যদি অসম্ভব হয় তাহলে কথা আর কাজে গোঁজামিল দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মনকে চোখ-ঠারানোই তখন বড় হয়ে ওঠে। যা আমাদের কেউ কেউ এখন করে চলেছেন। বলাবাহুল্য সামাজিক অগ্রগতির পথ এ নয়।

এক সময় ভারতে রাম-রাজ্যের কথা খুব সোচ্চার ছিল। কিন্তু রামরাজ্য সম্বন্ধে কারো মনে কোনরকম সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না সে যুগে যেমন এ যুগেও তেমনি নেই। রাম-লক্ষণ বা সীতার আদর্শ এখন কেউ অনুসরণ করবে তা ভাবাই যায় না। করতে চাইলেও করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে সব আদর্শের বাস্তবায়ন ছাড়া রাম-রাজ্য হয় কি করে?

এ সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আর চারিত্রিক বিপর্যয়ের যুগেও সত্যিকার পিতৃভক্ত সন্তানের অভাব হয়তো নেই কিন্তু তাই বলে পিতৃ-আদেশে কেউ-ই এখন চৌদ্দ বছরের জন্য বন-বাস কবুল করবে তা ভাবা যায় না। লক্ষণের মতো এমন কামনা-বাসনাহীন নিরীহ গোবেচারী ভাই বা দেবরওবা মিলবে কোথায় এখন? সতীত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য কোন্ মেয়েটাইবা এখন পাতালে ঢুকতে হবে রাজি? এখনকার মেয়ে কি সোজা মুখের ওপর বলে বসবে না—'তোমার সন্দেহ হয় ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখো?' হয়তো একমাত্র প্রচুর সংখ্যক মন্থরার দেখা মিললেও মিলতে পারে এ যুগে। শুধু মন্থরাকে নিয়ে যে রাম-রাজ্য তা কোন সৎমানুষেরই কাম্য হওয়ার কথা নয়!

কাজেই রাম-রাজ্য, রহিম-রাজ্য এ স্রেফ কথার ফুলঝুরি ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নয়—বাস্তব-চেতনা আর বাস্তব-জীবনের মুখোমুখি হতে না চাওয়ারই এক রকমের ফন্দি। বলাবাহুল্য এমন রোমান্টিকতার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন সাহিত্য-শিল্পকে বাস্তবধর্মী না হয়ে উপায় নেই। কারণ জীবন জিনিসটা এত প্রত্যক্ষ ও এত কঠিন বাস্তব যে সাহিত্য-শিল্পকে তার উপযোগী হতে হলে রাম-রাজ্য, রহিম-রাজ্যের আকাশ প্রদীপ থেকে চোখ ফেরাতেই হবে শিল্পীদের। তাকাতে হবে পায়ের নিচের মাটির দিকে। তাহলেই রচনা হতে পারবে সমাজ-প্রগতির বাহন। কারণ পায়ের নিচের কঠিন মাটি ভেঙ্গে ভেঙ্গেই ব্যক্তিকে যেমন তেমনই সমাজকেও এগুতে হয় সামনের দিকে। শিল্প-সাহিত্যের বাস্তবকে শুধু ব্যবহারিক অর্থে নিলে ভুল করা হবে। শিল্পের বাস্তব একই সঙ্গে ব্যবহারিক আর মানসিকও। সার্থক শিল্প-কর্মের জন্য এ বোধ অপরিহার্য।

মানুষের দুই সত্তা— জৈবিক আর আত্মিক। শিল্প-সাহিত্য তথা সংস্কৃতি চর্চা মানুষের এই দুই সত্তার সঙ্গেই জড়িত, তাতে এ দুয়েরই প্রকাশ আর বিকাশ ঘটে। আবার কালের গতিধারার সঙ্গেও এ দুই সত্তার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা, মনের

বাসনা-কামনা আর অভীপ্সা-অন্বেষা কালের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই আবর্তিত হচ্ছে। এ অবস্থায় জীবনের মূল্যবোধেরও রূপান্তর না ঘটে পারে না আর শিল্প-সাহিত্যে তার প্রতিফলনও অনিবার্য।

শিল্প-সাহিত্য একদিকে যেমন বর্তমানের দাবি মানুষের সামনে তুলে ধরে তেমনি অন্যদিকে তুলে ধরে আগামী দিনের মহত্তর সম্ভাবনার ছবিও। এর ফলে সমাজে আসে সচেতনতা—সমাজ তখন বোধ করে প্রগতির পথে পা বাড়াবার প্রেরণা অর্থাৎ সমৃদ্ধতর, সুন্দরতর ও সুস্থতর সমাজ গঠনের তাগিদ।

সংস্কৃতি চর্চা মানে নিজের মনকে মার্জিত করে তোলা, অনুভব-অনুভূতি, আবেগ-প্রেরণাকে সতেজ আর তীক্ষ্ণ রাখা, মূল্যবোধকে জীবনের সামগ্রী করে নেওয়া। সজীব মন ছাড়া সংস্কৃতি চর্চা হতেই পারে না। একমাত্র শিল্প-সাহিত্যই মনকে সজীব রাখে, সজীব করে তোলে, জুগিয়ে থাকে জীবনকে মহত্তর করে গড়ার এষণা—ব্যক্তিগত আর সমষ্টিগত দুই ক্ষেত্রেই। সাহিত্য মানে সহযোগিতা, জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ। এ বোধই সমাজের মূল বুনিয়াদ—কোন রকম সামাজিক প্রগতিও এ বোধ ছাড়া সম্ভব নয়।

শিল্প-সাহিত্য আর সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া জীবন কখনো অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না—কারণ ঐ ছাড়া জীবনের ধারণা আর উপলব্ধিই থেকে যায় অসম্পূর্ণ ও অলব্ধ। জীবন যে স্রেফ জৈবিক নয় এ বোধ একমাত্র শিল্প-সাহিত্যই সঞ্চারিত করে দেয় আমাদের মনে। কাজেই সমাজ-প্রগতি আর শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পরের সহযোগী ও একে অন্যের পরিপূরক। তবে এসবের যথাযথ ভূমিকা বোঝার জন্য এর প্রত্যেকটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ যেমন বুঝতে পারা যাবে না তেমনি পারা যাবে না সাহিত্যিক-শিল্পীদের যথার্থ ভূমিকা কি তাও।

বই দেখে দেখে সভা-সমিতিতে কবিতা পড়া আর খাতা দেখে দেখে কিছু গান করা বা রীতি রক্ষার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে ধার করা কিছু নাটক-নাটিকা অভিনয় করা সংস্কৃতি চর্চা নয়। সংস্কৃতি কখনো জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়—জীবনের গভীর সত্তা আর ব্যক্তি-চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। সংস্কৃতি বাহ্যিক প্রসাধনী নয়—সংস্কৃতির উৎস-মূল অন্তরে। মানুষের অন্তরকে জাগায় এবং জাগিয়ে রাখে শিল্প-সাহিত্য। তাই শিল্প-সাহিত্য ছাড়া কোন রকম সাংস্কৃতিক-জীবন কল্পনাই করা যায় না। যে সমাজে সংস্কৃতি চর্চা ব্যাপক আর গভীর রূপ নেয় সে সমাজ কখনো স্থানু বা অচল হয়ে পড়ে না, পারে না থাকতে অচল হয়ে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, বিচারবিমুখিনতা—এসব যে শুধু সাংস্কৃতিক জীবনের পরম শত্রু তা নয়, এসব সমাজ-প্রগতিরও প্রবল অন্তরায়। শিল্প-সাহিত্য এমন এক দু'ধারী অদৃশ্য অস্ত্র যে, অলক্ষ্যে সমাজ-জীবনের এসব জঞ্জাল কেটে কেটে তা রচনা করে চলে প্রগতির পথ।

অনেক সময় সমাজ নেতা আর শাসকরা সাহিত্য-শিল্পের এ ভূমিকা বুঝতে পারে না, তাই শিল্প-সাহিত্যকে তারা কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে। তেমন অবস্থায় শিল্প-সাহিত্য হয় বিপদের সম্মুখীন। শিল্প-সাহিত্য মানুষের অনুভব-অনুভূতি, আবেগ-এষণা ও সাধ-স্বপ্নেরই বহিঃপ্রকাশ আর এসব নিয়েই তো মানুষের মনুষ্যত্ব। এসব ছাড়া মানুষ মানুষই হতে পারে না, পারে না মানুষ থাকতে। বলাবাহুল্য অবয়ব কখনো মানুষের যথার্থ পরিচয়

নয়। তাই প্রবল বাধার মুখেও নবীদের মতো সাহিত্যিক-শিল্পীদেরও সাহিত্যশিল্পের বীজ বপন করেই যেতে হয়, তৈয়ারি করতে হয় মানুষের মন তথা মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্র—বাধা বিঘ্নসঙ্কুল অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য জোগাতে হয় সংগ্রামের প্রেরণা। সংগ্রামের ঐতিহ্য ও সভ্যতা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক মহান ঐতিহ্য। একমাত্র শিল্প-সাহিত্যই তেমন ঐতিহ্য রচনায় সক্ষম। সব রকম বিপ্লবের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। আমাদের সমাজ-প্রগতিও একমাত্র এ পথেই সম্ভব। জীবন উন্নয়নের যা কিছু উপকরণ, জীবন মানে বাহির ও অন্তরঙ্গ দুই-ই—তা সবই আমাদের সাহিত্য-শিল্পের বিষয়ীভূত হবে। সে সব উপকরণের উৎস আরবে-পারস্যে, ইউরোপ-আমেরিকায়, এশিয়া, আফ্রিকায়, সোভিয়েত রাশিয়া কি মহাচিন যেখানেই হোক। অর্থাৎ তাবৎ বিশ্বই এখন সাহিত্য-শিল্পের পটভূমি।

জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

জাতি স্থায়ী বা চিরকালের, কিন্তু সরকার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। সরকারের রদবদল হার-হামেশাই ঘটে, ঘটা উচিত—তা না হলে কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে পুরোপুরি। আর সব রকম গণতন্ত্রেরও এ এক অপরিহার্য শর্ত। সরকারের রদবদল সাধনের সুযোগ-সুবিধা অস্বীকৃত হলে তাকে কিছুতেই গণতন্ত্র নামে অভিহিত করা যায় না। কিন্তু দেশ আর জাতি অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য—কোন অভাবিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দেশের চিহ্ন মুছে না গেলে সে দেশের মাটিকে অবলম্বন করে যে জাতি গড়ে ওঠে তার মৃত্যু নেই, তার অস্তিত্ব চিরজীবী হয়ে থাকবে, হারিয়ে যাবে না কখনো ইতিহাসের পাতা থেকে। ইতিহাসের এক একটা ধাপ অতিক্রম করেই জাতি খুঁজে পায় নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। এসব আয়ত্ত হয় বহু মানুষের সাধনা আর অবদানেই। জাতির এ পথযাত্রায় কত সরকারেরই ঘটে উত্থান-পতন, কত নেতা, উপনেতা যায় হারিয়ে। কেউ কেউ স্বাভাবিক মৃত্যুর পথে কেউ কেউ প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে পর্যুদস্ত হয়ে। তবুও এরাও যে জাতির সেবা করেছেন, জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ও অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন—কেউ কেউ তার জন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা আজ নেই বলে বা অতীত হয়ে গেছেন বলে এঁদের ভুলে যাওয়া বা এঁদের স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো শুধু যে অকৃতজ্ঞতা তা নয়—তা আত্মবিস্মৃতিরও এক লক্ষণ। আত্মবিস্মৃতি নিয়ে আসে জাতীয় আত্মমর্যাদাহীনতা। রাশিয়ান কবি য়াকুব কোলাস বলেছেন : 'Respect for the dead is self-respect'. আমরা এবং আমাদের সরকার যেন এ মহৎ সত্যটা ভুলে যাচ্ছে দিন দিন—চেষ্টা করছে ভুলে যেতে। ফলে আমরা হারাচ্ছি জাতীয় আত্মমর্যাদা। হারাচ্ছি সার্বিক ও সামগ্রিক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি। হয়ে যাচ্ছি সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন আর অতিমাত্রায় দলগত মানুষ। দলের বাইরে বৃহত্তর দেশ জাতি আর জাতির ইতিহাস সবই যেন হয়ে যাচ্ছে আজ তুচ্ছ—সরকার আর সরকারি দলই যেন সব, আর সর্বস্ব। এ খণ্ডিত দৃষ্টির ফলে জাতি হিসেবে আমরা হয়ে পড়ছি ছোট ও দুর্বল। উদার জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আজ আমাদের রাষ্ট্রনীতি থেকেও নির্বাসিত। আমি আর আমার দল, দলও নয় দলের ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি মানুষ দেশ আর জাতি থেকেও হয়ে উঠেছে বড়। দেশের সামনে এ কল্প-মূর্তিটাই তুলে ধরার চেষ্টা চলছে অবিরাম। পাক-ভারতে আমরা মুসলমানরা ছিলাম একটা সম্প্রদায়—এখন আমরা হয়েছি একটা জাতি, পেয়েছি জাতিগত মর্যাদা। আমাদের এ জাতীয় সত্তা আর স্বাধীন জাতিগত অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্ব আর ভূমিকা ছিল সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমভাবে সত্য যে, অগণিত নেতা আর অসংখ্য কর্মী তাঁর পেছনে এসে না দাঁড়ালে এ অসাধ্য সাধন তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না কিছুতেই। প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায় অসংখ্য কর্মী বহু সাধনায় ও বহু ত্যাগ স্বীকার করে সেদিন মুসলিম জনমতকে পাকিস্তানের অনুকূলে সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছিল বলেই পাকিস্তান হাসিল ত্বরান্বিত হয়েছিল। এসব আজ ইতিহাসের বিষয়।

একটা নতুন রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থায় তাকে গড়ে তুলতে, রাষ্ট্রের অবয়ব দিতে তখনকার নেতা আর কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে—বর্জন করতে হয়েছে জীবনের সব আরাম-আয়েশ। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রতিদিনই করতে হয়েছে এঁদেরে সংগ্রাম। একরকম কিছু না থেকেই সম্পূর্ণ নতুন একটা রাষ্ট্র দাঁড় করানো, একটা দৃশ্যমান অবয়ব দিয়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়। বলাবাহুল্য এ দুঃসাধ্য সাধন একা কায়েদে আজম বা লিয়াকত আলী সাহেবের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বহু বিশ্বস্ত সহকর্মীর নির্ভেজাল সহায়তা না পেলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আর তার প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে আমাদের রাষ্ট্রতরিকে সময়-স্রোতে ভাসমান ও গতিশীল রাখাই সম্ভব হতো না। আজ তাঁরা যেমন নেই তেমনি তাঁদের সে সহকর্মীদেরও অনেকে গতায়ু। এসব গতায়ু নেতা আর কর্মীদের কেউ কোন ভুল করেননি বা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার কোন রকম পরিচয় দেননি, তা বলা যায় না। তাঁরাও আজকের দিনের রাষ্ট্র পরিচালকদের মতোই মানুষ ছিলেন—এঁরা যেমন ভুল করছেন, কেউ কেউ চরম স্বার্থপরতার পরিচয় দিচ্ছেন, অতীতের তাঁরাও হয়তো সবাই এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। তবুও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আর সংগ্রামে তাঁদের অবদান এঁদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আর সে প্রাথমিক স্তরের দুর্যোগময় দিনে এঁরা রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রনীতিকে সুস্থির আর সুপ্রতিষ্ঠা করতে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা বিস্মৃত হওয়ার মতো নয়। বিস্মৃত হলে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসকেই বিস্মৃত হতে হয়। আমার বিশ্বাস এটা জাতির জন্য কিছুমাত্র সুস্থ লক্ষণ নয়। আবারও য়াকুব কোলার কথাটা স্মরণে জাগে : Respect for the dead is selfrespect। আমরাও যেন দিন দিন আত্মমর্যাদা হারাচ্ছি—সরকারের বর্তমান নীতিই তার জন্য অনেকখানি দায়ী। মনে হয় এ সরকার নিজেকে ছাড়া আর কাকেও স্বীকার করে না—আত্মপ্রশংসা ছাড়া অন্যের প্রশংসা বা গুণ স্বীকারের পাঠ তাঁরা যেন কখনো শেখেননি এবং দেশকেও শেখাতে রাজি নন। নেহাৎ যাদের নাম না করলে নয় বা যাঁরা তাঁরা ক্ষমতায় আসার বহু আগেই গতায়ু হয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে ছাড়া অন্যের ব্যাপারে মামুলি রেওয়াজ রক্ষার ভদ্রতাটুকু পালন করতেও তাঁরা নারাজ। একটা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন সংকীর্ণ মনোভাব সত্যই পরিতাপের বিষয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অস্বাভাবিক বা অসাধারণ কিছু নয়। গণতান্ত্রিক দেশে এ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা—তাই বলে প্রতিদ্বন্দ্বীর গুণ আর অবদানকে ভুলে যাওয়ার বা ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা, অন্য দেশে বিরল বল্লেই চলে। গত কয়েক বছরে অর্থাৎ এ শাসন-ব্যবস্থার আমলেই পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য জননেতা গতায়ু হয়েছেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমউদ্দীন—এ তিনজন সারা পাকিস্তানেই স্মরণীয় ব্যক্তি। মুসলিম রাজনীতি ও পাকিস্তান আন্দোলনে আর পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও শাসন-ব্যবস্থায় এঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এঁরা সব সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত হতে পারেননি—অনেক সময় সুরে সুর মিলাননি শাসন কর্তাদের সাথে। ফলে বিভিন্ন সময়ে এঁরা সরকারের বিরাগভাজনও হয়েছেন। কিন্তু জাতির ইতিহাসে বিভিন্ন সংকট মুহূর্তে এঁরা যে ভূমিকা পালন করেছেন—জাতিকে জাতি গড়ে তোলার ব্যাপারে, আর আমাদের নতুন রাষ্ট্র একটা সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় অবয়ব দেওয়ার বেলায়

াদের যে অবদান তা স্মরণযোগ্য বলেই আমার বিশ্বাস। কম বেশি এ তিন জনেরই একটা পাকিস্তানি রূপ ও ভূমিকা ছিল—ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে ফজলুল হক সোহরওয়ার্দীর তো কোন তুলনাই হয় না। পাকিস্তানের রাজধানীতে এঁদের নাম ও স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা জানি না। সরকারি উদ্যোগে এঁদের জন্য কোন অনুষ্ঠান হতে দেখিনি এমন কি রেডিও পাকিস্তানেও এঁদের জন্ম-মৃত্যু দিবস স্মরণে কোন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় না—এঁদের জীবন আর অবদান সম্বন্ধে হয় না কোন আলোচনাই। সরকারের এ মনোভাব অত্যন্ত দুঃখজনক। আর জাতির দিক থেকে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। জাতির সামনে এ এক অত্যন্ত কু-আদর্শ স্থাপন করা হচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস। অত্যধিক ক্ষমতা ও ক্ষমতার প্রতাপ মালিককে অত্যন্ত অন্ধ করে তোলে—যাঁরা এখন ক্ষমতায় আছেন তাঁরা বুঝতে পারছেন না এ কু-আদর্শ স্থাপন করে তাঁরা নিজের হাতে নিজের জন্যও খনন করছেন বিস্মৃতির কুয়া। পরবর্তী সরকারও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের জন্যও যদি এ একই ব্যবস্থাই অবলম্বন করে তাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ থাকবে না। ক্ষমতা বর্তমান সরকারকে এমন অদূরদর্শী করে তুলেছে যে, তাঁরা নিজেদের সাময়িক স্বার্থ-সুবিধার বাইরে দৃষ্টিকে একটুও প্রসারিত করতে রাজি নয়।

জাস্টিস ইব্রাহীম দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার—এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদেও তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অলঙ্কৃত করেছিলেন। সরকারি তরফ থেকে এমন একজন লোককে স্মরণ করার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তিনি পারেননি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি মেলাতে—পারেননি মেলাতে সরকারি সুরের সঙ্গে নিজের সুর, বোধকরি এই তাঁর অপরাধ।

আর বহু ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি সরকারি পদের লোভ আর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি যখন তার প্রয়োজন বোধ করেছেন এবং তার পরেও নির্ভয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি বহুবার, বহু বিষয়ে। তাঁর এ সাহস, মানসিক সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বর্তমান সরকারের মনঃপূত না হওয়ারই কথা। কিন্তু জাতির জন্য বিশেষ করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁর এ আদর্শ ও ঐতিহ্য এক পরম সম্পদ। জাতি বড় ও মহৎ হয় এসব গুণের দ্বারাই। তাই জাতির সামনে এসব গুণ আর এসব গুণে গুণীদের তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি সজাগ থাকলে বর্তমান সরকারের পক্ষেও এ সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব হতো না। মৃত্যুর পরেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিদ্বন্দ্বী আর শত্রু মনে করার মধ্যে একটা হীনম্মন্যতা রয়েছে—শুধু হীনম্মন্যতা নয়, অমার্জিত রুচিহীনতাও এর মূলে সক্রিয়। যাঁরা জনমত ও জনসবোর পথে ক্ষমতায় বসেননি, তাঁরা নিজের সম্বন্ধে দুর্বলতা কখনো ভুলতে পারেন না। ফলে তাঁরা গুণী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিও হতে পারেন না কিছুমাত্র উদার ও সহিষ্ণু, পারেন না ওঁদের গুণের মূল্য দিতে মোটেও। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুর পরেও তাঁরা পারেন না এ সংকীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাতির জন্য এ এক কু-আদর্শ—ভবিষ্যতের জন্য এক অতি অবাঞ্ছিত ও হীন ঐতিহ্য সৃষ্টি করা ও রেখে যাওয়া।

জনগণের মতো জননেতারাও দোষে-গুণেই মানুষ। ওঁদের দোষটাই শুধু দেখব,

গুণের কোন আদর-কদর করব না এ অত্যন্ত একরোখা খণ্ডিত দৃষ্টিরই পরিচায়ক। সরকারদলীয় স্বার্থে বিপক্ষ জননেতাদের প্রতি সাময়িকভাবে এ দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন কিন্তু জাতিকে আয়ত্ত করতে হয় একটা সার্বিক ও সামগ্রিক দৃষ্টি। সরকার যেদিন জাতীয় সরকার হয়ে উঠবে সেদিন সরকারি দৃষ্টিও হবে এ রকম অর্থাৎ দলনিরপেক্ষ ও সার্বিক অর্থাৎ জাতীয়। সেদিন সরকারি দৃষ্টি ও জাতীয় দৃষ্টিতে থাকবে না কোন তফাৎ। আবার পুনরাবৃত্তি করছি—সরকার ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক, জাতি চিরকালের ও চিরস্থায়ী। জীবনের সব ক্ষেত্রে তাই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনই আমাদের কাম্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। সরকারি সংকীর্ণ মনোভাবের শিকার না হয়ে আমাদের পা বাড়াতে হবে ঐ পথে, অর্থাৎ সার্বিক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্তের পথে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির এ যেন হয় লক্ষ্য ও আদর্শ।

১৯৬৭

বুদ্ধের জীবন-দর্শন

মানুষের ইতিহাস সুদীর্ঘ— এ দীর্ঘ ইতিহাসে মানুষের জীবন আর জীবনের পরিণতি, তার ইহ-পরকাল আর সুখশান্তির ভাবনা-চিন্তায় যে গুটিকয়েক মহামানব জীবন উৎসর্গ করেছেন তার মধ্যে মহাপুরুষ বুদ্ধ শুধু অন্যতম নন—এক অনন্য আসনেরও তিনি অধিকারী। অন্যান্য বৃহৎ ধর্ম-প্রবর্তক ও প্রচারকেরা প্রায়ই সব'ই ছিলেন প্রেরিত পুরুষ—অন্তত তাই তাঁরা বলে গেছেন। তাঁদের বাণী ঈশ্বরের বাণী—তাঁদের শিক্ষা ঈশ্বর-নির্দেশিত ও ঈশ্বর-আদিষ্ট। তাঁরা সর্বোতোভাবে ঈশ্বরের মুখপাত্র ও তাঁরই প্রতিনিধি ও দূত। এমনকি কেউ কেউ ঈশ্বর পুত্র বা অবতাররূপেও হয়েছেন চিত্রিত ও বর্ণিত। অনুরক্ত ভক্তদের কাছে এসব অভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিণত। আর ঐসব বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের একাধিক বৃহৎ ধর্ম সম্প্রদায় ও সেসব সম্প্রদায়ের জীবন-দর্শন আচার-আচরণ।

বুদ্ধ নিজে তেমন কোন দাবি করেননি—কোন রকম অলৌকিক শক্তির ইংগিত বা নির্দেশে তিনি নূতন কোন ধর্ম-প্রচারের হননি ব্রতী। বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তিনি লাভ করেছেন তাঁর ধর্ম বোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা। তাঁর সব রকম প্রজ্ঞা আর পরিণামে বুদ্ধত্বলাভও এ অভিজ্ঞতার পথেই হয়েছে আয়ত্ত। কোন রকম অপৌরুষের শক্তির সহায়তা ছাড়াই তিনি পৌঁছেছেন প্রজ্ঞা পারমিতায়—সিদ্ধিলাভ করেছেন স্রেফ জীবনের অভিজ্ঞতাকে ধ্যান আর সাধনায় রূপান্তরিত করেই। এদিক দিয়েও তাঁর সাধনা ও মনীষা মানুষের জন্য এক বিরাট বিজয়। মানুষের অভ্যন্তরে এক অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে, আর নিজের সাধনা আর তপস্যায় মানুষ যে কত উঁচুতে উঠে যেতে পারে, তার এক সাক্ষাৎ নিদর্শন মহামানব বুদ্ধের জীবন। তিনি নির্ভর করেননি কোন অলৌকিক শক্তির ওপর—তুলে ধরেননি মানুষের সামনে অপার্থিব কোন আশা আশ্বাস বা ভয়ভীতি কি প্রলোভন। তাই তাঁর ধর্ম-দর্শনে ঈশ্বর যেমন অনুপস্থিত, স্বর্গ-নরকও তেমনি গৌণ। বৌদ্ধধর্মের এ এক বড় বৈশিষ্ট্য—অন্য ধর্মের সাথে এখানেও রয়েছে ধর্ম-দর্শনে তার বিরাট পার্থক্য। সজ্জীবন যাপন আর সদাচরণই বুদ্ধের শিক্ষা—তাহলেই লাভ হবে মোক্ষ বা নির্বাণ। নির্বাণ মানে বারবার জন্মে জীবন-যন্ত্রণা থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করা। জন্মান্তর-দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, তাই আমাদের বোধগম্যও নয় তা। মনে হয় এটি হিন্দু দর্শনেরই সহোদর—অন্তত তারই বর্ধিত রূপ।

বুদ্ধের এক বড় বৈশিষ্ট্য বাস্তব বোধ। নিজের জীবনের চারপাশে বুদ্ধ জীবনের বহুবিধ যন্ত্রণা দেখেছেন—যা দেখে তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছেন। শেষে গৃহ সংসার-সুখ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন এ জীবন-যন্ত্রণা উপশমের সন্ধানে। জীবন-যন্ত্রণা থেকেই তিনি পৌঁছেছেন জীবন প্রীতিতে। এ জীবন-প্রীতিরই সাক্ষাৎ ফল অহিংসা বা সর্বজীবে প্রেম। বলাবাহুল্য জীবন-যন্ত্রণা সব মহাভাবেরই উৎসমুখ। এমনকি মহৎ শিল্প-কর্মেরও। পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের উৎপত্তিও এভাবেই ঘটেছে। চারদিকে জীবন-যন্ত্রণা যখন অসহ্য

হয়ে ওঠে তখনই আবির্ভাব ঘটে তার ত্রাতারও। তাই যুগাতীত হয়েও মহাপুরুষরাও যুগ-সন্তান। তাঁদের জীবন-দর্শনে আর ধর্ম-দেশনায়ও তাই যুগ-পরিবেশ তথা যুগ-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন এ কারণেই অনিবার্য।

বুদ্ধের যুগে ভারতবর্ষে যাগ-যজ্ঞ-বলি, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এক নির্মম অমানুষিকতায় পরিণত হয়েছিল—বুদ্ধের জীবন-দর্শন এ সবেরই মূর্ত প্রতিবাদ! তাঁর যুগে তাঁর মতো অত বড় সমাজ-বিদ্রোহীর দ্বিতীয় কোন তুলনা নেই। তিনিই সর্বাগ্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সব রকম জীব-হত্যা, রহিত হলো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অস্বীকার করলেন জন্মগত আভিজাত্য বা শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁর শিষ্য আনন্দের জবানীতেই প্রকাশিত হলো তাঁর বাণী এভাবে :

জন্ম হেতু কেহ কভু চণ্ডাল না হয়,
জন্মের কারণে কেহ ব্রাহ্মণ তো নয় ;
চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ আখ্যা কর্মে প্রাপ্ত হয়।
সম্বুদ্ধের বাণী ইহা জানিবে নিশ্চয়।

[শ্রীশীলালঙ্কার মহাস্থবির প্রণীত 'আনন্দ' পৃঃ ১৪১]

এভাবে আড়াই হাজার বছরেরও অধিককাল আগে মহামানব বুদ্ধ মানবতার বাণী প্রচার করেছেন। জন্ম তো আকস্মিক ব্যাপার, তা নিয়ে গর্ব বা কৃতিত্বের দাবি চলে না। কর্ম তথা সৎকর্ম সজ্ঞান সাধনা আর ত্যাগ শ্রমেরই ফল—মানুষের স্বোপার্জিত সম্পদ। বুদ্ধ সে সম্পদেরই জয় ঘোষণা করেছেন। পড়ে-পাওয়া বা আরোপিত গৌরব গৌরবই নয়— তেমন গৌরব ধার-করা বাবুগিরির মতোই সর্বনেশে। সেদিনের ভারত-সমাজকে তিনি সে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন কর্মের গৌরব ঘোষণা করে। পরবর্তী যুগে তাঁর এ উদাত্তবাণী ভুলে গিয়ে ভারত সমাজ যে আবার কর্মের আভিজাত্য ত্যাগ করে জন্মের আভিজাত্যে ফিরে গিয়েছিল তার বিষময় ফল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি। দুঃখের বিষয় আজো এক বৃহৎ সম্প্রদায় এ বিষময় ও আত্মঘাতী ধারণা থেকে অব্যাহতি পায়নি। মহাপুরুষেরা আলোকবর্তিকা, তাঁরা মানুষকে পথ দেখিয়ে দেন, সে পথ ধরে চলার দায়িত্ব মানুষের। সে দায়িত্ব অবহেলা করলে তার ফলভোগী মানুষকে হতেই হবে। ভারতের বহু দুর্ভোগের অন্যতম কারণ যে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতা তা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত।

এ বিংশ শতাব্দীতেও—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতায় এত উন্নতির যুগেও বহু দেশে ও বহু সমাজে মানুষ কর্ম-বিচারকে প্রাধান্য না দিয়ে ধর্ম তথা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও গায়ের বর্ণকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের জীবনে ডেকে এনেছে বহু সংকট। এর ফলে বহু সভ্য দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসও হয়েছে বারে বারে রক্তরঞ্জিত ও কলঙ্কিত—এখনো হচ্ছে। বুদ্ধবাণী ও জীবন-দর্শন এ সবের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর প্রতিবাদ। এ প্রতিবাদের প্রতি কান দিলে মানব-সভ্যতার অশেষ কল্যাণ হতো, মানুষ বেঁচে যেত বহু দুঃখ-দুর্গতির হাত থেকে।

বুদ্ধ মানুষ আর মানবতায় বিশ্বাসী ছিলেন—তাই এমন কোন আদেশ-নিষেধ তিনি প্রচার করেননি যার ফলে মানুষের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অথ

আনুগত্যের তিনি বিরোধী ছিলেন—চিন্তার স্বাধীনতার মূল্য তিনি বুঝতেন ও দিতেন তার স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতির এক অকুণ্ঠ স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর অন্তিম বাণীতে, 'হে ভিক্ষুগণ, সংস্কারমাত্রই ধ্বংসশীল। আপন কর্তব্য অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন করো।' [আনন্দ : পৃঃ ২২৯]

অনেক সংস্কার মানুষের পক্ষে জগদ্দল পাথর হয়ে ওঠে—তার বাঁধনে অনেক সময় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে মানুষের মন, বিবেক ও বুদ্ধি। ফলে অপ্রমাদে কর্তব্য সম্পাদন হয়ে পড়ে অসম্ভব। ধর্ম-প্রচারকরা অনেক সময় নিজেদের ভক্ত আর শিষ্যদের মন আর বুদ্ধিকে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখতে চান- বুদ্ধ তা চাননি, তিনি ভক্ত আর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন মন আর বুদ্ধিকে সংস্কারমুক্ত রাখতে। তাঁর নির্দেশ আর শিক্ষা বুদ্ধির মুক্তির ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দিগ্‌দর্শন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের মূল কথা : সব দুঃখের কারণ—তৃষ্ণা। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা বা লোভ সংবরণ তথা সর্বআকাঙ্ক্ষা মুক্ত হওয়াই মানুষের চরম কাম্য। এ কাম্যধামে পৌছার, বৌদ্ধ পরিভাষায় যাকে বলা হয় নির্বাণ, কয়টি মার্গ বা পথ তিনি নির্দেশ করেছেন সংক্ষেপে যার নির্গলিত অর্থ : ইন্দ্রিয় দমন, স্বার্থত্যাগ ও স্থিরবুদ্ধি।

বলাবাহুল্য, এ সবই যে মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই—শুধু মনুষ্যত্ব বিকাশের নয় সব রকম দ্বন্দ্ব-বিরোধ পরিহারেরও এ এক রাজপথ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন, তেমনি সমষ্টিগত তথা জাতি ও সম্প্রদায়গত পর্যায়েও। স্থিরবুদ্ধি কথাটা খুবই মূল্যবান—স্থিরবুদ্ধি মানুষ কখনো কোন অপরাধ বা অঘটন ঘটাতে পারে না—পারে না নিজের বা অপরের দুঃখের কারণ হতে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনাচার, অশান্তি সবই অস্থিরমতিদেরই কাণ্ড। ইন্দ্রিয় দমন ও স্বার্থত্যাগ এ দুই প্রাথমিক শর্ত পালন করেই মানুষ স্থিরবুদ্ধি হতে পারে—কাজেই এ তিন একসূত্রে গ্রথিত। 'মধ্যমা প্রতিপদ।' অর্থাৎ মধ্যম মার্গ ধরেই চলে, বুদ্ধের এ নির্দেশের সঙ্গে আমাদের ধর্মের শিক্ষার সঙ্গেও আশ্চর্য মিল রয়েছে। আমাদের ধর্মেও বলা হয়েছে—কোন রকম বাড়াবাড়ি করো না, দুই চরম ত্যাগ করে মাঝামাঝি পথ ধরেই চলো। বলাবাহুল্য এও শান্তির পথ। বুদ্ধের যে শিক্ষা, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অহিংসা তথা সর্বজীবে দয়া। এ পথই যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তথা বিশ্ব-শান্তির একমাত্র পথ এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকার কথা নয়।

হিপ্পোক্রেটিক শপথ অনুষ্ঠানে ভাষণ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞান হিপ্পোক্রেটিস্ (Hippocratis) যে অবিস্মরণীয় শপথনামার উত্তরাধিকার বিশ্বের চিকিৎসকদের জন্য রেখে গেছেন তার সত্য আর আদর্শগত মূল্য আজো বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। প্রাচীন গ্রিসের কাছে মানব-সভ্যতার ঋণের অন্ত নেই—এ শপথ বাণীটুকু সে ঋণেরই অন্তর্গত। ভেবে অবাক হতে হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকল্পনীয় উন্নতি সত্ত্বেও এর চেয়ে মহত্তর শপথ বাণী আজো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই দেশ-কাল-ধর্ম-সংস্কৃতির দুস্তর ব্যবধান, এমনকি বিরোধকেও অগ্রাহ্য করে, আজ আমাদের তরুণ চিকিৎসকগণ এ শপথ বাণী উচ্চারণ করেই জীবনের যাত্রা পথে পা বাড়াচ্ছেন, প্রবেশ করছেন নিজেদের পেশা আর দায়িত্বে। যে-কোন শপথবাণী মানে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা, কর্তব্য সম্বন্ধে জাগ্রত-চিত্ততা। এ সার্বিক সচেতনতা তথা দায়িত্ববোধ ছাড়া যে কোন মহত্তম শপথবাণীও একটা প্রহসনে পরিণত হতে পারে, যেমন আদালতের মামলার 'হলপ পাঠের' বেলায় রোজ আমরা এ প্রহসন দেখতে পাই। সর্বান্তকরণে আশা করি আপনাদের আজকের শপথ গ্রহণ যেন তেমন 'হলপ পাঠে' পরিণত না হয়।

যাঁর রচিত শপথবাণী আজ আপনারা উচ্চারণ করলেন ইচ্ছা করলে তাঁর নামের বানানে সামান্য হেরফের করেই এ শপথ-বাণীর সমস্ত মাহাত্ম্যকে ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত করা যায়। আশা করি আপনারা তা করেন না। যে কোন ভালো বা সৎ উদ্দেশ্যকেই এভাবে নস্যাৎ করা যে যায় না তা নয় কিন্তু তাতে কোন গৌরব নেই, নেই কোন সার্থকতা কিংবা মাহাত্ম্য। তার জন্য জীবনের কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে প্রস্তুতিরও কোন প্রয়োজন পড়ে না। একখানি গৃহ নির্মাণ দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ বটে কিন্তু সেটাকে নিশ্চিহ্ন করা যায় এক মুহূর্তে, দেয়াশলাইয়ের একটামাত্র কাঠির সাহায্যে। তেমনি জীবন রক্ষা আর জীবন গড়ে তোলাও সময়সাপেক্ষ, তার পেছনে ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা অত্যাবশ্যক কিন্তু এক ফোঁটা পটাশিয়াম সাইনাইড সেই অমূল্য জীবনটাকে এক মুহূর্তে খতম করে দিতে সক্ষম। জীবন রক্ষা আর জীবন ধ্বংস করা এ দুইয়েরই দক্ষতা আপনাদের করায়ত্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অসম্ভব অগ্রগতির ফলে এ দক্ষতা, আজ অধিকতর কার্যকরী আর অধিকতর সহজলভ্য। তাই এ যুগের চিকিৎসকদের দায়িত্বও সে অনুপাতে অনেক বেড়ে গেছে—আজকের অনুষ্ঠান এ দায়িত্ব সচেতনতারই প্রতীক। যে শপথবাণী আপনারা উচ্চারণ করলেন তার গুরুত্ব উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি আপনাদের অনুরাগ আর আনুগত্য অক্ষয় হোক।

এ বাণীর অন্তর-সত্যকে বুকে নিয়ে আপনারা জীবনের পথে এগিয়ে যান। আপনাদের সামনে শুধু নিজের জীবন নয়, দেশের আর সমাজের বৃহত্তর জীবনও পড়ে আছে, সে জীবন থেকে রোগ, ক্ষয়, অকাল জরতা আর অকাল মৃত্যু দূর করার মহান ব্রতে আজ আপনারা দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা নেওয়া মানে দায়িত্ব গ্রহণ। এ দায়িত্বপালন সহজ হবে যদি আপনারা জীবনকে ভালবাসেন—আত্মপর নির্বিশেষে সব জীবনকে।

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আল্লার হাত থেকে মানুষ সবচেয়ে বড় নেয়ামত বড় সম্পদ কি পেয়েছে?

আমি বিনা দ্বিধায় বলব : জীবন। জীবনের চেয়ে বড় সম্পদ মানুষের আর নেই

জন্ম-মুহূর্তেই মানুষ এ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় আবার নির্ধারিত সময়-অন্তে ছাড়তে হয় এ সম্পদের মায়ামোহ। এ নির্ধারিত সময়েরই আমরা নাম দিয়েছি আয়ু আর এ আয়ু-সীমায় মানুষকে সুস্থ আর বাঁচিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব আপনাদের, চিকিৎসকদের। এ দায়িত্ব একদিকে যেমন ব্যক্তিক তেমনি অন্যদিকে সামাজিক, কারণ কোন ব্যক্তিই সমাজ-বহির্ভূত না। আবার ব্যক্তিকে ছাড়াও সমাজ হয় না। স্বয়ং চিকিৎসকও সামাজিক জীবন। এখন চিকিৎসক শুধু একজন ব্যক্তির চিকিৎসা করেন না, তিনি সমস্ত সমাজদেহেরও চিকিৎসা করেন। এতে চিকিৎসকের সীমা অনেক বেড়ে যায় সত্য কিন্তু এ চেতনা নিয়ে যিনি চিকিৎসা করেন তিনি যে আত্মতৃপ্তি পান তার আনন্দ আর মূল্য বরাদ্দ ফি'য়ের চেয়ে অনেক বেশি। পেশার উর্ধ্বে উঠতে না পারলে অচিরে পেশা স্রেফ এক নিরস জড় অভ্যাসে পরিণত হয়—তখন তাতে আর কোন আকর্ষণ থাকে না।

আগের দিনে চিকিৎসকরা শুধু দেহের চিকিৎসাই করতেন, এখন সে ধারণা আমূল বদলে গেছে। দেহ আর মনকে এখন আর পৃথক করে দেখা হয় না। এ দুই শুধু একে অপরের পরিপূরক নয় বরং একান্তভাবে পরস্পর নির্ভরশীলও। মন খারাপ হলে দেহও খারাপ হয় অথবা তার বিপরীত ঘটে, এ সম্বন্ধে বোধকরি আজ আর কোথাও দ্বিমত নেই। দেহের সঙ্গে সঙ্গে তাই আজ মনের চিকিৎসাও করতে হয়।

এখন শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানী হলে তাঁর চলে না, তাঁকে মনোবিজ্ঞানীও হতে হয়। ফ্রয়েড্ আবার চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অবচেতন ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। এভাবে চিকিৎসার এলাকা আর সমস্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আধুনিক চিকিৎসককে তাই শুধু পরীক্ষা পাস করলেই চলে না তাঁকে সব সময়, হয়তো সারাজীবনই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও থাকতে হয়। অর্থাৎ থাকতে হয় নিত্য নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তা না হলে চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন যেভাবে দিন দিন আর দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তাতে অচিরে সেকেলে বা Backdated হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই মনকে সজীব, সজাগ, সচেতন আর গ্রহণশীল রাখার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর অধ্যয়নকে নিত্য সঙ্গী করে নিতে হয়। আজকের দিনে যে কোন সুচিকিৎসকের জন্য এ প্রায় প্রাথমিক শর্ত। সফল চিকিৎসক বল্লাম এ কারণে যে এখন সাফল্যে অর্থ দাঁড়িয়েছে অতি দ্রুত, স্বল্পতম সময়ে বাড়ি-গাড়ির মালিক হওয়া। বলাবাহুল্য বাড়ি-গাড়ির যে প্রয়োজন নেই একথা বলার আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার বক্তব্য সেটা যেন চরম লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়, লক্ষ্য থাকা উচিত, সুচিকিৎসক বা সৎ-চিকিৎসক হওয়াই। সে সঙ্গে বাড়ী-গাড়ি, সোফা—সেটি হয় ভালো, না হলেও জীবন কিংবা পেশা ব্যর্থ হলো এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এমন হীনম্মন্যতায় যেন আপনাদের পেয়ে না বসে। মনে রাখবেন পৃথিবীর তাবৎ মহৎ মানুষই দরিদ্র ছিলেন। স্বয়ং হিপ্পোক্রেটিসও ধনী ছিলেন না। অথচ আড়াই হাজার বছরেও তাঁর নাম চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে আজো মুছে যায়নি। এরই নাম সাফল্য, এরই নাম কৃতিত্ব। প্রত্যেক পেশারই একটা দর্শন আছে, অন্তত থাকা উচিত। চিকিৎসকদের দর্শন কি? আমার মতে, নিজে বাঁচা আর অপরকে বাঁচতে সাহায্য করা। বাঁচা মানে স্রেফ ভাত-কাপড় বা বাড়ি গাড়ির মালিক হয়ে বাঁচা নয়, বাঁচা মানে মহৎ কোন বিশ্বাস আর আদর্শ নিয়ে বাঁচা। খাওয়া-দাওয়া আর আরামে বসা-শোওয়ার বেলায় মানুষে আর অন্য প্রাণীতে বিশেষ পার্থক্য নেই। ছাগলও লাউ-এর কচি ডগাটা খেতে চায়, গরুও চায় আরামে গাছের ছায়ায় শুয়ে জাবর কাটতে। মানুষ যেখানে

জীবনের মূল্যবোধে আর একটা মহত্তর জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী পার্থক্যটা সেখানেই। মানুষের যদি কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকে তা এখানেই আর ঐ জন্যই।

এ যুগের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর আলবার্ট সোয়াইজার যিনি একাধারে Dr. of Medicine, Dr of Philosophy আর Dr. of Theology ছিলেন, যাঁকে ১৯৫ ? শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাঁর জীবন-দর্শন ছিল Love of life জীবন-প্রেম অর্থাৎ জীবনকে ভালোবাসা। এ ভালোবাসার তাড়নায় তিনি সত্য জীবনের সব আরাম-আয়েস, সুখ-সুবিধা আর সাফল্য ত্যাগ করে সুদূর কৃষ্ণ আফ্রিকার লেম্বারনিতে গিয়ে অবহেলিত আর উপেক্ষিত মানুষের জন্য নিজের চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। নিজের হাতেই পুঁতেছেন তার খুঁটি, নিজের হাতে বেঁধেছেন তার বেড়া, রঙ লাগিয়েছেন তাতে নিজের হাতে আবার ঐ হাতে দিয়েছেন ইনজেকশন। মানুষের জীবনকে ভালোবাসতে পারলেই এমনি নির্লোভ হওয়া যায় আর নিজের পেশাকেও নেওয়া যায় একটা বিশেষ সাধনা হিসেবে। আমাদের দেশে এমন সাধনার ক্ষেত্র প্রচুর যেখানে আজো কোন রকম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার আলোর ছোঁয়া লাগেনি। আলবার্ট সোয়াইজারের জীবন আমাদের নবীন চিকিৎসকদের প্রেরণা দিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ আজো অলৌকিকতা আর অপ্রাকৃতে বিশ্বাসী। আপনারা আজ যাঁর রচিত শপথ গ্রহণ করনে তাঁর জীবনের একটি বড় কৃতিত্ব—তিনি মানুষকে অপ্রাকৃতের অন্ধ-বিশ্বাস থেকে উদ্ধার করে বিজ্ঞানের পথ, যুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি : "The fact is that invoking the gods to explain diseases and other natural events is all nonsense. In nature all things are alike in this, that they all can be traced to preceding causes. (Herbert J. Muller) Cause and Effect—বিজ্ঞানের এ প্রথম সূত্রকে চিকিৎসা বিদ্যায় মেনে নিয়ে হিপ্পোক্রেটিসই সর্বপ্রথম জাদু আর অলৌকিকতার হাত থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রকে মুক্তি দিয়ে তাকে উন্নীত করেছিলেন বিজ্ঞানের কোটায়। আজ চিকিৎসাশাস্ত্র রীতিমতো বিজ্ঞান—তাতে জাদু আর অলৌকিকতার কোন স্থান নেই। ঝাড়-ফুঁক আর তন্ত্রমন্ত্র আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের এলাকা থেকে নির্বাসিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার এলাকা থেকে নির্বাসিত হলেও আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের পল্লীগ্রামে তার প্রসার-প্রভাব আজো অক্ষুণ্ন, বিশেষ করে কলেরা-বসন্তের মহামারির দিনে ঐ সবের প্রতাপ যায় অসম্ভব রকম বেড়ে। যখন বেশি করে বিজ্ঞানের আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন তখনই বিজ্ঞান হয় বিসর্জিত। আর সে স্থান দখল করে অবিদ্যা আর কুসংস্কার। এসবের হাত থেকে মানুষের মনকে মুক্তি দিতে না পারলে আমাদের সব চিকিৎসাজ্ঞানই ব্যর্থ হবে। তাই মানুষের দেহের রোগ-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মুক্তির, বুদ্ধির মুক্তির সংকল্পও আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আপনাদের আজকের শপথ গ্রহণ সার্থক হবে। বলাবাহুল্য স্বয়ং হিপ্পোক্রেটিসও যুগপৎ এ দুই দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁর দেশে, তাঁর কালে।

আপনাদের দেশ আর আপনাদের কাল, আপনাদের নবীন মুখের দিকে চেয়ে আছে

১২.৮.৬৭

আর্ট গ্যালারি বা চিত্রশালা

প্রতিভাবান সফল চিত্রশিল্পীর অভাব নেই আমাদের। আজাদি-পূর্ব যুগেও আমাদের একাধিক শিল্পী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কলকাতাকে কেন্দ্র করে আমাদের যে ক্ষুদ্র শিল্পীগোষ্ঠী তখন গড়ে উঠেছিল বা চেয়েছিল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে তারা আজ সবাই পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে। প্রাথমিক বিপত্তি কেটে যাওয়ার পর তাঁরা, যত সীমিতভাবেই হোক আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেয়েছেন। সাহিত্যের মতো চিত্র-শিল্পেরও তেমন কোন ঐতিহ্য পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না স্বাধীনতার আগে। সাহিত্যিক যে তখনো আমাদের ছিল না তা নয় কিন্তু প্রকাশনা আর পরিবেশন-কেন্দ্র কলকাতা ছিল বলে এখানকার সাহিত্যিকরাও সেখানে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজতেন। চিত্রশিল্পীদের তো অন্য কোন উপায় ছিল না। যখন প্রদেশের একমাত্র আর্ট স্কুলটিও ছিল ওখানে— শিল্পের যা কিছু চাহিদা আর শিল্পীদের পেশাগত যতটুকু সুযোগ-সুবিধা তাও ছিল পুরোপুরি কলকাতাকেন্দ্রিক। প্রশাসনিক আর সাংস্কৃতিক অবস্থার ফলে এ না হয়ে পারেনি তখন।

স্বাধীনতার পর মুসলমান শিল্পীদের প্রায় ত্রিশঙ্কু দশা— রাতারাতি চলে আসতে হলো— ওঁদের কলকাতা ছেড়ে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে তখন চিত্রশিল্প ও চিত্রশিল্পীর ছিল না কোন আশ্রয় বা আস্তানা, ছিল না একটি শিল্প-স্কুলেরও অস্তিত্ব। চিত্রশিল্পীরা তাই এখানে এসে পা রাখার জায়গাও খুঁজে পেলেন না— আক্ষরিক অর্থেই দাঁড়াতে হলো তাঁদের পথে। লেখকরা তবু স্কুল-কলেজের শিক্ষকতায়, সাংবাদিকতায়, সরকারি তথ্য বিভাগ ইত্যাদিতে কোন রকমে ঠাঁই করে নিলেন। একেবারে অকূলে পড়লেন চিত্র-শিল্পীরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিভাবান, প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পী। অন্য দশজনের মতো তাঁদেরও জীবনধারণের সমস্যা আছে, তাঁদেরও প্রতিদিন তেল-লাকড়ির ভাবনা ভাবতে হয়— কারো কারো পরিবার রয়েছে সঙ্গে। এ দুঃসহ অবস্থায় পড়ে সেদিন বাধ্য হয়ে এসব শিল্পীদের কারো কারো এমনকি স্কুলের ড্রইং মাস্টারের পদও গ্রহণ করতে হয়েছিল। শিল্পীরা সাধারণত লাজুক প্রকৃতির মানুষ— এ অবস্থা তাঁদের জন্য কতখানি মর্মান্তিক হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

জাতির এ জন্ম বেদনার সন্ধিক্ষণে অন্যসব ক্ষেত্রেও জীবনে যে অকল্পনীয় ওলট-পালট ঘটেনি তা নয়— তবে চিত্রশিল্পীদের মতো এমন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন বোধ হয় অন্য কোন পেশার লোককেই হতে হয়নি। এ বিপর্যয়ের মুখোমুখিই ঢাকা আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা— যা আজ চারু আর কারু মহাবিদ্যালয়ে পরিণত। শিল্পীরা শিল্পীই— প্রতিষ্ঠান কি সংস্থা গড়ে তোলার মানুষ তাঁরা নন, সে অভিজ্ঞতাও তাঁদের কাছে আশা করা যায় না। তবুও শিল্পী জয়নাল আবেদীন আর তাঁর সহকর্মীরা সেদিন যে ধৈর্য ও অসম সাহসের সঙ্গে এ শিল্প-বিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। বলা যায় মাটি থেকে নয় একদম হাওয়া থেকেই এটাকে গড়ে তুলতে হয়েছে তাঁদের। আজ সারা পাকিস্তানে এটিই নাকি আমাদের সেরা চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়। শিল্পী জয়নাল আবেদিনের খ্যাতিও যে এর পেছনে অনেকখানি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

যাই হোক, বহু অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ শিল্পীদের অবদানে আমরা আজ একটি উৎকৃষ্ট চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় পেয়েছি। প্রদেশের এটি গর্বের বস্তু— এরি মধ্যে এর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশী শিল্প-রসিক পর্যটকরাও এ প্রদেশে এলে এ মহাবিদ্যালয় একবার না দেখে ছাড়েন না।

সূক্ষ্ম অনুভূতি চর্চা, রূপদক্ষতা আর সার্বিক সৌন্দর্য-চেতনা উচ্চতম সংস্কৃতিরই লক্ষণ। আমাদের সংস্কৃতি চর্চার মান এখনো ততখানি উন্নত হয়নি বলে শিল্পী আর শিল্প মহাবিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও শিল্প-সমঝদার আর শিল্প-রসিক এবং শিল্প-পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যা আমাদের দেশে নগণ্যই বলা যায়। ফলে প্রতি বছর শিল্পীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বটে কিন্তু সে অনুপাতে শিল্পীদের পেশা আর জীবিকার সুযোগ-সুবিধা মোটেও বাড়েনি। এ প্রদেশের চিত্রশিল্পের বাজার একরকম নেই বল্লেই চলে। উদীয়মান প্রতিশ্রুতিশীল নবীন শিল্পীরা তাই আজ এক দো টানার সম্মুখীন— এক দিকে শিল্পের প্রতি মজ্জাগত আকর্ষণ অন্যদিকে জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন। দেহ আর প্রাণ— এ দুইকে যুগপৎ বাঁচিয়ে রেখে জীবনের দুই প্রান্তকে মিলাতে তাঁরা আজ গলদঘর্ম। শিল্পীরা অধিকতর সংবেদনশীল বলে এ অবস্থায় তাঁদের পক্ষে আত্মনিষ্ঠ হওয়া হয়ে পড়েছে আরো অসম্ভব। দেশের শিক্ষিত আর বুদ্ধিজীবী সমাজ যদি শিল্প সচেতন না হয় তাহলে শিল্প আর শিল্পীর বিকাশ কিছুতেই আশা করা যায় না। পাঠক যেমন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক তেমনি শিল্প-সমঝদারও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। সব দেশে এঁরাই শিল্প আর শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখেন— প্রশস্ত করে দেন বিকাশের পথ।

শিল্প-বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই শিল্প-বোধ আর রস-চেতনা জাগ্রত হয়। বই পড়ে পড়ে বা ভালো আর অধিকতর বই-পুস্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিয়ে যেমন মনে সাহিত্য-প্রীতি জাগিয়ে তুলতে হয় তেমনি ছবি দেখে, ভালো চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি নিরীক্ষণ আর অধ্যয়ন করে, প্রতিটি মানুষের মনে যে সহজাত শিল্প-বোধ থাকে, তাকে তুলতে হয় জাগিয়ে। বই-পুস্তকের ব্যাপক অধ্যয়নের জন্য যেমন লাইব্রেরির প্রয়োজন তেমনি অধিকতর সংখ্যক মানুষের মনে শিল্প-চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারিও অত্যাবশ্যক। এদেশে এ বিষয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ দেখা যায়নি এযাবৎ। শুধু জনসাধারণের জন্যই যে চিত্রশালার প্রয়োজন তা নয়, শিল্প-শিক্ষার্থীদের জন্য তার প্রয়োজন আরো বেশি। এরা চোখের সামনে মহৎ শিল্প কর্মের কোন আদর্শই দেখতে পাচ্ছে না এখন। দেশ-বিদেশে শিল্প কতটুকু হয়েছে বা হচ্ছে, কতটুকু এগিয়েছে, কোন দিকে মোড় নিচ্ছে এ সবের চাক্ষুষ পরিচয় শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য। উৎকৃষ্ট, নির্বাচিত আর সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ছাড়া যেমন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কল্পনা করা যায় না তেমনি শিল্প-শিক্ষার বেলাও তা বলা যায়। কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে লাইব্রেরির যে স্থান আর্ট স্কুল বা কলেজের ক্ষেত্রে চিত্রশালারও সে একই স্থান। গুরুত্ব আর প্রয়োজনের দিক দিয়ে কোনটাই কম নয়।

ক্লাসের সীমিত সময়ে কতটুকু জ্ঞানই-বা দেওয়া যায় আর কোন শিক্ষক বা অধ্যাপককেই ভাবা যায় না সর্ববিদ্যাবিশারদ বলে। তাই জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্য আর নিজের প্রিয় লেখক বা গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য লাইব্রেরির আশ্রয় নিতেই

হবে। শুধু নাম শুনে বা আউড়ে কোন লেখক বা গ্রন্থের সঙ্গেই পরিচয় ঘটে না— ঐভাবে পাওয়া যায় না কোন ফায়দাও। চিত্রশিল্পের ইতিহাস আর ঐতিহ্য খুবই দীর্ঘ। এমনকি প্রাগৈতিহাসিকও বলা যায়— কত অবিস্মরণীয় নামই না যোগ হয়েছে এর সাথে! কত প্রতিভা কত দিকে চিত্রশিল্পকে বিচিত্র আর সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ঐ সব শিল্পীদের বা তাঁদের সৃষ্ট শিল্পবস্তুর শুধু নাম শুনে বা নাম আউড়িয়ে কোন শিল্প-শিক্ষার্থীরই কিছুমাত্র উপকার হয় না। আসল বা মূল ছবি না হোক অন্তত প্রতিলিপি দেখেও শিক্ষার্থী যা আয়ত্ত করতে পারে, হাজার বক্তৃতা শুনে বা প্রবন্ধ পড়ে তার সিকিও আয়ত্ত করতে পারা যায় না। মূল প্রতিলিপি একমাত্র আর্ট গ্যালারিতেই সংগৃহীত হয়ে দর্শনীয়ভাবে রাখা যেতে পারে। সেখানে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভিড় জমাতে হবে যেমন বিদেশের শিল্প-শিক্ষার্থীরা জমিয়ে থাকে তাদের দেশের চিত্রশালায়। তা ছাড়া আর্ট স্কুল বা আর্ট কলেজ অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। আর্ট— আর্ট কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে কখনো আবদ্ধ থাকে না— থাকলে তা হয়ে পড়বে প্রাচীন চিনা রমণীর পায়ের মতো। শিল্প আর শিল্পীকে নিজের বিস্তার খুঁজতে হয় বাইরে, তাই সফল শিল্প স্থান কালেও আবদ্ধ নয়। এ বিস্তারের পথ রচনা করে বা তার ইংগিত দেয় চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারি। এ সম্পর্কে একজন চিত্রশিল্পে বিশেষজ্ঞের মত শোনা যেতে পারে—

"চিত্র যদি শিখতে চাই চিত্রশালাতে যেতেই হবে আমাদের। প্রাচীন চিত্রে কেমন করে রেখাপাত, কেমন করে বর্ণপ্রলেপ, কেমন করে নানা অলঙ্কার বর্ধনা ইত্যাদি দেওয়া হতো— তার প্রক্রিয়া ছবি দেখেই আমাদের শিখে নিতে হবে। কোনো শিল্পশাস্ত্রে এ সমস্ত প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে ধরা নেই। কেমন কাগজে ছবি লেখা হতো, কি কি বর্ণ সংযোগ হতো, কোথায় কোথায় কেমন ধারা পালিশ দেওয়া হয় ছবিতে, কত রকম তুলির টান, কত রকম রঙের খেলা, কত বিচিত্র ভাবভঙ্গি রেখার ও লেখার এ সমস্ত এক একখানি ছবি দেখে ছাড়া উপায় নেই। শাস্ত্রে কুলোয় না এত বিচিত্র প্রক্রিয়ার রহস্য সমস্ত রয়েছে ছবির মধ্যে ধরা মোগল বাদশাহের আমল পর্যন্ত, তারপর এসেছে ইউরোপ জাপান চিন থেকে নতুন নতুন প্রক্রিয়ায় রচনা করা ছবি।"— অবনীন্দ্রনাথ

একমাত্র চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারিতে গেলেই যেখানে মূল (Original) না হলেও এসব ছবির প্রতিলিপি (Reproduction) সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে তা দেখে দেখে, অধ্যয়ন করে নানা ছবির নানা প্রক্রিয়া শিখতে পারে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষক বা অধ্যাপকরা, তাঁরা যত দক্ষই হোন, কাকেও সাহিত্যিক বানাতে পারে না— সাহিত্যিক হতে হলে প্রথমে সাহিত্যের সেরা সেরা বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, আয়ত্ত করতে হয় পূর্বসূরিদের লেখার ধরন-ধারণ। আর্ট স্কুলও আর্টিস্ট বানাতে পারে না— টেকনিক অ. তুলি ধরার, কি রঙ লাগাবার কায়দা-কানুনটা শিখিয়ে পথটা দেখিয়ে দিতে পারে শুধ কিন্তু সত্যিকার শিল্পী হতে হলে সফল শিল্পীদের কাছ থেকে অর্থাৎ তাঁদের ছবি দেখে তাঁ পড়ে গ্রহণ করতে হয় শিল্পের পাঠ। সে পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্র চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারি তাই আমাদেরও আর্ট গ্যালারি চাই

আর্ট গ্যালারি বা চিত্রশালা শিল্পের একটি ক্রেতা গ্রাহকও। আমাদের দেশের জন্য তারও প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আবার চিত্রশালা ছাড়া শিল্পকর্মের যাচাই বা বিচারও সম্ভব

নয়। অথচ শিল্পের উন্নতির জন্য তুলনামূলক বিচার অপরিহার্য। আমাদের কয়টা শিল্পীই বা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পায়, তদুপরি বিদেশের চিত্রশালা তো বিদেশী চিত্রেই ভরতি বিদেশী শিল্পীদের ছবির পাশাপাশি যদি স্বদেশী শিল্পীদেরও ছবি শিক্ষার্থীরা দেখতে না পায় তাহলে সহজেই তারা নিজের দেশের শিল্প-প্রেক্ষিত হারিয়ে বসবে। সেটা হবে আরো মারাত্মক। অ'র একবার দু'বার দেখে কোন বড় শিল্পীর শিল্প-কর্মের টেকনিক বা অন্ধি-সন্ধি বুঝতে পারা যায় না। তা বোঝার জন্য এক একটা শিল্প-কর্মকে বারবার দেখতে হয়, দেখতে হয় খুঁটে খুঁটে। সময় সময় অভিজ্ঞ শিল্প-শিক্ষকের নির্দেশনারও হয়তো হয়ে পড়ে প্রয়োজন। কাছাকাছি চিত্রশালা থাকলেই এসব সম্ভব। আমাদের শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের আজ যতই সুনাম থাক, চিত্রশালার সহায়তা না পেলে, অচিরে শিল্প-শিক্ষার পরিপূরক শিল্প-গ্যালারির প্রতিষ্ঠা না হলে এ সুনাম মোটেও আর বাড়বে না—সুযোগই পাবে না বাড়ার। স্থির আর স্থাণু হয়ে থাকাই হবে তার ভাগ্য।

১৯৬৭

সাহিত্যের উপকরণ

জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব কিছুই সাহিত্যের উপকরণ— মানুষের চেতনা, অনুভব আর কৌতূহলকে যা স্পর্শ করে সে সবকেই সাহিত্যে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ হয়তো একটা শিথিল ঢালা কথা। কারণ যে কোন উপকরণ সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী হয়ে উঠতে মাঝখানে আরো বহু স্তর পার হয়ে আসতে হয়। জীবন, জীবনের ঘটনা আর অভিজ্ঞতা এসব হলো স্রেফ কাঁচামাল— অন্য কাঁচামাল যেভাবে পণ্য বা বস্তু হয়ে ওঠে, এসবও সেভাবেই সাহিত্যের বস্তু হয়ে ওঠে। অন্য কাঁচামালের যে রূপান্তর, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ যা পুরোপুরি ব্যবহারিক তথা বাহ্যিক বলে তা চাক্ষুস আর সর্বজন দৃশ্য, তাই সে ভাবে গ্রাহ্যও। গো চর্মটা কি করে নানা স্তর পার হয়ে জুতো হয়ে ওঠে অথবা সবুজ পাট কি করে কার্পেটে রূপান্তরিত হয় তার সব প্রক্রিয়াই চোখে দেখা যায়, অবিশ্বাস কি অনুমানের অবসর তাতে নেই। এ কারণে এ নিয়ে বিতর্কও ওঠে না।

কিন্তু সাহিত্যে বস্তুটা এভাবে তৈয়ারি হয় না আর ওটা বাহ্যিক আর ব্যবহারিক নয় মোটেও। বাহ্যিক ঘটনা উপকরণ জোগায় সত্য কিন্তু সাহিত্যে রূপান্তরিত হওয়ার আগে তার যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তা সম্পূর্ণভাবে মানসিক তথা আভ্যন্তরিক— যেখানে চক্ষুবর্ণের প্রবেশ নিষেধ। এ কারণে সাহিত্যের উপকরণ কথাটায় জটিলতা যেমন আছে তেমনি বিভ্রান্তি ঘটারও সুযোগ রয়েছে অনেক বেশি— ঘটেও প্রচুর। তাই অনেক সময় ঘটনার নিখুঁত বর্ণনাকেও অনেকে সৎ-সাহিত্য বলে অভিহিত করে থাকেন। কবি থেকে সাংবাদিক বা শিল্পী থেকে ফটোগ্রাফার যে বর্ণনায় আর চিত্রণে সুদক্ষ তাতে সন্দেহ নেই— তাই বলে সাংবাদিকদের নিখুঁত বর্ণনাকে বা ফটোগ্রাফারের নিপুণভাবে তোলা ছবিকে কেউ সাহিত্য কি শিল্পের মর্যাদা দেবে না। যে মানসিক ক্রিয়ায় ঘটনা বা কোন বিশেষ অনুভব সাহিত্য আর শিল্প হয়ে ওঠে তার স্পর্শ ঐ সবে লাগেনি বলে ঐ সব অবিকল যা তার বেশি হতে পারেনি। এ বেশি হওয়াটাই মানসিক ক্রিয়া, এজন্যই শিল্পকে জীবনের চেয়ে বৃহত্তর (Larger than life) বলা হয়। যা আছে বা যা ঘটেছে তার চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার নামই সাহিত্য বা শিল্প। এ কথটাই রবীন্দ্রনাথ আরো সুন্দর করে বলেছেন তঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় :

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।"

অর্থাৎ সাহিত্যের সত্য আর ব্যবহারিক সত্য এক নয়। ব্যবহারিক বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তবে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে— শিল্পী-সাহিত্যিকদের এ জ্ঞানটুকু অত্যাবশ্যক।

স্রেফ তাকানো নয় সত্যিকার অর্থে দেখা সব ঘটনাই হয়তো সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে কিন্তু তা হয় লেখকের কল্পনা আর অভিজ্ঞতার জারক রসে জারিত হয়ে। এভাবেই তা সাহিত্যের বিষয়-বস্তুতে বিকশিত হয়ে ওঠে। লেখকের জন্য চিন্তাও একটি বড় শর্ত, তবুও সাহিত্য-শিল্প শুধু চিন্তার ফলশ্রুতি নয়। চিন্তা যুক্তির পথে শিল্পের সিদ্ধান্ত

আর রূপকল্পকে গড়ে তোলে বটে কিন্তু তা জীবনমুখী আর জীবনের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য কিনা তার যাচাই প্রয়োজন। অনুভূতির বেলায়ও এসত্য— আবেগী ঘটনার অভিজ্ঞতা সহজেই শিল্পী-মনকে আলোড়িত করে তোলে— কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার সাহায্যে শিল্পীর জাগ্রত অনুভূতি অভিজ্ঞতার সাথে একাত্ম না হলে শিল্প-বস্তু গড়ে ওঠে না। তাই সাহিত্য-শিল্পীর মানস ক্রিয়ার এক অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ চিন্তা— সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা। জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটে— ঘটে নিজের জীবনে, পরের জীবনে, নিজের মানস-অভিজ্ঞতার দিগন্তে। কিন্তু সব ঘটনা মনে দাগ কাটে না। যে ঘটনা বা অভিজ্ঞতা মনের গভীরে দাগ কাটে না অর্থাৎ গভীরভাবে কোন নাড়া দেয় না, তা নিয়েও ভালো সাহিত্য রচিত হতে পারে না। ভাসমান ঘটনা স্রোত সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে না কিছুতেই— মনের গভীরে তার অনুপ্রবেশ অত্যাবশ্যক। সব বড় সাহিত্য-কর্মই গভীর অনুভূতির ফল। বাস্তব জীবনের মোকাবেলার সঙ্গে সঙ্গে, দেখা যায় অনেকের আবেগ-অনুভূতি কমে আসে, নিস্তেজ হয়ে পড়ে, হারিয়ে বসে ধার ও তীক্ষ্ণতা— মনের এমন অবস্থায়ও উঁচু দরের সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা যতই বাড়ুক, সে অভিজ্ঞতা যদি মনে সাড়া না জাগায়, তীব্রভাবে গভীরভাবে শিল্পী-মনকে নাড়া না দেয় তাহলে অভিজ্ঞতা বা মহৎ উপকরণও কোন কাজেই আসবে না। সে সব উপকরণ শিল্পী মনের বাইর দরজা থেকেই করবে বিদায় গ্রহণ, পারবে না অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে। অথচ এ অন্তর্লোকই সৃষ্টি করে সাহিত্য ও শিল্প। এ কারণেই সবাই শিক্ষিত হতে পারলেও সবাই লেখক হতে পারে না— লেখক হয় কেউ কেউ। সত্যিকার সাহিত্যিক বা শিল্পীর সংখ্যা সব দেশে সীমিত হওয়ার এ কারণ। আবেগ জাগ্রত থাকলেই মনের কৌতূহলও জাগ্রত থাকে— কৌতূহল মনে গেলেও সাহিত্য হওয়ার কথা নয়। কৌতূহলের বশেই মানুষ জানতে চায়— নিজের ও পরের তথা সব জীবনের সব কিছু, প্রকৃতির দিকেও তখন টান থাকে অব্যাহত। এ জানাই অভিজ্ঞতা হয়ে মনের গভীরে স্থান গ্রহণ করে, পরে দেখা দেয় সাহিত্যের উপকরণ হয়ে। এমন কি দূর অতীতের অভিজ্ঞতাও এভাবে সাহিত্যের উপকরণ হয়ে ওঠে। লেখকের জন্য স্মৃতি এক অফুরন্ত ভাণ্ডার— এ ভাণ্ডারেই সঞ্চিত থাকে সাহিত্যের উপকরণ। বলাবাহুল্য গভীরভাবে যা মনে দাগ কাটে বা অনুভূতিতে গভীর অনুরণনের সঞ্চার করে মনের ভাণ্ডারে তাই সঞ্চিত হয়, অন্যগুলি হয় পরিত্যক্ত অর্থাৎ চিরতরে হারিয়ে যায় স্মৃতি থেকে। কৌতূহলই জীবনের রহস্য সন্ধানে শিল্পীকে নিয়ে যায় অভিজ্ঞতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, মানস-ক্রিয়ার এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্ত। মনের কৌতূহল জাগ্রত রাখা সম্বন্ধে যে কথা বলেছি— সে সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটি নজরুল ইসলামের মুখেই শোনা। কোন এক সাহিত্য সভা উপলক্ষে একবার শরৎচন্দ্র আর নজরুল নাকি ট্রেনে করে কোথায় যাচ্ছিলেন একসঙ্গে। দুজনে পাশাপাশি ট্রেনের জানালার ধারে বসেছেন। কোন এক স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছতেই ট্রেনের গতি যথারীতি মন্থর হয়ে এলে তাঁরা দেখলেন, রেল রাস্তার পাশের চলতি পথ ধরে একদল মেয়ে বেশ সেজেগুজে কোথায় যেন চলেছে। শরৎচন্দ্র একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন, নজরুল কিন্তু তাকিয়েই রইলেন মেয়েদের চলমান সারির দিকে। কিছুক্ষণ পর শরৎচন্দ্র নজরুলকে বল্লেন : 'আমি আর

সাহিত্য করতে পারব না, কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কৌতূহল মরে গেছে। তুমি এখনো তরুণ, তোমার কৌতূহল পুরোপুরি জাগ্রত, তুমি আরো বহুদিন লিখতে পারবে। এ কৌতূহলটাকে বাঁচিয়ে রেখো।' বলাবাহুল্য তখন শরৎচন্দ্র বার্ধক্যে পা দিয়েছেন আর নজরুল যৌবন-মধ্যাহ্নে। কৌতূহল মানে স্রেফ নারী সম্বন্ধে কি পুরুষ সম্বন্ধে কৌতূহল নয়— জীবনের সব ব্যাপারে, সব কিছু সম্বন্ধেই কৌতূহল।

১৯৬৭

আজাদি-উত্তর কথাসাহিত্যের ভাষা

আমাদের আজাদির আয়ু মাত্র কুড়ি বছর— কুড়ি বছরে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি যেমন আশা করা যায় না তেমনি ভাষার রূপ আর আঙ্গিকেও আশা করা যায় না তেমন লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাতারাতি বিপ্লব ঘটতে পারে, ঘটেও থাকে, কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের আঙ্গিকে যে পরিবর্তন তা ঘটে বিবর্তনের পথে— ধীরে ধীরে, অত্যন্ত মন্থর গতিতে।

প্রয়োজন আর প্রকাশ— ভাষার এ আদি আর মৌল ভূমিকা। এ ভূমিকার তাগিদ আর তাগাদায় সাহিত্য-শিল্পেরও ঘটেছে উৎপত্তি। ভাষা সবাই ব্যবহার করে, পড়তেও পারে কিন্তু সবাই সৃষ্টি করতে পারে না। বিশেষ করে যাকে আমরা সাহিত্য বলছি তা অতি মুষ্টিমেয়রই অবদান। এ মুষ্টিমেয়রাই লেখক বা সাহিত্যিক। সাহিত্য নির্বাচিতেরই সৃষ্টি বটে কিন্তু সৃষ্টি করা হয় প্রধানতই অনির্বাচিতদের জন্য। তাহলেও সাহিত্য কিন্তু অনির্বাচিত বস্তু নয়— সাহিত্যের অবশ্য পালনীয় প্রাথমিক শর্ত 'নির্বাচন'। ভাষায়, বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে সর্বত্রই নির্বাচন প্রয়োজন। হুবহু দেশের আপামর জনসাধারণের ভাষায় সাহিত্য হয় না— বলাবাহুল্য দু'একটা বিরল নমুনা কিছুতেই ভাষা কি সাহিত্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারেন।

লেখক আর পাঠক এ দুই মিলেই সাহিত্য— এ দুই-ই সাহিত্যের ভাষাকে গড়ে তোলে, করে নিয়ন্ত্রণ। ভাষার রূপ-বদল এ দু'য়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। গায়ের জোরে, কোন রকম ক্ষমতার রোলার চালিয়ে ভাষা বা সাহিত্যে রূপ-বদল সম্ভব নয়। তেমন চেষ্টা বহু জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে। অসাধারণ প্রতিভার পক্ষে, নিচের বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে ভাষায় কিছুটা নতুনত্ব আমদানি যে অসম্ভব তা নয় কিন্তু তার জন্য তেমন প্রতিভাধর চাই। গত কুড়ি বছরে আমাদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেনি। 'জাতীয় কর্তব্য' পালনের তাগাদায়, সমভাষী অন্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, নিজস্ব একটা ভাষা-রূপ গড়ে তোলার জন্য আমরা মাঝারি আর নিম্ন মাঝারিরা যদি আমাদের সাহিত্যের চলতি ভাষাকে দ্রুত বদলাতে চেষ্টা করি তাহলে শিব গড়তে বানর গড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। খাস ইংরেজের ইংরেজি থেকে আমেরিকার ইংরেজিতে যেটুকু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যগোচর, স্বাভাবিক বিবর্তনের পথেই তা ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গীয় বা কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষা থেকে আমাদের ভাষায়ও যে স্বাতন্ত্র্য দেখা দেবে তাও এভাবে বিবর্তনের পথেই আসবে। জোর করে যেমন তা করা যাবে না তেমনি যাবে না জোর করে ঠেকানোও। কারণ যে সাহিত্য জীবনের প্রয়োজন আর প্রকাশের মাধ্যম তা জীবনকেন্দ্রিক না হয়েই পারে না। লক্ষ্যযোগ্য স্বতন্ত্র জীবনধারা যদি এখানে গড়ে ওঠে তার প্রতিফলন ভাষা আর সাহিত্যে ঘটবেই।

এখন আমি যদি এমন একটা বাক্য লিখি : আয়ন্দা জমানায় আমি আরো ওমদা ওমদা কেচ্ছা লেখার কোশেশ করব। বাক্যটা কলকাতাকেন্দ্রিক হলো না সত্য কিন্তু পুরা পাকিস্তানি হয়েছে বলেও দাবি করা যাবে না কিছুতেই। যদিও সময় সময় স্বাভাবিক ভাবে

না কথার তোড়ে আয়ন্দা, জমানা, ওমদা, কেচ্ছা, কোশেশ ইত্যাদি শব্দ আমরা যে ব্যবহার করি না তা নয়— শব্দগুলির অর্থও আমাদের কাছে পুরোপুরি বোধগম্য তবুও সত্যিকার কোন লেখক বা ভাষা-শিল্পী এমন বাক্য লিখতে নিশ্চয়ই দ্বিধা করবে। না লেখার বড় কারণ এ বাক্যে সাহিত্যের কোন আমেজ নেই আর বাক্যটা শুধু যে কৃত্রিম তা নয় বরং কিছুটা ব্যঙ্গোক্তির মতোও শোনায়। এ কারণেই সাহিত্যে 'নির্বাচন' অত্যাবশ্যক— বিষয়বস্তুর বেলায় শুধু নয়, ভাষা আর শব্দ প্রয়োগেও। বাক্যের এখানে ওখানে দু'একটি শব্দ ঢুকিয়ে দিলেই ভাষা আঞ্চলিক হয়ে ওঠে না। সব আঞ্চলিক ভাষারই একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে— তা আয়ত্ত করা তত সোজা নয়। দীর্ঘ অভ্যাসসাপেক্ষ। 'জাতীয় কর্তব্য' পালন অর্থাৎ জাতিকে জাগিয়ে তোলা, প্রেরণা দেওয়া; তার মন-মানসের খোরাক পরিবেশন করা জাতির মনে মহত্তর জীবনের অভীপ্সা আর এষণা সৃষ্টি করা এসবও সাহিত্যের যে এক বিশেষ লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই— এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। আমার বক্তব্য, ভাষার স্বাভাবিক সাহিত্যিক রূপ বজায় রেখেও তা করা যায়। যেমন নজরুল ইসলাম করেছেন। এমনকি তাঁর ভাষায় বহু দুর্বোধ্য শব্দও এসে গেছে কিন্তু তা এসেছে তাঁর স্বাভাবিক কবি প্রেরণা বাহন হিসেবে। একমাত্র সাহিত্যের ছাড়া, অন্য কোন উদ্দেশ্যমূলক ইচ্ছাই স্থান পায়নি তাঁর মনে এসব শব্দ প্রয়োগের বেলায়। তাই সব ক্ষেত্রে সহজবোধ্য না হলেও তাঁর ভাষায় আরবি-পার্সি অপ্রচলিত শব্দ কোথাও বেমানান হয়নি। তাঁর রচনায় কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি সাহিত্যধর্ম— এ কারণে মোহিতলালের মতো গোঁড়া মানুষও তাঁর রচনা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা ব্যক্ত করলাম। সাহিত্য লেখকের অভিজ্ঞতারই ফসল— আমার এ ধারণাটাও আমি অন্য এক লেখায় প্রকাশ করেছি। কোন লেখকই নিজের অভিজ্ঞতাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না— গেলে রচনা কৃত্রিম হবেই। অভিজ্ঞতারও দুই রূপ— ব্যবহারিক আর মানসিক। স্রেফ মানসিক অভিজ্ঞতা নিয়েও যে শিল্প রচিত হয় তাতেও বাস্তবের প্রতিভাস থাক চাই। সাহিত্য বা শিল্প আকাশ-কুসুম নয়— অন্তত আজকের দিনে তা অকল্পনীয়। শিল্পের জন্যও মাটির আশ্রয় আর অবলম্বন অত্যাবশ্যক। পূর্ব পাকিস্তানের এ আশ্রয় থেকে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন— তাঁদের রচনায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রভাব পড়বেই— ইচ্ছা করেও তা এড়ানো যাবে না। আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি'র কথা স্মরণ করা যাক— বইটি তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, প্রথম প্রকাশও কলকাতা থেকে তবুও ওটা কলকাতাকেন্দ্রিক বই নয়। তখনকার পূর্ববাংলার যে সময়ের আর যে অঞ্চলের আর যে মানুষ আর ভাষার অভিজ্ঞতা লেখকের তাই প্রতিফলিত হয়েছে বইটিতে। ফলে অকৃত্রিমতার একটা আমেজ আর স্বাদ ঐ রচনায় পাওয়া যায়। বইটির যেটুকু সাহিত্যিক সাফল্য তার মূলে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, যা খাঁটি আর নির্ভেজাল। মনে হয় লেখকের অভিজ্ঞতার সীমিত পুঁজি ঐ একটি বইতেই নিঃশেষিত, না হয় দীর্ঘ কুড়ি, বাইশ বছরেও তাঁর হাত থেকে আর কোন সফল উপন্যাস পাওয়া গেল না কেন?

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়, শওকত ওসমানের 'জননী' সম্বন্ধেও সে একই কথা। লেখকদের অভিজ্ঞতার ছোঁয়া যেখানে লেগেছে

সেখানেই রচনা হয়েছে সার্থক। অভিজ্ঞতা ভাষাকেও প্রভাবিত না করে পারে না— অনেক অভিজ্ঞতা ভাষাবহী বলে রচনায় তার অনুপ্রবেশ অনিবার্য। আবেগ-অনুভূতি, কল্পনা অভিজ্ঞতা এসবই সাহিত্যের প্রেরণা উৎস— কিন্তু এ সবে যদি তেমন গভীরতা, তীব্রতা তীক্ষ্ণতা না থাকে, বিশেষ করে লেখক যদি সে সবকে ভাষা দেওয়ার কোন আন্তরিক ব্যাকুলতাই বোধ না করেন তাহলেও ঐ সবের তাড়ায় সাহিত্য রচিত হতে পারে না প্রকাশের ব্যাকুলতাই প্রকাশের মাধ্যম খুঁজে নেয়। তাই কান্না-হাসির ভাষা পৃথক লেখকের হাতিয়ার, একমাত্র ভাষা। যে ভাষাই তিনি লিখুন না কেন— তাঁর চর্চা তাঁকে করতেই হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষায় লিখতে হলে— সে ভাষার বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, রূপ-রস ভঙ্গি সবকিছুই আয়ত্ত করা চাই। এখানে প্রশ্ন অন্তরায়— পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলার ভাষা এক নয়। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে খাস ঢাকার ভাষা আরো অনুপযোগী। কাজেই সার্বজনীন বোধগম্য ভাষাতেই আমাদের লিখতে হয় এবং তাই আজো আমাদের সাহিত্যের ভাষা কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষার কাছাকাছি। এ ভাষাকে হয়তো একদিন ঢাকাকেন্দ্রিক বলা যাবে যদিও এর অধিকাংশ লেখক ঢাকার বাইরের লোক অর্থৎ ঢাকায় বসবাসকারী সাহিত্যিকদের আর ঢাকা থেকে প্রকাশিত বই-পুস্তকের ভাষাকেই তখন হয়তো বলা হবে ঢাকা-কেন্দ্রিক। কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষা থেকে এ ভাষার তফাৎ কতটুকু হবে তা আগাম বলার উপায় নেই। তবে আমার বিশ্বাস লক্ষ্যযোগ্য তেমন কোন তফাৎ হবে না— তফাৎ যা তা বিষয়-বস্তুতেই বেশি করে সীমিত থাকবে। এ তফাৎও ঘটবে অভিজ্ঞতার তারতম্যের জন্যই।

রাষ্ট্রীয় আর সামাজিক বিবর্তনের ফলে জীবনের রূপ আর চেতনায় যে তারতম্য দেখা দিয়েছে ও দেবে তার প্রতিফলন কথাসাহিত্যে না ঘটে পারে না। কিন্তু প্রকাশে তথা ভাষায় আর আঙ্গিকে তা খুবই মন্থরগতি হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিকদের রচনার দিকে তাকালেই তা সহজে বুঝতে পারা যাবে। শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কাজী আফসার উদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সরদার জয়েনউদ্দীন, আলাউদ্দীন আল-আজাদ প্রমুখ কথাশিল্পী আজাদির আগে যে ভাষায় লিখতেন এখন যে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাষায় লেখেন তা নয়। তাঁদের কারো ভাষারূপে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আজো দেখা যায়নি। কারো কারো রচনা বিশেষে আগের চেয়ে উর্দু, পার্সি শব্দের আধিক্য দেখা গেলেও তাকে ভাষারূপে বিবর্তন বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরাও হারহামেশাই তা করেছেন— এখনো করেন। রবীন্দ্রনাথ নৌকা অর্থে 'কিস্তি', অবনী ঠাকুর স্বাদের বদলে 'সোয়াদ' 'মজা' বহু জায়গায় ব্যবহার করেছেন (যদিও এ দুই শব্দ পূর্ব বাংলাতেই বেশি করে চলতি) সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলালও দেদার আরবি-পার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁদের কবিতায়। বিনয় সরকার গদ্যে— সাম্যবাদী লেখকরা প্রায় সব রচনাতেই।

উপরে যে কয়জন কথাসাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করলাম, তাঁদের ভাষা-রূপে এমনকি মনঃভঙ্গিতেও উত্তর-আজাদিযুগে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিবর্তন না ঘটার কারণ কি? এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর একটা উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ

ভাষার রূপবদল দ্রুত ঘটে না, ঘটা সম্ভবও নয় দ্বিতীয়ত সাহিত্য এমন এক মানসক্রিয়া যার পেছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি অ'র দীর্ঘ অভ্যাস প্রয়োজন— বলাবাহুল্য সে প্রস্তুতি আর অভ্যাস পুরোপুরি আমাদের প্রায় সব কয়টি উল্লেখিত সাহিত্যিকের আজাদি-পূর্বযুগেরই। তার মানে অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যের। তাঁদের রচনা তথা তাঁদের ভাষা সে প্রস্তুতি আর অভ্যাসেরই ফলশ্রুতি। টি. এস. ইলিয়ট জন্মভূমি আমেরিকা ছেড়ে ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণের পরও তাঁর ভাষা একই রয়ে গেছে— তাঁর রচনা আর তাঁর আঙ্গিক মোটেও বিচ্ছিন্ন হয়নি পূর্ব ধারা থেকে। আমাদের লেখকদের বেলায়ও অবিকল তাই সত্য হয়েছ। এঁদের মন-মানস ও শিল্পবোধ যে মানসভূমিতে হয়েছে লালিত, এমনকি কারো কারো বেলায় পেয়েছে পরিণতি— তা কি তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া কিংবা মন-মানস থেকে এত শীঘ্র মুছে ফেলা সম্ভব? সাহিত্য-শিল্পের প্রভাব অলক্ষ্য, অনুচ্চারিত— অদৃশ্য এক ফল্গুধারা, এমনকি অনেক প্রভাবিতজনও সে সম্বন্ধে অচেতন। শিশু জন্মের আগে মাতৃবুকে তার খোরাক সঞ্চিত থাকে, আজাদির আগে আমাদের সাহিত্যিকদের জন্য তেমন কোন মানস খোরাক পূর্ব পাকিস্তানের বুকে সঞ্চিত ছিল না। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানস জীবন গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। আজো এ অবস্থার তেমন ইতর বিশেষ ঘটেনি। আমাদের আজাদির আগের আর পরের ভাষা এক বলে— এখানকার ভাষাকে স্বতন্ত্র রূপ দেওয়ার তেমন কোন তাগাদা বা প্রয়োজনও বোধ করেননি কেউই। উর্দুর বেলায়ও অবিকল তাই হয়েছে— ভারতের দিল্লি, লক্ষ্ণৌ কি হায়দ্রাবাদে যে উর্দু লেখা হয় তার সঙ্গে লাহোর, করাচির উর্দুর কোন তফাৎ নেই। আঞ্চলিক বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে আঞ্চলিক শব্দ ভাষার অপনা থেকে স্থান গ্রহণ করে। বাংলা উর্দু উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই এ সত্য— বিশেষ করে কথাসাহিত্যের ভাষায় এ প্রায় অনিবার্য।

এ কুড়ি বছরে যে কয়জন প্রতিশ্রুতিশীল নবীন লেখক-লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছে এখানে— কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষার সঙ্গে যাঁদের কোন সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়, তাঁদের গল্প উপন্যাসের ভাষায়ও তেমন কোন স্বতন্ত্র রূপ দেখা দিয়েছে বলে মনে হয় না। বরং তাঁদের কারো কারো ভাষা অধিকতর পশ্চিমবঙ্গীয় ঘেঁষা। এর কারণ কি? কারণ, আজো এখানে তাঁদের মানস খোরাকের তেমন কোন দরাজ ব্যবস্থা হয়নি— এমন কোন সাহিত্য রচিত হয়নি যা তাঁদের মানস চেতনাকে স্বতন্ত্র রূপ-রেখায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাঁদের শিল্পবোধ আর সৌন্দর্য-চেতনা তাই বিদেশী সাহিত্যকর্ম আর সাহিত্যাদর্শেই তৃপ্তি খোঁজে। এ কারণেই বিদেশের জটিলতাকেও এঁদের কেউ কেউ অনুকরণীয় মনে করেন। যদিও এ জটিলতা অন্য দেশের সাহিত্য থেকে ধার করা— আমাদের পরিবেশ থেকে যার উদ্ভব নয় মোটেও। এ অবস্থায় স্ববিরোধিতা অনিবার্য। অবশ্য জীবনও আজ আমাদের তাই। জীবনে আমাদের আজ সংগতি নেই— জীবনের বহির্ভাগে আমরা দ্রুত বদলে যাচ্ছি, নিঃসন্দেহে এ আজাদির দান। কিন্তু মন-মানসে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি আজো আমাদের। পূর্ব পাকিস্তানে সমাজ পরিবর্তনের স্বরূপ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কমর উদ্দীন আহমদ তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'The Social History of East Pakistan' গ্রন্থে। গ্রন্থের শেষের দিকে তিনি মন্তব্য করেছেন : All these changes are perceptible mostly in urbar, areas where Society is more cosmopolitan but there is scarcely any change in the rural

areas as yet where eighty percent of the population lives. They have still no idea of making up their appearance and they do not as yet make any conscious effort to render themselves attractive. The change would come— but it seems it would take time, because their sisters in the cities who have accepted modern fashion, are not still stable. (P. 181)

কথাগুলি মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হলেও পুরুষদের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর শেষ কথা : East Bengal is changing— the dress of the people is changing— the food habit is changing— way of life is changing and they are all changing fast. It is difficult to keep pace with these changes unless they are inclined to accept the old adage 'Old order changeth yielding place to new." (P. 1182)

এখানে লেখক যেসব পরিবর্তনের ইংগিত করেছেন, লক্ষ্য করার বিষয়, তা সবই বাহ্যিক। বাহ্যিক পরিবর্তন দ্রুত হতে বাধা নেই— জামা-কাপড় মুহূর্তেই বদলানো যায়। কিন্তু মন-মানসের সঙ্গে যার সম্পর্ক তা অত সহজে আর অত দ্রুত বদলায় না— চেষ্টা করেও যায় না বদলানো। ভাষার একটা বাহ্যিক অবয়ব আছে বটে কিন্তু ভাষার সম্পর্ক মানুষের ভিতরের সঙ্গে তথা অন্তর্লোকের সঙ্গেই বেশি। কাজেই যে অন্তর্লোকে বিনাট পরিবর্তন সূচিত না হলে ভাষায় পরিবর্তন ঘটবে না। ভাষায় অত সহজে পরিবর্তন ঘটে না। এ পরিবর্তনের জন্য লেখকের প্রস্তুতি যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি অত্যাবশ্যক পাঠকের চাহিদাও এবং বৃহত্তর সমাজ পরিবেশও। লেখকের প্রস্তুতির প্রধান অঙ্গ তাঁর অভিজ্ঞতা একথা আগেই বলেছি। শতকরা আশি জনের জীবন যখন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে তখন তার প্রকাশেও রূপান্তর না ঘটে পারে না। কারণ জীবনের চেহারাই সেখানে আলাদা।

শওকত ওসমান 'ক্রীতদাসের হাসি' আর ইদানীংকার বহুগল্পে যে অতি বেশি সাধু ব্যবহার করেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত মনোভঙ্গির পরিচায়ক, পূর্ব পাকিস্তানি ভাষা-রূপের বৈশিষ্ট্য ওটি নয়। বরং এ কারণে তাঁর ভাষা কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়। তা সত্ত্বেও বর্ণনা কৌশল আর চমৎকার কাহিনী বিন্যাসের জন্য তাঁর গল্প সর্বসময় আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

ভাষায় বিবর্তন বা রূপ-বদল কতখানি খাঁটি তা জানার একটা উপায় হচ্ছে সমসাময়িক অন্যান্য লেখকরা, বিশেষ করে তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল লেখকরা তাঁর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হচ্ছে কতটুকু তারা অনুসরণ করছে এ ভাষা, তা যাচাই করে দেখা। এছাড়া ভাষায় রূপ-বদল বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুতেই সফল হতে পারে না। শওকত ওসমানের ভাষার কোন অনুকারক আমি আজো দেখিনি। মনে হয় আমাদের মধ্যে একমাত্র শওকত ওসমানই ভাষা নিয়ে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন— বিশেষ এই কারণেই তাঁর কথা এখানে বেশি করে উল্লেখিত হলো। বাংলা ভাষার সাধু-রূপের খোলস ছেড়ে কথ্য-রূপে উত্তরণ সহজ হয়েছিল এ কারণে যে তা স্রেফ প্রমথ চৌধুরীতে সীমিত ছিল না— রবীন্দ্রনাথ যেমন তা গ্রহণ করেছিলেন তেমনি পরবর্তী প্রতিশ্রুতিশীলরাও।

অনুসরণ করেছিলেন আন্তরিকতার সাথে আর সে অনুসরণের ধারায় ছেদ পড়েনি কখনো। এভাবেই তা স্থায়িত্ব পেয়েছে ভাষায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বিদ্যাসাগরে, বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথে— রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক সাহিত্যিকদের ভাষা-রূপে যে বিবর্তন দেখা যায় তা এভাবেই ঘটেছে— অর্থাৎ যোগ-বিয়োগ আর ব্যাপক অনুসরণের পথেই তা বর্তমান রূপে এসে ঠেকেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-রূপেও কালক্রমে যে পরিবর্তন ঘটবে তাও বিবর্তনের এ ধারা বেয়েই ঘটবে।

ভাষা সামাজিক উপকরণ— সামাজিক যন্ত্র, সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে তারও বিবর্তন ঘটে, না ঘটে পারে না। সমাজ আমাদের আজ অস্থির, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ অস্থিরতা আরো বেশি। এ অবস্থায় লেখকদের পক্ষে স্থির কোন মানস-দৃষ্টির সন্ধান সম্ভব নয়— এমন নৈরাজ্যিক লক্ষ্যহীনতার মাঝে ভাষার কোন সুনির্দিষ্ট রূপ আশা করা যায় না। মনের ভিতর কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দানা বেঁধে উঠলে ভাষায়ও তার প্রতিফলন অনিবার্য। আজাদী-উত্তর যুগেও আমরা এ লক্ষ্যহীনতা রোগেই ভুগছি— তাই সাহিত্য যেমন আমাদের আজো বিচিত্র ভাববাহী হয়ে ওঠেনি তেমনি প্রকাশেও এখনো তেমন কোন বৈচিত্র্য বা নতুনত্ব দেখা দেয়নি আমাদের ভাষায়। এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না— সমাজ একদিন সুস্থির রূপ নেবেই, তখন লেখকরাও খুঁজে পাবে একটি সুনির্দিষ্ট মানস-আশ্রয়। তখন ভাবের সাথে সাথে ভাষারূপেও বিবর্তন ঘটবেই।

১৯৬৭

সমালোচনা

আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা শাখা অত্যন্ত দরিদ্র, দুর্বল আর অবৈজ্ঞানিক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দুর্বলতা— বিচারবিমুখিনতাও এ সামগ্রিক দুর্বলতারই হয়তো আনুষঙ্গিক। এর পেছনে সঙ্গত কারণ নিশ্চয় আছে। সমালোচনায় আমাদের দেশে শুধু যে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা শত্রুতায়ও হয় পরিণত। লেখকদের পক্ষে শত্রু বাড়াতে না চাওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই সমালোচনার ক্ষেত্রে 'সাপও মরুক লাঠিও না ভাঙুক' এ নীতিই আমরা অনুসরণ করে থাকি। এতে সমালোচনার আসল উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে। সমালোচনা সাহিত্য-পত্রিকার এক বিশেষ অংশ হওয়া উচিত— দুঃখের বিষয় আমাদের কোন পত্রিকাই সচেতন দায়িত্ববোধের সাথে এ কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। হয়তো ইচ্ছা থাকলেও পারছে না পালন করতে। পরিমিত ও গণা লেখকের উপর নির্ভর করে যেখানে পত্রিকা চালু রাখতে হয় সেখানে স্বভাবতই সম্পাদকরা লেখক হারাতে চান না। নিয়মিত সমালোচনা বিভাগ চালানোর পথে এও হয়তো এক অন্তরায়। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত সমালোচকের অভাব। প্রচার-প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নতুন নতুন লেখক তৈয়েরি যেমন সম্পাদকের এক দায়িত্ব তেমনি সমালোচক তৈয়েরির দায়িত্বও তাঁর। দায়িত্ব কথাটা এখানে সাধারণ অর্থে অর্থাৎ সুযোগ-সুবিধা ও তাগাদা দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া অর্থেই ব্যবহার করা হলো। না হয় আমি জানি— অন্তরে সাহিত্যের অসীম প্রেরণা আর শিল্পের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধ না থাকলে কারো পক্ষে সত্যিকার অর্থে লেখক বা সমালোচক হওয়া যায় না। বলাবাহুল্য সমালোচনাও এক রকম সৃষ্টি। সৃষ্টি কথাটাও শুধু যে বিভ্রান্তিকর তা নয় তার পরিধি-ব্যাপ্তিও অসীম। বহু নাম-করা ও অসন্দিগ্ধ সাহিত্য-স্রষ্টাও যে দেদার সমালোচনা লিখেছেন তা নিরর্থক নয়। তাঁদের সৃষ্টি-প্রেরণাও মাঝে মাঝে সমালোচনায় খুঁজেছে মুক্তি। এমন খাঁটি স্রষ্টা খুব কমই আছেন যিনি সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনায়ও হাত দেননি। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথ, টি. এস. ইলিয়ট তার সাক্ষাৎ নজির।

সৃষ্টি আর সমালোচনা হাত ধরাধরি করে না চললে সাহিত্য কিছুতেই সমৃদ্ধ হতে পারে না— এমনকি সৃষ্টি আর সমালোচনার গতি দ্বান্দ্বিক হলেও ক্ষতি নেই। দ্বন্দ্বের মাঝে থাকে সৃষ্টির নতুন প্রেরণা। সমৃদ্ধ সাহিত্য মানে সমৃদ্ধ সমালোচনাও। এ ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যের তুলনা নেই। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে আর সমৃদ্ধতর— এ শুধু ওদের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ফল নয়। ওদের সমালোচনা-সাহিত্যও আমাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। গদ্যে ওদের প্রথম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র একজন সমালোচকও ছিলেন। সৎ ও নিষ্ঠাবান অনেক সমালোচক— তার মধ্যে অনেকে মৌলিক রচনায়ও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, অহরহ ওখানকার সাহিত্যের নিয়ত মূল্যায়ন করছেন। ফলে ওখানে বেশ বলিষ্ঠ এক সমালোচনা-সাহিত্যও গড়ে উঠেছে। এ সব সমালোচকদের অধিকাংশই অধ্যাপক— এ কোন ব্যতিক্রম নয়, সব দেশেই সাহিত্যের অধ্যাপকরা পঠন-পাঠনের সাথে সাথে সাহিত্য-সমালোচনার দায়িত্বও পালন করে থাকেন। সহিত্যের গঠন প্রকরণ ও শিল্পমূল্যায়ন তাঁদের পেশার অন্তর্ভুক্ত।

দায়িত্ব পালন তাঁদের পক্ষে, বিশেষ করে পরিশ্রমী অধ্যাপকদের পক্ষে কিছুটা সহজও হয়ে থাকে। শিক্ষা ও সাহিত্যের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবোধ আমাদের পক্ষে নতুন আশা করা যায় কালক্রমে আমাদের অধ্যাপকরাও তাঁদের এ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেন আর পেশার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণকেও অতিরিক্ত একটা নেশায় পরিণত করবেন তাঁরা। অবশ্য সবার পক্ষে যে এ সম্ভব তা নয় কিন্তু যাঁদের পক্ষে সম্ভব ও যাঁদের প্রবণতা আর যোগ্যতা রয়েছে তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের শ্রম স্বীকার করবেন না কেন?

আমাদের অধ্যাপকদের কেউ কেউ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন— নিঃসন্দেহে এসব মূল্যবান অবদান। সমালোচনার জন্যও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে। উপকরণ ছাড়া সমালোচনা বা মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অন্তত অতীত উপকরণের জন্য আমরা আমাদের এসব ঐতিহাসিকদের কাছে ঋণী। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস যেমন আছে তেমনি সাহিত্যের ভূগোলও আছে। এ ভূগোল রচনার দায়িত্ব সমালোচকদের। দেশের বিভিন্ন এলাকা আর নদনদীর নাম যেমন ভূগোল নয় তেমনি নাম ফিরিস্তি বা ঘটনার ধারা বর্ণনাও সমালোচনা নয়। এখন ভূগোল একটা বিজ্ঞানে পরিণত, সমালোচনায়ও সাহিত্যের বিজ্ঞাপন। তবে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিকের বটে কিন্তু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-রসিক তথা শিল্পবোদ্ধাও হতে হয়। সমালোচকের জন্য দুটি শর্ত অপরিহার্য— এক, তাঁকে শিল্পী বা শিল্পসমঝদার হতে হয়, দ্বিতীয়ত, তাঁকে হতে হয় চিন্তাশীল, ইংরেজিতে যাকে বলে Thinker। এ দুই গুণ ছাড়া ভালো সমালোচক হওয়া সম্ভব নয় বলেই আমার বিশ্বাস। শিল্প সমালোচককে শিল্পসমঝদার হতে হবে এ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ কথা কিন্তু চিন্তাশীল কেন হতে হবে এ নিয়ে কিছু খটকা থাকা হয়তো সম্ভব। সব শিল্পকর্মই শিল্পীর সৌন্দর্য-চেতনা তথা aesthetic experience-এরই ফলশ্রুতি— এ চেতনা বা অভিজ্ঞতার পেছনে চিন্তা সব সময় সক্রিয়। চিন্তার সাহায্যেই অভিজ্ঞতা শিল্পে রূপায়িত হয়। জীবন থেকে বা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যেমন শিল্পের উৎপত্তি তেমনি শিল্পের লক্ষ্যও জীবন অর্থাৎ জীবনের জন্যই শিল্প। সমালোচকের চারদিকে আবর্তিত বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে রচিত শিল্পের সাযুজ্য কতখানি, তার মূল্যওবা কতটুকু, এসবের মাপকাঠি একমাত্র চিন্তাবিদদেরই হাতে। আর চিন্তাই দিয়ে থাকে অনুভূতি আর চেতনাকে তীক্ষ্ণতা— কালের গতিধারা আর ভবিষ্যৎ রূপ-কল্প একমাত্র চিন্তাবিদের ধারণায় দিতে পারে ধরা। মূল্যবোধও স্থাণু নয়— কালের সঙ্গে সঙ্গে তারও রদ-বদল অনিবার্য। জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে চিন্তার কষ্টিপাথরেই এ সবের যাচাই সম্ভব। তাই শিল্পকর্মে মূল্যবোধের প্রতিফলন কতটুকু হয়েছে না হয়েছে, জীবনের সঙ্গে তার মৈত্রী বা বৈরিতা বিচারের জন্য শিল্পবোধের সঙ্গে চিন্তাশীলতাও অত্যাবশ্যক। কোন শিল্পই অসীম, বেপরওয়া বা উদ্ধত কি উদ্ভট নয়— চিন্তাই শিল্প রচনা আর শিল্পবিচারে দিয়ে থাকে পরিমিতবোধ। সমালোচককেও তাই একাধারে শিল্পী আর চিন্তাশীল হতে হয়। শিল্পবোধ সমালোচককে পদ্মবনে মত্ত হাতি হতে বাধা দেয় আর চিন্তাশিল্পের দিগন্ত উপলব্ধিতে করে সহায়তা।

সৌন্দর্য-চেতনাকে জাগানোই শুধু শিল্পের কাজ নয়, আত্মানুসন্ধান তার প্রধানতম দায়িত্ব। মানুষের আত্মাকে উন্মোচন করে মানুষকে তার মুখোমুখি দাঁড় করানোই শিল্পের কাজ। এ সম্পর্কে বার্নাড শ'র মন্তব্য : ... ... 'art is the magic mirror you

make to reflect your invisible dreams in visible pictures. You use a glass-mirror to see your face : you use works of art to see your 'soul.' (Back to Methuselah)

সমালোচক নিজে শিল্পী হলেই শিল্পের এ বৃহত্তর ভূমিকা তিনি উপলব্ধি আর ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। শিল্পের শিল্পগত গুণে সমালোচক নিজে সাড়া দিতে পারলেই সেদিকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। বলাবাহুল্য সমালোচকের এটিই বড় দায়িত্ব। রচনার শৈল্পিক গুণ বা সাফল্যের দিকে অনেক সময় সাধারণ পাঠকের নজর পড়ে না। সমালোচকের নিজের অনুভব-অনুভূতি ও বিচার-বিশ্লেষণ-শক্তি যদি সযত্নে অনুশীলিত হয় তাহলেই আলোচনা আর উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি অবহেলিত ও অস্বীকৃত শিল্পকর্মকে পাঠকদের কাছে পরিচিত করে তুলতে পারেন। রচনা বিশেষ কোনো ভালো তার ব্যাখ্যা আর ভাষ্যে তিনি না এগুলেও ক্ষতি নেই— ভালো দিকটা আবিষ্কার করে সেদিকে পাঠককে সজাগ করে তুলতে পারলেই তাঁর কর্তব্য সমাধা হয়। টি.এস. ইলিয়টের মতেও সমালোচকের কাজ হচ্ছে সাহিত্য বা শিল্প-বোধ তথা understanding-কে জাগ্রত করা, ভালো-মন্দের রায় দিয়ে গ্রহণ বা বাতিল করা তাঁর দায়িত্ব নয়। মনে হয় ক্লাসিক্স-এর সাথে পরিচয় আর অন্তরঙ্গতা থাকলে সৎ-সাহিত্যের আবেদনে সাড়া দেওয়া সমালোচকের পক্ষে হয় সহজ। সমালোচকের জন্য সাড়া দিতে পারাটাই বড় কথা— তিনি নিজে সাড়া দিতে পারলেই না তবে পাঠকের মনেও তিনি সাড়া জাগাতে পারবেন।

অবশ্য শিল্প আর মানুষ দুইয়েরই রয়েছে সীমা— সে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার মানুষ নিজের মতামতের সীমায়ও আবদ্ধ। নৈর্ব্যক্তিক হওয়া যতই প্রশংসনীয় হোক— পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক কেউই হতে পারে না। সাহিত্যে-শিল্পে রচয়িতার মতামত প্রতিফলিত হবেই। "It is impossible to be an impersonal artist in literature. if you are an artist at all. (M. Murray) কাজেই সমালোচনার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-মনের এ সীমাবদ্ধতার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েই আমরা নিরপেক্ষতার দাবি জানাব। তিনি বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারেন, আত্মনিরপেক্ষ হবেন কি করে?

সাহিত্যে যাকে Critical record বলা হয় আমাদের সাহিত্যে তেমন সমালোচনামূলক ইতিবৃত্ত আজো গড়ে ওঠেনি। এখন অন্তত তার সূচনা হওয়া উচিত। তা না হলে আমাদের সাহিত্যের সঠিক কোন খতিয়ান পাওয়া যাবে না— আর ফলে আমাদের সাহিত্যে থেকে যাবে বিভ্রান্তি, এমনকি লেখকেরাও নিজেদের শিল্প-মূল্য সম্বন্ধে থেকে যাবেন অজ্ঞ। খাঁটি সমালোচনায় লেখকও নিজেকে খুঁজে পান— অনেক সময় তেমন রচনায় নিজেকে আবিষ্কার করে বিস্মিতও কম হন না তিনি। সমালোচনা লেখকের জন্যও অত্যাবশ্যক। লেখককে খুঁজে বার করেন, আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন সমালোচক।

সমালোচনাকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়— গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক। বলাবাহুল্য এও অনেকখানি মন-গড়া বিভাগ। রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যাপক আর নির্বিচার ব্যবহারের ফলে এ দুই শব্দের অর্থ আর প্রয়োগ নিয়েও যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে

পারস্পরিক স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখা হয় বলেই উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এ দুই শব্দের। সাহিত্যে আমরা গুণগ্রাহিতাকেই মোটামুটি গঠনমূলক সমালোচনা বলতে পারি আর স্রেফ নির্জলা নিন্দামূলক সমালোচনাকে বলতে পারি ধ্বংসাত্মক। ধ্বংসাত্মক বা নিন্দামূলক সমালোচনাও একেবারে ব্যর্থ নয়— তারও কিছু সুফল রয়েছে। তাতে লেখক আরো সতর্ক, সচেতন ও তীক্ষ্ণ হন— লেখাকে আরো উন্নত করার একটা প্রেরণাও যে তিনি তখন বোধ না করেন তা নয়। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক রেমন্ড উইলিয়ামসের নিম্নলিখিত মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : 'Yet there is an essential place, in development of a literature, for cristicism of the kind that is usually called destructive. The large body of destructive criticism of the last seventy years was fundamentally necessary to the reform of the drama. (Drama from Ibsen to Illiot). কাজেই কোন সমালোচনাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়। উপেক্ষাই সাহিত্যের জন্য মারাত্মক। আমাদের যেটুকু সাহিত্য হয়েছে ও হচ্ছে তার কোন মূল্যায়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ হচ্ছে না। তা প্রায় উপেক্ষিত হচ্ছে, হচ্ছে অবহেলিত। এটা আশঙ্কার কথা। এ কারণে সাহিত্যে প্রবীণ রুচির একটা মানদণ্ড আমরা খুঁজে পাচ্ছি না— সমালোচক সে মানদণ্ড নির্মাতা।

সাহিত্য বনাম প্রকৃতি চেতনা

আমাদের ঋতু পরিবর্তনের দেশ— প্রাচীন বিবরণ মতে প্রতি দুই মাস অন্তর আমাদের দেশে ঋতুর রূপান্তর ঘটে। অর্থাৎ বছরে ছ'বার ঋতু বদল ঘটে আমাদের প্রকৃতিতে। প্রাচীন সাহিত্যে আমরা 'বারমাসী' নামে একটা সাহিত্য রীতির সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি— তাতে বিভিন্ন ঋতুর একটা ছবি যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় ঋতু পরিবর্তনের প্রভাবে নায়ক-নায়িকার মন কিভাবে দোল খায় তারও পরিচয়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি সে যুগের মানুষ কতখানি সচেতন আর অনুভূতিশীল ছিল। প্রকৃতির রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আবেগ-অনুভূতি দোল খেত, উঠত অনুরণিত হয়ে। সে যুগের শিল্পীর জন্য এও ছিল এক বড় ক্ষেত্র— উপরন্তু এ প্রকৃতি আর তার রূপ-বদল পাঠক আর শ্রোতারও পরিচিত ছিল বলে তারাও এ থেকে আনন্দ পেত প্রচুর।

যন্ত্র সভ্যতা আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে বটে কিন্তু হরণ করেছে প্রকৃতিকে দেখার চোখ আর অনুভব করার মন। আমাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ আমরা অনেক বেশি সচেতন। প্রকৃতির দিকে ফিরে তাকাবার অবসর নেই আজ আমাদের— এমনকি আমাদের কবিরাও আজ প্রকৃতিবিমুখ। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা লেখা আজ অনেক আধুনিক কবির কাছে রীতিমতো মানহানিকর।

গোড়া থেকে প্রকৃতিকে দেখা ও জানার শিক্ষা আমরা পাই না— আমাদের শিক্ষা রীতির এ এক বড় ত্রুটি বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের গাছ-গাছড়া আর পাখ-পাখির দেশ কিন্তু আমরা আমাদের দেশের কয়টা গাছ বা কয়টা পাখির নাম জানি? গ্রামে যারা মানুষ হয়েছে পরিচিত গাছ বা পাখির যতটা নাম তারা জানে, শহরের ছেলেরা সেটুকুও জানে না। এমন তরুণ কবি ঢের আছে, যারা হার-হামেশা কৃষ্ণচূড়া কথাটা কবিতায় ব্যবহার করে থাকে অথচ দেখেনি কৃষ্ণচূড়া জীবনে, এমনকি ধরতে পারে না কৃষ্ণচূড়া আর শিরিষের পার্থক্য! অনেকে হিজল গাছ আদৌ দেখেনি কিন্তু হরদম ব্যবহার করে থাকে কবিতায়— যেহেতু জীবনানন্দ দাশ ব্যবহার করেছেন! জীবনানন্দ দাশ পূর্ব বাংলার গ্রাম দেশের মানুষ— এখানকার গাছ-গাছড়া আর খাল-বিল ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার নখদর্পণে আর তা প্রায় মিশে গিয়েছিল তাঁর রক্তের সঙ্গে। ফলে তাঁর প্রয়োগ কোথাও কৃত্রিম হয়নি। আমি এমন বহু নাম-বাচক শব্দের উল্লেখ করতে পারব যা জীবনানন্দের পরে বাংলা কবিতায় ব্যাপক চালু হয়েছে অথচ তাঁর অনুকারীদের অনেকের সে সম্বন্ধে না আছে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান, না আছে কোন অভিজ্ঞতা। এ যেন কবিতা পড়ে কবিতা লেখা। অন্য কবির কবিতা থেকেই এর উৎপত্তি— কবির নিজের হৃদয় বা অভিজ্ঞতা থেকে মোটেও নয়। এ স্রেফ কাগজের ফুল তৈরেরি।

আমি কৃষ্ণনগর কলেজে থাকতে একবার প্রথম কি দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র নেতা দিতে উঠে বুর্জোয়াদের বাপান্ত করে ছাড়ছিল, হঠাৎ শ্রোতাদের একজন দাঁড়িয়ে [illegible] বলে উঠল, বুর্জোয়া শব্দটা বানান করো দেখি? আশ্চর্য, অনলবর্ষী বক্তার মুখ থেকে আর একটি কথাও বেরুল না— বক্তৃতার সব উত্তাপ আর স্রোত ওখানেই পেল মুহূর্তে থমকে

জ্ঞানের একটি Basic বা মৌল ভিত আছে তা আয়ত্ত না করে জাহির করতে গেলে এমন বেসামাল অবস্থায় পড়তে হয়।

আমরা অনেকে রচনায় বাবলা কাঁটার উল্লেখ করে থাকি কিন্তু জীবনে হয়তো বাবলা গাছ কখনো দেখিইনি। আমাদের এ অঞ্চলে বাবলা গাছ সাধারণত দেখা যায় না বোধকরি হয়ও না। আমি প্রথম দেখি কৃষ্ণনগর গিয়ে। গর্জন গাছ শহরে এবং আশপাশে প্রচুর তবুও অনেক ছেলে ঐ গাছ চেনে না, পারে না বলতে কখন ঐ গাছে ফুল ফোটে বা দেখতে কেমন ঐ ফুল। সাহিত্য-শিল্পেরও রয়েছে দুটা দিক— একটা জ্ঞান আর একটা আবেগ-অনুভূতির দিক। জ্ঞানের খুঁটি বেয়েই আবেগ-অনুভূতির ফুল-পল্লবেই জ্ঞান হয়ে ওঠে শিল্প বা শিল্পের উপকরণ। আবেগ-অনুভূতি বায়ুভুখ বা বায়ুবিহারী নয়— সে সবেরও অবলম্বন চাই, সে অবলম্বন জোগায় জ্ঞান বা জানা— চারদিকের সব কিছুকে জানা।

আমাদের দেশে ঋতুর সেরা ঋতু বসন্ত। এ ঋতুতেই দক্ষিণ দিক থেকে মলয় হাওয়া বইতে থাকে, গাছে গাছে ফোটে ফুল, গজায় নতুন পত্র-পল্লব। শোনা যয় মৌমাছির গুন্ গুন্— কোকিলের কুহু স্বর। প্রকৃতি ধারণ করে নতুন বেশ। মানুষের দেহমনও হয়ে ওঠে চাংগা ও সচেতন। সজীব মন একটা নবতর দোলা বোধ না করে পারে না এ ঋতুতে। তাই মন চায় এ সময় কিছুটা উৎসবমুখর হতে। এ উৎসবের পেছনে লাভ-লোকসানের কোন হিসাব নেই— এ স্রেফ অকারণ আনন্দ। আমাদের চারদিকের প্রকৃতিই জোগায় এর প্রেরণা। যে প্রকৃতি বা ঋতুবদলের কাছে আমরা এতখানি ঋণী তার রূপ আর স্বরূপ আরো ভালো করে জানা কি আমাদের উচিত নয়? যখন এ জানার ফলে এ সবকে আমরা আরো যথাযথভাবে সাহিত্য আর শিল্পের বিষয়বস্তু করে নিতে পারব? কোন ঋতুতে কোন কোন গাছে ফুল ফোটে নতুন পাতা গজায় আর কোন ফুলের কি রঙ কি রকম গন্ধ তা জানা দরকার—এসব হওয়া উচিত শিক্ষার অঙ্গ। স্কুল-কলেজে আমরা বিশ্বভুবনের পরিচয় লাভ করছি অথচ নিজের দেশ ও নিজের দেশের প্রকৃতিকে জানার কোন চেষ্টা করি না। জীবনের প্রতি একি এক অদ্ভুত ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নয়? স্বদেশপ্রেমের ভিত রচিত না হয় তাহলে বালির প্রাসাদের মতোই তাও হবে অস্থায়ী আর এমন স্বদেশপ্রেমের একমাত্র পুঁজি বাকর্সবস্বতা। যার প্রদর্শনী আমরা রোজই দেখতে আর শুনতে পাচ্ছি চারিদিকে।

রবীন্দ্রনাথ সব ঋতু নিয়েই কবিতা আর গীতিনাট্য লিখেছেন। নজরুলের বহু কবিতা আর গানেরও বিষয়বস্তু দেশের ঋতু-বৈচিত্র্য। এঁরা দেশের সব ঋতু সম্বন্ধেই ছিলেন সচেতন। বলাবাহুল্য সচেতনতাই সব রকম শিল্প-সাহিত্যের মূল উৎস।

১৯৬৭

ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি দ্য গল হতে পারতেন

॥ ১॥

দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় পণ্ডিত নেহরু তা হতে পারেননি, অথচ তাঁর মধ্যেই ছিল হতে পারার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা। স্বদেশপ্রেম আর মানবপ্রেমের প্রচুর পরিচয় তিনি দিয়েছেন, বিশেষ করে তাঁর জীবনের প্রাক্ প্রধানমন্ত্রিত্বের যুগে। শুধু স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য নয়, অন্যান্য পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতিও তিনি ছিলেন সবচেয়ে সহানুভূতিশীল, ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল সবচেয়ে উচ্চরোল। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ভূমিকার ইতর-বিশেষ ঘটেনি তেমন। বিশ্ব রাজনীতি আর তার প্রতি মোড়-বদল সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা ওয়াকিফহাল। এমনকি তাঁকে কেউ কেউ বিশ্ব-নাগরিক বা আন্তর্জাতিকতাবাদী বলেও মনে করতেন। এহেন নেহরুও কাশ্মীর আর চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আর সংঘর্ষের ব্যাপারে ক্ষুদ্র জাতীয়তা আর তার থেকে উদ্ভূত অহমিকার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। পাক-ভারত চীন তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ এক মস্ত বড় ট্রাজেডি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু আর ঔপনিবেশিক-বিরোধী, সংগ্রামী নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন অদ্ভুত বিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিক কারণ মনস্তাত্ত্বিকরাই সন্ধান করবেন, আমরা শুধু তাঁর এ পরস্পরবিরোধী ভূমিকার ফলে, বিশেষ করে পাক-ভারতের অগণিত মানুষের জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন আর অনিশ্চয়তা নেমে এসেছে তার দিকে পাক-ভারত সম্প্রীতিকামীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি মাত্র।

একমাত্র কাশ্মীর সমস্যাই ভারত আর পাকিস্তানের সম্পর্ককে সহজ, স্বাভাবিক আর প্রতিবেশীসুলভ হতে দিচ্ছে না— দুই দেশের মধ্যে সমস্ত বিরোধের মূলেও এটি। এর ফলে দুই দেশের মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে অশেষ দুর্গতি। নেহরু ইচ্ছা করলে এ দুই দেশের মানুষকে অতি সহজেই এ দুর্গতির হাত থেকে রেহাই দিতে পারতেন— যদি না তিনি তাঁর পূর্ব ভূমিকা ভুলে যেতেন। অধিকতর দুঃখের কারণ এ যে কাশ্মীর সমস্যাকে তিনি নিজেই জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছেন তিনিই একদিন কাশ্মীরে গণভোট মেনে নিয়েছিলেন, সে আশ্বাসেও ওখানকার জন-নায়কদের তিনি দিয়েছিলেন ভারতের পক্ষ থেকে। এমনকি ভারত আর পাকিস্তানের সম্মতিতে গণভোট পরিচালকও হয়েছিলেন নিযুক্ত। পরে কি মনে করে হঠাৎ নেহরুই বেঁকে বসলেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে ঘোষণা করলেন— 'কাশ্মীর ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, অতএব গণভোটের প্রয়োজন নেই'। শুধু তা নয় নিজের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু আর সহকর্মীকেও মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ করে জেলে পাঠাতেও তিনি দ্বিধা করলেন না গণভোট দাবি করেছেন এ অপরাধে। যেন সিকেম আর সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ একদিন ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল না! সেখানে গণভোট কি নেহরু দাবি করেননি আর গণভোট কি সেখানে হয়নি? তার ফলাফল কি ভারত আর পাকিস্তান মেনে নেয়নি? কাশ্মীরের বেলায় ব্যতিক্রম হওয়ার যুক্তি কোথায়?

নেহেরু যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন তা প্রায় গল্পে বর্ণিত মেষ শাবকের প্রতি ব্যাঘ্রের যুক্তির সঙ্গেই তুলনীয়। চির গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে বিশ্বাসী নেহরু কাশ্মীরের বেলায় এমন ভূমিকা গ্রহণ করবেন কেউই আশা করেনি। তাই বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো যুক্তি ও শান্তিবাদী বিশ্ব-মানবিকও নেহরুর এ দ্বিমুখোনীতির প্রতি কটাক্ষ করতে দ্বিধা করেননি : "Internationally, the Indian government stood, in general, for peace and conciliation, for which it did useful work, especially in Korea. There was evidence, however, that, when India's national interests were involved, the Indian government was not capable of the impartiality which it urged in disputes to which it was not a party. The chief instances of these were Kashmir and Nagaland." (Unarmed Victory p. 64)

রাসেলকে কোন অর্থেই ভারতবিরোধী বা অ-নিরপেক্ষ মনে করার কারণ নেই। ঐ গ্রন্থেই রাসেল ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে : "It was indeed true that I had been a life-long friend of India." তারপর ভারতের সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পুরুষের সুদীর্ঘ সম্বন্ধের কথা বলে এ তথ্যটিও তিনি জানিয়েছেন : "Very many years later I was the President of India League and worked for her freedom." (P. P. 70-71)

কাজেই ভারত সম্পর্কে এহেন লোকের উক্তিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই। বিশেষত শান্তি আর যুদ্ধ ঠেকানো ছাড়া রাসেলের তো অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আজও নেই। আশ্চর্য, পশ্চিমী প্রচারণার ফলে এতকাল আমাদের ধারণা ছিল কমিউনিস্টরাই বুঝি সব বদমাইশ, যুদ্ধবাজ, একগুঁয়ে আর বদমেজাজি— কিউবা-সংকট আর চীন-ভারত সংঘর্ষের বেলায় দেখা গেছে, না, ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। শান্তি এবং যুক্তির আবেদনে কমিউনিস্ট নেতারা যত সহজে ও আন্তরিকতার সাথে সাড়া দিয়েছেন, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশের 'সাধু' নেতারা তত সহজে সাড়া দেননি বরং অধিকতর গোঁয়ার্তুমি দেখিয়ে একটা বিশ্বযুদ্ধকে প্রায় আসন্ন করে তুলেছিলেন। এখন বিশ্বযুদ্ধ মানে আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ অর্থাৎ— আরো কয়েকটি হিরোসিমা আর নাগাসাকি, হয়তো গোটা মানব-বংশেরই ধ্বংস। মানবতাবাদী রাসেলের এ জন্যই উদ্বেগ ও আশঙ্কা। রণোন্মুখ রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি এ জন্যই তাঁর আকুল আহ্বান। সে আহ্বানে ক্রুশ্চেভ, চো-আন লাই সাড়া দিয়েছেন— সাড়া দেননি তথাকথিত গণতন্ত্রের মুখপাত্র কেনেডি আর নেহরু। রাসেলের 'অস্ত্রহীন বিজয়' নামক বইটিতে এ সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য দলিল উদ্ধৃত হয়েছে। কিউবা যুদ্ধ পরিহার করায় ক্রুশ্চেভকে কাপুরুষতার অভিযোগও শুনতে হয়েছে। সুখের বিষয় ক্রুশ্চেভ তাতে বিচলিত হননি— ত্যাগ করেননি বিবেক আর শুভবুদ্ধির পথ। এজন্য বিশ্বের শান্তিকামীদের অজস্র প্রশংসা তিনি পেয়েছেনও। উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার— প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। এ অন্ধ জাতীয়তারই পরিণতি দুই দুটা বিশ্বযুদ্ধ। সংকীর্ণ ক্ষেত্রে কাশ্মীর

আর ভারত-চীন সংঘর্ষও তাই। উগ্র জাতীয়তার কাছে যুক্তি, ন্যায়, সততা ঠাঁই পায় না। ফলে তেমন অবস্থায় একই মানুষ দ্বিধা-খণ্ডিত হয়ে পড়েন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুরও সে দশা হয়ে পড়েছিল— গণতান্ত্রিক নেহরুও কাশ্মীরের বেলায় হয়ে পড়েছিলেন গণতন্ত্রবিরোধী চীনের বেলায় হয়ে পড়েছিলেন স্বয়ং পঞ্চশীলের প্রবক্তা পঞ্চশীলবিরোধী। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চীন বারবারই আলাপ-আলোচনা করতে চেয়েছে— নেহরু রাজি হননি। যুদ্ধের নামে গণতান্ত্রিক ভারতে সরকার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে তখন কি করে তুলেছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে রাসেলকে লেখা এক ভারতীয় বিজ্ঞান-অধ্যাপকের চিঠির এ কয়েকটি পঙক্তি থেকে : "There is a reign of terror in India to-day and the voice of intellectuals is more effectively choked in this so called free India than it ever was in the days of British Raj! They way the innocent people are being exploited, intellectuals silenced & businessmen robbed in the name of war, often makes me question : "What worse will the chinese do?" (Un armed Victory P. 104)

এ অধ্যাপকের নাম রাসেল উল্লেখ করেননি তবে বলেছেন একে অচিরে ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসেলের এ মন্তব্যও স্মরণীয় : "In India and I suspect China, nationalism has been used and played upon and encouraged to such an extent that is it quite out of hand (P. 105) কাশ্মীরের বেলায়ও তা করা হয়েছে— কাশ্মীর ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, এ স্লোগান তারই অভিব্যক্তি। আমার বিশ্বাস এ বেপরওয়া ও অযৌক্তিক জাতীয়তাবাদই শেষকালে নেহরুকে তাঁর পূর্ব ভূমিকা থেকে দূরে সরিয়ে এনেছিল। যার ফলে কাশ্মীর বিরোধটাকে তিনি একটা আগ্নেয় ডিপো করেই রেখে গেছেন— যার ভয়াবহ বিস্ফোরণ আমরা পঁয়ষট্টির সেপ্টেম্বরে দেখেছি। আশ্চর্য এবারও কোন গণতান্ত্রিক দেশ নয় বরং নিন্দিত কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়াই আমাদের এ দুই দেশকে এক ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সালিসী করে, শান্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে।

সীমিত অর্থে জাতীয়তাবাদ ভালো— স্বদেশপ্রেম আর নিজের দেশের মানুষকে ভালোবাসা. এসব জাতীয়তাবাদের শুভ দিক নিঃসন্দেহে কিন্তু তা যদি পরদেশ আর পর জাতি বিদ্বেষের পরিণত হয় আর হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য দেশকে দাবিয়ে রাখার হাতিয়ার তাহলে তা ভয়াবহ হয়ে উঠবেই, উঠেই থাকে। বিশেষত যুদ্ধ, বিরোধ আর সংঘর্ষের দিনে তা আর কিছুকেই পাত্তা দেয় না, এমনকি মনুষ্যত্বকেও না। ভারতীয় বিজ্ঞান অধ্যাপক চীন ভারত সংঘর্ষের দিনে ভারতের আভ্যন্তরীণ জীবনের যে ছবি তুলে ধরেছেন, তা যুদ্ধের সময় অন্য দেশের, আমার নিজের দেশের বেলায়ও প্রযোজ্য : যুদ্ধের সময় ঐ না হয়ে থাকতে পারে না। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের এ মন্দ দিকটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয় উন্মাদনা জাতীয়তার মোহে। এ জন্যই জাতীয়তাবাদ অনেক সময় শুভের চেয়েও অশুভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ আর যুদ্ধের কারণ পরিহার করার মধ্যেই রয়েছে জাতীয়তাবাদের এ দানব দৈত্যের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ— এ যুগে রাসেল তারই প্রতিভূ।

এক সময় নেহরু সমাজতন্ত্রবাদী বলে পরিচিত ছিলেন— সেকালের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী উপদলের তিনি ছিলেন পুরোধা। স্বাধীনতার পর, প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি হয়ে পড়েছেন উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধি। এমনকি জাতি গঠনে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে রাসেলকে চিঠিও লিখেছেন তিনি। (রাসেলের উল্লেখিত বইটির ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। রাসেল বারবারই বলেছেন কমিউনিজমের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই, তিনি মনে প্রাণে কমিউনিজম বিরোধী আর গণতন্ত্রেই তাঁর আস্থা আর বিশ্বাস। কিন্তু যুদ্ধ আর সংকটের মুখে গণতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিকা দেখে তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত না হয়ে পারেননি। তিনি লিখেছেন : 'It is to me, who have never been sympathetic to Communism, an ironic and distressing thought that only Yugoslavia and possible, very recently, Russia— both communist countries have eschewed the use of such (Nationalistic) encouragement, but so far as I know, no Western country has done so. Both the governments and the press of Western countries have during the recent crisis concentrated upon whipping up warlike enthusiasm and hatred. (P. 105)

এককালে সমাজতন্ত্রী নেহরু পরে গণতান্ত্রিক হয়েও কাশ্মীরের বেলায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগে রাজি হননি। হয়তো স্বজাতির উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধতার ফলেই রাজি হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ কারণে শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি অনমনীয় থেকে গেছেন। কারণ যাই হোক দুই দেশের মানুষের জন্য তাঁর এ অনমনীয় মনোভাবের ফল হয়েছে একই। বিরোধ জিয়ে রাখায় দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক সহজ হতে পারছে না বলেই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের সম্পর্কও হতে পারছে না সহজ, স্বাভাবিক মানবীয় আর প্রতিবেশীসুলভ। পরস্পরের ভয়ে দুই রাষ্ট্রকেই প্রতিবেশী মারার হাতিয়ারের জন্য থাকতে হচ্ছে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে, গরিব দেশের গরিবদের থেকে আদায় করা রাষ্ট্রীয় তহবিলের প্রভূত অর্থ করতে হচ্ছে এভাবে অপচয়। এ অর্থ দিয়ে দুই দেশের কত অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়নই না সম্ভব হতো, হয়তো সম্ভব হতো দুই দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান, দারিদ্র্য নিবারণ আর নিরক্ষরতা দূরীকরণও। অন্তত কিছুটা পরিমাণে তো বটেই।

॥ ২ ॥

রাজনৈতিক দিক দিয়ে কাশ্মীর আর আলজিরিয়ায় সাদৃশ্য রয়েছে। কাশ্মীর যেমন ভারত, ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে দাবি করছে, তেমনি ১৯৫৮ পর্যন্ত ফ্রান্সও আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই দাবি করত। 'আলজিরিয়াই ফ্রান্স' 'ফ্রান্সই আলজিরিয়া' এসব স্লোগান ছিল তখন ফরাসিদের, বিশেষ করে আলজিরিয়ায় বসবাসকারী ফরাসি ঔপনিবেশিকদের মুখে মুখে। ভারতকে যেমন কাশ্মীরে প্রভূত ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন রাখতে হচ্ছে, পোষণ করতে হচ্ছে জনসমর্থনহীন সরকারকে। আলজিরিয়ায়ও ফ্রান্সকে করতে হয়েছিল অবিকল তাই। যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুর্বল অর্থনীতিকে আরো দুর্বল আর

ঘায়েল করে অপচয় করতে হয়েছে প্রভূত অর্থ। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের মুখপাত্ররা অপচয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : "Educational experts remarked that the money which should have provided adequate schools was being poured down the 'rat holes' of Indo-China and Algeria." আর আলজিরিয়াবাসীদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিণতিও বর্ণিত হয়েছে এভাবে : "The war, which began in November, 1954, with a limited uprising, has cost many million pounds. Nearly half a million French Soldiers are kept on continuous duty in Algeria, with disastrous effects on the French contribution to the North Atlantic Treaty Organisation. A million-and-a-half Frenchmen have served in Algeria since the war began. They have in many cases been recalled to service after having already done their ordinary military stirt. The war has been bloody as well as costly. At least 250,000 men have been killed—thought most have been Algerian rebels." এ প্রসঙ্গে সরকারি মুখপাত্রের এ মন্তব্যও স্মরণীয় : "But the war has been more than expensive and bloody. It has been corrupting." আলজিরিয়ার তুলনায় কাশ্মীর অনেক ছোট— সে অনুসারে এখানে রক্তক্ষয় হয়তো কম হয়েছে, আলজিরিয়ার মতো এখানেও হয়তো কাশ্মীরবাসীই মরেছে বেশি। এ অনিশ্চিত অবস্থার ফলে দুর্নীতি এখানেও প্রবেশ করেছে নানা স্তরে। এমনকি ভারত-নিযুক্ত কাশ্মীরী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অথচ এর ফলে ভারত বা কাশ্মীর কারো কোন ফায়দা হয়নি, ইচ্ছেও না বরং সীমান্তের দুই পারে মানুষের দুর্ভোগ গেছে আরো বেড়ে। কাশ্মীরের জনসাধারণের তো কথাই নেই।

জাতীয় অহমিকা বা উগ্র জাতীয়তাবাদ যেখানেই প্রশ্রয় পাক না কেন তা ক্ষতির কারণ না হয়ে যায় না— এ কারণে তা নিন্দনীয়, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী আর মানবতাবাদীদের কাছে। কাশ্মীর ব্যাপারে পাকিস্তানকে আমি যে নিন্দা করছি না তার একমাত্র কারণ এ নয় যে আমি পাকিস্তানি নাগরিক, পাকিস্তান আমার নিজের রাষ্ট্র। বরং এ কারণে যে অন্তত কাশ্মীর ব্যাপারে পাকিস্তানের দাবি ন্যায়সঙ্গত আর পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। পাকিস্তান ভারতের মতো এমন দাবি কখনো করেনি যে কাশ্মীর পাকিস্তানের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বা জোর করে হলেও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের দখলে আনতে বা রাখতে হবেই। এ যুগে দেশের মানুষ বা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বাদ দিয়ে দেশ বা রাষ্ট্র কল্পনা স্রেফ বাতুলতাই। কাশ্মীরের জনগণের তারা কিরকম রাষ্ট্র ব্যবস্থা চায়, এ ইচ্ছা প্রকাশের অধিকার আর তা মেনে নেওয়ার প্রতিই শুধু পাকিস্তান জোর দাবি জানাচ্ছে, এমনকি তা যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও যায় তা মেনে নিতেও পাকিস্তান রাজি এমন কথা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ভারত তেমন কথা আজো বলেনি বলেনি কাশ্মীরের ইচ্ছাকে ভারত মেনে নেবে। উপরন্তু কাশ্মীরবাসীদের ইচ্ছা প্রকাশের স্বাধীনতাকেও ভারত স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক। বিরোধের মূল কারণ তো এখানে। তার মানে যে জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও ভারত কাশ্মীরের বেলায়

মেনে নিতে গত উনিশ বছর ধরে অস্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে। ভারত আর পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পার্থক্যও এখানে। যার ফলে উনিশ বছরেও পাশাপাশি এই দুই রাষ্ট্র কিছুতেই সমঝোতায় আসতে পারছে না। অথচ এ সমঝোতার ওপর দুই দেশের সুখ শান্তি, উন্নয়ন, নিরাপত্তা সব কিছুই নির্ভর করছে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বিশেষের কর্তৃত্বাধীনে যে নির্বাচন তা যে কি রকম গণতান্ত্রিক প্রহসন তা আমাদের ভালো করেই জানা আছে। কাজেই ঐ রকম নির্বাচনের ফলাফলকে কিছুতেই জনগণের চূড়ান্ত রায় বলে মনে করা যেতে পারে না। ভারতও যে এ না জানে তা নয়, তা না হলে কাশ্মীরে একের পর এক মুখ্যমন্ত্রী বরখাস্ত হয় কেন? অনির্দিষ্টকালের জন্য কাকেও কাকেও রাখা হয় কেন আটকে? কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারত নিঃসন্দেহে নিজের মনকেই চোখ ঠারাচ্ছে। মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলও এ ইংগিতই করেছেন।

॥ ৩ ॥

পাকিস্তান বা ভারতের মূল ভূখণ্ডে কি রকম গণতন্ত্র চলছে। কাশ্মীর প্রশ্নে তা তুলে পরস্পরকে খোঁচা দেওয়া বা সে অজুহাতে কাশ্মীর বিরোধের সমাধানে অনাগ্রহী হওয়ার কোন মানে হয় না, কারণ এ দুই রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে কি রকম শাসন-ব্যবস্থা চলবে কি চলবে না তা কিছুতেই এ বিরোধের কেন্দ্র-বিন্দু নয়, এ প্রসঙ্গে তা বরং সম্পূর্ণ অবান্তরও। দেশ নিয়ে বা দেশের অংশ নিয়ে বিরোধ যেখানে সেখানে গণতান্ত্রিক, নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া মীমাংসার দ্বিতীয় পন্থা আর কি হতে পারে? অন্য পন্থা নেই বলেই হয়তো এ যাবৎ ভারতও বিকল্প কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা দেয়নি, তা দিতে পারেনি। আমরা সাধারণ মানুষরাও তাই হতে পারছি না আজো সংকটমুক্ত। পাক-ভারত ইতিহাসে এ এক অত্যন্ত বেদনাদায়ক ট্রাজেডি— আমরা সবাই, পাক-ভারতের সাধারণ মানুষরাই এ ট্রাজেডির শিকার। আমার বিশ্বাস নেহরু আমাদের এ ট্রাজেডি থেকে মুক্তি দিতে পারতেন যেমন দ্য গল মুক্তি দিয়েছেন ফ্রান্স আর আলজিরিয়াকে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর অমানুষিক বর্বরতা থেকে। দ্য গলের এ ভূমিকা ও নেতৃত্ব শুধু ফ্রান্সের ইতিহাসে নয়, যুক্তি আর বিবেকের ইতিবৃত্তেও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফ্রান্স আর আলজিরিয়া সম্পর্কে সব রকম নৈতিক আর আর্থিক-ভার আর দায়মুক্ত হতে পেরেছে বলে তার সব শক্তি আর সম্পদ এখন সর্বোতভাবে ফ্রান্সের উন্নয়নে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে ফ্রান্স আজ তার সাবেক শক্তি অনেকখানি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফ্রান্সের কণ্ঠস্বরকে আজ আর তাই কেউই অস্বীকার করতে পারছে না। আলজিরিয়াও নিজের ইচ্ছামতো শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করে শান্তি আর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। এখন দুই দেশেই বন্ধ হয়েছে অকারণ অর্থ আর লোকক্ষয়। তাই আবার বারবার মনে হয়, ভারত যদি একজন দ্য গলকে খুঁজে পেত— তাহলে ভারতও কাশ্মীর সম্পর্কে সব রকম ভার আর দায়মুক্ত হয়ে শান্তি আর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারত। আর কাশ্মীরও বেছে নিতে পারত নিজেদের পথ নিজে, কাশ্মীরের জনগণও ফিরে পেত শান্তি, নিরাপত্তা আর সমৃদ্ধির পথ ও পাথেয়।

দেশের জনগণই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মালিক— গণতন্ত্রের এ প্রাথমিক শর্ত মেনে নিয়ে আলজিরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিতে দ্য গলকে কম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে

হয়নি। ফ্রান্সের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে দ্য গল এ বিরুদ্ধতাকে মোটেও আমল দেননি। ভারতে যেমন এক দল কাশ্মীরে ভারত-সমর্থক একটা গোষ্ঠী দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছে, দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সেও অবিকল তেমন একটি দল ছিল : "..... The young officers and many of the French officials believe that Algerian sentiments could be made more friendly to French and that a pro-French governing class could be rapidly created."

আলজিরিয়ার বেলায় এসব ফরাসিদের ইচ্ছা যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি কাশ্মীরে ভারতের তেমন ইচ্ছা আজো থেকে গেছে অপূর্ণই এবং পূর্ণ হওয়ার তেমন কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তবে দ্য গলের একটি সুবিধা ছিল ফ্রান্সের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ সাম্রাজ্যবাদের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে এ বুঝতে পেরেছিল আর বুঝতে পেরেছিল সহযোগিতার পথই এখন শ্রেয় ও কাম্য : "They believe France sould concentrate on developing her own resources. She should accept the fact that the day of imperialism is over and should try to make a friend of the nascent Algerian nation, doing what she can to save the million-odd Frence colonists from having to leave what they feel is their nativeland To these theoriticians... France free from the moral and material burden of the Algerian War would have a power of leadership.....".

[ফ্রান্স সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি Life পত্রিকায় World Library সিরিজের France বই থেকেই নেওয়া।]

আলজিরিয়া সমস্যা সমাধানে দ্য গল যেমন নেতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি আলজিরিয়ার ভারমুক্ত ফ্রান্সকেও তিনি দিয়েছেন নেতৃত্বের ক্ষমতা। সে ক্ষমতার পথেই ফ্রান্স এখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দ্য গলের দূরদর্শিতা আর নেতৃত্ব শুধু ফ্রান্স আর আলজিরিয়ার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেনি— সমস্ত এলাকাটাকেই একটা ব্যাপক যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে। আলজিরিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ নাকি ফরাসি ঔপনিবেশিক— স্বাধীন আলজিরিয়ায় তাদের নিরাপত্তা আর সমৃদ্ধি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল তবুও বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এ ঝুঁকি নিতে দ্য গল দ্বিধা করেননি। স্বাধীনতা আর সহযোগিতার পথই যে ফরাসি ঔপনিবেশিকদের জন্যও শ্রেয়— দ্য গলের দুঃসাহসিক নেতৃত্ব তাই প্রমাণ করেছে। তাই এর পর থেকে শুধু ফ্রান্স নয় আলজিরিয়ায়ও দ্য গলের জনপ্রিয়তা অত্যাশিতভাবে বেড়ে গেছে। অথচ কাশ্মীরে ভারতের তেমন কোন ঝুঁকি ছিল না— তবুও ভারতীয় নেতৃত্ব জাতীয় অহমিকার ঊর্ধ্বে উঠতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আলজিরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে দ্য'গলের সামনেও বিরুদ্ধতা কম ছিল না— কিন্তু সে বিরুদ্ধতাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার মতো মনোবল আর নেতৃত্বের গুণ ছিল বলে আজ তাঁর নেতৃত্ব ফ্রান্সের জন্য এতখানি সুফলপ্রসূ হতে পেরেছে। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের জন্য এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেও যদি এমন দূরদর্শী ও দৃঢ়-চিত্ত নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটতো তাহলে কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারতের সম্বন্ধও এমন তিক্ত আর নিষ্ফল পথে গড়াতে পারত না— একটা বৃহত্তর সংগ্রামের ইন্ধন হয়ে থাকত না এত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে।

॥ ৪ ॥

আমার বিশ্বাস, ভারতে যদি দ্য গলের মতো কোন নেতার আবির্ভাব ঘটত, তাহলে কবেই কাশ্মীর-বিরোধ চুকে যেত, কাশ্মীরের জনসাধারণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত আর পাক-ভারতের মধ্যে সম্বন্ধও গড়ে উঠত একটা সার্বিক বন্ধুত্ব আর সহযোগিতার। শুধু দুই রাষ্ট্রের মধ্যে নয়, দুই রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের পরস্পরিক সম্বন্ধও দ্রুত হয়ে উঠতো সহজ, স্বাভাবিক আর হৃদ্যতাপূর্ণ। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয় আর্থিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দুই দেশের সম্বন্ধ হতো আরো নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। সহযোগিতা সম্ভব হতো সব ক্ষেত্রে। দুই দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি অকারণ সন্দেহ পোষণের মনোভাবেরও ঘটত অবসান। পাকিস্তানে এমন বহু জিনিস উৎপন্ন হয় যা সহজে ভারতে রপ্তনি করা যায় আবার ভারতেও এমন বহু জিনিস উৎপন্ন হয় যা এখানে আমদানি করা যায় অল্প ব্যয়ে— এভাবে পণ্য বিনিময় আর বাণিজ্যিক লেন-দেনের ফলে দুই দেশেরই উন্নয়ন হতো সহজ ও দ্রুতগতি।

আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয় মানবিক সম্পর্ক— স্রেফ কাশ্মীরের জন্যই দুই নিকটতম প্রতিবেশী দেশের মানুষের মধ্যে এ অতি স্বাভাবিক সম্পর্কটাও গড়ে উঠতে পারছে না। এ বেদনা আমার দীর্ঘদিনের। আর কাশ্মীরের কথা মনে হলেই আমার আলজিরিয়ার কথা মনে পড়ে। এ দুইয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আমি দেখতে পাই। এ কারণেই এ রচনার এ শিরোনাম।

কাশ্মীর সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণাটুকুও নিবেদন করছি। ভারত আর পাকিস্তান এ দুয়ের সীমান্ত এসে মিশেছে কাশ্মীরে। আর কাশ্মীর এমন কোন বৃহৎ বা সমৃদ্ধ এলাকা নয় যে, পাক-ভারতের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ত্যাগ করে তার চলা সম্ভব। সমুদ্রের সঙ্গে বা বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগও এ দুই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়েই। কাশ্মীর কোন দিক দিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ নয়— তার বেশিরভাগ জমি যেমন অনুর্বর তেমনি অন্যদিক থেকে তার অর্থসম্পদও অত্যন্ত সীমিত। এ অবস্থায় কাশ্মীরকে হয় পাকিস্তানের না হয় ভারতের সঙ্গে যোগ দিতেই হয়। অন্যথায় বাঁচতে হয় এ দুই রাষ্ট্রের সহযোগিতায়, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করে। শেষোক্ত অবস্থায় পাক-ভারতের স্বীকৃতি, সহযোগিতা, সদিচ্ছা ও বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য— ঐ ছাড়া স্বাধীন কাশ্মীর অকল্পনীয়। পাক-ভারতের মিত্র রাষ্ট্র হিসেবেই শুধু স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কাশ্মীর কল্পনা করা যায়— কিন্তু এর জন্যও সর্বাগ্রে প্রয়োজন পাকিস্তান আর ভারতের নিজেদের মধ্যে মৈত্রী, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা আর একটা সার্বিক বোঝাপড়া।

কাশ্মীরে পাকিস্তান আর ভারত উভয়ের রাষ্ট্রগত আর অর্থনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে। পাকিস্তানের তো আছেই, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সব কটি প্রধান নদীরই উৎসমুখ কাশ্মীরে। আর ওখানকার কৃষির প্রধান নির্ভর সেচ আর সেচ ব্যবস্থার সাফল্যের ওপর— তার মানে শস্যভূমিতে জল সরবরাহটা অব্যাহত রাখার ওপরই নির্ভর করে ওখানকার সাধারণ মানুষের অন্ন-বস্ত্র। কাজেই এর একটা মানবীয় দিকও আছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় আর অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা আমার অজানা ধরে নেওয়া যায় ভারতেরও অনুরূপ স্বার্থ

রয়েছে কাশ্মীরে কিন্তু জিজ্ঞাস্য কাশ্মীরের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করেও কি সে স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না?

আমার বিশ্বাস, কাশ্মীরিদের মূল দাবি অর্থাৎ আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করে নিয়ে পাকিস্তান আর ভারত সহজেই একটা স্থায়ী মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে, সে চুক্তির প্রধান শর্ত হবে কাশ্মীরে উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ। এর জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তাও প্রয়োজন হলে নেওয়া যেতে পারে। আসল কথা কাশ্মীরিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নেওয়া। এ নিলেই মুহূর্তে সব বিরোধের অবসান ঘটবে বলেই আমার বিশ্বাস। পাকিস্তান কাশ্মীরিদের এ দাবি স্বীকার করে আর এ দাবির সমর্থনেই কাশ্মীর ব্যাপারে তার যা কিছু ভূমিকা। ভারত এ দাবি বিরোধের প্রাথমিক স্তরে স্বীকার করলেও এখন আর স্বীকার করতে চায় না। ফলে দুই রাষ্ট্রের বিরোধের হয় না অবসান— কাশ্মীর আর পাক-ভারতের সাধারণ মানুষও এ কারণে অশেষ দুর্গতির হাত থেকে পাচ্ছে না রেহাই।

এ দুঃসহ পরিস্থিতিতেই আমার মনে পড়ে দ্য গলের আর দ্য গল ভূমিকার কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারত যদি একজন দ্য গলকে খুঁজে পেত তাহলে পাক-ভারত আর কাশ্মীরের মানুষও খুঁজে পেত শান্তি আর বাঁচত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এখানে এ কথাটিও স্মরণীয়— ভারত ভাগ হয়ে যে দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তাও ধর্মের ভিত্তিতেই হয়েছে— ভালো হোক মন্দ হোক এ এক ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে কংগ্রেস এ নীতি মেনে নিয়েই বাংলা আর পাঞ্জাব বিভক্তিকরণ দাবি করেছিল— এ দুই প্রদেশও যে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে তাও সন্দেহাতীত। হায়দ্রাবাদ দখলের সময়ও ভারত সরকার ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্মের কথা মুসলিম সংখ্যালঘুতর নজির উত্থাপন করেছিল। ভারত-বিভাগের এ মৌল স্বীকৃত নীতি একমাত্র কাশ্মীরের বেলায় ভারত মানতে রাজি নয়। এটিই সবচেয়ে বেদনার কথা। ভারতের এ স্ববিরোধী নীতি দেখে ভারত-বন্ধু মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলও ব্যথিত হয়েছেন— সে ব্যথার পরিচয় রয়েছে তাঁর Unarmed Victory নামক বইতে।

সুকর্ণ

ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ আর সুকর্ণের ইন্দোনেশিয়া— এ প্রায় একার্থবাচক হয়ে পড়েছিল। কথাটা হয়তো মোটেও অর্থহীন নয়। সাড়ে তিনশ' বছরের পরাধীন ডাচ্-ইন্ডিচকে সুকর্ণ শুধু ইন্দোনেশিয়ায় রূপান্তরিত করেননি, তার স্বাধীনতা নির্মাতাদের তিনিই ছিলেন পুরোধা, ধরতে গেলে তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তাও। এমনকি, তার ভাষাও। এর আগে বিভিন্ন আঞ্চলিক আর লৌকিক বুলি ছাড়া সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার কোন জাতীয় ভাষা ছিল না। সুকর্ণের হাতে তারও ভিতপত্তন। এখন ইন্দোনেশিয়া খুঁজে পেয়েছে তার সাহিত্যের পথ, তার আত্মবিকাশের মাধ্যম। দশ হাজার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ আর তার বিচিত্র মানুষকে একটি দেশগত জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা কম দুঃসাধ্য ছিল না, সে দুঃসাধ্য কাজে সুকর্ণ যে অনেকখানি সফল হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ব্যক্তি হিসেবেও সুকর্ণ কম আকর্ষণীয় নন— এমন বর্ণাঢ্য চরিত্র আর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সমন্বয় কদাচিৎ দেখা যায়। এদিক দিয়ে এ যুগের রাষ্ট্রবিদদের মধ্যে তাঁর জুড়ি আছে বলে মনে হয় না। অথচ এক সর্বাধিক অনুন্নত দেশের এক অতি সাধারণ দরিদ্র পরিবারেই তাঁর জন্ম আর তাঁর কোন কোন সহকর্মীর মতো বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগও তিনি পাননি। তিনি পুরোপুরি ইন্দোনেশিয়ার খাস মাটির সন্তান, ঐ মাটিতেই তাঁর জন্ম, তাঁর মন-মানস ব্যক্তিত্বের গঠন আর বিকাশও ঐ মাটিতেই— ঐ মাটির দোষগুণ সবই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান। তাঁর রক্তে, তাঁর স্বভাবে মিশে রয়েছে তাঁর দেশের লৌকিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব কিছুই। তিনি কখনো নিজেকে সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক ভাবেননি, ওদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এত নিবিড় যে ওদের কাছে তিনি ছিলেন বুং সুকর্ণ অর্থাৎ ভাই সুকর্ণ। তাঁর বক্তৃতা শুনে ওরা উল্লাস প্রকাশ করত ঐ স্লোগান দিয়েই। দীর্ঘকাল ধরে, এমনকি সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। শুধু ইন্দোনেশিয়ার কেন, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি ছিল তাঁর প্রতি।

সুকর্ণের আত্মজীবনী একটি স্মরণীয় গ্রন্থ— বইটি যেমন সুলিখিত তেমনি প্রাণবন্ত। সুকর্ণ নিজেও অত্যন্ত প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব, সে ব্যক্তিত্বের পরিচয় ছড়িয়ে আছে বইটির সর্বত্র। কথা প্রসঙ্গে এক প্রবীণ বন্ধু হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন একদিন : "হযরত মোহাম্মদের পর সুকর্ণই দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম মুসলমান।" সুকর্ণের আত্মজীবনী পড়ার পর মনে হলো কথাটি নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত আর নিছক বাড়াবাড়ি। তবে এ যুগের প্রাচ্যের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সুকর্ণ যে এক রহস্যময় অসাধারণ পুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর ব্যক্তি-জীবনও কম বিচিত্র নয়। সহজ কাণ্ডজ্ঞান, মনুষ্যত্ব চেতনা আর তীক্ষ্ণ রস-বোধের এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর জীবন। রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা ধর্মীয় কোন রকম গোঁড়ামিই তাঁকে কোন দিন মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি, তাঁর মন-মানস সব সময় রয়েছে এসব থেকে মুক্ত। ইন্দোনেশিয়ার মতো অনুন্নত দেশে এও এক বিরল দৃষ্টান্ত। আর সুকর্ণ কোনরকম ভানের আশ্রয় নেননি কোন দিন— আচার-আচরণে সব সময় থেকেছেন সহজ আর স্বাভাবিক

মানুষ। রাষ্ট্রপ্রধান আর রাজনৈতিক নেতাদের অনেক সময় অবস্থার হেরফেরে নানা মুখোশ পরতে দেখা যায়। অনেকে অবস্থা বুঝে বারেবারে বদলান চেহারা, জনতাকে খুশি করার জন্য সাজেন বহুরূপী, হয়ে পড়েন হরবোলা! সুকর্ণ কিন্তু তা করেননি কোন দিন যদিও তাঁর পরিবেশ ছিল এসবের সম্পূর্ণ অনুকূল। তাঁর ব্যক্তিজীবনের মানবিক বাসনা-কামনাকেও তিনি জনমতের খাতিরে কখনো অস্বীকার করেননি। প্রেম আর নারী-সঙ্গ তাঁর জীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ— এ সম্বন্ধেও তিনি মুক্ত, খোলাখুলি আর অবিশ্বাস্যরূপে আন্তরিক। নারীকে ভালোবাসা আর পেতে চাওয়া তেমন কোন মারাত্মক অপরাধ নয়— এ লক্ষণ বহু মহৎ চরিত্রেরই দেখা গেছে। এ যুগের বিখ্যাত দার্শনিক আর মানবপ্রেমিক বার্ট্রান্ড রাসেলও তাঁর জীবনের তিনটি আকর্ষণের মধ্যে একটিকে নারীর প্রতি আকর্ষণ বা ভালোবাসা বলে উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য এমনতর প্রবণতা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক কিংবা অমানুষিক নয়। সুকর্ণও সম্পূর্ণভাবে দোষগুণে এক অতি স্বাভাবিক মানুষ— তাঁর চরিত্রে কোন রকম অতি-মানবতার ভান নেই। তাঁর আত্মজীবনী এ স্বাভাবিক মানুষটির ব্যক্তি-জীবনেরও এক চমৎকার দলিল। এ কারণেও বইটি মূল্যবান। সুকর্ণের আত্মজীবনী শুধু সুকর্ণের নয়, ইন্দোনেশিয়ারও জন্মবেদনার আত্মকাহিনী, তার জন্ম আর বিকাশের এক প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত। সুকর্ণের আগে দুনিয়ার মানচিত্রে ইন্দোনেশিয়ার কোন নাম বা চিহ্নই ছিল না— সুকর্ণ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার যেমন প্রধানতম নির্মাতা তেমনি বিশ্বের ইতিহাস আর মানচিত্রে ইন্দোনেশিয়ার স্থান কায়েমী করে দেওয়ার মূলেও তিনি ও তাঁর কর্মময় জীবন আর তাঁর স্বপ্ন-কল্পনা।

স্বদেশপ্রেম আর স্বাধীনতাপ্রীতি— এ দুই সুকর্ণকে প্রায় মদের নেশার মতোই পেয়ে বসেছিল জীবনের শুরুতে। এক মুহূর্তের জন্যও এ নেশা তিনি ছাড়তে পারেননি। স্বদেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ ও আদর্শবাদ। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মন্তব্য : "Liberty is the food I lived on. Ideology. Idealism. The nurishment of the soul. I myself lived in rags but what did it matter?" দেশ আর নিজের জীবন সম্বন্ধে এ সুকর্ণের দৃষ্টিভঙ্গি। এ আদর্শবাদই ছিল তরুণ সুকর্ণের আধ্যাত্ম-আহার্য আর এ ছিল তাঁর সর্বাসত্তা জুড়ে। আদর্শবাদী মানুষ অনেক সময় জীবন বিমুখ হয়ে থাকে— সুকর্ণ কিন্তু তার বিপরীত। রক্ত-মাংসের মানবিক-জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আকর্ষণকেও তিনি অবহেলা করেননি। এসব ব্যাপার নিয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বও দেয়নি দেখা কোনদিন। তাই নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি অনেকটা অসংকোচে প্রকাশ করেছেন যা অন্যরা হয়তো পাশ কেটে যেত।

দীর্ঘদিন গৃহ-সংসার আর নারীসঙ্গ বিবর্জিত কারাবাস থেকে ফিরে আসার পর তাঁর আর তাঁর বন্ধুদের খুশি আর আবেগ-উচ্ছাসের মাঝখানে তাঁর মনে যে প্রবল বাসনা উদ্যত হয়ে উঠেছিল স্পষ্টবাদী সুকর্ণ তা প্রকাশেও দ্বিধা করেননি। তাঁর ভাষায় : "It was exciting and I was overcome with emotion, but I must say, at that moment the first thing I wanted was not gay party, not even silk sheets nor a luxurious bath. The first thing I wanted was a woman. সুকর্ণ ব্যক্তি-মানুষটি এই। তাঁর বিবাহিত জীবনেরও কিছুটা ইতিহাস

মিলবে এতে। ব্যক্তিগত আর সামাজিক কারণে বিবাহ-ভঙ্গ আর বহু বিবাহে ইসলামের সম্মতি— এসবের যৌক্তিকতা সুকর্ণ স্বীকার করেন, এ সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তিনি বহু জায়গায় মন্তব্যও করেছেন। পরলোকগত আগা খাঁও এ মতানুসারী ছিলেন। বিবাহিত জীবনের মৌল শর্ত যৌন-জীবন— যৌন-জীবন যে কারণেই হোক ব্যাহত হলে নর-নারীর জীবনে অনেক কিছু হারিয়ে যায়। বিশেষত সুস্থ আর সক্ষম মানুষের বেলায়। ঐ সম্পর্কে শৈথিল্য বা অক্ষমতা দেখা দিলে ভাঙ্গন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুকর্ণ একাধিক বিয়ে করেছেন, ত্যাগ করেছেন প্রথমা স্ত্রীকে। কিন্তু কারো প্রতি অবিচার করেননি। প্রথমটি ছাড়া তাঁর অন্য বিয়েগুলি দু'পক্ষের প্রেমের পরিণতি। তাঁর প্রথম বিয়ে যখন হয় তখন তাঁর বয়স উনিশ-কুড়ি আর ঐ বিয়ে হয় হিতৈষীদের উদ্যোগে। সুকর্ণের মতে ঐ স্ত্রীর তেমন কোন যৌন-চেতনা বা আবেগ ছিল না। আর তাঁরা একে অপরের প্রতি বোধ করেননি কোন আকর্ষণও। এ বিয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় আর আপোষে ভেঙ্গে যায় বিয়ের অল্পকাল পরে, তাও ঘটে তাঁর স্ত্রীর পূর্ণ সম্মতিতে। দ্বিতীয়টি অবশ্য প্রেমের বিয়ে কিন্তু এ স্ত্রী ছিল তাঁর চেয়ে তের বছরের বড়। সুকর্ণের তখন চল্লিশ আর তাঁর স্ত্রীর যখন তিপ্পান্ন বয়স তখনো তাঁর নিঃসন্তান। অথচ সুকর্ণ তখন বোধ করছিলেন প্রবল এক সন্তান-ক্ষুধা— এও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অমানবিক নয়। এ ক্ষুধার আংশিক তৃপ্তির জন্যই বোধকরি তিনি তখন একটি মেয়েকে পোষ্যও নিয়েছিলেন। কিন্তু দুধের স্বাদ তো ঘোলে মেটে না।

এ সময় তিনি সুন্দরী তরুণী পদ্মাবতীকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের পর তিনি লাভ করেন পিতৃত্বের গৌরব আর আনন্দ দু-ই। পদ্মাবতী যখন পাঁচ সন্তানের মা তখন সুকর্ণ পুরোপুরি রাষ্ট্রনায়ক আর বয়সের দিক দিয়েও পুরোপুরি প্রবীণ। তবুও এর পরও তিনি একের পর এক দুই বিয়ে করেছেন। তার মধ্যে শেষেরটি এক অল্পবয়স্কা জাপানি তরুণী। এ দুই বিয়েও নাকি ভালোবাসার পরিণতি। শেষ বিয়ে যখন করেন তখন সুকর্ণর বয়স ষাটের ওপর। মানুষ বিয়ে করে দৈহিক আর মানসিক এ দুই প্রয়োজনেই— অগ্রাধিকার অবশ্য দেহের। সুখ-সম্পদ আর সম্মান প্রতিপত্তির আকর্ষণও মানুষের মনে কম দুর্বার নয়। তার ওপর নারীর মনের খবর দেবতাদেরও নাকি অগোচর। প্রেম এমন এক রহস্যময় ব্যাপার যে, সে সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভবের নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছা এক রকম অসাধ্য বল্লেই চলে। যাই হোক, রাষ্ট্রনায়কদের ব্যক্তিগত জীবন তেমন কিছু বড় কথা নয়, যদি না তা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করে। সুকর্ণের বেলায় তা হয়নি— সুকর্ণের স্ত্রীরা পুরোপুরি প্রাচ্য, স্ত্রী সম্বন্ধে সুকর্ণের ধারণাও বোধ করি তাই তাঁর নির্বাসন জীবনে তাঁর দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন তাঁর স্ত্রী (দ্বিতীয়জন) কিন্তু কেউই হননি তাঁর জন-জীবনের সাথী, চাননি হতে। মনে হয় পারিবারিক জীবনের বেশি তাঁদের কারো কোন উচ্চাশা ছিল না। সুকর্ণের রাষ্ট্রীয় আর জন-জীবনে তাঁরা কেউই কখনো বাধা হননি। বিয়ের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে সুকর্ণের ব্যক্তিগত জীবনের অঙ্গ হিসেবেই গণ্য করা যায়। ব্যক্তি-জীবনে রুচিভেদের মতো প্রয়োজনভেদও অনস্বীকার্য।

সুকর্ণ নিজের দেশের জন্য চেয়েছিলেন সমাজতন্ত্র। অবশ্য এ সমাজতন্ত্র অন্য দেশের নকল নয়। বহু কিছুর মিশ্রণেই এক ধরনের সমাজতন্ত্র তাঁর মনে রূপ নিয়েছিল— যার

ইন্দোনেশিয়ার জন্য তিনি মনে করতেন এ হবে সর্বরোগহর। এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এভাবে :

Our socialism is a mixture. We draw political equality from the American Declaration of Independence. We draw spiritual eqality from Islam and Christianity. We draw scientific equality from Marx. To this mixture we add the national identity Marhaenism (Marhaen-নিঃস্ব মেহনতি জনতা) Then we sprinkle in gotong rayong, which is the sprit, the essence of working together, living together and helping one another. Mix it all up and the result is Indonesian socialism.

এ সমাজতন্ত্রকে বিরুদ্ধপক্ষ আর পশ্চিমা দেশগুলি কমিউনিজম বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষের মনে এক বিভ্রান্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে। অনুন্নত দেশে আর যেখানে অধিকাংশ মানুষ মুসলমান সেখানে এ প্রচারণা দাবানলের মতো কাজ করে। বিশেষ করে কমিউনিজম আর নিরীশ্বরবাদকে এক ধরে নেওয়ার ফলে জনতা সহজেই এ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে মারমুখো হয়ে ওঠে। পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক দেশগুলি এতে জোগায় ইন্ধন। সুকর্ণ আর ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ এই। না হয় সুকর্ণ নিজে কমিউনিস্ট নন একথা তিনি আত্মজীবনীতেও বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধর্মবিশ্বাসও মনে হয় গভীর ও আন্তরিক। দশ হাজার দ্বীপপুঞ্জের বহু সম্প্রদায় আর গোত্রে বিভক্ত মানুষকে একই জাতীয়তার সূত্রে গ্রথিত করা কম দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। সুকর্ণ এ দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। অথচ নিজের জন্য তেমন ধনদৌলত নাকি কিছুই তিনি সংগ্রহ করেননি। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের একটা ইমেজ বা কল্পরূপ তিনি নিজের জাতি আর বহির্বিশ্বের সামনে খাড়া করতে চেয়েছিলেন, তাঁর জাঁকজমক আর প্রাসাদের সাজসজ্জার এ কারণ বলেই উল্লেখ করেছেন, তিনি সামান্য স্কুল মাস্টারের ছেলে। সুকর্ণ প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত কঠোর দারিদ্র্যে অভ্যস্ত ছিলেন। ফলে যে কোন প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন, ভেঙ্গে মুষড়ে কখনো পড়তেন না।

অনুন্নত দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ প্রতিক্রিয়াশীলতা। এ অভিশাপের বিরুদ্ধে সুকর্ণকে সারাজীবনই সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমাদের দেশের মতো ইন্দোনেশিয়ায়ও বামপন্থী কথাটা প্রতিক্রিয়াশীলরা সব সময় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে নিজেদের ব্যক্তিগত আর দলীয় স্বার্থে। এ হাতিয়ারের বিরুদ্ধে সুকর্ণকে বারবারই মোকাবেলা করতে হয়েছে। বামপন্থী কাকে বলে? কারা বামপন্থী? তারা কি চায়? সুকর্ণের মতে :

Leftists are those who desire to change the existing capitalistic, imperialistic order. To desire to spread social justice is leftist. It is not necessarily Communistic. A person with such ideals is leftist. He is not necessarily Communistic. Leftist can even be at odds with the communists. Leftophobia the disease of dreading leftist ideas is a sickness I dread as much a

Islamphobia. Nationalism without social justice is nothingness. How can a miserable poor country such as ours have anything but a socialist trend?

দরিদ্র আর অনুন্নত দেশের জন্য সমাজতন্ত্র ছাড়া ভাবাই যায় না। ধনতন্ত্র মানে মাত্র কয়েক জনের জন্য বহুকে বঞ্চিত করা, বঞ্চিত রাখা। তথাকথিত ধর্মতন্ত্র কোন দেশে কোন যুগেই সফল হয়নি বরং এর ফলে নির্যাতন আরো বেশি করে প্রশ্রয় পেয়েছে। তাতে বৃহত্তর জনসংখ্যার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেনি মোটেও। দেশের উন্নয়নের জন্য আমেরিকার কাছে সাহায্য চেয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আর চীন বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। এর ফলেই ইন্দোনেশিয়া তথা সুকর্ণ রাশিয়া আর চীন ঘেঁষা হয়ে পড়েছিলেন। না হয় তিনি নিজে কমিউনিস্ট নন। জীবনের প্রতিটি সংকট মুহূর্তে আর যে কোন গুরুতর সিদ্ধান্তের আগে তিনি আল্লাহ'র নাম নিতেন, প্রার্থনা করতেন। তবে সব ব্যাপারে ছিলেন মুক্তবুদ্ধি, কোন ব্যাপারেই গোঁড়ামিকে দেননি এতটুকু প্রশ্রয়। সব রকম অন্ধবিশ্বাস আর চলতি বহু দেশজ সংস্কারকে ডিঙিয়ে যেতে সারাজীবন তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

একবার এক বন্ধু তাঁকে একটি জাদু-সিদ্ধ আংটি উপহার দিয়েছিলেন— এতে তাঁর শুভ হবে, জয় হবে— It is a luck bringer সঙ্গে সঙ্গে এ আশার বাণী শুনিয়েও ছিল উক্ত বন্ধুটি। সুকর্ণও তখন এসব বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি : I believed anything in those days because I needed all the help I could get. দেশের স্বাধীনতার জন্যই তিনি বোধ করছিলেন তখন সব রকম সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। তাঁর ভাষায় : 'Immediately I got deported to Fores' (একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান)। এরপর তিনি ঐ বন্ধুর কথায় আর তেমন আস্থা স্থাপন করেননি। আর মনে মনে সংকল্প নিয়েছিলেন এসব দুর্বুদ্ধিতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার। একদিন নিজেকে সম্বোধন করেই বল্লেন :

'You have seen the evils of superstition, yet is not it so you do not eat from a saucer with crack in it because you believe all manner of dire things will befall you if you do!'

ভাঙ্গা-বাসন থেকে খাওয়া আমাদের দেশের মতো ও দেশেও বোধকরি অশুভ মনে করা হয়। এক সংস্কারের শিকল ভাঙ্গতে পারলে অন্য শিকলগুলি ভাঙ্গাও হয় সহজ। তাই একদিন তিনি তাঁকে ভাঙ্গা বাসনে পরিবেশন করতে বলে দিলেন। তা করার পর তিনি যা করলেন আর তাঁর মনের যা অবস্থা হলো তা তাঁর নিজের জবানীতেই শোনা যেতে পারে :

I trembled a little because I had enough troubles without adding more by breaking a potent law, but I set the saucer on a table and stared it down. Then I made a speech to this silly plate which held much authority over me. I said "You, you dead lifeless stupid thing. You can have no power over my destiny. I face you. I am free of you. Now I eat out of you." That has

become my pattern for my fear which threatens me. I face it and then I am no longer afraid. এ ভাবে সুকর্ণ অন্ধ আর যুক্তিহীন সংস্কারের হাত থেকে নিজেকে একে একে মুক্ত করে নিয়েছিলেন।

সুকর্ণের বয়স যখন চৌষট্টি তখন স্বভাবতই অন্যের মতো তাঁরও মৃত্যুর কথা মনে পড়েছে। নিজেই বলছেন : একথা সুনিশ্চিত যে আমাকেও একদিন সর্বশক্তিমানের সামনে নিয়ে হাজির করা হবে। পরলোক সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় আর এও আমার বিশ্বাস যে, আমার চারদিকে সব সময় অদৃশ্য ফেরেস্তারা রয়েছেন। বিচারের দিন আমার ডানের ফেরেস্তা আমার সুকীর্তির ফর্দটা তুলে ধরে বলবেন—সুকর্ণ, চেয়ে দেখো এটুকুই স্রেফ তোমার সৎকর্মের তালিকা। এর পর বাঁয়ের ফেরেস্তাটা বলে উঠবেন—কিন্তু তোমার পাপের ফর্দ যে অনেক বেশি লম্বা, কাজেই সুকর্ণ তোমাকে দোজখে না পাঠিয়ে আমার উপায় নেই।

এ প্রসঙ্গে সুরসিক সুকর্ণ একটি চমৎকার গল্প উদ্ধৃত করেছেন। গল্পটি নাকি তাঁকে বলেছেন তাঁর বন্ধু পশ্চিম ইরিয়ানের এক বিশপ। গল্পটি এই : বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী সোফিয়া লরেন একদিন পরলোকের সোনালি দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়া দিলে। হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন সেন্ট পিটার। তাঁকে দেখেই অভিনেত্রী বল্লে ঃ সার, আমি সোফিয়া লরেন, দয়া করে আমাকে স্বর্গে ঢুকতে দেবেন কি?

বিহ্বল সেন্ট পিটার ভ্রূ কুঁচকে কিছুটা ইতস্তত করে বল্লেন : একটু থামো, তালিকাটায় তোমার নাম আছে কিনা দেখে নেই। লরেন, লরেন, সোফ, বিড় বিড় করে তালিকায় তিনি খুঁজতে লাগলেন ঐ নাম। পরে বল্লেন—না, আমার তালিকায় তোমার নাম তো দেখছি না। মিস্, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তোমাকে আমি তো ভিতরে ঢুকতে দিতে পারি না।

অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে সোফিয়া অনুনয় করে বল্লে—প্রিয় সেন্ট পিটার, আমার প্রতি একটি বার দয়া করুন। দয়ালু সেন্টের মন যেন কিছুটা নরম হলো, বললেন, দেখো আমি নিরপেক্ষ মানুষ, তুমি যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারো তাহলে তোমাকে স্বর্গে ঢুকতে দিতে আমার আপত্তি নেই। স্বর্গের মুখে একটি হ্রদ আছে ওটার উপর আছে একটা খুব সরু সেতু। ওটা পার হতে পারলেই তোমার স্বর্গে প্রবেশ সুনিশ্চিত। সোফিয়া জানতে চাইল, ওটা পার হওয়া এমন কি কঠিন?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সেন্ট পিটার বল্লেন : পাপীরা ওটা কিছুতেই পার হতে পারে না, পড়ে যায় নিচে। দু'জনেই এবার হ্রদের পাড়ে সেতুর ধারে গিয়ে হাজির হলেন—সত্যই সেতু ভয়ানক সরু। কোনরকমে একজন শুধু পা রাখতে পারে। সোফিয়ার তর সইছিল না, সে আগেই পা বাড়াল, তার পেছনে পেছনে সেন্ট পিটার তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। সুন্দরী লাস্যময়ী সোফিয়ার পরনে টাইট স্কার্ট। এবার পাছা দুলিয়ে, গা হেলিয়ে, নিতম্ব নাচিয়ে হেলেদুলে সর্বাঙ্গে মোহ ছড়িয়ে ও একটার পর একটা পা ফেলে আগে আগে চলেছে। আর সেন্ট পিটার পেছন থেকে দেখতে দেখতে এগুচ্ছেন। সোফিয়া যখন নিরাপদে অপর পরে পা ঠেকিয়েছে তখন হঠাৎ পেছনে ঝপাৎ শব্দ শুনতে পেয়ে ও চমকে উঠল! গল্পশেষে সুকর্ণের মন্তব্য : স্বয়ং সেন্ট পিটারের যদি এ দশা হয় তাহলে সুকর্ণ

নির্ঘাত ডুববেই। যদি সত্য সত্যই স্বর্গের দুয়ারে কোন দ্বাররক্ষক থাকেন আর তিনি যদি মানুষকে যেখানে ইচ্ছা পাঠাতে পারেন তাহলে সোজা নরকে পতন ছাড়া আমার আর কোন উপায়ই থাকবে না!

সুকর্ণ নিজের জন্য কোন জাঁকজমকপূর্ণ স্মৃতিসৌধ কামনা করেননি। এও তাঁর সহজ কাণ্ডজ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি যে শুধু স্পষ্টবাক তা নন; জীবন আর জীবনের ব্যাপার, এমনকি বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্বন্ধেও তিনি নির্ভীক আর পুরোপুরি জীবন-রসিক। ভয়ে নিজের বাসনা-কামনাকে যেমন তেমনি মনের গোপন কথাকেও চাপা দেননি কখনো। এ যুগে এমন উদার আর সর্বসংস্কারমুক্ত রাষ্ট্রনায়ক দেখা যায় না—হয়তো তাঁর পতনের কারণও এই। প্রতিক্রিয়াশীলরা এসবের সুযোগ নিয়েছে– চূড়ান্তভাবে অনুন্নত দেশের জনতাকে ধর্মের নামে ক্ষেপিয়ে তোলা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়ায়ও তাই ঘটেছে। ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত, কালক্রমে ইন্দোনেশিয়ারও মহাকাব্য হয়ে পড়েছে। ঐ মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকারা ইন্দোনেশিয়াবাসীর কাছে আজো বীর আর বীরাঙ্গনা বলেই স্বীকৃত। তাদের নাচগান আর সাংস্কৃতিক জীবনে এ দুই মহাকাব্যের প্রভাব অসীম। মহাভারতের কর্ণ চরিত্র সুকর্ণের স্কুল শিক্ষক পিতার নাকি খুব প্রিয় ছিল, তাই তিনি পুত্রের নাম রেখেছিলেন কর্ণ। পরে তার সঙ্গে গুণবাচক 'সু' উপসর্গ যোগ হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার জনগণই করেছে যোগ। সুকর্ণের মা ছিলেন এক গরিব বামুনের মেয়ে—সুকর্ণের বাবার সঙ্গে তার বিয়েও নাকি ভালোবাসারই পরিণতি। শুধু রামায়ণ-মহাভারত নয়, ভারতীয় পুরাণ আর কিংবদন্তিও বোধকরি ঐ সব দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় পুরাণোক্ত কল্পতরুর কথাও ইন্দোনেশিয়ার লোক-বিশ্বাসে স্থান পেয়েছে। সুকর্ণ নিজের অন্তিম বাসনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন : মৃত্যু মুহূর্তে যদি ফেরেস্তারা আমাকে কল্পতরু বৃক্ষের নিচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, তোমার কি আরজু বলো। আমি বলব: আমি শান্তিতে নিরুপদ্রবে আমার দেশের মাটিতেই মরতে চাই। আমার যাওয়ার সময় যদি হয়েই থাকে আমি শুধু চাই চোখ দুটো বুজতে আর তৎক্ষণাৎ আমার প্রভুর দুই বাহুতে গিয়ে আশ্রয় পেতে। সুকর্ণ তাঁর আত্মজীবনী শেষ করেছেন এ ক'টি কথা বলে : এ দুনিয়ায় আমি যদি কিছু সাফল্য অর্জন করে থাকি, তা করেছি আমার জাতির সহায়তায়। তারা ছাড়া আমি কিছুই না। যখন আমার মৃত্যু হবে আমাকে ইসলাম ধর্মানুসারেই কবরে সমাধিস্থ করে সাদাসিধা এক টুকরা পাথরে শুধু এ কথা কয়টিই লিখে রেখো আমার কবরের ওপর : ইন্দোনেশীয় জাতির মুখপাত্র বং সুকর্ণ এখানেই শুয়ে আছে।

ভাষা ও সাহিত্য

ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি এসবই দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। রাতারাতি এতে ওলট-পালট ঘটাতে গেলে অনিবার্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়ে রেহাই নেই, ভাষা আর সাহিত্যে বিশেষ করে জীবনেরই অভিব্যক্তি ঘটে, জীবন চলিষ্ণু বলে তার প্রতিফলন যে ভাষা আর সাহিত্যে ঘটে তাও চলিষ্ণু হবেই। আর অচল সমাজের মতো অচল ভাষারও মৃত্যু অবধারিত। সংস্কৃত, পালি, ল্যাটিন, প্রাচীন গ্রিক ইত্যাদি তার নিদর্শন— এসব ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য থাকা সত্ত্বেও তা এখন কোন চলমান সমাজের নিত্যদিনের অঙ্গ নয় বলে, মূল্যবান মিরাছের বেশি এসবের আর কোন মূল্য নেই। পণ্ডিত আর একাডেমিক প্রয়োজনের বাইরে এসব ভাষার ব্যবহার আর আবেদন আজ নিঃশেষিত। এসবে তাই নতুন রঙ, নতুন ঢঙ, নতুন ভঙ্গি কিংবা নতুন গতি-ছন্দ অর্থাৎ প্রকাশের নতুন নতুন আঙ্গিক কিংবা ভাবের কোন নব তরঙ্গাঘাত আশা করা যায় না, এসব ভাষা ও সাহিত্য পুরোনো স্মৃতিসৌধের মতোই স্থির-অচল-জড় কিন্তু মনোহর ও উপভোগ্য। আপন প্রিয়জনের অতি মনোরম মৃতদেহও কেউ কাঁধে করে বয়ে বেড়ায় না। কারণ সবাই জানে জীবিত খোঁড়া কি কুৎসিত মানুষটাও ঐ দেহের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। সমৃদ্ধ মৃতভাষা সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে।

ভাষাকে যে 'বহতা নদী'র সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় তারও বিচার প্রয়োজন। কারণ, নদীর মতো ভাষার নিজস্ব কোন গতি বা চলশক্তি নেই, ভাষা যে মানবগোষ্ঠীর প্রকাশ-বাহন সে মানবগোষ্ঠী তথা সে সমাজ সচল হলেই তার ভাষাও হবে গতিশীল ও বহতা। জীবনের প্রয়োজন আর তাগাদা চলিষ্ণু, সমাজের ভাষাকেও করে তুলবে চলিষ্ণু, দেবে না ঐ ভাষাকে স্থির আর স্থাণু হয়ে থাকতে। তাই বলা যায়, ভাষার গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে সমাজের গতি-প্রকৃতির সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা। বাংলা ভাষার গতিধারা অনুসরণ করলেও আমরা এ একই সিদ্ধান্তে পৌছব। যাঁরা পুঁথি-সাহিত্যের ভাষাকে আদর্শ আর আজো এ যুগের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম বলে মনে করেন তাঁরা ভুলে যান যে পুঁথি-সাহিত্য ছিল এক অচল সমাজের, এক অতি সীমিত ও গণ্ডিবদ্ধ মানুষের সাহিত্য। সে সমাজে চলিষ্ণুতার কোন লক্ষণই ছিল না, ঐ সমাজের প্রতিদিনের জীবন-সমস্যাও ছিল না এমন বিচিত্র ও জটিল। ওটা শিল্প-বিজ্ঞান যুগের সাহিত্য যেমন নয় তেমনি বিশ্বের সঙ্গে মোকাবিলা বা ভাব-বিনিময়ও সম্ভব নয় ঐ সাহিত্যের ভাষা আর আঙ্গিক দিয়ে। বলাবাহুল্য, ভাষা ভাবের অনুগামী, দুই-ই হাত ধরাধরি করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। ভাব বা বিষয়বস্তুর অনুরূপ না হলে তেমন ভাষাকে নিন্দা করা হয় গুরুচণ্ডালি বলে। তাই খাঁটি লেখকরা তেমন ভাষা পরিহার করতে চেষ্টা করেন যথাসাধ্য। নন্দনতত্ত্ব, আপেক্ষিক থিওরি কি অস্তিত্ববাদের যথোপযুক্ত আলোচনা পুঁথির ভাষায় সম্ভব এ বিশ্বাস করা যায় না যতদিন না কেউ এর সফল দৃষ্টান্ত দেখান আমাদের চোখের সামনে। তিনটি মাত্র আধুনিক বিষয়ের নাম করলাম বটে কিন্তু এরকম অসংখ্য বিষয় আজ আমাদের মননশীল চিন্তা কর্মের অংশ যা পুঁথি-রচয়িতাদের কল্পনায়ও ছিল অনুপস্থিত। যে যুগ আমরা এখন

পেছনে ফেলে এসেছি সে যুগে আমাদের ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সে যুগের মুখের ভাষা কি কলমের ভাষাকে আমাদের মুখের কিংবা কলমের ভাষা করা।

ভাষার ব্যাপারে সংবাদপত্র আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিদিনই ভাষা নতুন করে রূপ নিচ্ছে সংবাদপত্রের হাতে। প্রতিদিনের জীবন আর ঘটনার সঙ্গে সংবাদপত্র এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে এ দুই প্রায় পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। পুঁথি-সাহিত্য যুগের অচল সমাজে এর প্রয়োজন যেমন ছিল না, তেমনি তাগিদও ছিল না, ফলে উৎপত্তিও ঘটেনি। সে অচল সমাজের অচল ভাষাকে যাঁরা আজ আমাদের সচল সমাজেও চালাতে চান তাঁরা স্রেফ মৃত ঘোড়াকেই চাবুক মারছেন। বিশ্বের রেস-কোর্সে সে ঘোড়া সান্ত্বনা প্রাইজও পাবে না কোন দিন। ঐ যুগের তুলনায় আমাদের জীবন এখন প্রতিনিয়তই আলোড়িত, আবর্তিত, বিচলিত, অস্থির ও অধীর— প্রতিদিন এ জীবনের প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে ও সংবাদপত্রের ভাষায়। এভাবে নতুন নতুন শব্দে, বক্তব্যে আর প্রকাশশৈলীতে আমাদের ভাষা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নির্মিত হয়ে চলেছে। সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার পার্থক্য যতই সুস্পষ্ট হোক না কেন ভাষার গতিশীলতা আর ক্রমবিবর্তনের রূপ সাময়িকপত্রেই আগে প্রতিফলিত হয়। ভাষার গায়ে নতুন শব্দের সংযোজন আর অপ্রয়োজনীয় পুরাতনকে বর্জন করে ত যে প্রতিনিয়তই রূপান্তরিত হচ্ছে সে পরিচয়ও সর্বাগ্রে দেখা দেয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। সচেতন লেখক এ রূপান্তর লক্ষ্য না করে পারে না। এখানে মুসলমানি আর হিন্দুয়ানি শব্দের সংখ্যানুপাত নিয়ে বিচার করতে গেলে ভাষা আর সাহিত্য দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দুই-ই চলৎশক্তি হারিয়ে হয়ে পড়বে পুঁথি-সাহিত্যের মতো বন্ধ্যা আর অথর্ব। চলিষ্ণু জীবনের পাথেয় একমাত্র চলিষ্ণু ভাষা আর সাহিত্যই পারে জোগাতে।

গদ্যই যে কোন ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অংশ। শুধু ভাব-বিনিময়ের নয় জীবনের সব কাজ আর সব প্রয়োজনেরও বাহন গদ্য। কবিতার ভাষা কৃত্রিম, ছন্দের খাতিরে কিছুটা কৃত্রিমতা কবিতার জন্য অত্যাবশ্যকও। গদ্যই স্বাভাবিক, লৌকিক আর ব্যবহারিক ভাষা, জীবনের গতিশীলতার লক্ষণ তাই সর্বাগ্রে ও সবচেয়ে বেশি গদ্যেই প্রতিফলিত। সাহিত্যে কাব্যের আবির্ভাব যে আগে হয়েছে তার পেছনে অন্য কারণ নিহিত। আর সে কারণ অনেকখানি অব্যবহারিক, তা শৈল্পিক। গদ্য আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের আর প্রতিদিনের ব্যবহারের অপরিহার্য হাতিয়ার। তাই গতিশীল জীবনের ও সমাজের প্রতিফলন গদ্যেই আগে এবং বেশি করে ঘটে। পরে তা ধীরে ধীরে কাব্যেও ফেলে ছায়া। আজ যে কাব্য অনেকখানি গদ্যধর্মী হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে এ যুগের চলমান জীবনের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বিদেশের অনুকরণ এতে যতই থাক, এ কিন্তু স্রেফ উড়ে এসে জুড়ে বসা নয়। বর্তমান জীবনেরই এও এক অভিব্যক্তি। বিদেশের বেলায় যেমন আমাদের বেলায়ও তাই।

আমাদের গদ্য সাহিত্যের আয়ু মোটামুটি দেড়শ বছর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রিস্টাব্দে) থেকেই তার সূচনা। এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে আমাদের স্থির ও মন্থর জীবনে সর্বপ্রথম গতিশীলতার হাওয়া বইয়ে দিয়েছে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য যা ইংরেজ শাসনেরই সাক্ষাৎ অনুষঙ্গ। এরই প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের সাহিত্যে— গদ্য আর কবিতা দুই ক্ষেত্রেই। পুঁথি-সাহিত্য ছিল পুরোপুরি পল্লীকেন্দ্রিক। আরাকান রাজসভায়ও যেসব পুঁথি

রচিত হয়েছে তারও পাঠক ও ভোক্তা পল্লীবাসী। পুঁথি কখনো শহরে-নগরে পাত্তা পায়নি, নগরবাসীর রসবোধ তাতে কখনো তৃপ্তিসাধন করেছে তার প্রমাণ আজও অজ্ঞাত। কাজেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নগরবাসী পণ্ডিত আর মুন্সিদের ওপর পুঁথি-সাহিত্যের কোন প্রভাব পড়ার কথা নয়। ওঁদের মুরুব্বিরাও অর্থাৎ ক্যারি আর তাঁর সহকর্মীরাও পুঁথি সম্বন্ধে খুব উৎসাহী ছিলেন বলে জানা যায়নি। তখনকার লেখকদের রচনা তাঁদের বিদ্যা অভিজ্ঞতা আর পরিবেশের ফল। বলাবাহুল্য সব রচনাই এভাবেই হয় রচিত। সাহিত্য-রচনার এ এক সনাতন পন্থা ও নীতি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানি লেখকরা এখন যে সাহিত্য করছি তাও এ পথে ও এ নীতি অনুসরণ করেই। বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করেই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত-বহুল করে তুলেছেন, এ অভিযোগ সত্য নয় বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁরাও সাহিত্যের সনাতন পদ্ধতিতেই সাহিত্য রচনা করেছেন অর্থাৎ তাঁদের বিদ্যা অভিজ্ঞতা আর পরিবেশের ফলশ্রুতিই তাঁদের রচনা। তাঁরা কেউই পুঁথি-সাহিত্যের উত্তর-সাধক নন, এমনকি ঐ সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল তাও মনে হয় না। তাঁদের ব্যাপক পরিচয় ছিল সংস্কৃত আর ইংরেজির সঙ্গে আর অভিজ্ঞতা ছিল নিজ সমাজ আর পরিবেশের— সে সমাজের চাহিদা পূরণই তাঁদের রচনা। তাঁদের রচনার ভাব, বিষয়বস্তু আর আঙ্গিকে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সেদিন তাঁদের সামনে মুসলমান সমাজ বা পাঠক তেমন বড় হয়ে দেখা দেয়নি, দেওয়ার কথাও নয়— তাঁদের সামনে ছিল উদীয়মান হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাঁরা জুগিয়েছেন সে শ্রেণীরই মানসিক খোরাক। কাজেই তাঁদের ভাষা কিছুতেই পুঁথি-সাহিত্যের দোভাষী ভাষা হতে পারে না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম আর তাঁদের সমসাময়িকদের রচনার প্রতি এ দৃষ্টিতে না তাকালে তাঁদের রচনার যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আমরা পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যিকরা এখন যে সাহিত্য করছি তার ওপরও কি আমাদের বিদ্যা, অভিজ্ঞতা আর পরিবেশের প্রভাব অধিকতর লক্ষ্যগোচর নয়? আমরাও আমাদের সামনে এখন বেশি করে দেখতে পাচ্ছি মুসলমান সমাজ ও পাঠককেই, ফলে আমাদের ভাষা আর বিষয়বস্তু এমনকি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও সেভাবেই গড়ে উঠছে, প্রতিদিন সেভাবেই রূপ আর মোড় নিচ্ছে। এ হচ্ছে সাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়ম। মহা-প্রতিভাও নিজের পরিবেশ আর অভিজ্ঞতাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না যেমন পারে না গাছ মাটির বন্ধন [illegible] আকাশে উড়ে যেতে— এমনকি বট অশ্বত্থ হলেও। রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যও তাঁদের [illegible] বিদ্যা, পরিবেশ আর অভিজ্ঞতারই ফল। তাঁদের সাহিত্যের বিচার-মূল্যায়ন [illegible] পরিপ্রেক্ষিতেই করা বাঞ্ছনীয়। মীর মশাররফের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, একেবারে [illegible] আমলের মওলানা আকরাম খাঁ কিংবা এয়াকুব আলী চৌধুরীর ভাষাও তো সংস্কৃত-[illegible] তাঁরাও কি স্রেফ মুসলমানদের জব্দ করার মতলবেই দোভাষী ভাষা ছেড়ে অমন [illegible] ভাষায় লিখেছেন? সাহিত্য সাহিত্যিক আর ভাষা সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার আগে [illegible] ভেবে দেখতে হয়, বিশেষ করে বিবেচনা করে দেখতে হয় যুগ, কাল, সমাজ [illegible] পরিবেশকে। আমার বিশ্বাস বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষায় লিখেছেন ঐ ছাড়া [illegible] ভাষায় লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবই হতো না।

'আলালের ঘরের দুলাল' কিংবা 'হুতুম প্যাঁচার নকশা' তেমন কোন মহৎ সা[illegible] নয় আর ঐ ভাষা কখনো পূর্ব কি পশ্চিম কোন বাংলারই সাহিত্যের ভ[illegible]

পারে না, তাই হয়ওনি। স্যাটায়ারের বেশি ঐ দুই গ্রন্থের বিশেষ কোন মূল্য নেইও যেটুকু মূল্য তা স্রেফ ঐতিহাসিক নজির হিসেবে। সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার অনুসারী হবে, সে ভাবে নির্মিত হবে ভাষা, এ মতবাদেও আমার সায় নেই। কোন সাহিত্যই এভাবে গড়ে ওঠেনি— শেক্সপিয়র থেকে নজরুল ইসলাম কেউই জনসাধারণের মুখের ভাষায় রচনা করেননি সাহিত্য। মুখের ভাষার দেদার শব্দ চিরকালই সাহিত্যে স্থান পেয়ে এসেছে, এখনো পাচ্ছে, সামনেও পাবে। চলমান জীবনের ছবি আঁকতে গেলে, তার যথাযথ অভিব্যক্তি দেখাতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। কাব্যে ছন্দের খাতিরে অনেক অপ্রচলিত শব্দ জায়গা পেয়ে যায়, অভিনবত্বের জন্যও লেখকরা অনেক সময় নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, আরোপ করে থাকেন নতুন অর্থও। এসবই সাহিত্যের স্বীকৃত নীতি। রবীন্দ্রনাথ নৌকা অর্থে কিস্তি শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। ওটা দোভাষী ব পুঁথির ভাষার প্রতি মমতার বশে বা পূর্ব সংকল্প নিয়ে তিনি করেননি, যে কবিতায় ঐ শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন সে বিশেষ কবিতার স্বাভাবিক গতিতেই তা তাঁর কলমের মুখে এসে গেছে, এতে তাঁর রচনায় যথার্থ ও অভিনবত্ব এসেছে বলেই তিনি ঐ অপরিচিত 'বিজাতীয়' শব্দকেও স্বাগত জানিয়েছেন, বদলে অন্যে কোন খাঁটি বাংলা শব্দ বসাতে চেষ্টা করেননি। খাঁটি শিল্পীর এই ধর্ম, এই নীতি।

আমরা যদি এখন থেকে জল, সলিল, জীবন, নীর ইত্যাদি শব্দ আর না লিখে শুধু 'পানি' লেখার সঙ্কল্পই নিই তাহলে আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের মূলে কুঠার হানাই হবে। এ মনোভাব নিয়ে ভাষাকে সংস্কার করতে গেলে ভাষা যে শুধু দুর্বল হয়ে পড়বে তা নয়, হয়ে পড়বে সংকীর্ণ ও পঙ্গু, হারাবে প্রকাশ আর চলৎশক্তি। তখন কোন কোন বিষয়ে পুনরাবৃত্তির জাবর কেটে কেটেই আমাদের কবি, সাহিত্যিকদের থাকতে হবে সন্তুষ্ট। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এভাবে একটা কৃত্রিম কারবালা সৃষ্টির অপচেষ্টার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় বলেই কথাটার অবতারণা করা গেল এখানে। একে স্রেফ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টাই বলা যায়, আমরা সবাই মিলে যদি সব সময় 'পানি' বলতে আর লিখতে শুরু করি তাহলে আমরা আরো বেশি ভালো মুসলমান হবো আর ঈমান আমাদের আরো পাকা-পোক্ত হবে এ বিশ্বাস যাঁদের মনে হয় সাহিত্যবোধ যেমন তাঁদের নেই, তেমনি প্রকৃত ধর্ম-বোধ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত। যাই হোক আমার যা আপত্তি তা ভাষা আর সাহিত্যের দিক থেকেই। নজরুল ইসলামের গানের দুটি কলি মনে পড়ল :

"বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিটল না-কবি,
ফটিক জল! জল খুঁজিস যেথায়, কেবলি তড়িৎ ঝলকে।"

ফটিক জলের জায়গায় যদি এখানে ফটিক পানি লেখা হয় তাহলে গানটার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাটাকেও কি কতল করা হয় না? ফাঁসির আসামির বেলায় জল্লাদের ভূমিকা স্বীকার করা গেলেও ভাষা আর সাহিত্যের বেলায় এমন জল্লাদি কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

শব্দ ভাষার সম্পদ, ভাষার ঐশ্বর্য, ভাষার বাহন ও হাতিয়ার : গুটি কয়েক শব্দ নিয়ে অনুন্নত ভাষার, অনুন্নত সমাজের ও অনুন্নত সাহিত্যের কোন রকমে হয়তো চলে। কারণ তার প্রয়োজন কম, আবেগ-অনুভূতির দিগন্তও তার নেহাৎ সীমিত। উন্নত সমাজ মানে উন্নত ভাষা ও সাহিত্য আর উন্নত ভাষা আর সাহিত্য মানে অপরিমিত শব্দসম্ভার আর তার

ক্রম-বৃদ্ধি। তেমন সমাজ চলিষ্ণু বলেই গ্রহণশীল আর গ্রহণশীল বলেই উন্নয়নাভিসারী ও বিকাশোন্মুখ। উন্নয়ন মানে শুধু কলকারখানার উন্নয়ন নয়। শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি জীবনের সব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন। এ উন্নয়নের প্রধান ও মূল বাহন ভাষা। তাই কোন উন্নত জাতি তার ভাষা নিয়ে কন্দুক খেলা খেলে না। উন্নত সমাজের চাহিদা যেমন অপরিমিত তেমনি তার আবেগ-অনুভূতি আর মননশীল ক্রিয়া-কার্যের দিগন্তও অসীম, তাই সীমিত শব্দসম্পদে ঐ সমাজের চলে না, প্রতিদিনই ঐ সমাজকে নতুন নতুন শব্দ দিয়ে নিজের ভাষা আর সাহিত্যকে পুষ্ট করে তুলতে হয়। নিজের দেশ ও দেশজ শব্দ তার চাহিদা পূরণে অক্ষম হলে বিদেশ-বিজাতির ভাষা থেকে ধার করতেও তার দ্বিধা নেই।

প্রতিশব্দ, অলঙ্কার, উপমা-উপমান, যমক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির প্রাচুর্য উন্নত ভাষারই লক্ষণ, সাহিত্যের সম্পদ। এ সবে ভাষার প্রকাশ শক্তি যে শুধু বৃদ্ধি পায় তা নয়, ভাষার সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য আর আকর্ষণও বেড়ে যায়। আর এর ফলে ভাষা হয় অধিকতর হৃদয়-বেদ্য। পাখি জন্মসূত্রে যে একটি মাত্র স্বরের উত্তরাধিকার পায়, তা নিয়েই তার সারাটা জীবন কেটে যায়। কারণ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ইত্যাদি তার জীবনে অনাবশ্যক। কিন্তু মানুষের নিয়তি তা নয়—তাই তার শব্দ-বৈচিত্র্য স্বর-বৈচিত্র্য ও সুর বৈচিত্র্য চাই-ই। এ সবেরই প্রতিফলন ঘটে তার ভাষা আর সাহিত্যে— উন্নত সাহিত্যে এ প্রতিফলনের হার অধিকতর। বইতে পড়েছি আরবি ভাষায় এক উটেরই পাঁচ হাজার আর তলোয়ারের আছে তিন হাজার প্রতিশব্দ। বলাবাহুল্য এর বেশিরভাগ যে 'অন্ধকার যুগ' তথা কাফেরি জামানারই উত্তরাধিকার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবুও এসব শব্দ বর্জনের ধুয়া ওখানে উঠেছে শুনিনি।

সুদিনে-দুর্দিনে নিজের ভাষা আর সাহিত্যই মানুষের এক প্রধান আশ্রয়। তুর্কি শাসনের কঠিন বিপ্পেষণের দিনে আরবেরাও নিজেদের মাতৃভাষার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েই আত্মরক্ষা করেছিল। ঐ যুগের আরব-ইতিহাস সম্বন্ধে এক বড় বিশেষজ্ঞ T. E. Lawrence (যিনি লরেন্স্ অব এরেবিয়া নামে খ্যাত) লিখেছেন : "The Arabs would not give up thier rich and flexible tongue for crude Turkish : instead they filled Turkish with Arabic words, and held to the treasures of their own literature" বলাবাহুল্য তখন আরবদের ওপর তুর্কি ভাষা চাপাবার জোর চেষ্টা চলেছিল। আরবদের অনুকরণে আমরাও ইচ্ছা করলে প্রচুর বাংলা শব্দ উর্দুতে চালিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু তা না করে আমাদের কেউ কেউ তার বিপরীতটাই করেছে বা এখনো করছে। ভাষার ব্যাপারে আরবদের সঙ্গে আমাদের আরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লরেন্স লিখেছেন, তখন— They (The Arabs) lost their geographical sense, and their racial and political and historical memories; but they clung the more tightly to their language, and erected it almost into a fatherland of its own. (Seven Pillars of Wisdom). বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন আমাদেরও মাতৃভূমি সন্ধান আর তাতে আত্মরক্ষা ও আশ্রয় গ্রহণ। সে আশ্রয় আমরা পেয়েছি

আমাদের কর্তব্য সে আশ্রয়কে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা। তার প্রকাশ শক্তিকে আরও বেশি করে সম্প্রসারিত করা। আশ্চর্য, তা না করে আমাদের কেউ কেউ উল্টো এ আশ্রয়কে দুর্বল আর পঙ্গু করার চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। আরবি-ফারসি, সংস্কৃত-ইংরেজি যেখান থেকে যত শব্দ আমাদের ভাষায় আমরা শুধু রক্ষা করব না বরং পৃথিবীর তাবৎ ভাষা থেকে অপ্রয়োজনীয় নতুন নতুন শব্দ গ্রহণেও আমাদের কোন দ্বিধা থাকবে না। আমাদের সাহিত্য ও জীবন বিকাশের অনুকূল যে-কোন শব্দ গ্রহণে আমরা কোন রকম গোঁড়ামি আর অস্পৃশ্যতাকে দেব না প্রশ্রয়। আমাদের লেখকদের এখন এ-মনোভাব হওয়াই উচিত।

জাত লেখকরাই সৃষ্টি করে ভাষা আর সংস্কারকরা অকারণেও ডেকে আনে অনাসৃষ্টি। বাংলা ভাষাও স্থির হয়ে নেই, নেই অচল-অনড় হয়ে। অতীতেও প্রত্যেকটি শক্তিমান লেখক ক্রমাগতই এ ভাষাকে নিয়ে গেছেন নতুন পথে, মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন নানা দিক। তাই দেখা যায় বঙ্কিম-মধুসূদনের ভাষা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রে নতুন-চেহারা নিয়েছে, নজরুল-জসীম উদ্‌দীনের ভাষ্যও লেখকরাই ভাষায় নতুনত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম। অবনীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রশিল্পী নন, সার্থক ভাষা-শিল্পীও। ভাষার রূপ-বদল সম্বন্ধে তাঁর এ মন্তব্য মূল্যবান : "নতুন কবি, নতুন আর্টিস্ট এঁরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উল্টে-পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে। এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বলতেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখনো লিখতেম এবং যাত্রা করেই বসে থাকতেম সবাই। ভাষা সকল গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াত অথচ দেশে মনে হতো ভাষা যেন কতই চলেছে।" (শিল্প ও ভাষা)। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম 'এঁরাই নতুন কবি, নতুন আর্টিস্ট— এঁদের হাতে বাংলা ভাষা কিভাবে নতুন করে সচল ও বিচিত্র হয়েছে তা সাহিত্য-পাঠকদের অজানা নয়। ভাষায় রূপান্তর একমাত্র রসের পথে, সৃষ্টির পথেই সম্ভব। যান্ত্রিকভাবে আরোপিত জোর করা রদ-বদল ব্যর্থ হবেই একদিন— যন্ত্রের জোর কমে এলেই কালের হাত শুরু করবে তাতে রাবার ঘষতে। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার যে বিবর্তন ঘটে, তা ঘটে স্বভাবের পথে; প্রাকৃতিক নিয়মে। তাই ঠেকানো যায় না তেমন বিবর্তন কিছুতেই।

উচ্চাঙ্গের ভাষা ছাড়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্য অকল্পনীয়। ইতর ভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য রচিত হয়েছে এমন নজির আমার জানা নেই। ঐ প্রায় একসঙ্গে দুধ আর তামাক খাওয়ার মতোই এক উদ্ভট কথা। ইতর শব্দটি আমি এখানে ইংরেজি commoner-এর অর্থেই ব্যবহার করেছি। শব্দটির মূল অর্থই বোধকরি তাই। যাই হোক আমার বক্তব্য মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা সব সময় আলাদা। কোন কালেই মুখের ভাষায় সৎ সাহিত্য রচিত হয়নি। শেক্সপিয়র তাঁর আমলের জনসাধারণের ভাষায় লেখেননি, টলস্টয় লেখেননি তাঁর যুগের রুশ সাধারণের মুখের ভাষায়। পদ্মা-তীরে বোটে বসে রবীন্দ্রনাথ যে সব গল্প লিখেছেন তার ভাষাও পদ্মাতীরবাসী জেলে চাষীদের ভাষা নয়। নজরুলের গদ্য ভাষা তাঁর অঞ্চলের জনসাধারণের ভাষার কাছাকাছিও নয়। এমনকি পল্লীকবি বিশেষিত জসীম উদ্‌দীনের ভাষাও ফরিদপুরের সাধারণ মানুষের ভাষা নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মার্জিত রুচি ও মার্জিত মনেরই ফসল। এমন মানুষের ভাষা আর প্রকাশশৈলী কিছুতেই অমার্জিত,

অসাধু হতে পারে না। সাধু মানে ইংরেজিতে যাকে বলে Elegance. ফরাসি সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে : It is culture giving priority to language and to literary polish" মার্জিত ভাষা তথ্য মার্জিত সাহিত্যই সব সংস্কৃতির বুনিয়াদ। ভাষার ব্যাপারে কে কাকে অনুকরণ করবে? শিক্ষিত মার্জিত রুচিবানেরা কি অশিক্ষিত ও অমার্জিতদের ভাষা আর প্রকাশভঙ্গির না কি শেষোক্তরা প্রথমোক্তদের? জনসাধারণের মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা করার একটা বুলি এখন অহরহ উচ্চারিত হচ্ছে বলেই প্রশ্নটা তুলতে হলো। বাংলা ভাষাকে সাধু ভাষার নিগড় থেকে যিনি মুক্তি দিয়েছেন তিনিও কোন Commoner ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত, পণ্ডিত ও মার্জিত রুচির লোক ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল শুধু যে ... ইংরেজি, সংস্কৃত ভালো জানতেন তা নয়, ফরাসি ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল গভীর। সাধু ক্রিয়াপদের বদলে কথ্য ক্রিয়াপদ চালু করে তিনি বাংলা ভাষাকে অধিকতর সচলতা দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে তিনি জনসাধারণের ভাষার সাহিত্য করেছেন তেমন দাবি সম্পূর্ণ অচল। নমুনা হিসেবে তাঁর রচনা থেকে নির্বিচারে দুটি নজির এখানে উদ্ধৃত হলো, তা থেকে দেখা যাবে ক্রিয়াপদ বাদ দিলে খাঁটি সাধু ভাষার সঙ্গে তাঁর ভাষার তেমন কোন তফাৎ নেই। বলাবাহুল্য তাঁর রচনার ধাঁচ ও রূপ সর্বত্রই এক রকম।

(ক) "কবির সৃষ্টিও এই বিশ্ব সৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোন অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই— সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্তি এবং তার ফল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্য সৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভুক্ত; কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।" (সাহিত্যের খেলা : প্রবন্ধ সংগ্রহ পৃ. ১০২)

(খ) "কাব্যচর্চা না করলে মানুষ জীবনের একটা বড় আনন্দ থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হয়। এ আনন্দের ভাণ্ডার সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং কোন সভ্য জাতি কস্মিনকালে তাঁর দিকে পিঠ ফেরায়নি; এ দেশেও নয় বিদেশেও নয়। বরং যে জাতি যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বল্লে বোধহয় অন্যায় কথা বলা হয় না। নিদ্রা-কলহে দিন যাপন করার চাইতে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা যে প্রশংসনীয়, এমন কথা সংস্কৃতিতেই আছে।" (বই পড়া : প্রবন্ধ সংগ্রহ : পৃ. ১৫৯)

এ ভাষায় জনসাধারণ কেন স্বয়ং বীরবলও কথা বলতেন বিশ্বাস করা যায় না। সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলামের মুখের কথা শোনার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু তাঁদেরও নিজেদের লেখা বইয়ের ভাষায় কথা বলতে শুনিনি। দুঃখের বিষয় আমাদের অনেক প্রবীণ লোকও ভাষা আর সাহিত্য সম্পর্কে যখন কথা বলেন মোটেও ভেবে বলেন না। ভাষা-সংস্কার কথাটাই ভুল— ভাষা দালান-কোঠা-ইমারত নয় যে ইচ্ছামত সংস্কার করা যায়। ভাষার Evolution ঘটে, বিবর্তন হয়, জীবন তথা সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গেই তা জড়িত। তড়িঘড়ি যে কোন রকম সংস্কারের রোলার চালাতে গেলেই বিপর্যয় অনিবার্য। ভাষা আমাদের গায়ের জামা-কাপড় নয়, ভাষার সঙ্গে আমাদের মন মানস, চিন্তা-ভাবনা আর আবেগ-অনুভূতির নিবিড় সম্পর্ক। ভাষা চিন্তার বাহন বলে, রাজনৈতিক বা অন্য যে কোন কারণে ভাষাকে বিকৃত করলে চিন্তা-ভাবনায়ও নাবালক থেকেই যাবে। "If thought corrupts language, language can also

corrupt thought." —George Orwell. কাজেই ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে সাবধানে পা ফেলাই উচিত।

সব সভ্য ভাষারই একটা ক্লাসিকেল রূপ আছে, ধারাবাহিকতার ফলেই তা গড়ে ওঠে। যে-কোন ঐতিহ্যেরও মূলে ধারাবাহিকতা। ধারাবাহিকতার ফলেই ভাষা আর সাহিত্যে দেখা দেয় Maturity বা সাবালকত্ব। আমাদের স্বতন্ত্র সাহিত্য বলা যায় এখনো শৈশবে— তবে পদক্ষেপ আমাদের সাবালকত্বের লক্ষ্যাভিসারী না হলে আমাদের সাহিত্যের নাবালকত্ব কখনো ঘুচবে না। এ সময় বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে আমাদের নির্মিয়মান সাহিত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। সাহিত্যের ঐতিহ্য বলতে আমি কি বুঝি ইতিপূর্বে একাধিক প্রবন্ধে তার আভাস আমি দিয়েছি, এখানে ফের পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা আর ধ্বনির প্রতীক বর্ণ বা হরফ। সব ভাষারই মূল উপাদান বর্ণ। আদিম যুগে সামান্য কয়টি ধ্বনি দিয়েই মানুষের কাজ চলত কারণ তখন মানুষের সব প্রয়োজন সীমিত ছিল স্রেফ জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষায়। জীবন আর সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাব-বিনিময়ের ক্ষেত্র আর নিজেকে প্রকাশের প্রয়োজনও বেড়ে গেছে অনেক গুণ। সীমিত ধ্বনি দিয়ে তার এখন আর চলে না, অন্য দশটা প্রয়োজনের মতো ধ্বনি আর ধ্বনির প্রতীক তথা বর্ণের প্রয়োজনও এ কারণে না বেড়ে পারেনি। এভাবেই বর্তমান বর্ণমালা গড়ে উঠেছে। ঘরে বসে কেউ একজন একদিনে এ বর্ণমালা বানায়নি। মানুষের মানস-চেতনার দীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে বর্ণমালার ইতিহাসও জড়িত। জীবনের তাগিদেই এসেছে স্বর-বৈচিত্র্য, যার স্বাভাবিক পরিণতি বর্ণ-বৈচিত্র্য। কোন ভাষারই বর্ণমালা ভুঁই-ফুঁড়ে বের হয়নি বা পড়েনি আকাশ থেকে ঝরে। এমনকি অবতীর্ণ গ্রন্থগুলিও যে বর্ণমালায় লেখা হয়েছে সে বর্ণমালারও উৎপত্তি পার্থিব নিয়মে, তার ইতিহাসও অন্যান্য বর্ণমালার মতই। সব বর্ণমালার পেছনেই দীর্ঘ ইতিহাস ও দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ঐ ঐতিহ্য রক্ষা করে, মেনে চলেই ভাষা আর সাহিত্য সমৃদ্ধি আর বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। তা না হলে আজ একদল বল্লে এ বর্ণটা দরকার নেই, কাল অন্য দল বল্লে অমুক বর্ণটা অনাবশ্যক, পরশু আর এক পণ্ডিতের দল বল্লে ঐ বর্ণটা ফালতু, সাধারণে উচ্চারণ করতেই পারে না, অতএব ওটাকে ছাঁটাই করা যাক। ফলে ভাষায় দেখা দেবে বিশৃঙ্খলা। আজ যে বর্ণটা উচ্চারিত হয় না, একদিন নিশ্চয়ই তা উচ্চারিত হতো, অকারণে নেহাৎ গায়ের জোরে তার অনুপ্রবেশ ঘটেনি ভাষায়। ভাষা-বিজ্ঞানী আর ভাষা-তাত্ত্বিকদের কাছে তার হাল-হাকিকৎ ও ইতিহাস ভালো করেই জানা আছে, বর্ণমালার ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে, অপরিণামদর্শী সংস্কারকদের খপ্পরে পড়লে বর্ণমালা আর ভাষায় নৈরাজ্য সৃষ্টি না ঘটে পারে না। অধিকন্তু অতীতের বিচিত্র সাহিত্য-সম্পদ থেকেও হবো আমরা বঞ্চিত। যে পুঁথি-সাহিত্যের নামে এঁদের কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত তার সঙ্গেও যোগাযোগ হবে বিচ্ছিন্ন।

এ কারণে ইংরেজ তার ভাষার বহু অনুচ্চারিত বর্ণ আজো ত্যাগ করেনি। প্রাচীন ইংরেজি আজো ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য। অথচ ইংরেজ জাত আমাদের তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। ভাষা শুধু কানে শুনে শেখা হয় না, চোখে দেখেও শিখতে হয়। নলেজ (knowledge) লিখতে k আর Dও যে দরকার ইংরেজ শিশু তা

চোখে দেখেই শেখে। এ করেই সে নলেজ শব্দটার বানান আর লেখ্যরূপ করে আয়ত্ত। উচ্চারণ করে করেই সে B-U-T বাট P-U-T পুট্ শেখে। ভাষা শেখার এই নিয়ম। ভাষার এমনিতর অবৈজ্ঞানিক উচ্চারণ শিখতে ইংরেজ শিশুকেও প্রচুর খাটতে হয়। সরলীকরণের ধুয়া ওখানে কেউ ওঠায়নি, কারণ ওরা জানে পরিশ্রম করে শেখার নামই শিক্ষা বা Education। বলেছি, ভাষার মতো শব্দ আর বর্ণেরও ইতিহাস আছে পরিশ্রম বাঁচাবার নামে সে ইতিহাস বর্জন করার কোন মানে হয় না। এ মনোভাব অসভ্যতার একটি লক্ষণ। সভ্যতার প্রথম বুনিয়াদ শ্রম।

আরবি ভাষায় ব্যাকরণের মতো এমন দুরূহ ব্যাকরণ আর নেই। আর ঐ ব্যাকরণের সম্যক জ্ঞান ছাড়া আরবি ভাষা শুদ্ধভাবে গড়াই যায় না যদি না হরকৎ অর্থাৎ জের, জবর, পেশ ইত্যাদি দেওয়া থাকে। আর সবাই জানেন হরকতের সামান্য বেশকমে ঐ ভাষার অর্থে পাহাড় পরিমাণ ওলট-পালট ঘটে। এমনকি একই শব্দের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থও হয়ে দাঁড়ায়। তবু ঐ ভাষার ব্যাকরণ সংস্কারের দাবি উঠেছে শোনা যায়নি। আরবিতেও ধ্বনি-বৈচিত্র্য কম নয়। ওদেরও দুটা ক্বাপ, রয়েছে জ-ধ্বনির জন্য জিম্, জাল, জে ছাড়াও জোয়াৎ, জোয়াদ আছে। আমরা কেন, সব আরবও যে ঐসব বর্ণের যথাযথ ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উচ্চারণ করতে পারে তা বলা যায় না। শিক্ষাগত আর অঞ্চলগত পার্থক্য ওখানেও আছে। ওয়াকিবহালদের মুখে শুনেছি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চারণ-বৈষম্য অন্য কোন দেশের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। বিশেষজ্ঞরা ওদের আলাপ থেকেই তা ধরতে পারেন যেমন আমাদের আলাপ থেকে আমাদের জেলাওয়ারি পরিচয় ধরা পড়ে। তবুও ওখানে একটা ক্বাপ রেখে অন্যটাকে বর্জন বা জ-ধ্বনিসূচক একটা বর্ণ রেখে বাকি কয়টাকে বিসর্জনের কোন দাবি ওঠেনি। উঠলে শিক্ষিত আরব কেন, বোধকরি কোন বদ্দুও তা বরদাস্ত করবে না। ওদের মাতৃভাষা-প্রীতি যে কত গভীর সে ইঙ্গিত উপরেই করা হয়েছে। আরবিও এককালে বিদেশী ভাষা ছিল, মুসলমানরাই তাকে নিজস্ব করে নিয়েছে নিজেদের বিদ্যা, পরিবেশ আর অভিজ্ঞতা দিয়ে। সাহিত্য আর ভাষার এ সনাতন নীতিতেই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আর সাহিত্য গড়ে উঠবে, তার দেহ-মন এখানকার মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি পরিবেশ-চেতনা আর জীবনের অভিজ্ঞতার জারক রসেই হবে জারিত অর এভাবেই হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ। তার জন্য ভাষার বর্ণমালার গায়ে সংস্কারের নামে কসাইগিরি ফলাবার কোন দরকার নেই। কসাইরা জানোয়ার জানে বটে কিন্তু জান দিতে জানে না, পারেও না। ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু দৈহিক নয় প্রাণের তথা বেঁচে থাকা আর বিকাশের সম্পর্কও। কোন বর্ণ বিশেষকে আজ যদি অপ্রয়োজন মনে হয় তাহলেও ইতিহাস আর ঐতিহ্যগত কারণে, ভাষা আর সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার খাতিরে তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। জোর করে ধরে সুস্থ মানুষের অস্ত্রোপচার করলে যা হয় ভাষার ব্যাপারেও তাই হবে। এক সময় মানবদেহের কোথায় নাকি একটা লাঙ্গুল ছিল— কালক্রমে এ ফালতু অঙ্গটা অব্যবহারের ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতির মন্থর গতিতে অধৈর্য হয়ে কোন দেহ-সংস্কারক যদি লাঙ্গুলটার গোড়া ঘেঁষে তক্ষুণি একটা কোপ দিয়ে বসতো তাহলে হয়তো মানব দেহের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ত। কারণ তখনো এন্টিসেপটিক আবিষ্কৃত হয়নি! ভাষার ব্যাপারেও স্বভাবের নীতি, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কোন অঙ্গ বা অকেজো বা ফালতুও বিবেচিত হয়, অব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে তার মৃত্যু

আসবেই, সে হবে স্বাভাবিক মৃত্যু। আমাদের লাঙ্গুলের মতোই তখন তারও অস্তিত্ব হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না ভাষার গায়ে। তার জন্য তখন কোন আফসোসও জাগবে না কারো মনে। এক সময় আমাদের ভাষায় হ্রস্ব লিং নামেও একটি বর্ণ ছিল। আজ তার অস্তিত্ব অভিধানেও খুঁজে পাওয়া যায় না। কারো মনে জাগেও না তার জন্য কোন আফসোস! ফলেই তো সব কিছুর পরিচয়। জিজ্ঞাসা করা যায়— এখন আমাদের যে বর্ণমালা আছে তাতে আমাদের কি ক্ষতিটুকু হয়েছে বা কি ক্ষতি হচ্ছে? এ বর্ণমালার বিদ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার এক কবি তো বিশ্বের সেরা সাহিত্য-পুরস্কারই জয় করে এনেছেন। এ ভাষার কোন সফল কবি বা সাহিত্যিককে এ যাবৎ বর্ণমালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুনিনি। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও কেউ কোন দিন একথা বলেননি যে এ বর্ণমালার বাধার ফলেই তাঁরা আরো বড় কবি বা লেখক হতে পারেননি! মীর মশাররফ হোসেন থেকে নজরুল-জসীম উদ্‌দীন অথবা আমাদের আধুনিক কবি ও লেখকগণ কেউই তো বাংলা বর্ণমালা তাঁদের লেখার পথে কাঁটা হয়ে আছে এমন কথা বলেননি। যেসব আরবি শিক্ষিত মৌলবী-মওলানা বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মুখ থেকেও বর্তমান বর্ণমালার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এ যাবৎ শোনা যায়নি। শোনা যায়নি আমাদের কৃতী সাংবাদিকদের মুখ থেকেও। ভুয়ো দর্শন বলে নাচতে যারা জানে না তারা উঠোনের দোষ খুঁজে বেড়ায়। আমাদের দশাও হয়েছে আজ তাই। এ পর্যন্ত কোন জাত লেখকের মুখে বর্ণমালার দোষেই সুলেখক কি সফল লেখক হতে পারেননি বা পারছেন না এমন খেদোক্তি শুনিনি। শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রসঙ্গে আমি একবার বলেছিলাম— যে ছেলে হ্রস্ব-ইকার, দীর্ঘ-ইকার কিংবা হ্রস্ব-উকার, দীর্ঘ-উকার অথবা ট-ঠ-এর কি স-শ-এর উচ্চারণ পার্থক্য শেখার পরিশ্রম করতে রাজি নয় সে ভবিষ্যতে হয়তোবা অধ্যাপক অধ্যক্ষ হতে পারবে কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কখনো হতে পারবে না। অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত আর পণ্ডিত হতে হলে মানসিক পরিশ্রমের ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই।

বর্ণমালাকে কাটছাঁট করা মানে ভাষাকেও কাটছাঁট করা। এতে ব্যবহারিক কাজে বিশেষ অসুবিধা না হলেও সাহিত্য-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। সঙ্গীতের বেলায় সে ক্ষতির পরিমাণ হবে আরো বেশি। সুর-বৈচিত্র্য সঙ্গীতের এক প্রধান শর্ত, সুর-বৈচিত্র্য মানে স্বর বৈচিত্র্যও, স্বর-বৈচিত্র্য মানে ধ্বনি-বৈষম্য আর ধ্বনি-বৈষম্য বর্ণনির্ভর। সঙ্গীতের অনেকখানি মাধুর্য বর্ণ-বৈষম্যের সঙ্গে জড়িত। সঙ্গীতের শিক্ষিত কান 'স' আর 'ষ'-এর কিংবা 'ন' আর 'ণ'-এর পার্থক্য বোঝে, এখন একে এক ধ্বনি বা এক বর্ণে বেঁধে দেওয়া মানে শিক্ষিত কানকে অশিক্ষিত করে তোলা এ হবে স্রেফ উল্টো পথে যাত্রা। মানবদেহে এখনো ফালতু জিনিসের অভাব নেই, দাড়ি-গোঁফ আমরা অনেকে কাটিয়ে ফেলি বটে, না উঠলে কিন্তু লোকে মাকুন্দ বলবে বলে লজ্জাবোধ করি, রেখে দিলেও তা যে তেমন কাজে লাগে তা নয়, তবুও মুখের শোভা বৃদ্ধির জন্য অনেকে শখ করে রেখেও দেন। কেউ কেউ সোয়াবের জন্যও। সোয়াবটাও তো জীবনে তেমন অত্যাবশ্যক বস্তু নয়। মেয়েদের মাথায় লম্বা চুল আর বেনী তো একদম ফালতু, তবুও স্ত্রীর খোঁপাটায় কেউই কাঁচি চালাতে রাজি হবে না। স্ত্রী তো নয়ই। সাহিত্য-শিল্পেও সব কিছু প্রয়োজনের ভিত্তিতে ওজন করা যায় না। রমণীদেহের মতো ভাষায়ও কিছু অলঙ্কার চাই। এ চাওয়াটা খুব গভীর না হলে অলঙ্কারশাস্ত্রের মতো এমন একটা শাস্ত্রই গড়ে উঠত না সব ভাষায়। 'প্রাকটিকেল' স্বামী অলঙ্কারটাকে যতই

ফালতু আর অনাবশ্যক মনে করুক না কেন, সুসজ্জিতা সালঙ্কারা স্ত্রীর প্রতি তিনিও ফিরে ফিরে তাকান। ভাষায় অলঙ্কারও তেমন এক বড় আকর্ষণ।

সাহিত্য-সঙ্গীতে ধ্বনি-বৈষম্য তথা বিভিন্ন বর্ণের সহ-অবস্থান কেন অত্যাবশ্যক তা নজির নজরুল ইসলামের গানেও দেখতে পাওয়া যাবে :

ঝরছে শারাব জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল,
হাসতেছে চাঁদ ঝলমল,
কালকে এ চাঁদ খুঁজবে বৃথাই,
হারিয়ে যাবে কোনখানে॥
প্রেমিক যত আমার মত
মদের রঙে হোক রঙীন,
হোক দীওয়ানা মশ্‌ত, নেশায়
নিমেষ-সুখের সন্ধানে॥
(নজরুল গীতিকা)

অথবা

এই বিষাদ এই ব্যথার পারে
দাও আনন্দ ভর-আকাশ।
নুতন দিনের বধূ যদি আসে তোমার, খোশ-নসীব।
যৌতুক তায় দিয়ো লিখে হাফিজের এই প্রেম-বিলাস॥
(নজরুল গীতিকা)

উদ্ধৃতাংশে যেসব সম বা নিকট সম উচ্চারিত একাধিক বর্ণ আছে তার থেকে যে কোন একটা মাত্র রেখে বাকিগুলিকে বাদ দিয়ে দেখুন ভাষার আর গান দুটির দুরবস্থা দাঁড়ায়। কোন খাঁটি লেখকই ভাষার এমন নির্লজ্জ 'বস্ত্রহরণে' রাজি হবে বলে মনে হয় না।

আমাদের নতুন রাষ্ট্র, নতুন করে গঠন করতে হচ্ছে জাতি আর জাতীয়তা, সাহিত্য আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক কিছুই গড়ে তুলতে হচ্ছে একদম গোড়া থেকেই। দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল-কলেজ নেই, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও পাঠ্যবই। রোগীর অনুপাতে নেই ডাক্তার কি হাসপাতাল। মন-মানসের প্রায় সবটুকু খোরাকের জন্য আজো আমরা বিদেশের মুখাপেক্ষী। এমনি হাজারো অনিবার্য সমস্যার সম্মুখীন আজ আমরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আর বর্ণমালা মোটেও আমাদের আপাত সমস্যা নয়। এখনো যেসব শিক্ষিত লোককে দেশের সম্পদ মনে করা হয় তাঁরাও এ বর্ণমালা নিয়েই মানুষ হয়েছেন। এ বর্ণমালা তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার পথে যেমন কোন ক্ষতির কারণ হয়নি তেমনি তাঁদের স্ব-স্ব মননশীল কর্মেও সৃষ্টি করেনি কোন বাধা। অন্তত তাঁদের মুখে আজো তেমন কথা শোনা যায়নি। 'সহজ বাংলা', 'সহজ শিক্ষা' বা 'বর্ণমালা সংস্কার' ইত্যাদির কথা বলে ভাষা আর সাহিত্যে 'বস্ত্রহরণ'-পালার যে তোড়জোড় এখন মহল বিশেষে দেখা যায়, একটা সাময়িক উপদ্রব সৃষ্টির বেশি তার কোন গুরুত্ব নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

আর এও আমার বিশ্বাস, ভাষা তার স্বাভাবিক গতিপথে চলবেই, এই চলার পথে ভাষার গায়ে যেটুকু নতুনত্ব সংযোজিত হবে, তা হবে 'সংস্কারকদের' দ্বারা নয়, প্রতিভাবান 'নতুন কবি আর নতুন আর্টিস্টদের' দ্বারাই।

শিক্ষার ব্যাপারে 'সহজ' কথাটা আরো বিভ্রান্তিকর। এর অর্থ প্রকৃত শিক্ষার জড়সুদ্ধ কেটে দেওয়া। যে কোন শিক্ষা পরিশ্রমসাপেক্ষ— পরিশ্রম ছাড়া ভাষা শেখা বা লেখাপড়া কিছুই হয় না। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ডক্টর শহীদউল্লাহ্ হতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। আজ সে কথা তিনি নিজেও হয়তো ভুলে গেছেন। এমনিই তো দেশে লেখাপড়া অত্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে, মান গেছে অসম্ভব নেমে— যার সাক্ষাৎ পরিণতি ব্যাপক নকল প্রবণতা। এর ওপর যদি আমরা সহজ শিক্ষার ঢোল পেটাতে থাকি তাহলে সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন নকলে হাত পাকানোকেই মনে করা হবে শিক্ষার চরম আদর্শ! 'সহজ' পথে এ যাবৎ কেউ সুশিক্ষিত হয়েছেন এমন নজির আমার জানা নেই। ভাষা শেখা বা লেখাপড়াকে সরল করা মানে তরল করা, তরল খাদ্যে রোগীর চলে কিন্তু সুস্থ আর বেড়ে-ওঠা মানুষের চলে না। যে ছেলে স্রেফ তরল খাদ্যেই মানুষ হবে পরিণামে সে একটা আস্ত অকর্মার ঢেঁকি ছাড়া আর কিছুই হবে না। এমন ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানাও চলে না। 'সহজ বাংলা' যার মাতৃভাষা বাংলা নয় তার আংশিক প্রয়োজন হয়তো মেটাতে পারে যেমন বেসিক ইংলিশ মেটাতে পারে যার মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তার সীমিত প্রয়োজন। ঐ ভাষা কোন বুদ্ধিজীবীর মননশীল জীবনের পথ বা পাথেয়, সহায় বা সহযাত্রী হতে পারে না কিছুতেই। কাজেই যার মাতৃভাষা বাংলা 'সহজ বাংলা' তার জন্য নয়।

সব ভাষারই একটা স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড বা মান আছে, যাকে শিক্ষিতজনের বোধগম্য রূপ বলা যায়। সাহিত্যে ভাষার ঐরূপই অনুসৃত হয়। আমরা পূর্ব পাকিস্তানি লেখকদেরও ঐ ছাড়া অন্য উপায় নেই। মুখের ভাষার সাহিত্য করতে গেলে আমাদের সাহিত্য জেলাওয়ারি হয়ে পড়বে আর তার ফল হবে মারাত্মক, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা আর রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই।

সিলেটের সাধারণ লোক 'ক'-কে 'খ' উচ্চারণ করে, কমলাকে বলে 'খমলা'। আমরা চাটগাঁর লোকেরা 'ভ'-এর কাজ প্রায় 'ব'-দিয়েই চালাই, করিনা 'ট' আর 'ঠ'-এর পার্থক্য। শিক্ষকতা করতে গিয়ে আমি যদি আমার ছাত্রদের বলি— আমার মুখের উচ্চারণই বিশুদ্ধ উচ্চারণ, তোমরা ওটাই আয়ত্ত করবে, অনুরূপভাবে অন্য জেলার শিক্ষক যদি তাঁর উচ্চারণকেই খাঁটি বলে দাবি করে ছাত্রদের তা অনুসরণের নির্দেশ দেন, তাহলে অবস্থা যা দাঁড়াবে তাকে শিক্ষার অনুকূল অবস্থা কিছুতেই বলা যায় না। উচ্চারণ মানে তো ধ্বনি অর্থাৎ বর্ণ। মুখের ভাষায় সাহিত্য করতে গেলে বর্তমান বর্ণমালা থেকে অনেক বর্ণ বাদ দিতে যেমন হবে তেমনি নতুন করে বানিয়েও নিতে হবে অনেক নতুন বর্ণ। গল্প-উপন্যাস-নাটকে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে যে মুখের ভাষা প্রয়োগ করা হয় তা অন্য কারণে অর্থাৎ সাহিত্যে বাস্তবধর্মিতা আরোপের জন্যই। না হয় ঐ ভাষাও লেখকরাই কল্পিত যেমন কল্পিত তাঁর পাত্র-পাত্রীরা। সাহিত্যের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা আমাদের রাখতেই হবে আর করতে হবে সে ভাষারই চর্চা (কোন জেলা বা জনপদের মুখের ভাষা নয়), আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধি আর বিকাশের পথ মনে হয় এটিই।

শরৎ-১৩৭৪

রাষ্ট্র ও আইনের শাসন

॥ ১ ॥

'মালিকানা'র সঙ্গে সঙ্গে এসেছে সমাজ আর সমাজেরই স্বাভাবিক পরিণতি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র গঠিত আর পরিচালিত হয় আইনের সাহায্যে। আইন মানব-মনীষার সর্বোত্তম আবিষ্কার। আইন ছাড়া সভ্যতা ও সভ্য-জীবন কল্পনা করা যায় না। আইনের শাসন যে দেশে উপেক্ষিত চলতি কথায় সে দেশকেই বলা হয় 'মগের মুল্লুক।' আইন রচনার যেমন তেমনি প্রয়োগের দায়িত্বও রাষ্ট্রের। আইন সার্বিক, সামগ্রিকতার চোখে ব্যক্তি বা ব্যতিক্রম নেই। আইন রচয়িতারাও আইনের আয়ত্তাধীন— প্রয়োগকর্তাদেরও অধিকার নেই আইনের সীমা লঙ্ঘনের। এখানেই আইনের মহত্ত্ব আর আইনের শাসনের গুরুত্ব। আইন বস্তুগত বটে কিন্তু পুরোপুরি মানবিক। যা মানুষের জন্য আর মানুষের দ্বারাই রচিত তা সর্বতোভাবে মানবিক না হলে তার উদ্দেশ্যই হয়ে যায় ব্যর্থ। মানবিক দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি এমনকি বিকৃতিরও প্রতিকার সন্ধান যে আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা মানবিক শুধু নয়, হওয়া চাই তা মানবিক বুদ্ধিগ্রাহ্যও। নিক্তিকে যে আইনের তথা বিচারের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা যথার্থ, ওজন তথা ভারসাম্য রক্ষিত না হলে আইন আইন থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় পক্ষপাত নয়তো নির্যাতন। এ দুয়ের কোনটাই আইন বা আইনের শাসন নয়।

ক্ষমতা আর আইনের মধ্যে চিরকালই একটা অহি-নকুল সম্পর্ক রয়েছে। অবাধ ক্ষমতা আইনের প্রধানতম শত্রু। এ শত্রুকে নিয়ন্ত্রিত করা ও রাখা আইনের এক প্রধান লক্ষ্য— এ লক্ষ্য হাসিলে ব্যর্থ হলে আইন অকেজো হয়ে পড়তে বাধ্য। তখন আইনের শাসনের ভরাডুবি অনিবার্য। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশের সামনে আজ এটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কারণ এসব দেশে অবাধ ক্ষমতা দখল তেমন দুঃসাধ্য কিছু নয়। রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণা যেমন এসব দেশে এখনো নড়বড়ে ও অস্পষ্ট তেমনি আইনের শাসনও গড়ে ওঠেনি তেমন দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে। আইনের শাসনের পেছনেও প্রয়োজন দীর্ঘ ঐতিহ্যের। শাসক আর শাসিত উভয়পক্ষের অন্তরে এ ঐতিহ্য চেতনা গভীর মূলাশ্রয়ী না হলে অবাধ ক্ষমতা সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দ্বিধা করে না। তখন আইন হয়ে পড়ে নির্যাতনের হাতিয়ার। প্রচলিত আইনে না কুলোলে তখন রাতারাতি নতুন আইন বানাতেও অবাধ ক্ষমতা কসুর করে না এ অবস্থায়। হয়তো এসব আইন ও আইনেরই নামান্তর। ঐসব দেশে আইনের নামে এভাবে নির্যাতন হয়ে পড়ে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির দিকে তাকালে এ সত্য আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পাব। এর হাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় আইন আর আইনের শাসনের ওপর জোর দেওয়া। তার দাবি অপ্রতিরোধ্য করে তোলা।

পাকিস্তানও সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও উন্নয়নশীল দেশ। আমাদেরও আজ এটি এক বড় সমস্যা অর্থাৎ আইনের শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সমস্যা। অপরাধের সঙ্গে দণ্ডের সম্পর্ক এক চিরকেলে ব্যাপার। অপরাধ নির্ণয়ের পদ্ধতি আর বিচারের নিয়ম-কানুন আইনের

করতে মানুষকে দীর্ঘ ইতিহাস পার হয়ে আসতে হয়েছে— সমাজের সর্বোত্তম মস্তিষ্কেরই এ অবদান। নিরপরাধ যাতে দণ্ডিত না হয় আর অপরাধীও রেহাই না পায় দণ্ডের হাত থেকে বা অপরাধের তুলনায় না পায় মাত্রাধিক দণ্ড সব রকম আইন-কানুন আর বিচারের এ লক্ষ্য। আইন আর শৃঙ্খলার পথেই সভ্যতার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে— আইন আর বিচার যেখানে নির্যাতনমুক্ত ও মানবিক হয়ে উঠেছে সেখানে এ অগ্রগতি হয়েছে অধিকতর সার্থক। নির্যাতন কখনো শাসন নয় বরং তা বিচার আর আইনকে করে কলুষিত। অচিরে তা নিয়ে আসে ধ্বংস। আইনের শাসন সভ্যতার এক অপরিহার্য অঙ্গ। যে দেশে আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আনুগত্য রয়েছে— শাসকরাও যেখানে আইনকে শ্রদ্ধা না করে পারে না, সেখানেই বিরাজ করে অধিকতর সভ্যতা। আইনের শাসন ছাড়া কোন রকম সভ্যতা কিংবা সভ্য-জীবন ভাবাই যায় না। অধিকন্তু আইনের নামে নির্যাতন চালালে একদিন না একদিন তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। আর সে প্রতিক্রিয়া কখনো হবে না নির্যাতনকারীর অনুকূল।

রাজনৈতিক বা রাষ্ট্র-ঘটিত অপরাধের অভিযোগে আমাদের দেশেও মাঝে মাঝে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়— অনেককে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন কারাগারে আটকে রাখার নজিরও দেদার। রাষ্ট্রীয় জীবনে গ্রেপ্তার, বিচার বা দণ্ড এসব কিছুমাত্র অসাধারণ বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ সম্বন্ধে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু সময় সময় অভিযুক্তদের প্রতি নির্যাতনের যেসব কাহিনী শোনা যায়, এমনকি হাইকোর্টের শুনানিতেও নির্যাতনের যে হৃদয়হীন বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় তা আংশিক সত্য হলেও আমরা যে এখনো সভ্যতার নিম্নতম স্তরেই রয়ে গেছি তাই প্রমাণিত হয়। এ যুগে এমন বর্বরতা ভাবাই যায় না। আসামিও মানুষ, তারও একটা মানব-মর্যাদা আছে। ক্ষমতার জোরে সে মর্যাদাকে লাঞ্ছিত করা মানে নিজেকেও খানিকটা অমানুষের স্তরে নামিয়ে আনা। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে এমন বিস্তর ঘটনা ঘটেছে। শোনা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে, বিচার বা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগেও সত্য বা মিথ্যা অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য অভিযুক্তদের ওপর নির্মম দৈহিক অত্যাচার নাকি চালানো হয়ে থাকে। এদের অনেকে শিক্ষিত, পদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান আছে আইনে। আর সে আইন সব সভ্য-দেশেই স্বীকৃত। আর এও সত্য, অনেকের কাছে মানব-মর্যাদা মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। হাসতে হাসতে, উন্নত মস্তকে মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয় কিন্তু হাসিমুখে লাঞ্ছনা কিংবা নির্যাতন ভোগের দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। প্রাণের চেয়েও মান-মর্যাদার দাম যে অনেক বেশি এ থেকে তাও বুঝতে পারা যায়।

বিচারে কারো প্রাণদণ্ড হয়েছে শুনে মানুষ শিউরে ওঠে না, ঘৃণায়-ধিক্কারে কারো আত্মা করে না বিদ্রোহ। কিন্তু নির্যাতনে তা হয়, তা করে। এমনকি প্রকৃত অপরাধীর প্রতি নির্যাতনেও মানুষ ক্রুদ্ধ ও বিচলিত না হয়ে পারে না— এমনকি অনুভব করে নির্যাতিতের প্রতি একটা সুগভীর মানবিক সহানুভূতিও। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সব রকম মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। নির্যাতন মানুষের অন্তরে অন্তরে দাবানলের মতো কাজ করে। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা দেশ, সমাজ, সভ্যতা কারো পক্ষে শুভ হয়

না। মোটেও শুভ হয় না নির্যাতনকারীর পক্ষে।

অনুন্নত দেশে অর্থাৎ যেসব দেশে স্বাধীনতা আর সভ্যতা এখনো একটা সুষ্ঠু রূপ নেয়নি সেখানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে শত্রু মনে করে নির্যাতন করা একটা যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সম্ভব অসম্ভব, সত্য মিথ্যা, বানানো ও কাল্পনিক অভিযোগে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার চেষ্টা অবিরাম চলতেই থাকে ঐসব দেশে। আশ্চর্য ক্ষমতার এ ব্যভিচার থেকে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত শাসকরাও মুক্ত নন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা আরো বেশি অত্যাচারী হয়ে থাকেন। কারণ অত্যাচারের কৌশল তাঁদের বেশি করে জানা। আমরা মোটামুটি একটা গণতান্ত্রিক সভ্য শাসন-ব্যবস্থা ও সভ্যজীবনের উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম। ইংরেজের যত দোষই থাক কিন্তু একটা সভ্য সমাজ-জীবন আর রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থা তারা আমাদের দিয়ে গিয়েছিল এবং আইনের শাসনের কাঠামোও তাদের দান। স্বাধীনতা আমাদের সামনে যে অবাধ ক্ষমতার দরজা খুলে দিয়েছে তাতে আমরা অনেকটা বেসামাল হয়ে পড়েছি। দেশ বা দেশের মানুষের চেয়েও ক্ষমতাটাই আমাদের সামনে হয়ে উঠেছে মোক্ষ। এর ফলেই চলে আইনকে মোচড়ানো, রাতারাতি ইচ্ছামতো বানানো, বদলানো। যার জন্যে আইন বা আইনের শাসন আজ রীতিমতো প্রহসনে পরিণত। বিশেষত রাজনীতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বেলায়। এ কারণে সুস্থ রাজনীতি গড়ে ওঠাও আমাদের দেশে অসম্ভব হয়েছে। যতদিন কঠোরভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না ততদিন সরকারি রাজনীতি ছাড়া অন্য রাজনীতি করা কিছুতেই সম্ভব নয়— করতে গেলে পদে পদে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পুরোপুরি আশঙ্কা দেখা দেয়। আর সরকারি রাজনীতি মানে প্রতিদিন খোশামোদ তোষামোদের মহড়া দেওয়া, পঞ্চমুখে ক্ষমতাসীনের গুণকীর্তন করা। নিজের বিবেক আর স্বাধীন মতামতকে শিকেয় তুলে রেখে অতি বড় পাষণ্ডকেও ফেরেস্তা বলে চিত্রিত করা। এতে শুধু যে আত্মমর্যাদা সমূলে বিনষ্ট হয় তা নয় নৈতিক মেরুদণ্ডও ভেঙ্গে পড়ে। জাতির জন্য এ এক ভয়াবহ অবস্থা। হাড়হীন মেদ-মাংসের যে অবস্থা নৈতিক মেরুদণ্ডহীন জাতিরও সে একই দশা। বাঁশের ঠেলা দিয়েও তেমন মানুষ আর তেমন জাতিকে খাড়া রাখা যায় না। বহু নিন্দিত পরাধীনতার যুগে এমন শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন আমরা হইনি।

॥ ২ ॥

রাজনীতি ক্ষেত্রে আইন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে তার আভাস উপরে দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত আর সামাজিক ক্ষেত্রে আইন ও বিচারের ওপর ক্ষমতার হস্তক্ষেপ তেমন প্রত্যক্ষ নয় বটে কিন্তু আইন এক্ষেত্রে আমাদের দেশে এক অচলায়তনে পরিণত। এখন আইনের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন সম্পর্কই নেই। বলাবাহুল্য জীবন কোথাও অচল বা স্থির হয়ে নেই। কালের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই তার রূপান্তর ঘটেই চলেছে। জীবনের সমবায়েই সমাজ, তাই সমাজও সচল ও চলিষ্ণু না হয়ে পারে না। সমাজের জন্যই আইন আর আইনের দ্বারাই সমাজ নিয়ন্ত্রিত। কাজেই সমাজের সঙ্গে সঙ্গে আইনও যদি যুগোপযোগী হয়ে না ওঠে তাহলে আইন তার সব তাৎপর্য হারিয়ে বসে। জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যদি তার কোন সম্পর্কই না থাকে তাহলে আইনের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ

প্রতিকার, সমঝোতা, বোঝাপড়া বা adjustment তা আর হয় না। অধিকাংশ অপরাধ সামাজিক Maladjustment বা সমঝোতার অভাবেরই ফল। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বোঝাপড়া যেখানে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত সেখানেই ঘটে অপরাধ। স্রেফ দণ্ড এর প্রতিকার নয়, নয় বলেই দেখা যায় দণ্ডিতও একই অপরাধ বারবার করে বসে। অপরাধের কারণ দূরীভূত না হলে অপরাধ নির্মূল হতে পারে না। তাই ব্যক্তিকেও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করাই সঙ্গত। কোন মানুষ সমাজ-বহির্ভূত বা সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। যারা তেমন তারা ব্যতিক্রম। সাধারণ আইন সাধারণ মানুষের জন্যই— সাধারণ মানুষ চলমান জীবনেরই অঙ্গ। আইনকেও এ চলমান জীবনেরই পরিপূরক হতে হয়— তাহলেই তার যা উদ্দেশ্য তা সফল হতে পারে। আমাদের দেশের সামাজিক আইন আজ কিভাবে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে তা কারো অজানা নয়। এই আইনে প্রতিকার সন্ধান প্রায় উত্তপ্ত কড়াই থেকে উনানের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ারই শামিল।

সামাজিক আইন ও বিচারের প্রধানতম লক্ষ্য অপরাধীকে জীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেওয়া। অনেক অপরাধ প্রতিষ্ঠার অভাবেরই সাক্ষাৎ পরিণতি। কোন অপরাধই বিনা কারণে ঘটে না। কারণ নির্ণয় বিচারের প্রাথমিক শর্ত হওয়া উচিত। আইন যদি স্রেফ দণ্ড দিয়েই খালাস হয়, শোধরানোর পথ বাৎলাতে হয় ব্যর্থ তাহলে তার কোন উন্নয়নমূলক ভূমিকাই থাকে না। বেত্রদণ্ডের মতোই আইন তখন স্রেফ এক জড়বস্তু হয়েই পড়ে। মানুষ যেমন সজীব ও জীবন্ত মানুষের জন্য রচিত আইনও তেমনি সজীব ও জীবন্ত হওয়া চাই। আইন যদি জীবনের সমস্যার মোকাবেলা করতে না পারে বা সে ভাবে রচিত না হয় তাহলে আইন অচিরে অকেজো হয়ে পড়তে বাধ্য। যেমন আমাদের দেশে হয়ে পড়েছে। ফলে বিচারক আর কাঠগড়ায় এখন কোন তফাৎ নেই। অপরাধের প্রেক্ষিত বা সামাজিক কারণ আমাদের দেশের বিচারকদের অজ্ঞাত, সে সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেও তিনি বাধ্য নন। তাঁর বিচারের ফলে দণ্ডিতের চারিত্রিক উন্নতি হচ্ছে না অবনতি তার সন্ধানও তাঁর এক্তেয়ারের বাইরে। ফলে আইনের কোন রকম সংশোধনের সুপারিশ করতেও তিনি অক্ষম। আইন এভাবে আমাদের দেশে এক জড়বস্তুতে পরিণত। অর্থ ও ধৈর্য থাকলে এ আইনের সাহায্যে কখনো কখনো প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করা যায় বটে কিন্তু সামাজিক adjustment যেটাকে বলা হয় তা এ আইনের দ্বারা কখনো সাধিত হয় না। ফলে প্রতিদিনই দণ্ডের বহর বেড়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু অপরাধ কোথাও হ্রাস পাচ্ছে এমন কথা শোনা যায় না। বরং সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় সব রকম অপরাধ দিন দিনই বেড়ে চলেছে।

পুঁজিবাদী দেশে বিচার এক ব্যয়বহুল ব্যাপার, সমাজতান্ত্রিক দেশে অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে অপরাধ প্রমাণের জন্য বা সে প্রমাণকে নস্যাৎ করার জন্য ফি দিয়ে উকিল নিয়োগ করতে হয় না, দিতে হয় না কোন রকম কোর্ট ফি অর্থাৎ বিচারের জন্য কোন খরচই লাগে না ওখানে অবশ্য বিচারের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরে দিতে হয় না ধৈর্যের পরীক্ষাও। ওখানকার আইন আর বিচারের মূল ভিত্তিই হলো Social adjustment. দীর্ঘকাল আগে ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি একবার সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরে ওখানকার বিচার-পদ্ধতি স্বচক্ষে দেখে এসে 'Law and Justice in Soviet

Russia' নামে একটি বই লিখেছেন। সে বইতে তিনি ঐদেশের বিচার পদ্ধতির অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন যা তাঁর নিজের চোখে দেখা। সে বই থেকে ওখানকার বিচারপদ্ধতির একটি মাত্র নমুনা উদ্ধৃত হলো।

এক বইয়ের দোকানের কোন এক মহিলা সহকারীকে ১৭০ রুবল চুরির জন্য অভিযুক্ত করা হয়। মহিলাটির বয়স আনুমানিক ৪০ আর এটি তার দ্বিতীয় অপরাধ। আদালতে হাজির করা হলে তাকে পেশাদার বিচারক জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। বিচারকদের রূঢ় প্রশ্ন আর ধমকে মেয়েটি প্রায় কেঁদে ফেলে। তখন তাকে অদূরে উপবিষ্ট এক অপেশাদার বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়— এ বিচারক একজন শ্রমিক মহিলা। অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিচারক অভিযুক্ত মহিলাটির সব ইতিহাস জেনে নেন। জানা গেল মহিলাটি মাইনে প্রায় মাসে ৯০ রুবল। তার স্বামী বোমার আঘাতে পঙ্গু হয়ে আছে আর তার আছে ছোট ছোট চারটি ছেলেমেয়ে। অবসর সময়টা স্বামী আর ছেলেমেয়েগুলির দেখাশোনা করতেই তার কেটে যায়। ফলে সে কোন নাইট স্কুলে পড়াশোনা করে নিজের যোগ্যতা বাড়াবার সুযোগ পায় না। তার অনেক দেনা হয়ে গেছে— তার একার রোজগারে সংসার চলে না। এ অবস্থায় সে হঠাৎ লোভে পড়ে এ চুরি করেছে।

বিচারক তক্ষুণি টেলিফোনে একজন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি আর মেয়েটি যে মহল্লায় থাকে সে মহল্লার বাড়ি-ঘরের বিলি ব্যবস্থা কমিটির একজন সদস্যকে ডেকে পাঠান। মেয়েটির কথার সত্যাসত্য এদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে বিচারক-মহিলাটি রায় দিলেন : অভিযুক্তা মহিলাটি সপ্তাহে তিনদিন নাইট স্কুলে গিয়ে টাইপ আর স্টেনোগ্রাফি শিখবে আর এ তিন রাত্রি একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তার স্বামীকে দেখাশোনা করবে আর একজন ওর ছেলে-মেয়েদের বাইরে নিয়ে গিয়ে খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দেবে যদ্দিন ও বর্তমান মাইনেয় কাজ করবে তদ্দিন ও মাসে দশ রুবল করে শোধ দিয়ে যাবে। টাইপ ইত্যাদি শেখার পর ওর মাইনে যখন বাড়বে তখন ও দিতে থাকবে পনেরো রুবল করে। মাসে মাসে এ ভাবে সে শোধ দিয়ে দেবে চুরি করা ১৭০ রুবল। অভিযোগ আর বিচারের এভাবে ঘটল সমাপ্তি।

এ প্রসঙ্গে লাস্কির এ মন্তব্য অত্যন্ত অর্থপূর্ণ : The woman left the court a transformed person, clearly for the first time in years, hope had come into her life. এও স্মরণীয়, মহিলা বিচারকটি পেশাদার বিচারককে নাকি তখন এ বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন : 'না ধমকে বা আক্রমণ না করে আসামিকে বুঝতে আর সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন। এ রকম নিষ্ঠুরতার পরিচয় যদি আপনি দিতে দেন তাহলে আপনার ব্যবহার আমি স্থানীয় সোভিয়েতের গোচরীভূত করব— এ যে আপনার ব্যবহার ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।' রাশিয়ার বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে লাস্কির নিম্নলিখিত মন্তব্যও স্মরণীয় :

'They are resolving social maladjustment and not merely inflicting penalties. They relate the case they try to all the economic back-ground they can discover. In the case I have named

ed, nothing would have been gained by sending the defendant to prison : and little by binding her over on provation. What was done gave her a chance of personal development which strengthened her own self-respect; and it was accomplished within the minimum of administrative machinary as part of the natural expression of an environment to which judges no less than the prisoners equally belong.' বিচারক আর আসামি একই পরিবেশ আর একই সমাজের অঙ্গ— সে প্রেক্ষিতে বিচার হলেই বিচার হয় স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত আর হয় ফলপ্রসূ। সোভিয়েত রাশিয়ার সব আইন আর বিচারের মূল ভিত : 'Work is the basis of self-respect অর্থাৎ কর্মই আত্মমর্যাদার মূল বুনিয়াদ। তাই তাঁদের ধারণা— The prisoner must work for wages at tasks similar in character to those of normal industry. (Laski) তাঁদের মতে কঠোর দণ্ড মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ডকে এমনভাবে ভেঙ্গে দেয় যে আসামির পক্ষে নতুন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই তাঁরা সে রকম দণ্ড-নীতি ত্যাগ করেছেন— এখন তাঁদের আইন আর বিচারের একমাত্র লক্ষ্য শিক্ষা আর কর্ম সংস্থানের উপায় করে দেওয়া। তাঁদের বিশ্বাস : The prisoner must live a full and self-respecting life. কোন আইন বা বিচারেরই এর চেয়ে মহত্তর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত না হয়ে পারে না।

আমাদের দেশে বিচারকের সঙ্গে কারাগারের কোন সম্পর্ক নেই। সোভিয়েতে প্রত্যেক বিচারককে কারাগারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়— রাখা বাধ্যতামূলক। দণ্ড বা আইনের প্রয়োগ কয়েদির জীবনের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করছে তা প্রত্যক্ষ করার দায়িত্ব বিচারকের— তাঁর এ অভিজ্ঞতার আলোয় আইনের সংশোধন আর রদবদল ঘটে। জীবনের মতই আইন ওখানে চলিষ্ণু। কয়েদির বর্তমান অবস্থার জন্য যিনি অর্থাৎ যে বিচারক দায়ী, কয়েদির পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণ তাঁর অবশ্য কর্তব্য।

আইন আর বিচারকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে আমাদেরও এ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে, আইনকে মৃত জড়বস্তু করে না রেখে গড়ে তুলতে হবে জীবনের সঙ্গী আর কালোপযোগী করে। আমাদের দেশে বিচারের নামে অর্থ ও সময়ের যে অপচয় ঘটে তার কোন তুলনা হয় না— আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে কত মানুষ যে দুঃসহ হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার কোন ইয়াত্তা নেই। কিছুদিন আগে এ দেশের এক অধ্যাপক আইনের সাহায্যে অন্যায়ের প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে যেভাবে নাজেহাল হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন তা আমাদের বিচার-পদ্ধতি আর তার নিষ্ফলতার এক অতি করুণ ও নির্মম নজির হয়েই রয়েছে। আইন সভ্য মানুষের একমাত্র আশ্রয়ভূমি, সে ভূমিতে পা রাখতে গিয়েই ক্ষমতার কারসাজিতে এ অধ্যাপক হয়েছেন আশ্রয়-চ্যুত। অবাধ ক্ষমতার কাছে আইন আজ এমনি হতবাক ও হৃতশক্তি।

ম্যাক্সিম গোর্কি

ম্যাক্সিম গোর্কি— সাহিত্যের ইতিহাসে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নাম। এ তাৎপর্য শুধু রুশ সাহিত্যে সীমিত হয়ে নেই। সারা বিশ্বে এমন একটি দ্বিতীয় নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না যা একই সঙ্গে এতখানি সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এ বিস্ময় ও সম্ভ্রম শুধু তাঁর সাহিত্যের প্রতি নয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিও। এমন বিচিত্র জীবন কদাচিৎ দেখা যায়— বিশেষ করে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে। তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় যে দুঃসহ দুঃখ-দারিদ্র্য ও নির্যাতনের ভিতর দিয়ে কেটেছে— তেমন অবস্থায় মানুষের মন থেকে সব রকম সুকুমার আবেগ-অনুভূতি চিরতরে নির্মূল হয়ে যাওয়ার কথা এবং থাকার কথা নয় মানুষের ওপর কিছুমাত্র বিশ্বাস। কিন্তু গোর্কির বেলায় প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিপরীত। মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিক নির্যাতন তিনি যতই দেখেছেন, তাঁর মনে মানুষের আর মানবতার প্রতি বিশ্বাস ততই যেন বেড়ে গেছে, এ বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়মূল হয়েছে তাঁর অন্তরে প্রতিদিন। কালক্রমে এ বিশ্বাস তাঁর জীবন-দর্শন আর শিল্প-সত্তার সঙ্গে হয়ে গেছে এক। তাঁর মাতৃভূমির সাহিত্যিক-ঋষি টলস্টয়কে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন : 'I am profoundly convinced that there is nothing better than man on the whole earth. I say : Man is the only thing that exists; all else is opinion, I always was, and shall be a worshiper of man. only I don't know how to express this sufficiently strongly.'

শেষোক্ত কথাটি অবশ্য তাঁর শিল্পী-জনোচিত বিনয়-ভাষণ। না হয় মানুষের মতো বিচিত্র প্রকাশ, বিশেষ করে মানব-অভিজ্ঞতার এমন অভিনব রূপায়ণ তাঁর রচনায় যতখানি দেখা যায় তা অন্যত্র দুর্লভ বল্লেই চলে। উপরোক্ত চিঠির অন্যত্র তিনি লিখেছেন : Even a great book is only the dead, black shadow of the word and a hint at the Truth, whereas man is the temple of the living God God I understand as an unquenchable striving after perfection, truth and justice. And for this reason even a bad man is better than a good book.'

এ কয়টি কথায় ম্যাক্সিম গোর্কির সমস্ত অন্তরটাই যেন উদঘাটিত হয়ে পড়েছে আর এতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি আর সাহিত্যের আদর্শ। মানুষকে বাদ দিয়ে তিনি কিছুই কল্পনা করেননি। উচ্চশিক্ষা বলতে যা বুঝায় তার থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, কিছুমাত্র সুযোগ ঘটেনি বিধিবদ্ধ লেখাপড়ার। কিন্তু জীবনকে দেখেছেন একেবারে নিচু থেকে, মাটি থেকেই— তাঁর স্বদেশের সর্বহারা অগণিত মানুষের জীবন যেখানে কেটেছে জার স্বৈরতন্ত্রের আমলে। যে জীবনের তিনি নিজেও অংশ ও অংশীদার ছিলেন। সাহিত্য আর শিল্পের পাঠ নিয়েছেন সেখান থেকে, সেখানেই তিনি শিখেছেন 'একটা নিকৃষ্ট মানুষও উৎকৃষ্টতম গ্রন্থ থেকে উত্তম।' এ অমূল্য পাঠ কালো অক্ষরের ছাপা ছায়া লেখা কোন কেতাব পড়ে তিনি শেখেননি, শিখেছেন প্রতিদিনের নিত্য প্রত্যক্ষ জীবন

থেকে। স্রেফ বেঁচে থাকার যে লড়াই তা যে কত নিদারুণ ও দুঃসহ হতে পারে তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব তারও এক মহাকাব্য; যে মহাকাব্যে তিনি নিজের হাতেই লিখে গেছেন পরবর্তী জীবনে। জীবন কখনো তাঁর প্রতি— সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে— হাসিমুখে কিংবা একটুখানি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকায়নি— কিন্তু এ মহাশিল্পী যখন জীবন তথা মানুষ আর মনুষ্যত্বের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন তখন তাঁর মনের সমস্ত আনন্দ আর প্রসন্নতা তিনি উজার করে ঢেলে দিয়েছেন ঐসবের প্রতি।

মানুষের দুঃখ আর নির্যাতন তিনি দেখেছেন, নিজে হয়েছেন তার শিকার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছেন, এর জন্য মানুষ দায়ী নয়, দায়ী পরিবেশ, সমাজের সার্বিক রূপ আর কাঠামো। নির্যাতনকারী আর নির্যাতিত উভয়ে এ পরিবেশেরই সন্তান, এ সমাজ-দেহেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে এর হাত থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই। এখানে আমরা বিপ্লবী-চিন্তার নায়ক গোর্কিকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর প্রতিটি রচনায় একদিকে মানব মহিমা যেমন তিনি প্রচার করেছেন তেমনি অন্যদিকে বপন করেছে বিপ্লবের, সমাজ-বিপ্লবের বীজ। লেনিন যেমন ছিলেন রুশ-বিপ্লবের অবিসংবাদিত কর্ম-যোগী তেমনি গোর্কি ছিলেন ভাব-যোগী। সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে— গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে আর সাহিত্য সমালোচনায় যে ভাব-বীজ গোর্কি ছড়িয়েছেন পরবর্তী রুশ-সাহিত্য তাই হয়েছে বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলন্ত। সাহিত্য-গুরু বল্লে যা বুঝায় আধুনিক রুশ সাহিত্যে গোর্কি ছিলেন তাই। শুধু যে রুশ-সাহিত্য তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তা নয়— তাঁর দ্বারা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গেও রুশ বুদ্ধিজীবী আর সাহিত্যিকদের পরিচয় হয়েছে ঘনিষ্ঠতর। সে পথও তিনিই রচনা করেছেন নিজের হাতে। মানুষকে তিনি কখনো সংকীর্ণ অর্থে দেখেননি। সারা পৃথিবীর মানুষই, বিশেষ করে নির্যাতিত, দরিদ্র, নিঃস্বরাই ছিল তাঁর লেখনীর আদর্শ— তাঁর মানস-দৃষ্টির সামনে এরাই ছিল সব সময় উপস্থিত। জীবনের তিক্ততার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা তাঁর মতো আর কারো ছিল না। বোধকরি তাই তিনি লেখক জীবনের সূচনায় গোর্কি বা তিক্ততা, এ ছদ্ম নাম নিয়েছিলেন। মানব জীবনের তিক্ততাকে তাঁর মতো আর কে দেখেছেন, কে এঁকেছেন আমার জানা নেই— কিন্তু তিক্ততার অন্তরালে যে মানব-সত্য রয়েছে আসলে তিনি ছিলেন তার দক্ষ রূপকার। সেটাকেই তিনি খুঁজে বের করতেন। সমাজে যাদের বাতিল মনে করা হয় সে সব অন্ধ, খোঁড়া, বিকলাঙ্গদেরও তিনি মনে করতেন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— তাদের ব্যক্তিত্ব আর মানব-সত্তাও সাহিত্যে শিল্পে উপেক্ষিত নয়। তারাও ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের হাতিয়ার, সমাজতন্ত্রে তাদের জন্যও যোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তাঁর কাছে মেহনত আর মেহনতি মানুষের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— 'তাঁর সাহিত্যে তাই দেখা যায় মেহনতি মানুষের জয়-জয়কার। একটা গল্পে তিনি গল্পে বলেছেন : 'সব শহরই হলো মানুষের মেহনতে তোলা এক একটা মন্দির, সব মেহনতই হলো ভবিষ্যতের কাছে এক একটি প্রার্থনা।' শ্রমের এমন বন্দনা সত্যই সাহিত্যে দুর্লভ!

মানুষ, মানুষের শ্রম আর সঙ্গবদ্ধতা— এ সবই তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর বিশ্বাস এ সবই সমাজ বিবর্তনের মূল উপাদান। আর তিনি জানতেন মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য সমাজ বিবর্তন অপরিহার্য। একদিক থেকে, লেখক হিসেবে

গোর্কি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান— রাশিয়ার দুই যুগেরই ইতিহাস তিনি দেখেছেন, এ দুয়েরই তিনি সাক্ষী। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম, জারতন্ত্রের নির্যাতন আর বিভীষিকার মধ্যে তাঁর জীবনের অনেক কাল কেটেছে আর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৩৬। কাজেই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ারও অনেক কিছু দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। সমাজতন্ত্রের অসীম সম্ভাবনায় তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। শুধু সমাজতন্ত্রে নয় মানুষ আর মানবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব কিছুর প্রতিই ছিল তাঁর সুগভীর বিশ্বাস— এ বিশ্বাস তাঁর শিল্পী-সত্তারও অঙ্গ। মানুষ আর মানুষের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে জারতন্ত্রের যুগে মানুষের যে দুর্দশা তিনি দেখেছেন ও নিজে ভোগ করেছেন সে চিত্র যেমন তিনি এঁকেছেন তেমনি এ বিশ্বাসের ফলে মানুষের সামনে, জীবনের সর্বস্তরে, সাফল্য ও সমৃদ্ধির যে স্বর্ণ-দুয়ার খুলে গিয়েছে সে চিত্রও তিনি এঁকেছেন নিখুঁতভাবে। মানুষ আর মানুষের অস্তিত্বই তাঁর সাহিত্যে বড় হয়ে উঠেছে বলেই শুধু রাশিয়ার নন, সারা বিশ্বের, সারা মানবজাতির লেখক হতে পেরেছেন আর সমাদৃতও হয়েছেন সেভাবে। আমাদের কাছেও তাঁর মূল্য এখানে। সাধারণ মেহনতি মানুষকেই যে তিনি সাহিত্যে তুলে ধরেছেন শুধু তা নয়, সাহিত্যকেও তিনি তুলে দিয়েছেন এ মেহনতি মানুষের হাতে। এভাবে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যেমন তিনি সাহিত্যের দিগন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি পাঠক-সংখ্যার সীমারেখা বৃদ্ধিতেও করেছেন সহায়তা। এর জন্য সাহিত্য গোর্কির কাছে অশেষ ঋণে ঋণী। আগে বিত্তবান বুর্জোয়া সমাজেরই ছবি থাকত সাহিত্যে আর সে সাহিত্যের পাঠকও ছিল সে সমাজ। গোর্কি-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম মেহনতি মানুষেরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে— তাদের প্রতিদিনের সুখ-দুখ ও আনন্দ-বেদনাই এখন থেকে সাহিত্যে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন। বিখ্যাত জার্মান লেখক হেনরিখ ম্যান (Heinrich Mann) সাহিত্যের প্রতি গোর্কির এ অবদান এভাবে সবিনয়ে স্বীকার করেছেন : Maxim Gorky has extended the realm of literature, for he has conquered new themes for her and new readers. He has depicted such class of society as were not known to literature before him. He has made proletaraians the friends of literature. And if writers no longer depend totally and altogether on the taste and interests of the bourgeois world then for this we have to thank the genius of Gorky.

জীবনের পাঠশালায়, দেহের ঘাম ফেলে আর রক্ত জল করে, গোর্কি যে পাঠ গ্রহণ করেছেন তা আবার জীবনকে ফিরিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের জারক-রসে জারিত করে। তাঁর মতো অনলস সাহিত্যকর্মী বিরল, এ করতেও তাঁকে ঘাম ঝরাতে হয়েছে, রক্ত দিতে করতে হয়েছে। তাঁর আঁকা মানুষের বাইরটাই শুধু দেশ-কালের পরিচয়ে পরিচিত, অন্তরে তারা সর্বমানবিক।

ম্যাক্সিম গোর্কি সর্বমানবের শিল্পী। এ সর্বমানবের শিল্পীকেই আজ আমরা জানাচ্ছি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

সাহিত্যে বিদ্রোহ

এক

সাহিত্যে বিদ্রোহ কথাটার দুটা দিক আছে— একটা ভাবগত অন্যটা আঙ্গিক বা প্রকাশগত। দুই-ই গভীরতর উপলব্ধি আর জীবনকে দেখার বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল। যা গতানুগতিকের বিপরীত— একটা বৈশিষ্ট্য আর স্বাতন্ত্র্য-চেতনায় যা দীপ্যমান। এ দুই মোটেও বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্করহিত নয় বরং একটা আর একটারই পরিণতি। গতানুগতিক ভাবই গতানুগতিক ভাষার রূপ পেয়ে থাকে— স্বতন্ত্র ভাব-চেতনা ভাষা আর প্রকাশেও নিয়ে আসে অভিনবত্ব। সাহিত্যের ভাষা আর ব্যবহারিক আটপৌরে ভাষার পার্থক্যটাও লক্ষ্য করবার মতো— এ পার্থক্যটাও ঘটে ভাবগত তারতম্যের জন্যই। নিত্যদিনের বস্তুগত প্রয়োজনে যে ভাষা আমরা প্রয়োগ করে থাকি তা দিয়ে কখনো মানস প্রয়োজন পুরোপুরি মিটতে পারে না বিশেষত মননশীল মানুষের। আমাদের মানস-খোরাক যেমন দৈহিক খোরাক থেকে আলাদা তেমনি তার প্রকাশের মাধ্যম আর আঙ্গিকও পৃথক। সাহিত্যে মৌখিক বুলির দাবি যখন উত্থাপিত হয় তখন আমরা এ মৌলিক কথাটা ভুলে যাই।

বিদ্রোহের মূল-উৎস ভাব বা আইডিয়া— সেখানে বিদ্রোহ দানা না বাঁধলে প্রকাশে বিদ্রোহ কখনো খাঁটি হতে পারে না। নকল পালোওয়ানিতে যেমন শক্তির পরিচয় মেলে না তেমনি স্রেফ আঙ্গিকগত বিদ্রোহেও শিল্পগত সৌন্দর্যের থাকে না কোন পরিচয়। তা দু'দিনেই আসে ফিকে হয়ে! এককালে বাংলা সাহিত্যের ত্রিশের কিছু সংখ্যক কবি আর লেখককে 'বিদ্রোহী' মনে করা হতো, কিন্তু সে বিদ্রোহও যতখানি ভাবগত ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল ভঙ্গিগত— ফলে তা সৃষ্টিশীল ফসলের দিক দিয়ে শোচনীয়ভাবেই হয়েছে ব্যর্থ। বাংলা সাহিত্যের ঐ যুগে এমন কোন সাহিত্য-কর্ম সৃষ্টি হয়নি যা শিল্পোত্তীর্ণ কি কালোত্তীর্ণের দাবি রাখে।

শুধু প্রচলিত ধারা কি গতানুগতিকতার বিরোধিতা কিংবা সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র বা পারিপার্শ্বিকের সমালোচনা কি তার নিখুঁত রূপায়ণ কখনো সাহিত্যে-শিল্পে বিদ্রোহ বলে স্থান পেতে পারে না যদি না তা সত্যিকার সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়। সৃষ্টির জন্য যে গ্রহণশীলতা, সহনশীলতা আর ঔদার্য প্রয়োজন তা 'প্রতিবাদমুখী' মনে অনেক আশ্রয় পায় না। তেমন মন কখনো যথার্থ সৃষ্টিশীল হতে পারে না এ কারণে। আমাদের সমাজের হতশ্রী অবস্থা দেখে আমরা অনেকেই অনেক সময় বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর হয়েছি। আমাদের বহু রচনায় তার প্রতিফলন ঘটেছে। এ সবকেও স্রেফ 'প্রতিবাদী' সাহিত্যই বলা যায়। যথার্থ 'বিদ্রোহী সাহিত্য' এ নয়। আমরা জীবনে যা মেনে নিয়েছি অনেক সময় তারই প্রতিবাদ করেছি কলমের মুখে। ফলে আমরা খাঁটি হতে পারিনি, সাহিত্য-কর্মে হতে পারিনি 'সত্য'। ত্রিশের লেখকদেরও এ দশা ঘটেছিল। এ হয়তো প্রাচ্য সমাজ-ব্যবস্থা আর তাতে লালিত মনেরই এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আমাদের লেখকদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক স্ব-বিরোধী সমাজেই বাস করতে হয়। এ সমাজকে অস্বীকার করা

আজ কোন শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এর পেছনে বহু কারণ রয়েছে। বিশ্বের ভাব দেশের সঙ্গে আমাদের ভাবের আদান-প্রদান এখন দ্রুত ও সহজতর হয়েছে— যে কোন ভাব-তরঙ্গ এখন আমাদের শিল্পীদের মনেও হানা দেয়, নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে তাদেরেও। কিন্তু শিল্পে এর অভিব্যক্তি এখন দু'কারণে অসম্ভব : এক— সমাজ তথাকথিত ঐতিহ্য-বিরোধী রচনার প্রতি মোটেও সহিষ্ণু নয়। বলাবাহুল্য এ সামাজিক সহিষ্ণুতাটুকু শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যক— সমঝদারির কথা নাইবা বল্লাম। দ্বিতীয়ত গাছের মতো যে কোন ভাব-চেতনাও একটা মাটি বা পরিবেশকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে, সেখান থেকে রস আর খাদ্য গ্রহণ করেই ওঠে বেঁচে, হয় পল্লবিত। কাজেই বিদেশের যে কোন ভাব তরঙ্গ আমাদের মনে দোলা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক বটে কিন্তু তা আমাদের শিল্প-কর্মের সহজাত অবলম্বন হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। দেখা গেছে যতবারই এ চেষ্টা হয়েছে ততবারই তা হয়েছে ব্যর্থ।

লেখকের ব্যবহারিক জীবনে আর তাঁর শিল্প-সত্তায় যে কিছুটা পার্থক্য নেই তা নয়-তা হলেও তাঁর ভাব বস্তু যদি তাঁর কাছে 'বিজাতি' থেকে যায় তা নিয়ে সার্থক শিল্প-সৃষ্টি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বিদেশী জীবন বা সাহিত্য থেকে আহরিত ভাব-চেতনা এমনকি আঙ্গিক চেতনাও আমাদের অনেকের কাছে 'বিজাতি'-ই থেকে যায়। এমন ভাব-চেতনা নিয়ে কিছুটা আকাশকুসুম হয়তো রচিত হতে পারে কিন্তু সাহিত্যের পুষ্পোদ্যান রচিত হয় না। যে পরিবেশ-চেতনায় লেখকের শিল্পী-সত্তার বিকাশ ঘটে সেটাকে অতিক্রম করে যে শিল্প-কর্ম তাতে কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ অনিবার্য। শিল্পের পক্ষে কৃত্রিমতা সবচেয়ে মারাত্মক।

নানা অভিঘাতে মানুষ অহরহই পরিবর্তিত হচ্ছে— কিন্তু এ পরিবর্তন যতখানি বাহ্যিক ততখানি অভ্যন্তরীণ নয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন অত সহজে ঘটে না। সাহেবী পোশাক পরে বাইরে সাহেব হওয়া অতি সোজা ব্যাপার কিন্তু মনের দিক দিয়ে সাহেব হওয়া অত সহজ নয়, এমনকি অসম্ভবও বলা যায়। অথচ মনই সৃষ্টি করে সব রকম সাহিত্য আর শিল্প কর্ম। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহের একটা লক্ষণ হতে পারে, এ লক্ষণ আমাদের অনেকের রচনায় আছে কিন্তু মনে-প্রাণে পুরোপুরি বিদ্রোহী না হলে সাহিত্যে সত্যিকার বিদ্রোহ আমদানি সম্ভব নয় কিছুতেই। রাজনৈতিক আর সামাজিক বিদ্রোহের চেয়ে সাহিত্যের বিদ্রোহ স্বতন্ত্র। এর উৎস-মূল শিল্পীর অভ্যন্তরীণ সত্তায়— আর এর অভিব্যক্তি নবতর ভাব-চেতনায় আর তার রূপায়ণে।

দুই

সব সাহিত্য শিল্পই সভ্যতার উপকরণ— লেখক আর শিল্পীরা সভ্যতা-নির্মাতা আর সভ্যতার কারিগর। মহৎ সাহিত্য-কর্মের ওপরই রচিত হয় সব রকম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিৎ। মহৎ সাহিত্য মানে মানবাত্মার উদঘাটন ও অভিব্যক্তি। ব্যক্তি আর সমষ্টিগত সব মানুষের জীবনেই বাইরের সঙ্গে ভিতরের দ্বন্দ্ব এক চিরকেলে ব্যাপার— বাহ্যিক জীবনের দাবি আর অভ্যন্তরীণ জীবনের চাহিদা বা আকুতির সংঘর্ষ যেমন অনিবার্য তেমনি তার সমাধান সন্ধানও মানুষের অবিরাম সাধনা। অতীত বা বর্তমান সব মহৎ সাহিত্যে ...

সাধনাই প্রতিফলিত। এর সমাধানের পথে বিদ্রোহেরও আবির্ভাব! এ বিদ্রোহ যখন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয় অথবা রচনা আর শিল্পকর্মে যখন তারই সার্থক প্রতিফলন ঘটে তখনই তাকে 'বিদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এ বিদ্রোহ মানবাত্মারই অনুষঙ্গ, সভ্যতারই অঙ্গ। এছাড়া সভ্যতা এগুতে পারে না, পারে না হতে নবায়িত। স্থির, স্থাণু, আর একটা অচলায়তনে বাঁধা পড়া কখনো সভ্যতার আদর্শ নয়। সভ্যতাকে সচল ও সজীব রাখার জন্যেই বিদ্রোহ অত্যাবশ্যক— সভ্যতার প্রধান বাহন সাহিত্য বলে তাতেই রূপায়িত হয় এ বিদ্রোহ সর্বাগ্রে। এ কারণেই উন্নত সাহিত্যে, বলাবাহুল্য উন্নত সাহিত্য মানে উন্নত সমাজও— বারে বারেই বিদ্রোহ দেখা দেয় যার ফলে তা হয়ে ওঠে প্রাণ-চঞ্চলও চলিষ্ণু। তখনই দেখা দেয় সাহিত্যে নবতর ফসল— যা স্বাদে, ভংঙ্গিতে আর বৈচিত্র্যে পূর্ববর্তীদের থেকে আলাদা।

বলা হয়ে থাকে গ্রিক সভ্যতাই আধুনিক সভ্যতার জনক। তার আগে মানুষের ভাবনা-চিন্তা আর সব রকম উপলব্ধি ছিল অশরীরী, অপার্থিব আর অপৌরুষের চেতনায় সীমাবদ্ধ। গ্রিকরাই প্রথম ফিরে তাকায় মানুষের দিকে। মানুষের মন আর মনের অসীম দিগন্তরেখার পানে। মন আর আত্মা এ দুয়ের অধিকারী বলেই মানুষ, মানুষ। তার স্বাতন্ত্র্য আর শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণে। এ দুয়েরই চর্চা গ্রিক সভ্যতার অবদান পরবর্তী ইউরোপীয় সভ্যতাও গড়ে উঠেছে এ পথের অনুসরণ করেই। 'The Greeks were the first intellectualists. In a world where the irrational had played the chief role, they came forward as the protogonists of the mind." (Edith Hamilton. The Greek Way to Western Civilization.)

অন্যত্র : "Mind and spirit together make up chat which separates us from the rest of the animal world, that which enables a man to know the truth and that which enables him to die for the truth. (ঐ)

মননশীলতার সূচনা যেমন এখান থেকে তেমনি মননশীলতার ফলে যে স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব যা সব বিদ্রোহের মূল কারণ, তারও শুরু তখন থেকেই। ফলে যুক্তিহীন স্বৈরাচারী ও নির্মম পৌরহিত্যতন্ত্রের যে শুধু অবসান ঘটল তা নয়, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য-বিজ্ঞান, শিল্প ও রাষ্ট্রতন্ত্রেও দেখা দিল নতুন ধ্যান-ধারণা, নতুন রূপ ও চেহারা। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রেরও আবির্ভাব এ কালে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানে স্বতন্ত্র চিন্তা— আর স্বতন্ত্র চিন্তাই জন্ম দেয় শিল্প-সাহিত্য, দর্শন আর বিজ্ঞানের, যা সব সভ্যতার পাদপীঠ। গ্রিকরা মনের আবিষ্কার করেছে, মনের বিচিত্র ফসলে তাদের সভ্যতাও হয়েছে সমৃদ্ধ। মনকে আবিষ্কার করা বা খুঁজে পাওয়া মানে জীবনকে খুঁজে পাওয়া— জীবনের আনন্দ আর উল্লাসকে ফিরে পাওয়া। গ্রিক সভ্যতায় জীবনের আনন্দেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে নানাভাবে। এ সভ্যতার ভাব-সন্তান বলে ইউরোপীয় সভ্যতায়ও আমরা জীবনের বিচিত্র আনন্দেরই প্রকাশ দেখতে পাই।

আমাদের মুশকিল, আমাদের সভ্যতা জীবনমুখী নয় অনেকখানি পরলোকমুখী। ফলে জীবনের বিচিত্র বিকাশ আর তার আনন্দের প্রকাশ আমাদের সভ্যতায় তেমন ঘটেনি।

সভ্যতায় না ঘটা মানে সাহিত্য-শিল্পেও না ঘটা। এ যুগেও আমাদের সমাজ যতখানি অনুষ্ঠান-অনুরাগী ততখানি জীবনপ্রেমিক নয়। মন আমাদের অনেকখানি একই বৃত্তরেখায় বাঁধা। আমাদের সাহিত্যিক-শিল্পীরাও এ বৃত্তরেখা ডিঙিয়ে যেতে পারে না— না পারার কারণ উপরে উল্লেখিত হয়েছে। মন যদি অবাধে বিচরণ করতে না পারে আর না পারে তাকে অবাধে প্রকাশ করতে, সেখানে জীবন চেতনা তথা জীবনের আনন্দের প্রকাশও অবাধ হতে পারে না। আমাদের এ সীমাবদ্ধতাই আমাদের বিদ্রোহের প্রতিকূল এ যুগে আধুনিকতার পথেই সাহিত্যে বিদ্রোহের আবির্ভাব— আধুনিকতা মানে সমকালীন জীবনের ও জীবনের সমস্যার মুখোমুখী হওয়া। উন্মুক্ত চোখে তার নগ্ন রূপটা দেখে নেওয়া আর তাকে শিল্পায়িত করা। এ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে আমাদের আধুনিকতাও হচ্ছে না খাঁটি। ফলে বলিষ্ঠ কোন বিদ্রোহের সুরও আমরা শুনতে পাচ্ছি না আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে। মনে হয় বিদ্রোহী সাহিত্য-শিল্পীর জন্য আমাদের আরো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

বিদ্রোহ বলিষ্ঠ জীবন আর জীবনমুখী দর্শনেরই অভিব্যক্তি— আমাদের জীবন তার বিপরীত। কবর না সমাধিসৌধের যত কদর আমাদের সমাজে তার সিকির সিকিও রঙ্গমঞ্চের নয়। বলাবাহুল্য সমাধিসৌধ পরলোকমুখী দর্শনেরই প্রতীক আর রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার জীবনমুখী দর্শনের।

মার্চ. ১৯৬৮